মাসুদ রানা

কে কেন কিভাবে

কুচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন



দুটি বই একত্রে

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কে কেন কিভাবে

মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম থেকে
সবাইকে জানিয়ে সবার চোখের সামনে দিয়ে
পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। কিন্তু কেউ জানে না
'কে' করছে কাজটা, 'কেন' হেঁচকি তুলছে
কমপিউটর, 'কিভাবে' আত্মসাৎ করা সম্ভব
এতগুলো টাকা।

কুচক্র

সার্কভুক্ত দেশগুলোকে লুটেপুটে খাবার জন্যে
অত্যন্ত শক্তিশালী এক সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে-
বিজনেস সিন্ডিকেট।

বাংলাদেশ থেকে টপ সিক্রেট একটি মূল্যবান ফর্মুলা
বের করে নিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু কি করে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

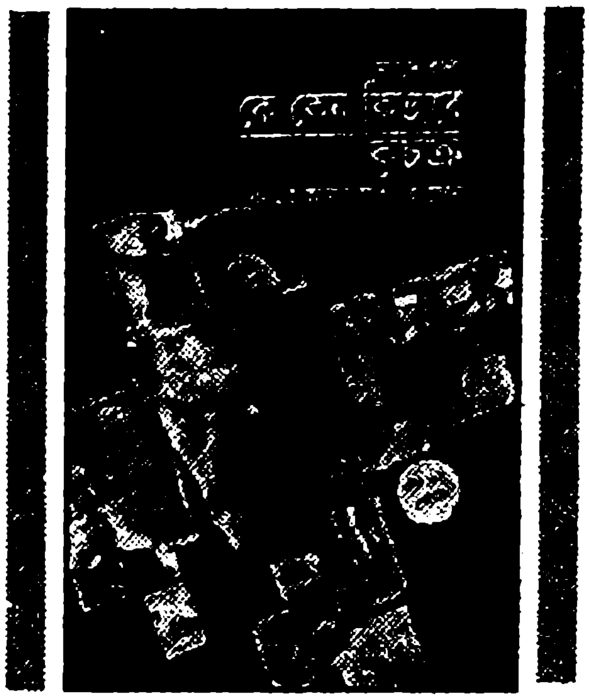
মাসুদ রানা

কে কেন কিভাবে

কুচক্র

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7619-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
KE KANO KIBHABEY

KUCHAKRO
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

উনআশি টাকা

কে কেন কিভাবে: ৫-১৪৩

কুচক্র: ১৪৪-৩০৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংসে পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হংকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ বাঘীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয় সংকেত-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ কিংব্যাক+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মৃত্যুযন্ত্র+সুরবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২,(একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ফাঁসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সংকট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চক্রদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ বুইড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুইন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-

কে কেন কিভাবে

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৮৯

এক

মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম-এর জুরিখ হেডকোয়ার্টার। নিজের অফিসে বসে রয়েছে হেনরি নামফি। জানালার বাইরে লেক আর ফেরিবোটগুলো দেখছে। হতভম্ব নামফি বোট বা লেকের কথা ভাবছে না, তার মন চলে গেছে বহুদূর নিউ ইয়র্কে। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল্ সেকশন, নিউ ইয়র্কে কাজ করছিল সে, প্রমোশন পেয়ে অ্যাকাউন্টস স্ক্রুটিনি জুরিখে চলে আসে, নিজের কাজ এবং ডেস্ক তুলে দিয়ে আসে টিনা সিরিল-এর হাতে। টিনা সিরিল ব্রুকলিনের মেয়ে, সে-জন্যেই বোধহয় আর দশটা আমেরিকান মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে আর চালাক-চতুর। সেই টিনা সিরিল তার কাজে একটা ভুল করেছে।

ছোট্ট একটা ভুল। মিটারের বদলে পড়া হয়েছে ফুট। সাউথ উইলিয়ামসবার্গ, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস থেকে স্টেনলেস স্টীল টিউব কিনেছিল মিডো, মাপটা মিটারের বদলে ফুট ধরায় পাওনার চেয়ে তিনগুণ বেশি দাম পেয়ে গেছে ডেল্টা টিউবস। বিশালবপু মিডো স্টীলের প্রকাণ্ড বাজেটের কথা মনে রাখলে বেরিয়ে যাওয়া অতিরিক্ত টাকার অঙ্কটা নেহাতই নগণ্য, এবং গরমিলটা ধরা পড়ার সম্ভাবনা দশ লক্ষ ভাগের মাত্র এক ভাগ। কিন্তু হেনরি নামফির রয়েছে কমপিউটরতুল্য স্মরণশক্তি, আর তাছাড়া ডেল্টা টিউবস-এর সাথে চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করার সময় সে নিজেও উপস্থিত ছিল। তার পরিষ্কার মনে আছে টিউবের দাম ধরা হয় মিটারের হিসেবে। কিন্তু ফুট হিসেবে পেমেন্ট দেয়ায় অতিরিক্ত সাতাশ হাজার মার্কিন ডলার বেরিয়ে গেছে। হেনরি নামফি শুধু হতভম্ব নয়, উদ্বিগ্নও বটে—এ-ধরনের ভুল করার মেয়ে টিনা সিরিল নয়। তাহলে?

তার টেলিফোনে আলো জ্বলে উঠল। রিসিভার তোলার পর অপারেটর বলল, 'নিউ ইয়র্ক, এক্সটেনশন টু সেভেন থ্রী নাইন।'

অপরপ্রান্ত থেকে এরপর টিনা সিরিলের কণ্ঠ ভেসে এল, 'অ্যাকাউন্টস পেয়েবল্, টিনা সিরিল।'

'এই কি সেই টিনা যার কখনও ভুল হয় না?' কৌতুক করার সুযোগটা ছাড়ল না নামফি, এ-ধরনের একটা প্রসঙ্গ তোলার জন্যে রসিকতা খুব সাহায্য করে।

'চিনেছি, তুমি সেই লেজবিশিষ্ট হনুমান…'

'হনুমান হলেও লেজটা এত বড় নয় যে মিটারের বদলে ফুট দিয়ে মাপতে হবে,' বলল নামফি।

সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠল টিনা সিরিল। 'মিটারের বদলে ফুট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল্-এ। সেরেছে, সেরকম কিছু ঘটলে মোটা রকমের গচ্চা দিতে হবে…'

'হয়েছেও তাই। ডেল্টা টিউবস–ইনভয়েস সেভেন থ্রী ফাইভ ফুলস্টপ নিউ ইয়র্ক ফুলস্টপ ডাবল ও ওয়ান সিক্স টু। সাতাশ হাজার ডলার বেশি দেয়া হয়েছে।'

নামফি শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু জানে এরইমধ্যে কমপিউটারাইজড্ ফাইলিং সিস্টেমের বোতাম টিপতে শুরু করেছে টিনা সিরিল, ইনভয়েস নাম্বার দেয়ায় কমপিউটর তার সামনের মনিটর স্ক্রীনে ফুটিয়ে তুলেছে ট্র্যানজ্যাকশন প্রিন্টআউট। নিউ ইয়র্কে থাকার সময় সে নিজে সিস্টেমটা চালু করেছিল।

'এই তো, স্ক্রীনে দেখতে পাচ্ছি,' বলল টিনা সিরিল। 'সবই তো চেক করা হয়েছে...'

'চেক করা তো হবেই, তা না হলে ডিপার্টমেন্ট অডিটররা ব্যাপারটা ধরত। কিন্তু দাম ধরা হয়েছিল প্রতি মিটার হিসেবে, বুঝলে, প্রতি ফুট হিসেবে নয়।'

'কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি ডেলিভারি দেয়া হয়েছে ফুট হিসেবে।'

'শোনো, টিনা। চুক্তিপত্র সই হবার সময় আমি ছিলাম। পরিষ্কার মনে আছে, ব্যাপারটা প্রতি মিটার হিসেবে। খুব সহজেই চেক করে দেখতে পারো তুমি। এখুনি যদি তুমি তোমার...'

'জানি, বলতে হবে না। এ.পি.আই. ডাটা বেস-এর সাহায্য নিচ্ছি। অপেক্ষা করো, দেখি খালি পাওয়া যায় কিনা।'

কী-বোর্ডের বোতাম টিপছে টিনা সিরিল, এবার শব্দটা শুনতে পেল নামফি। ডাটা বেস-এ চোখ বোলানোর অনুরোধ করছে সে, যেটার 'মেমোরি'-তে অরিজিনাল ট্র্যানজ্যাকশন রেকর্ড করা আছে। নিউ ইয়র্ক অফিসের তিন নম্বর সাব বেসমেন্টে রয়েছে দৈত্যাকার কমপিউটর, অনুরোধটা গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেবে 'স্লেভ' অপারেশনে। টিনা যেটা চেয়েছে সেটা পাবার জন্যে সাজিয়ে রাখা ডাটা বেসগুলোর ভেতর সন্ধান চালাবে স্লেভ। এরইমধ্যে সেটা যদি সাজিয়ে রাখা হয়ে থাকে, সাথে সাথে চাক্ষুষ বা হস্তগত করার অনুমোদিত অধিকার টিনা সিরিলের রয়েছে। তার অফিসের লাইন কোড করা, সাঙ্কেতিক সংখ্যা জানা না থাকলে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তার কাছে চাবি আছে, প্রতিদিন সকালে ইমিডিয়েট বসের কাছ থেকে পায়।

'ডাটা বেস সাজিয়ে রাখা হয়েছে,' টেলিফোনে নামফিকে জানাল টিনা সিরিল। অপেক্ষা করছে নামফি, কল্পনায় দেখতে পেল মেয়েটা ইনভয়েস আর ট্র্যানজ্যাকশন কোড রেফারেন্স জানাবার জন্যে কী-বোর্ড অপারেট করছে। এবার স্লেভ কমপিউটর সংশ্লিষ্ট ডাটা বেস-এ সন্ধান চালাবে, ওটা থেকে পাওয়া ইনফরমেশন প্রিন্ট করবে, পাঠিয়ে দেবে মাস্টার কমপিউটরে। মাস্টার কমপিউটর পরীক্ষা করে দেখবে টিনা সিরিল ঠিক এই জিনিসটার জন্যেই অনুরোধ করেছিল কিনা, তারপর টিনা সিরিলের কোড করা নির্দেশ অনুসারে একটা প্রিন্ট আউট সেকশনে পাঠিয়ে দেবে সেটা।

হঠাৎ আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেল হেনরি নামফি। তারপর শুনতে পেল টিনা সিরিল বলছে, 'ওহ্, মাই গড!' অথচ তার খুব ভাল করেই জানা আছে মেয়েটা ধর্ম ইত্যাদি মানে না।

'কি হলো...?'

'তুমি বিশ্বাস করবে না, হেনরি! ডাটা বেস মুছে ফেলা হয়েছে। কোন

ইনফরমেশনই নেই। তার বদলে একটা কথা...'
'কথা? কি কথা?'
'প্ল্যাটন থেকে সরাসরি পড়ছি, হেনরি। আমাদের ফাইল নম্বরটা ঠিক আছে, আর তারপর...'
'তারপর কি? ধুত্তোর, সিরিল, তুমি দেখছি...'
'তারপর: মিডো স্টীল, বলো তো, কে তোমাদের বাঁশ দিচ্ছে?'

গাড়ি নিয়ে নিউ ইয়র্কের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় চলে এল চার্লি ফ্রানসি। দরজায় তালা, জানালার কাচ তোলা, চারদিকে তাকাচ্ছে। নোংরা পরিবেশ, রাস্তার ধারে আবর্জনার উঁচু স্তূপ। যে-ক'বার সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল, ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পরা লোকজন হাতে ন্যাকড়া নিয়ে ছুটে এল গাড়ির দিকে, উইন্ডস্ক্রীন মুছে দিয়ে দু'পয়সা কামাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। এক সময় একটা লোককে পছন্দ হলো চার্লি ফ্রানসির। টলতে দেখে বোঝা গেল মাতাল হয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে জানালার কাচ নামাল সে।

বলল, 'মদ খাবে? কথা বলার জন্যে একজনকে দরকার আমার।'

খুশিতে গলে গেল লোকটা। এ-ধরনের অনুরোধ মাঝে মধ্যে সাধারণত মধ্যবয়স্কা চর্বি থলথলে মহিলাদের কাছ থেকে আসে। এ ভদ্রলোক ব্যতিক্রম, সম্ভবত খুব কষ্টকর মানসিক যন্ত্রণার ভেতর আছে। ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন, ভাবল সে, এক-আধ ঘণ্টা সঙ্গ দেয়ার বিনিময়ে ভাল বকশিশ পাওয়া যাবে। তবু, লাইটপোস্টের আলোয় গাড়ির ভেতরটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করল সে। কাগজের ব্যাগ থেকে বের করে হুইস্কির একটা বোতল দেখাল চার্লি ফ্রানসি।

'মদ খাবে, নাকি খাবে না?' বিরক্ত সুরে জিজ্ঞেস করল সে। 'খেলে উঠে এসো। তোমার জন্যে এখানে আমি সারারাত অপেক্ষা করতে পারব না।'

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে গাড়িতে উঠে বসল লোকটা। 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, মনে শান্তি দিন,' বিড়বিড় করে বলল সে। কথা না বলে বাঁ দিকে বাঁক নিল চার্লি ফ্রানসি, জানালা খোলা রেখে ইস্ট রিভারের দিকে যাচ্ছে।

'পৌছুতে কতক্ষণ লাগবে?' এক সময় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'বোতলটা কখন আমি হাতে পাব?'

দ্বিতীয় কাগজের ব্যাগে ছ'টা বিয়ারের ক্যান রয়েছে, তার একটা বের করে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি। পরিত্যক্ত জেটির কাছাকাছি, প্রবেশপথের মুখে গাড়ি থামাল সে, এক সময় নিকিতা ক্রুশ্চেভ এখানে পায়ের ধুলো ফেলেছিলেন। ভাঙা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। নদীতে বোট চলাচল করছে, অন্ধকারের ভেতর ঢেউয়ের দোলায় দুলছে আলোগুলো। মাঝরাতের দিকে প্রায় খালি হয়ে যাবে নদী, তার আর বেশি দেরিও নেই। ওদের পিছনে আর মাথার ওপর হাইওয়েতে সাঁ সাঁ করে ছুটছে গাড়ির মিছিল, কংক্রিটের জেটিতে হেডলাইটের আলো কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি সৃষ্টি করছে। জেটির কিনারায় তারের বেড়া থাকলেও, লোনা পানির ছিটা লেগে মরচে ধরে গেছে, কোথাও কোথাও বেড়ার অস্তিত্বই নেই। বেড়া নেই এরকম একটা জায়গায় পানির দিকে পা ঝুলিয়ে বসল

ওরা, পিছনে গোটা ম্যানহ্যাটন জেগে থাকলেও ওদের আশপাশে অটুট নিস্তব্ধতা। যে-সব তথ্য চার্লি ফ্রানসির দরকার সেগুলো পেতে সব ক'টা বিয়ার আর আধ বোতল হুইস্কি খরচ হয়ে গেল। লোকটার নাম, কোথায় জন্মেছে, তার সোশাল সিকিউরিটি নাম্বার, মা-বাবার আর জন্মস্থানের নাম। লোকটা থার্ড জেনারেশন আমেরিকান শুনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল চার্লি ফ্রানসি। গায়ে গলানো কাপড়টাকে এখন আর শার্ট বলা চলে না, সেটার পকেট থেকে সোশাল সিকিউরিটি কার্ডটাও বেরুল। সব তথ্য পাবার পর হুইস্কির বোতলটা লোকটার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

বলল, 'মেকোগান, ইন্ডিয়ানার লী হার্ভে, তোমার দুঃখ ভরা জীবনবৃত্তান্ত শোনার পর নিজের সব দুঃখ ভুলে গেছি আমি। খাও, ভাই, হুইস্কিটুকু খেয়ে সব ভুলে যাবার চেষ্টা করো।'

সিকিউরিটি কার্ডটা এখনও তার হাতে রয়েছে, ছাপা অক্ষরগুলো কোন রকমে পড়া যায়। প্লাস্টিকের মোড়কের ভেতর আরও রয়েছে লী হার্ভের সাথে তোলা তার আট বছরের মেয়ে শার্লটের ফটো। ফটোটা দেখছে সে, লী হার্ভে চোখের পানি মুছে বলল, 'এই মেয়ের কথাই বলছিলাম, স্যার। দেবীর মত নিষ্পাপ, কিন্তু অকালে ঝরে পড়ল...' বাকি হুইস্কিটুকু খাবার পর তার কান্না থামল। খালি বোতলটা নদীতে ফেলে দিল চার্লি ফ্রানসি, দেখল ডুবে যাবার আগে কয়েক সেকেন্ড ভেসে থাকল ওটা। তারপর ব্র্যান্ডির বোতলটা খুলল সে।

অত্যন্ত দামী ব্র্যান্ডি, জীবনে চোখেও দেখেনি লী হার্ভে। বোতলটা অর্ধেক খালি হওয়ার আগেই জ্ঞান হারাল সে। বোতলটার সাথে লী হার্ভেকেও নদীতে ফেলে দিল চার্লি ফ্রানসি। ডুবে যাবার আগে লী হার্ভেও ভেসে থাকল কিছুক্ষণ।

দুই

সোরিন বাবি মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের প্রধান হিসাবরক্ষক। হেড অফিস জুরিখে তার অফিস কামরাটা সব রকম বাহুল্যবর্জিত—সাদা দেয়ালে ঘড়ি, ক্যালেন্ডার, ছবি ইত্যাদি কিছুই নেই। স্টেনলেস স্টীলের ডেস্ক কালো ল্যামিনেট-এ মোড়া। ডেস্কের পিছনের চেয়ারটাও কালো, চেয়ারের পিঠ কাঠের এবং খাড়া। একই ধরনের আরও দুটো চেয়ার রয়েছে ডেস্কের সামনে ভিজিটরদের জন্যে। ডেস্কের ওপর কয়েকটা মনিটর স্ক্রীন, বিল্ডিংটার সাব-বেসমেন্ট থেকে মিডো কমপিউটর ওগুলোর খোরাক যোগান দেয়। একই ধরনের মনিটর স্ক্রীন রয়েছে দেয়ালগুলোতেও, শুধু বোতামে চাপ দিয়ে এক স্ক্রীন থেকে আরেক স্ক্রীনে স্থানান্তরিত করা যায় যে-কোন ইমেজ। তার ডেস্কের বাঁ দিকে রয়েছে টাইপরাইটার কী-বোর্ড, ওটার সাথেই রয়েছে একটা টেলিফোন ডায়ালিং সিস্টেম, ফলে এই কী-বোর্ডের সাহায্যে সোরিন বাবি 'কথা বলতে' পারে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের বসানো কয়েকটা কমপিউটরের সাথে। দুটো ম্যাগনেটিক কী-র সাহায্যে চালু করা যায় কী-বোর্ড। একটা চাবি সোরিন বাবি তার চশমার ডাঁটিতে বয়ে বেড়ায়, দ্বিতীয় চাবিটা রাতের

বেলা রাখা হয় মিডো স্টীলের ভল্টে।

ডেস্কের সামনে শক্ত একটা চেয়ারে বসে আছে হেনরি নামফি। সোরিন বাবি তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে, যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। দুনিয়া জুড়ে মিডো স্টীলের সাজানো বা তৈরি করা ডাটা বেস তল্লাশি চালাতে এবং পরীক্ষা করার জন্যে প্রিন্ট করতে সময় লেগেছে মাত্র এক ঘণ্টা। 'কে তোমাদের বাঁশ দিচ্ছে?' এই প্রশ্নটা পাঁচবার পাওয়া গেছে, প্রতিটি সংশ্লিষ্ট দেশের স্থানীয় ভাষায়। কেউ একজন গত এক বছরে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে সব মিলিয়ে পৌনে এক মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি বের করে নিয়ে গেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রে টাকাগুলো জমা পড়েছে মর্যাদা এবং সুখ্যাতি আছে এমন সব সাপ্লাইয়ার কোম্পানীর অ্যাকাউন্টে।

'পাঁচ-সাত বছর ধরে ইউনিক প্রিন্টিং-কে দিয়ে কাজ করাচ্ছি আমরা,' সোরিন বাবি বলল। 'অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক, অথচ দেখে শুনে মনে হচ্ছে প্রায় আশি হাজার পাউন্ড ওরা আমাদের কাছ থেকে ডাকাতি করে নিয়ে গেছে।'

'এক্সকিউজ মি, মি. বাবি,' বলল হেনরি নামফি। 'ব্যাপারটা ঠিক ওরকম নয়। ওরা আমাদেরকে একটা ইনভয়েস দিয়েছে এই বিশ্বাসে যে ওতে কোন ভুল নেই, আমরাও সেটা দেখে পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছি। আমাদের রিটার্ন ট্র্যানজ্যাকশনে দেখা যাচ্ছে পেমেন্টটা ওরা রিসিভ করেছে, কোন রকম উচ্চবাচ্য করেনি। আমাদের ফাইল বলছে, চেকটা ঠিকভাবেই মিডো ব্যাংকে পেশ করা হয়, ফলে ইউনিক প্রিন্টিং টাকাটা পেয়ে গেছে। আত্মসাতের ঘটনাটা অবশ্য ইউনিক প্রিন্টিং থেকেই ঘটেছে...'

'এবং অবশ্যই মিডোর কারও কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেয়ে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সোরিন বাবি। কী-বোর্ডের কয়েকটা বোতামে চাপ দিল সে। এক মিনিট পর একটা আলো জ্বলে উঠল। আরেকটা বোতামে চাপ দিল সে, ডেস্কটপে লুকানো স্পীকার থেকে ভেসে এল অপারেটরের কণ্ঠস্বর, 'আপনার কল, মি. বাবি, ইউনিক প্রিন্টিঙের সাথে কথা বলুন।'

স্বাভাবিক গলায় কথা বলল সোরিন বাবি, জানে মাইক্রোফোন ঠিকমতই পৌঁছে দেবে। 'স্টিফেন?' জিজ্ঞেস করল সে। 'সোরিন বাবি।'

'আরে, হ্যালো, সোরিন? তুমি ইংল্যান্ডে নাকি...?'

'না, আমার অফিস জুরিখে...'

'ভাবলাম তুমি বুঝি লাঞ্চের দাওয়াত দেবে। তোমার গলা এত পরিষ্কার...'

'ঠিক ধরেছ, লাঞ্চ খেতেই ডাকছি বটে, তবে জুরিখে।'

'ওহ্ গড, কী সৌভাগ্য! কিন্তু হায়, এক দণ্ড সময় নেই...'

'আরে রাখো। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের হেলিকপ্টার, বুঝলে। কোম্পানীর প্লেনে করে সরাসরি চলে এসো...'

'আলফা, তোমাদের আলফা? সোরিন, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি বলো তো? অনেক দিনের ইচ্ছে তোমাদের একটা আলফায় চড়ব। কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো?'

'আগে এসোই তো! তাহলে সে-কথাই রইল। একটার দিকে দেখা হবে

তোমার সাথে।'

'তোমরা টাইকুনরা কখন যে কি করো!' স্টিফেন ব্লোচার সোরিন বাবিকে ভাল করেই চেনে, জানে এই মুহূর্তে কোন প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে না। আলফা পাঠিয়ে তাকে যখন জুরিখে নিয়ে যেতে চাইছে, গুরুতর কিছু একটা না ঘটেই পারে না। যেতে তাকে অবশ্যই হবে।

ঘটনাচক্রে ভিক্টর মার্জিন জুরিখেই ছিল, লাঞ্চে সে-ও ওদের সাথে যোগ দিল।

লন্ডনে বসে সোরিন বাবির সাথে টেলিফোনে কথা বলল স্টিফেন ব্লোচার, কয়েক মিনিট পরই মিডোর একজন লোক ইউনিক প্রিন্টিঙে পৌঁছে ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে দেখা করতে চাইল। সেই সাক্ষাৎকারের ফলশ্রুতিতে স্টিফেন ব্লোচার অ্যাকাউন্টস ফাইলটা সাথে করে জুরিখে নিয়ে এল। লাঞ্চের অর্ডার দেয়া হয়েছে, এই ফাঁকে ফাইলটা পড়ে নিল ভিক্টর মার্জিন।

হার্ভার্ড থেকে পাস করেছে ভিক্টর মার্জিন, বয়স পঞ্চাশ, মিডোর ম্যাথামেটিক্যাল জিনিয়াস নামে খ্যাতি আছে তার। মিডো বোর্ড-এর চেয়ারপারসন লিনা অটারম্যানের ফিন্যানশিয়াল অ্যাডভাইজার সে। ফাইল পড়া শেষ করে মুখ তুলল, স্টিফেন ব্লোচারকে জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পেরেছ কিভাবে কি করা হয়েছে?' ধরেই নিয়েছে, ত্রিশ মিনিট প্লেনে থাকার সময় ফাইলটা পড়েছে সে। স্টিফেন ব্লোচার মাথা ঝাঁকাল।

লাঞ্চ পরিবেশন করার পর কথা বলল, 'সত্যি আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। অবশ্যই আমরা অতিরিক্ত টাকাটা ফিরিয়ে দেব, ইন্টারেস্ট সহ।'

সোরিন বাবি ফাইলটা দেখেনি। ভিক্টর মার্জিন ব্যাখ্যা করল। 'দশম বার্ষিকী উপলক্ষে পুস্তিকাটা ওদেরকে আমরা ছাপতে দিয়েছিলাম। ওরা আমাদেরকে একটা সেটিং প্রাইস আর একটা প্রিন্টিং প্রাইস জানায়, পরবর্তী প্রতি হাজার ছাপলে রেট কি হবে তাও বলে দেয়। শুধু যদি এক হাজার ছাপা হয়, বিল হবে দু'হাজার সাতশো পাউন্ড স্টার্লিং। আমরা যদি দশ হাজার পর্যন্ত "রান অন"-এর অর্ডার দেই, বিলের সাথে মাত্র তিন হাজার পাউন্ড স্টার্লিং যোগ হবে কারণ এরইমধ্যে আমরা টাইপসেটিঙের খরচা দিয়ে রেখেছি। বলাই বাহুল্য, এই প্রাইস স্ট্রাকচারে আমরা রাজি হই।'

'প্রিন্টিং ব্যবসায় এটা একটা সাধারণ নিয়ম,' বলল স্টিফেন ব্লোচার।

'কিন্তু আমরা যখন ফাইন্যাল বিলটা পেলাম, দেখা গেল "রান অন" প্রাইসের যেন কোন অস্তিত্বই নেই,' বলল সোরিন বাবি।

'হ্যাঁ, তাই ঘটেছে,' ভিক্টর মার্জিন প্লেটে ফর্ক রেখে দিয়ে বলল। 'এক হাজার ছাপতে যে টাকা লাগল, দশ হাজার ছাপতে লাগল তার ঠিক দশগুণ।'

সোরিন বাবি কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল, তারও খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। 'ব্যাপারটা আমি বুঝছি না,' বলল সে, বিস্ময় কাটছে না। 'এই অসঙ্গতি কমপিউটারে ধরা পড়েনি কেন? চুক্তিপত্র যখন চূড়ান্ত হলো নিশ্চয়ই তখন চুক্তিপত্রের শর্তগুলো একটা ডাটা বেসে তুলে রাখা হয়েছে। হিসাবটা অনুমোদন পাবার পর চেক রেডি করা হয়, তার আগে চুক্তির শর্তগুলো দেখে নেয়ার নিয়ম আছে। ওই চুক্তিপত্রের

একটা ভেরিফিকেশন কপি অবশ্যই স্টিফেনের কাছে পাঠানো হয়েছিল, সাথে থাকার কথা কাজ শুরু করার জন্যে আমাদের অনুমোদন।'

'ঠিক,' বলল ভিক্টর মার্জিন। স্টিফেন ব্লোচারের ফাইল থেকে একটা ডকুমেন্ট বের করল সে। 'এই তো সেটা।'

ডকুমেন্টটা নিয়ে চোখ বোলাল সোরিন বাবি।

'বুঝতে পারছ কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল ভিক্টর মার্জিন। 'কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন থেকে রান-অন প্রাইস বাদ দেয়া হয়েছে। স্বভাবতই কমপিউটর যদি পড়ে প্রতি হাজারে দু'হাজার সাতশো পাউন্ড স্টার্লিং, পে-ও করবে দশগুণ আমরা যদি দশ হাজার ছাপি। তোমার অ্যাকাউন্ট সেকশন কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন পড়েছে, রান-অন টার্মস ছিল না তাতে। তাদের চোখে কোন ত্রুটি ধরা পড়ার কথা নয়, ভেরিফিকেশন দেখে হিসেবটা অনুমোদন করেছে তারা।'

'কিন্তু ইউনিক প্রিন্টিঙের কারও চোখে ধরা পড়ল না?'

স্টিফেন ব্লোচার গম্ভীর, আবারও সে তার ফর্ক নামিয়ে রাখল। 'বুঝতে পারছি কিরকম দেখাচ্ছে ব্যাপারটা,' বলল সে। 'কারচুপি করে টাকা মেরে দেয়ার চেষ্টা করেছি আমরা, তাই না? একটা কাজের মূল্য সম্পর্কে একমত হলাম, তারপর বিল করলাম দশগুণ, টাকাটা পেয়েও গেলাম। বাট অনেস্টলি, তোমাদের এত বেশি কাজ আমাদের করতে হয় যে মিডোর বড় চেকগুলো লেজারের মাধ্যমে পার করে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। লেজার ক্লার্ককে প্রিন্টিং সংক্রান্ত ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্যে বেতন দেয়া হয় না, কমপিউটর আর কাগজ পড়ে যা পায় তাই নিয়ে কাজ করে সে। এক্ষেত্রে কি ঘটেছে? একটা কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন পড়েছে সে, তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া। আমাদের কাছ থেকে পেয়েছে একটা ইনভয়েস। তারপর তোমরা একটা চেক পাঠিয়েছ। তিনটে জিনিসই পরস্পরের সাথে মেলে, কোথাও কোন অসঙ্গতি দেখেনি সে। কাজেই চেকটা ব্যাংকে জমা করা হয়।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে, তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আজ আমি আমার ব্যক্তিগত চেক বইটা সাথে করে নিয়ে এসেছি। তোমরা যদি আমাকে জানাও অতিরিক্ত যে টাকাটা আমরা নিয়েছি তার সুদ কত তাহলে…'

'তার কোন দরকার নেই,' শান্তভাবে বলল ভিক্টর মার্জিন। 'আমরা যাকে ধরতে চাইছি সে তুমি নও। লোকটা যে-ই হোক, সন্দেহ নেই অতিশয় পাকা চোর। ডাটা বেস থেকে কন্ট্রাক্ট ভেরিফিকেশন বদলে ফেলেছে। এক জায়গা থেকে নয়, চুরি করেছে পাঁচ জায়গা থেকে।'

মেকোগান, ইন্ডিয়ানার টাউন ক্লার্ককে টেলিফোন করল চার্লি ফ্রানসি। নিজের পরিচয় দিল লী হার্ভে। বলল, তার একটা চাকরি হতে যাচ্ছে, কাজেই বার্থ সার্টিফিকেট দরকার। টাউন ক্লার্ক লী হার্ভের বাপকে এক সময় চিনত, শুনেছে লী হার্ভের একমাত্র মেয়েটা অকালে মারা গেছে, কাজেই টেলিফোনে সদয় ব্যবহার করল সে। তাকে একটা হোটেলের ঠিকানা দিল চার্লি ফ্রানসি, বার্থ সার্টিফিকেটটা ওখানে পাঠিয়ে দিলেই সে পেয়ে যাবে। তার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো টাউন ক্লার্ক। টেলিফোন বুদ থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি। কোথাও তার

আটকাচ্ছে না, প্রতিটি কাজ সহজেই সারতে পারছে। ধনী হতে আর বেশি দেরি নেই।

তিন

ফিকে সবুজ, হালকা নীল আর কালো রঙের প্লেন; মিডোর প্রাইভেট একজিকিউটিভ জেট আলফা মার্ক টু, জুরিখের আকাশে উদয় হলো ভিন দেশী অচেনা পাখির মত। সাথে সাথে ল্যান্ড করার ক্লিয়ার‍্যান্স পেয়ে গেল পাইলট, মন্থরগতিতে গড়িয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় থামার আগেই দেখা গেল একজন কাস্টমস অফিসার সেখানে অপেক্ষা করছে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একমাত্র আরোহী মাসুদ রানা।

'এনিথিং, মি. রানা?' চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করল কাস্টমস অফিসার।

জ্যাকেটের সাইড পকেট থেকে আলতোভাবে কালো একটা বাক্স বের করে খুলল রানা।

বাক্সের ভেতরটা দেখে শিস দিল অফিসার। 'কি ওটা?' জানতে চাইল সে।

'দ্য অর্ডার অভ দ্য নীজ্‌ন্‌ অভ দ্য শেভ্যালিয়্যার দ্'ওর।'

'একটা উপহার, মি. রানা?'

'পুরস্কার বলতে পারেন···মরক্কোর বাদশা দিয়েছেন।'

'তাহলে ওটাকে ব্যক্তিগত অলঙ্কার হিসেবে বিবেচনা করা যায়,' বলল অফিসার। 'ইট'স আ বিউটিফুল থিং অ্যান্ড আ গ্রেট অনার। ইউ মাস্ট বি ভেরি প্রাউড···'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্ষীণ হাসল রানা, বিনয় সংযম এবং সামান্য গর্ব সহ তার এই ভঙ্গিতে আরও অনেক কিছু প্রকাশ পেল। টারমাকের বাকি বিস্তৃতিটুকু হেঁটে চলে এল এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের পাশে অপেক্ষারত মার্সিডিজের কাছে। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে মিডোর ইউনিফর্ম পরা শোফার, স্যালুট করল ওকে।

মাসুদ রানা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ স্পাইদের অন্যতম একজন। তার কাঁধে রয়েছে দেশমাতৃকার বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার কঠিন গুরুদায়িত্ব। অসমসাহসী এই বাঙালী যুবক জ্ঞানে-গরিমায়, শিক্ষায়-অভিজ্ঞতায়, চিন্তায়-মননে আর দশজনের চেয়ে কিছুটা আলাদা। প্রয়োজনে সে নিষ্ঠুর চণ্ডাল হতে পারে, শত্রুহননে দয়ামায়াহীন পাষাণ। তার ভেতর মিথ্যে ভান, অহঙ্কার বা স্বার্থপরতা নেই, কারণ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন সে, জানে মানুষের শ্রেষ্ঠ সুন্দর রূপটি অধিকার করার সাধনায় তাকে বিজয়ী হতে হবে। বাংলার জলবায়ুর মতই তার রয়েছে কোমল একটা মন, সবার ওপর মানুষ শ্রেষ্ঠ এই ধ্রুবসত্যে বিশ্বাস। তার রক্তে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা, গোটা অস্তিত্ব জুড়ে অজানাকে জানার অজেয়কে জয় করার দুর্মর আকুতি। অস্থির। হাতে কাজ না থাকলে মাঝে মধ্যেই ভবঘুরের মত নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে রানা, পরিচয়হীন অভিযাত্রী, কোথায় চলেছে বা কি উদ্দেশ্য নিজেরই কোন ধারণা নেই। পিছনে পড়ে থাকে তার

পরিচয়, দায়-দায়িত্ব, ঠিকানা আর যোগাযোগ। নতুন নতুন দেশে ঘুরে বেড়ায়, পরিচিত হয় বিচিত্র সব মানুষের সাথে। হাসি-আনন্দে কেটে যায় রোমাঞ্চে ভরপুর কয়েকটা দিন, আবার কখনও বা জড়িয়ে পড়ে সঙ্কট আর যুদ্ধে। তারপর একদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে, আবার কাঁধে তুলে নেয় দায়িত্ব। চলাতেই ওর আনন্দ। চলতে চলতে স্পর্শ করে জীবনকে। সঞ্চয় করে অনেক তিক্ত-মধুর স্মৃতি। মনের মণিকোঠায় অমূল্য রতনের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে আবার বেরিয়ে পড়ার একটা ব্যাকুল ইচ্ছা।

অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথেও রানা জড়িত। রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সে। রানা এজেন্সি বি.সি.আই-এরই একটা কাভার, দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে এজেন্সির শাখা রয়েছে। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন, নুমা, রেবেকার জাহাজ ব্যবসা, লিনার মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম ইত্যাদি আরও কয়েকটি সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় তাকে।

এগুলোর মধ্যে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের সাথে রানার সম্পর্ক ঠিক অফিশিয়াল নয়। ব্যারনেস লিনা অটারম্যানের সাথে রানার প্রথম পরিচয় হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করার সময়।* ব্যারন মিডো অটারম্যানের বিধবা স্ত্রী লিনার সাথে জটিল বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল রানা। লিনাকে খুন করতে যাওয়ার মুহূর্তে নিজের ভুল উপলব্ধি করে রানা, সেই থেকে অদ্ভুত এক বাঁধনে পরস্পরের সাথে জড়িয়ে পড়েছে ওরা, যে বাঁধন ওদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করে না, বা পিছুটানের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। আগে বা পরে আরও অনেক মেয়ে ভালবেসেছে রানাকে, কিন্তু ব্যারনেস লিনা তাদের সবার থেকে আলাদা। রানার প্রতি লিনার প্রেম পরিমাপ করা সম্ভব নয়, সেই সাথে রানার প্রতি তার কৃতজ্ঞতারও বুঝি কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই মিডো স্টীলের বড় একটা শেয়ার রানার নামে লিখে দিয়েছে লিনা, সেই সূত্রে মিডো বোর্ডের একজন ডিরেক্টরও বটে রানা। তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদেও থাকতে হয়েছে হেড অভ দ্য টেকনিক্যাল সেলস। তাছাড়া গোটা মিডো সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকটাও তাকে দেখতে হয়, মাঝে মধ্যেই লড়তে হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ আর স্যাবোটাজ-এর বিরুদ্ধে। মিডোর যে বিশাল আকার-আকৃতি, প্রতি বছর উৎপাদন আর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ খাতে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করতে হয়। প্রতি মাসেই মিডোর গবেষকরা নতুন কিছু না কিছু আবিষ্কার করছে, প্রতিপক্ষরাও সেগুলো গোপনে চুরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ-ধরনের অন্যান্য সমস্যা সংখ্যায় কম নয়, সামাল দেয়ার জন্যে রানা এজেন্সির কয়েকজন এজেন্টকে মিডোর বিভিন্ন কারখানায় এবং অফিসে বসানো হয়েছে। হঠাৎ মাঝে মধ্যে এমন দু'একটা সমস্যা দেখা দেয়, হালে পানি পায় না তারা, তখন ডাক পড়ে মাসুদ রানার। ডাক পেয়ে চলে আসে সে, বুদ্ধির খানিকটা ব্যায়াম হয়, সেই সাথে লিনার মধুর সঙ্গ পাবার আকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ হয়।

---

* শ্বেত সন্ত্রাস দেখুন

রানা এজেন্সির একটা কাজে মরক্কোয় ছিল রানা, কাজটা শেষ করেছে এই সময় ব্যারনেস লিনার আমন্ত্রণ পায় সে। কাজেই রাবাতে আয়োজিত অঘোষিত রাজকীয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে সরাসরি জুরিখে চলে এসেছে।

রাবাতে রানা এজেন্সি খুব জটিল একটা পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েছিল। মরক্কোর বাদশা মাসখানেক আগে ড্রাগস স্মাগলারদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর পাকড়াও অভিযান শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন আধা-সামরিক বাহিনীকে, সেই থেকে ঘটনার সূত্রপাত। গোপন সূত্রে রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে খবর আসে, স্মাগলারদের সাহায্য-পুষ্ট আধা-সামরিক, সামরিক এবং পুলিস বিভাগের কিছু অফিসার বাদশার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশী কূটনীতিকদের মাধ্যমে খবরটা জানানো হলে বাদশা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, রানা এজেন্সি যদি এই ষড়যন্ত্র বানচাল করার কাজে সিকিউরিটি ফোর্সকে সহায়তা করে তাহলে অত্যন্ত খুশি হবেন তিনি। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশ পেয়ে বাদশার প্রস্তাবটা গ্রহণ করে রানা, এবং একটানা আঠারো দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে এবং জীবনের ওপর বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে গোটা মরক্কো জুড়ে কম্বিং অপারেশন চালায়। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, জেল-হাজতে ভরা হয়েছে স্মাগলারদের, এবং সশস্ত্রবাহিনীর কিছু সদস্যকে পাঠানো হয়েছে কোর্ট-মার্শালে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় লাঞ্চ খাবার জন্যে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয় রানাকে, সেখানে বাদশা নিজ হাতে ওকে দান করেন পদকটি।

মার্সিডিজ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল শোফার, জানে সীটে রাখা মেসেজগুলো ঠিকই দেখতে পাবে রানা। এক এক করে এনভেলাপগুলো খুলল রানা। প্রথমটা, স্বভাবতই, লিনার হাতে লেখা। 'ওয়েলকাম ব্যাক, ডার্লিং। তুমি আসছ তাই সব কাজ আগেভাগে সেরে রেখেছি, যাতে আমাকে তোমার যখন যেভাবে খুশি দরকার হলেই পেতে পারো।' পরের এনভেলাপটা ওর অন্যতম সেক্রেটারি পাপিয়া রহমানের, 'ওয়েলকাম, স্যার। অগ্নিপরীক্ষার জন্যে আমি তৈরি।'

সোরিন বাবি লিখেছে, 'পৌঁছুনোর সাথে সাথে তোমার সাথে আমার দেখা হওয়াটা জরুরী।' রানা ধারণা করল এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট নিয়ে নিশ্চয়ই কোন ধাঁধায় পড়েছে বাবি। সবশেষের এনভেলাপটা ভিনসেন্ট গগলের। রানার এই অদ্ভুত পুরানো বন্ধুটিও মিডোর একজন ডিরেক্টর, মোটা টাকার শেয়ার কেনার সূত্রে। সে লিখেছে, 'কংগ্রাচুলেশন্স, শেভ্যালিয়্যার।' আপনমনে ক্ষীণ একটু হাসল রানা, জানে পুরস্কার পদক ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে গগল। মিডো বিল্ডিঙের গ্রাউন্ড ফ্লোর কার পার্কে থামল মার্সিডিজ, বোতাম চাপ দিয়ে রানা দরজা না খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল শোফার, তারপর ঢালু র‍্যাম্প বেয়ে গাড়ি নিয়ে নেমে গেল আন্ডারগ্রাউন্ড কার পার্কের দিকে। ব্যারনেস লিনার রোলস রয়েস রয়েছে ওখানে, পাশে ভিক্টর মার্জিনের লিংকন, তার পাশে একটা ডিনো ফেরারি–সম্ভবত গগলের সর্বশেষ খেলনা। লিফট কিউবিকল-এ ঢুকে দেয়ালে ফিট করা মাইক্রোফোনে নিজের নাম বলল রানা, তারপর লিফটে চড়ল।

বন্ধ হলো দরজা। কমপিউটর ওর ভয়েস-গ্রাম পড়েছে, সংরক্ষিত নমুনার সাথে মিলিয়েছে, কাজেই বোতামে চাপ দিলে লিফট সচল হবে এখন। হস্তরেখার মত প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র, আর এই লিফট শুধু যাদের কণ্ঠস্বর ডাটা ব্যাংকে রেকর্ড করা আছে সেই অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই বহন করবে। সাবলীল ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠে এল লিফট, টেকনিক্যাল সেলস ফ্লোরে নামল রানা। বাঁ দিকে ঘুরে করিডর ধরে এগোল ও, দেখা হলো না কারও সাথে। বন্ধ দরজাগুলোর ভেতর থেকে টাইপরাইটার আর হাই-স্পীড প্রিন্টারের খটাখট আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, কাজের লোকেরা সবাই খুব ব্যস্ত।

নিজের অফিসে অপেক্ষা করছিল ক্রিস্টিন ওটো। হাড় জিরজিরে পঞ্চাশোত্তীর্ণা, দক্ষ এবং চটপটে, জুরিখ অফিসে রানার দ্বিতীয় সেক্রেটারি, শুধু বৈধ সেলস-এর দিকটা দেখাশোনা করে। ওকে দেখামাত্র অসংখ্য ভাঁজ ফুটে উঠল তার চেহারায়, কেবলমাত্র আন্তরিকভাবে হাসলে ফোটে ওগুলো, এবং রানার অনুপস্থিতিতে এ-ধরনের হাসি তার মুখে দেখা গেছে এমন কোন রেকর্ড নেই। চেয়ার ছেড়ে ছুটে এল সে, অভিযোগের সুরে বলল, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার! একেবারে শুকিয়ে দেখছি কাঠ হয়ে গেছ!' মহিলার সন্তানাদি নেই, রানাকে অত্যন্ত আদর করে।

'কেমন আছেন, মিসেস ওটো?' হেসে ফেলল রানা, ওজন বাড়লেও অভিযোগটা শুনতে হয় ওকে। 'কাজকর্মের খবর কি?'

'এক হাজার চিঠি জমা হয়েছে, কিন্তু সে-সব পরে হবে'খন। তোমাকে বাবা খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আগে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও...'

নিজের ইনার অফিসে চলে এল রানা, বন্ধ করল দরজা, জানে নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও দরজাটা পাহারা দেবে ক্রিস্টিন ওটো। ড্রেসিংরুমে ঢুকে বিবস্ত্র হলো, প্রায় শুকিয়ে আসা কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করল অন্যমনস্কভাবে। ছুরির কিনারা শুধু ছুঁয়ে দিয়েছিল, ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তবে রাবাতের আতঙ্ক গুণ্ডাসর্দার যতদিন বেঁচে থাকবে দুঃস্বপ্নের মত স্মরণ করবে রানার কারাতে কোপ। ভিজে তুলো দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করল রানা, তারপর শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে গরম পানিতে গোসল করল। ক্ষতটায় অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে প্লাস্টার দিয়ে ঢাকল। ওয়ার্ডরোব খুলে কাপড় বাছাই করল—গাঢ় রঙের হাফ-ওয়েট স্যুট, সী-আইল্যান্ড কটন শার্ট, সুলকা টাই।

অফিসে ফিরে এসে ক্রিস্টিনা ওটোর রেখে যাওয়া মেজেসগুলোর ওপর চোখ বোলাল। কোনটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পল ওয়াকার লেখা একটা ফাইলের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল সব, সে-ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এরপর একদিকের দেয়াল লক্ষ্য করে এগোল, বসল একটা সোফায়। কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সোফার পিছনে, কালো চামড়ার নিচে লুকানো নবে চাপ দিল। গোটা দেয়াল, সোফাসহ, ঘুরে গেল আধ পাক। দেয়ালের অপর দিকটাও হুবহু একইরকম দেখতে, ফ্রেমে আটকানো রয়েছে একই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দুটো সোফা সেটের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় কামরাটা অবশ্য একটু ছোট। ডেস্কের পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে রয়েছে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের চেয়ারপারসন ব্যারনেস লিনা অটারম্যান। রানার প্রতি যার মনোযোগ, শুভকামনা, কৃতজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের কোন তুলনা হয় না। রানার জীবনে আগেও অনেক মেয়ে এসেছে, আজও

আসে, কিন্তু সোহানা চৌধুরী ছাড়া ব্যারনেস লিনার মত আর কারও কাছ থেকে এই মাত্রার স্বাধীনতা এবং প্রশ্রয় কখনও পায়নি বা পাবার আশাও করে না ও।

আটটা কামরা নিয়ে এই অফিস, মিডোর প্রধান অফিস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা। এটার অস্তিত্ব এমনকি বোর্ড ডিরেক্টরদেরও অনেকের জানা নেই। অল্প কয়েকজন যারা জানে তারা হলো কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট আর সেক্রেটারি, যারা প্রয়োজনে এই অফিসে বসে কাজ করে। বিশাল মিডো সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্যে নেপথ্যে রয়েছে বেশ কিছু রিসার্চার, এঞ্জিনিয়ার, অ্যানালিস্ট, সিকিউরিটি অফিসার, অডিটর, পলিটিক্যাল এবং পাবলিক রিলেশন্স এক্সপার্ট; এদের সাথে মাঝে মধ্যেই একান্তে কথা বলার দরকার হয় ব্যারনেস অটারম্যানের। ঘানায় নক্রুমা ক্ষমতাচ্যুত হবার অনেক আগেই খবরটা জেনে ফেলে এই অফিস, ফলে আফ্রিকা থেকে মিডো তার ইনভেস্টমেন্ট প্রত্যাহার করে নেয়ার সময় পায় হাতে। জেনারেল আমীন এশিয়ানদের বের করে দিলেন উগান্ডা থেকে, তার আগেই গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী আর ডকুমেন্টস কাম্পালা থেকে সরিয়ে ফেলেছিল মিডো। মিডোর ফ্যাক্টরিতে বোমা ফাটাবার পরিকল্পনা করল ইরা, বোমাগুলো কিভাবে কোথায় ফিট করা হলো মিডোর এক্সপার্টরা সব ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশনে দেখতে পেয়েছিল। বোমাগুলো অকেজো করল ব্রিটিশ আর্মি নয়, ট্রেনিং পাওয়া রানা এজেন্সির এজেন্টরা, রানা তাদেরকে এই কাজের জন্যেই উত্তর আয়ারল্যান্ডে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল। মানাগুয়া থেকে ভূমিকম্পের খবর এল, মারা গেল কয়েক হাজার মানুষ, একটা মিডো আলফা খাবার আর মেডিক্যাল সাপ্লাই নিয়ে অকুস্থলে যখন পৌঁছুল দেখা গেল রিলিফ নিয়ে তারাই সবার আগে এসেছে।

শিরদাঁড়া খাড়া করে প্যাপিয়া রহমানের রিভলভিং চেয়ারে বসেছে ব্যারনেস লিনা, চোখে ব্যাকুল প্রত্যাশা। দেয়ালটা ঘুরতে শুরু করল দেখে হেলান দিয়েছে সে, হাসির রূপ নিয়ে গোটা অবয়বে ছড়িয়ে পড়ল খুশি। সুডৌল দুই কাঁধের মাঝখানে সরু লম্বা গলা, মাখন রঙা ত্বকে লাবণ্য আর উজ্জ্বলতার প্রলেপ, গলার ওপর মুখ আকৃতিতে ঠিক যেন একটা পদ্ম। গায়ের রঙের সাথে মিলিয়ে পকেটবহুল একটা স্যুট পরে আছে সে, রেশমের মত ফুলে থাকা চুল জড়ো হয়ে আছে দুই কাঁধে। 'আমি নাটোরের বনলতা সেন নই,' সহাস্যে বলল সে। রানারই উৎসাহে বেশ কিছুদিন বাংলা ভাষা আর কাব্য নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। 'তবু বলি, এত দিন কোথায় ছিলে?'

'এদিকে এসো,' বলে হাত দুটো সামনে লম্বা করে দিল রানা। কামরার আরেক প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে হেঁটে এল লিনা, প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে, তারপর সোফার সামনে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল। তার গালের দু'পাশে হাত রাখল রানা, নিজের দিকে টানল, চুমো খেলো ঠোঁটে। পরস্পরের প্রতি ওদের সমস্ত অনুভূতি আর ভালবাসার অস্তিত্ব এই দীর্ঘ মন্থরগতি চুম্বন যেন নতুন করে ঘোষণা এবং সমর্থন দান করল। 'তোমার অনুপস্থিতি ভুলে থাকার জন্যে কাজের ভেতর ডুবে ছিলাম, রানা। নিজেকে এক মুহূর্ত অবসর দিইনি।'

'আর আমি শুধু বেছে বেছে ঝুঁকি আছে এমন কাজগুলোয় হাত দিয়েছি।'

রানার গাল স্পর্শ করার জন্যে হাত তুলল লিনা, কাঁধে ছোঁয়া পেয়ে চোখ

কোঁচকাল রানা। 'ব্যথা পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস, চেহারায় উদ্বেগ। 'দেখতে দাও আমাকে...'

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'ছুরিটা ঠিকমত লাগাতে পারেনি।'

'তুমি সংশোধনের অযোগ্য।' লিনা জানে, ক্ষতটা যদি মারাত্মক হত কোন ডাক্তারকে নিশ্চয়ই দেখাত রানা। বোকার মত ঝুঁকি নেয়ার মানুষ নয় সে। 'খুব খুশি হয়েছি বাদশার কাছ থেকে অর্ডার পেয়েছ শুনে।'

'সবাই দেখছি সব কিছু জানে!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা।

'সাংবাদিকরা নাছোড়বান্দার মত ঘুর ঘুর করছিল, বাধ্য হয়ে একটা বিবৃতি দিতে হয় আমাকে। বলেছি, "কোম্পানীর সদস্য এবং রাজপরিবারের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য করা আমাদের পলিসি নয়। তাছাড়া, আলোচ্য ব্যক্তি মরক্কোয় মিডোর কোন দায়িত্ব পালন করছিলেন না বিধায়..." ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার বলো, পদকটা পেয়ে কেমন লাগছে তোমার?'

'এই মুহূর্তে একটামাত্র সম্মান পাবার জন্যে লালায়িত আমি,' সহাস্যে বলল রানা। 'তোমাকে নিয়ে কোথাও সাপার খেতে যাব।'

'নিশ্চয়ই কোন রেস্তোরাঁয় নয়?' হাসি গোপন করে জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস।

'তা যে নয় তুমি ভাল করেই জানো,' বলল রানা। 'বললাম না, তোমাকে কাছে না পেয়ে আমি শুধু ঝুঁকিবহুল কাজগুলো হাতে নিচ্ছিলাম।'

'পাপিয়া কোথায় জানতে চাইছ না যে?'

'এটুকু জানি যে তার চাকরি যায়নি।'

'বোর্ড মীটিঙের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পাঠিয়েছি ওকে,' বলল ব্যারনেস। 'দুঃখিত, তোমার অনুমতি না নিয়েই তোমার হাউসকীপারকে বিদায় করে দিয়েছি।' জুরিখে মিডোর কাজে এলে কোম্পানীর কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা হয় রানার। ওকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল লিনা, চুমো খেলো। 'আজ সারাদিন আমি অফিস করিনি, রানা। তোমার কিচেনে ছিলাম। আমি জানি কি কি খেতে ভালবাস তুমি...'

লিনাকে আরও কাছে টানল রানা, টেনে সোফায় তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ব্যারনেস। রানা হতভম্ব।

'সোরিন বাবি,' বলল লিনা। 'আর ভিক্টর মার্জিন। দু'জনেই তোমার সাথে কথা বলতে চায়। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।'

'গুরুত্বপূর্ণ মানে...এখনই?'

'আমিও ঠিক সেই ভয়ই করছি, শেভ্যালিয়্যার রানা।'

চার

নিউ ইয়র্কে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে চার্লি ফ্রানসি। ফিফথ্ এভিনিউ, রকফেলার সেন্টারে এল সে, পাসপোর্ট অফিসে ঢুকল। সাথে রয়েছে নিজের পাসপোর্ট সাইজ

ফটোগ্রাফ আর বার্থ সার্টিফিকেট, লী হার্ভের সোশাল সিকিউরিটি কার্ডটাও সাথে আনতে ভোলেনি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লার্ক ফটো, ফটোর পিছনে সই, পূরণ করা ফর্ম, বার্থ সার্টিফিকেট খুঁটিয়ে দেখল, তারপর একটা পিনে আটকে নিয়ে সবগুলোয় এক এক করে অফিশিয়াল সীল মারল। 'ঠিক আছে, মি. হার্ভে,' বলল মেয়েটা, 'দু'হপ্তার ভেতর পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন। কোথায় পাঠাব বলে যান।'

'পাঠানোর দরকার নেই, আমি এসে নিয়ে যাব,' শিস দিতে দিতে পাসপোর্ট অফিস থেকে বেরিয়ে গেল চার্লি ফ্রানসি।

টিনা সিরিলকে জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছিল তার মা, আর মদ্যপানজনিত সমস্যায় কাবু কুৎসিত হোৎকা বাবার আদর-যত্ন কোনদিনই তার কপালে জোটেনি। বাড়ির পাশেই ছিল একটা ব্যবহৃত গাড়ি বেচা-কেনার বিশাল ব্যবসা, সেখানে মেকানিকের কাজ করত লোকটা। পাড়ার গ্রেড স্কুলে লেখাপড়া শুরু হলো টিনার, ফ্র্যাঙ্কলিন হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করল। কিশোরী টিনা যুবকদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না, লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই তার একমাত্র সাধনা। বাড়িতে মদ্যপ বাবার আচরণ সহ্য করার মত নয়, কিন্তু মুখ বুজে নিজের কাজ করে চলেছে সে। পাস করার পর সেক্রেটারিয়্যাল স্কুলে ভর্তি হলো। রেগে গিয়ে তার পড়াশোনার খরচ বন্ধ করে দিল বাবা। তার ইচ্ছে সে যে কোম্পানীতে চাকরি করে সেখানেই ক্লার্ক হিসেবে যোগ দিক টিনা। বাধ্য হয়ে একটা রেস্তোরাঁয় বাসনকোসন ধোয়ার কাজ নিল মেয়েটা। তার দৃষ্টি নদীর ওপারে, ম্যানহাটনের দিকে। সময় পেলেই টাইমস্ স্কয়্যার আর ব্রডওয়ে ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটে, আর স্বপ্ন দেখে কোর্স শেষ করে বিশাল কোন কোম্পানীর মস্ত কোন ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি পেয়ে গেছে। তার যা চেহারা, টিভি বা সিনেমায় ভাল করতে পারত, কিন্তু সেদিকে কোন আগ্রহ নেই তার। তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে অঙ্ক, কম্পিউটর, কোন ব্যাংকের হেড অফিস ইত্যাদি। সেক্রেটারিয়্যাল কোর্স শেষ করে সি.পি.এ-তে ভর্তি হলো টিনা, রাতে ক্লাস করবে। আলফ্রেড বোনার-এর সাথে দেখা না হলে কোর্সটা ঠিকই শেষ করতে পারত সে। আলফ্রেড বোনার নাইট স্কুলেরই টীচার, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক রাতে টিনাকে ব্যবহার করল সে। কিছুদিন পর জানা গেল টিনা অন্তঃসত্ত্বা, খবর শুনে গায়েব হয়ে গেল আলফ্রেড বোনার। মরিয়া হয়ে সুদখোর এক লোকের কাছ থেকে এক হাজার ডলার ধার করে গর্ভপাত ঘটাল টিনা। টাকাটা ফেরত দিতে দীর্ঘ দু'বছর সময় লাগল তার, রেস্তোরাঁটায় নাইট শিফটেও কাজ নিতে হলো তাকে, ফলে পড়াশোনার জন্যে সময় থাকল না।

সুদখোর লোকটা সুদের সুদ আদায়ের জন্যে অফিসের পিছন দিকের একটা ঘরে সোফায় শুতে বাধ্য করত টিনাকে। যে দিন শেষ কিস্তির টাকা পরিশোধ করল টিনা, দুর্ঘটনাবশত লোকটার গোপন জায়গায় এত জোরে চাপ দিয়ে ফেলে যে মাসখানেক সে বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। এরপর বাবাকে বিদায় জানিয়ে নদী পেরোল টিনা, প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর কখনও ফিরবে না।

ইন্টারভিউ দিয়ে মিডো স্টীলে ঢুকল টিনা সিরিল, ফাইলিং ক্লার্ক হিসেবে।

অ্যাকাউন্টিং স্কুলে অল্প দিন পড়াশোনা করলেও যা শিখেছিল কিছুই ভোলেনি সে, একটা লেজার কিভাবে সামলাতে হয় তা তার জানা ছিল। শেখার অদম্য আগ্রহ, অকাতর পরিশ্রম, মেধা আর উচ্চাভিলাষ ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে সাহায্য করল তাকে। মিডোভে ঢোকার পর থেকে একটাই স্বপ্ন তার, একটা ডিপার্টমেন্টের প্রধান হওয়া। এই মুহূর্তে চূড়া থেকে আর মাত্র একটা ধাপ নিচে রয়েছে সে, এই ধাপটা টপকাতে পারলেই তার স্বপ্ন সার্থক হবে। আর ঠিক এই মুহূর্তেই কিনা কোথাকার কোন এক বেজন্মা শয়তান তার অ্যাকাউন্ট নিয়ে উল্টোপাল্টা করেছে! এর পরিণতি কি হতে পারে জানা আছে টিনা সিরিলের। ডেল্টা টিউবকে বেশি টাকা দিয়ে ফেলার ঘটনাটা কেন ঘটল তা যদি আবিষ্কার করা সম্ভব না হয়, মিডোতে তার পদোন্নতির সম্ভাবনা চিরকালের জন্যে উধাও হয়ে যাবে। কাজেই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না টিনা, ডেল্টা ইনভয়েস যে-ই রদবদল করে থাকুক, তাকে খুঁজে বের করবে সে। কিন্তু তার আগে প্রথমে তাকে কমপিউটর সম্পর্কে জানতে হবে।

ছ'ফুট, খুব বেশি হলে ছ'ফুট এক ইঞ্চি, আন্দাজ করল টিনা সিরিল। ওজন···দুশো থেকে দুশো বিশ পাউন্ডের মধ্যে। লোকটাকে অনেকদিনই কমপিউটর রুম থেকে বেরোতে দেখেছে সে। শিং-এর তৈরি মোটা ফ্রেমের চশমা পরে, ওটা যেন তার সরু লম্বাটে মুখকে নিখুঁত দু'ভাগ করে রেখেছে। আজকাল আবার লম্বা চুল রাখার ফ্যাশন চালু হয়েছে, কিন্তু এ-লোকটা চুল কাটে ছোট করে। কাপড়চোপড় ভালই, তবে একটু পুরানো মডেল। পাঁচটায় অফিসের কাজ শেষ করে এলিভেটরে করে নেমে এল টিনা, লবিতে অপেক্ষায় থাকল। বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পত্র-পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করলেও একটা চোখ থাকল এলিভেটরের দিকে। কর্মচারীরা দলে দলে বেরিয়ে আসছে লবিতে, বিশেষভাবে কেউ লক্ষ করছে না তাকে। চশমা পরা লোকটা পাঁচটা পনেরো মিনিটে তিন নম্বর এলিভেটর থেকে নামল, ভিড়ের সাথে বেরিয়ে গেল আউটার সুইং ডোর ঠেলে। পিছু নিল টিনা।

রাস্তায় নেমে ডান দিকে বাঁক নিল লোকটা, সিক্সথ এভিনিউ ধরে দুটো ব্লক পেরোল, হাঁটার মধ্যে ব্যস্ততার কোন ভাব নেই। বরাবর ত্রিশগজের মত পিছনে থাকছে টিনা। পরবর্তী ব্লকের কোণে একটা কফি শপ, ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। টিনা ঢুকে দেখল ইতোমধ্যে একটা টেবিলে বসেছে সে, দ্বিতীয় চেয়ারটা খালি। ভেবেচিন্তে একটা খালি টেবিল দখল করল টিনা, একটু দূরে হলেও মুখ তুললেই সামনে তাকে দেখতে পাবে লোকটা।

শুধু কফির অর্ডার দিল টিনা, কাপে চুমুক দেয়ার আগে মুখ তুলল না। দেখল লোকটার টেবিলে সাপার পরিবেশন করা হয়েছে, কোনদিকে না তাকিয়ে খাচ্ছে সে। মিনিটখানেক পর পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, অস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল যেন তাকে চিনতে পেরেছে লোকটা। ওয়েটার এল কফির কাপ নেয়ার জন্যে, টেবিল পরিষ্কার করল, কিছুক্ষণ পরস্পরকে ওরা দেখতে পেল না। ওয়েটার সরে যেতে আবার চোখাচোখি হলো ওদের, এবার মৃদু হাসল টিনা। লোকটাও হাসল। শান্তভাবে বলল টিনা, 'হাই।' লোকটাও সাড়া দিল, 'হাই।' হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল টিনা, ইঙ্গিতে পাশের খালি চেয়ারটা দেখাল। ইতোমধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে লোকটার,

উঠে এল টিনার টেবিলে।

'সেদিনের পার্টিটা কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল টিনা।

'পার্টি...?'

'আমাকে যে নিয়ে গিয়েছিল, পৌছুবার পর এক ঘণ্টার মধ্যে বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল, বাধ্য হয়ে ট্যাক্সি ডেকে তাকে পৌছে দিতে হলো বাড়িতে। তবে আপনার সাথে নাচটা সত্যি আমি উপভোগ করেছিলাম...'

'নাচ? আমার সাথে?' প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত গলা লম্বা করল লোকটা, হতভম্ব।

টিনার চেহারায় অপ্রতিভ এবং বিস্ময়ের একটা ভাব ফুটে উঠল। 'ওহ্ মাই গড,' বলল সে, 'কি লজ্জাকর ব্যাপার! আপনাকে দেখে মনে হলো একটা পার্টিতে আমাদের দেখা হয়েছিল, আমরা নেচেও ছিলাম...'

হেসে ফেলল লোকটা। 'এরকম ভুল হয়। কোন পার্টিতে নয়, আসলে আমাকে আপনি মিডো স্টীলে দেখেছেন।'

'আপনি মিডো স্টীলে আছেন?' টিনা আরও অবাক হবার ভান করল।

'কমপিউটরে...'

'আমি অ্যাকাউন্টসে আছি,' বলল টিনা। 'একেই বলে দৈব যোগ, কি বলেন? গড, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ভোঁতা একটা মেয়ে ভাবছেন।'

'সুন্দরী মেয়েরা, সত্যিকার সুন্দরী মেয়েরা, কখনোই ভোঁতা হয় না,' হাসতে হাসতে বলল লোকটা। 'শুধু কফি খেলেন দেখে আমি কি ধরে নিতে পারি আজ সন্ধ্যায় আপনি কাউকে সঙ্গ দিচ্ছেন না?'

'আজ আমার চুল ধোয়ার দিন।'

'আমি তো কোন প্রয়োজন দেখি না...'

সিনেমায় গেল ওরা, টিকেট কাটল লোকটা। হাত ধরাধরি করে রাস্তা ধরে হেঁটে ঢুকে পড়ল একটা বারে, বিয়ার খেলো, বিল মেটাল টিনা। আবার রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল ওরা, হাঁটতে হাঁটতে মাঝরাত পার করে দিল। একটার দিকে থামল ওরা ওয়েস্ট এইট্টি এইট স্ট্রীটে, টিনার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দু'জনেই সময়টা দারুণ উপভোগ করেছে, পরস্পরকে ভারি পছন্দ হয়েছে ওদের।

'ওপরে উঠবে নাকি, চার্লি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল টিনা।

'কফির জন্যে?'

'কফির জন্যে।' ব্যাকুল দৃষ্টিতে চার্লি ফ্রানসির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল টিনা। 'আমাকে আনাড়ী বলতে পারো, ভয় লাগা স্বাভাবিক, কাজেই কফি ছাড়া আর কিছুর প্রতিশ্রুতি প্রথম দিনই...বুঝতেই পারছ।'

'প্রথম দিন আমিও আড়ষ্ট বোধ করছি।'

'গ্রেট। তাহলে চলো, ওপরে উঠি।'

কিচেনে ঢুকে কফি বানাল টিনা, অ্যাপার্টমেন্টটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিল চার্লি ফ্রানসি। যা যা থাকলে আরামে বসবাস করা যায় তার সবই আছে, ফার্নিচারগুলো রুচি আর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও তুলে ধরছে, কিন্তু এমন কোন জিনিস দেখা গেল না যার সাথে ভাবাবেগের সম্পর্ক থাকতে পারে—কোন ফটো নেই, খেলনা বা পুতুল নেই, এমনকি কোন অ্যান্টিকসও নেই।

রাত তিনটের দিকে চলে গেল চার্লি ফ্রানসি, টিনাকে একটা চুমো পর্যন্ত খায়নি। কথাবার্তা বেশিরভাগই হয়েছে কমপিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং টেকনিক নিয়ে। দরজা বন্ধ করে তালা দেয়ার আগে চার্লি ফ্রানসিকে বলল টিনা, 'পরেরবার কিন্তু তোমার গল্প শুনব, কেমন?'

'পরেরবারও কি শুধু কফি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাকে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল ফ্রানসি।

'সেটা নির্ভর করবে আমার মূডের ওপর। মূড ভাল থাকলে…কে বলতে পারে!'

ওয়েস্ট ফরটি স্ট্রীটে, নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল ফ্রানসি, বিছানার তলা থেকে সুটকেস টেনে ভেতর থেকে মেগা-বক্স বের করল, এলিভেটরে চড়ে উঠে এল ন'তলায়। ন'তলা থেকে ছাদে উঠল সিঁড়ি বেয়ে, পাঁচিলের মাথায় বসে হেলান দিল এলিভেটর শ্যাফটের বাইরের দিকের দেয়ালে। মেগা-বক্সের লিড একজোড়া টেলিফোন টার্মিন্যালের সাথে জোড়া লাগাল, কানের কাছে তুলে অ্যাডজাস্ট করল ইয়ারফোন, মাইক্রোফোনটা ঝুলিয়ে নিল গলায়, তারপর শুরু করল বেআইনী ফোন কল।

এ তার নিজের উদ্ভাবিত একটা টেকনিক, যদিও কাজের সময় কিছুটা রদবদল করে নিয়েছে। একটা বিজ্ঞান পত্রিকায় টেকনিকটা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখা হয়েছিল, ফলে পত্রিকার সেই সংস্করণ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে দুটো কমিউনিকেশন পয়েন্টের মাঝখানে উপস্থিত নরমাল ক্যারিয়ার ওয়েভ ট্যাপ করার জন্যে ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়। ওয়েভটা কোন প্রচলিত পথ অবলম্বন করে না বা কোন ডাইরেক্ট লাইন ধরে যায় না, কাজেই টেলিফোন কোম্পানীর পক্ষে কিছু টের পাওয়া সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে, তার নিজস্ব অ্যাপারেটাসের সাহায্যে ফোন করায়, মাঝে মধ্যে কলটা গোটা পৃথিবী ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছায়, যেটা হয়তো মাত্র আধ মাইল দূরে। অ্যাপারেটাস বলতে মেগা-বক্সটাকেই বোঝায় ফ্রানসি। নামকরণটাও তার, সাধারণ লোকের ধারণার চেয়ে আকারে সেটা বড়। পাঁচিলের মাথায় বসে মেগা-বক্সটা অপারেট করার সময় গর্বে বুকের ছাতি যেন কয়েক ইঞ্চি ফুলে উঠল তার, নিজেকে মনে হলো জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী। ছোট একটা বাক্স, ভেতরে সংখ্যা লেখা অনেকগুলো বোতাম, মাইক্রো সুইচ আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির জঙ্গল বলা চলে—এগুলো তাকে যেন আমন্ত্রণ জানিয়ে বলতে থাকে আমরা কি করতে পারি তা জানিয়ে দিয়ে দুনিয়াটাকে একবার কাঁপিয়ে দাও হে। তবে আজ মেগা-বক্সটা সে সাধারণ একটা কাজে ব্যবহার করতে যাচ্ছে। হোয়াইট প্লেইনস ওভারসীজ লিঙ্ক ট্যাপ করল, ক্যারিয়ার ওয়েভ ধরে স্যাটেলাইট পর্যন্ত পৌঁছুল, প্রথমবারের চেষ্টাতেই একটা চ্যানেল পেয়ে গেল, চ্যানেলটা তাকে পৌঁছে দিল গুনহিলি ডাউনস এ অর্থাৎ ইংল্যান্ডের ইউনিক প্রিন্টিঙে।

ঠিক সাত সেকেন্ড ফোনটা বাজতে দিল ফ্রানসি, তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে কাঁটায় কাঁটায় এক মিনিট অপেক্ষা করল, যোগাযোগ করল আবার।

'হ্যালো, চার্লি। আমরা নিরাপদ তো?'

'হ্যাঁ। ডিক, আমার বিশ্বাস ওরা আমাদের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে।'

'ডেল্টা?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। আমাদের এদিকেও কিছু নড়াচড়া টের পাচ্ছি। এস. বি-র ডাক পড়েছে মিডোর হেডকোয়ার্টারে, অ্যাকাউন্টস ফাইল নিয়ে পৌঁছে গেছে সে আজ।'

'গুড। তারমানে যে-কোন দিন সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'সামলাবার জন্যে কাকে ওরা দায়িত্ব দেবে বলে মনে করো তুমি?'

'প্রথমে ওরা অ্যাকাউন্ট সেকশনের লোকদের ডাকবে। আজ রাতে তাদের একজন আমাকে বেছে নিয়েছিল। মেয়েটা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল-এর। ভারি সুন্দরী।'

'বয়স?'

'একদম ছুকরি, তবে আর বলছি কি!' হাসতে লাগল চার্লি ফ্রানসি। 'মিডোর এই জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে, ওদের বেশিরভাগ মেয়েই কম বয়েসী আর সুন্দরী।'

'তারমানে আমারও কিছুটা আশা আছে, কি বলো? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মেয়েটা তোমাকে চিহ্নিত করল কিভাবে?'

'ঠিক তা নয়। কমপিউটর সেকশনের যে-কোন একজন লোক তার দরকার। আমারই নেহাত ভাগ্য যে চোখে পড়ে গেছি। মুহূর্তের জন্যেও এ-কথা মনে হয়নি যে আমাকে সে সন্দেহ করে। স্রেফ ইনফরমেশনের জন্যে আমাকে দরকার তার।'

'লাকি ডেভিল। বেচারিকে ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিতে ভুলো না।'

'আমাকে তুমি কঠিন হতে বলছ?'

'ন্যাকামি রাখো, বুঝলে। শোনো, কখন কি ঘটে সব জানাবে, কেমন? গুড ইভনিং।'

'এখানে রাত।'

'তাহলে গুড নাইট।'

উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী কয়েকজন কমপিউটর বিশেষজ্ঞের মাথা থেকে কুবুদ্ধিটা বেরোয়। তাদের জন্যে পদ্ধতিটা পানির মতই সহজ।

অ্যামস্টারডামে একটা কমপিউটর সিম্পোজিয়াম চলছিল, দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকে কমপিউটর এক্সপার্টরা যোগ দিয়েছিল তাতে। সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছিল কমপিউটর অ্যান্ড কমপিউটর লিমিটেড, আলোচ্য বিষয় ছিল–'দ্য ইউজ অভ কমপিউটরস ইন অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওরস'। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল মিডো নিউ ইয়র্কের চার্লি ফ্রানসি, ইউনিক প্রিন্টিং ইংল্যান্ডের ডিক লোভেল, পিলমোর ফ্রানসের কেকারিয়া উইলিয়ামস। মাঝরাতের পর একটা ক্লান্তিকর সেসন শেষ করে মেয়ে আর মদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল তিনজন, মেয়ে না পেয়ে একটা বার-এ বসে গল্প শুরু করল ওরা। প্রসঙ্গটা প্রথমে চার্লি ফ্রানসিই তুলল–ব্যক্তিগত এবং বেআইনী স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওরে কমপিউটর কাজে লাগানো যায় কিনা। প্রথম বাধাটা, দ্রুত উপলব্ধি করল ওরা, এরইমধ্যে পেরোনো গেছে–বিভিন্ন কোম্পানীর লোকদের নিয়ে একটা নেটওঅর্ক গঠন করা, যে

কোম্পানীগুলো পরস্পরের সাথে ব্যবসা করে। মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত প্রায় সবগুলো কোম্পানীর হয় কাস্টমার নয়তো সাপ্লাইয়ার, কাজেই এই মুহূর্তে অ্যামস্টারডাম কমপিউটর সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত লোকজনদের নিয়ে এখুনি একটা নেটওঅর্ক গঠন করা সম্ভব। চোদ্দ দিনের সিম্পোজিয়াম, বাকি ছিল সাত দিন, এই সাত দিনে ওরা দলের সদস্য সংখ্যা বাড়াবার জন্যে উপস্থিত কমপিউটর এক্সপার্ট আর অ্যাকাউন্টস অফিসারদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে ফেলল। সবশেষে দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচে। এই পাঁচজন দুনিয়ার পাঁচ জায়গায় কাজ করে–কেউ প্রোগ্রামার, কেউ কমপিউটর-অপারেশন বিশেষজ্ঞ, কেউ শুধু অপারেটর, আবার কেউ কমপিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সেকশনের অ্যাকাউন্টস অফিসার। ষড়যন্ত্রের সারমর্ম হলো, মিডো স্টীল তার কমপিউটরের মাধ্যমে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড হারাবে। দেখে মনে হবে বৈধ ইনভয়েস অনুসারে পেমেন্ট করা হয়েছে, পেমেন্ট করা হবে পরিচিত এবং নামকরা কোম্পানীগুলোর নামে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীগুলো থেকে অপারেটররা টাকা তুলে নেবে। হবু চোরদের এই সমিতির প্রত্যেক সদস্য দশ লাখ পাউন্ড করে ভাগে পাবে, বিরাট ধনী হয়ে যাবে এক একজন। পদ্ধতিটা পানির মতই সহজ; বৈধ একটা ইনভয়েসে গোপন ওভারপেমেন্ট-এর আকারে টাকাগুলো বেরিয়ে আসবে মিডো স্টীল থেকে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোম্পানীতে টাকা এসে পৌঁছুবার পর তা সরিয়ে নেয়া হবে। মিডো নিউ ইয়র্কের চার্লি ফ্রানসির মাথা থেকে আরেকটা চমকপ্রদ বুদ্ধি বেরুল। 'এসো,' বলল সে, 'পদ্ধতিটা আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি। পরীক্ষাটা কি রকম হবে বলছি। ব্যাপারটা যেন ওরা ধরে ফেলতে পারে। ফলে এ-ধরনের কাজ আর যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও কড়া হবে। তারপর, যখন ওরা ভাববে আর কোন ফাঁক নেই, আমরা তখন সিকিউরিটি সিস্টেম গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেব, বের করে নেব বড় অঙ্কের টাকা।'

'মিডো স্টীল, বলো তো, কে তোমাদের বাঁশ দিচ্ছে?' এই বাক্যটিও চার্লি ফ্রানসির মাথা থেকে বেরিয়েছিল।

মেগা-বক্স ব্যবহার করে এরপর লিয়নস, মিউনিক আর লিমার সাথে যোগাযোগ করল সে। তারপর নিচে নেমে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল। মনে মনে ভাবছে, টিনা সিরিল, বেশ মিষ্টি নাম। না-জানি বিছানায় কেমন হবে মেয়েটা।

পাঁচ

'এর যে কি তাৎপর্য তাই আমি বুঝতে পারছি না,' একজিকিউটিভ ডিরেক্টরদের বোর্ড মীটিঙে বলল চেয়ার-পারসন ব্যারনেস লিনা। তার ডান দিকে ফিন্যানশিয়াল অ্যাডভাইজার ভিক্টর মার্জিন, বাঁ দিকে ভিনসেন্ট গগল; যার ব্যক্তিগত সম্পদের মূল্য শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। বোর্ড-এর সদস্যরা প্রায় সবাই ধনকুবের, একমাত্র মাসুদ রানা বাদে, এবং ওদের সবার সম্পত্তি ব্যারনেস লিনা একাই যে-কোন মুহূর্তে

কিনে ফেলার সামর্থ্য রাখে।

'ব্যাপারটা আমি সরলভাবে বুঝতে চাই,' বলল গগল, তার মত আর সবাইও ফরাসী ভাষাটা ইংরেজীর মতই অনর্গল বলতে পারে। 'কেউ একজন কমপিউটারে এমন কারিগরি ফলিয়েছে যে ওটা নির্দিষ্ট কিছু ইনভয়েসের মাধ্যমে অতিরিক্ত টাকা পেমেন্ট করে ফেলছে।' ভিক্টর মার্জিন কথা বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সে। 'কিভাবে কাজটা করা হয়েছে আবার তা শোনার ইচ্ছে আমার নেই, ভিক্টর। শেষবার তুমি যা ব্যাখ্যা করলে তার কিছুই আমি বুঝিনি। কমপিউটর আমার কাছে তালা লাগানো দরজার মত, আর সেই তালা আমি খুলতেও আগ্রহী নই। কেউ আমাদের কমপিউটর ব্যবহার করছে যাতে আমরা আমাদের সাপ্লাইয়ারদের বেশি টাকা দিয়ে ফেলি। ওই সাপ্লাইয়াররা আসলেও টাকাগুলো রিসিভ করছে। অথচ প্রত্যেকে তারা সন্দেহের উর্ধ্বে, এবং টাকাগুলো তাদের সাথে রয়েও যাচ্ছে। ওদের কাছ থেকে কেউ টাকাগুলো চুরি করার চেষ্টা করেনি। কিংবা ব্যাপারটা গোপন রাখার কোন প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায়নি।'

'সবচেয়ে যেটা আপত্তিকর,' ব্যারনেস বলল, 'ডাটা বেসে রেকর্ড করা কথাগুলো। কার এত স্পর্ধা এ-ধরনের অপমানকর…'

তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল রানা, টেবিলের আরেক মাথায় বসে আছে ও। 'আমি যেভাবে দেখছি—ক্রাইম একটা ঘটলেও ক্রিমিনালের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। ইউনিক প্রিন্টিং আর পিলমোর টাকা রিসিভ করেছে মাত্র, এবং টাকাগুলো নিয়ে এখন তারা খুবই বিব্রত। একটা ক্রাইমের পরিকল্পনা করা হলো অথচ কেউ তা থেকে লাভবান হবে না, স্রেফ হতেই পারে না। যারা এর পিছনে রয়েছে তারা সম্ভবত আরও বড় দাঁও মারার মতলবে আছে। সেই সাথে চ্যালেঞ্জ করছে, পারো তো ধরো আমাদের। জানে, তাদেরকে ধরা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

'স্টিফেন ব্রোচার ইউনিক প্রিন্টিঙে ফিরে গিয়েই,' বলল ভিক্টর মার্জিন, 'কর্ডন অ্যান্ড মারফিকে তদন্তের কাজে লাগাবে বলে জানিয়েছে। আমাদের জগতে ওরাই সেরা ইনভেস্টিগেটিভ অ্যাকাউন্টেন্ট। না, ইউনিক থেকেও এক পয়সা খোয়া যায়নি। অতিরিক্ত যে টাকাটা তাদেরকে ওভার-পে করা হয়েছে এখনও সব তাদের অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'হ্যাঁ, বিব্রত তো বটেই, সেই সাথে হতভম্বও।'

'এমনও হতে পারে কেউ হয়তো টাকাগুলো পরে সরাবে ভেবেছিল, তার আগেই আমরা জেনে ফেলেছি।' সমর্থনের আশায় রানার দিকে তাকাল গগল।

শান্তভাবে মাথা নাড়ল রানা। 'আমার তা মনে হয় না। সে-রকম ইচ্ছে থাকলে অন্তত ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে কিছু ব্যবস্থা রাখত। কিন্তু এখানে আমরা উল্টোটা দেখতে পাচ্ছি, তাই না?' সামনে খোলা নোট বইটার দিকে তাকাল একবার। 'তাহলে কি আমরা পেলাম?' ইতোমধ্যে টোকা পয়েন্টগুলোয় টিক চিহ্ন দিতে শুরু করল। 'এক, মিডোর স্টাফদের মধ্যে এমন কেউ একজন আছে যে একটা ডাটা ব্যাংকের ডাটা বেস বদলে দেয়ার জ্ঞান এবং দক্ষতা রাখে। দুই, ইউনিক প্রিন্টিঙের কেউ একজন, যে এখনও তার তৎপরতা দেখায়নি, ইচ্ছে করলে টাকা গ্রহণ করে নিজের কাজে লাগাতে পারে, ভাগ দিতে পারে মিডোয় তার

দোসরকে।'

মাঝখান থেকে একজন ডিরেক্টর বলল, 'হ্যাঁ, একই কথা পিলমোর এবং অন্যান্য কোম্পানী সম্পর্কে খাটে, যাদেরকে আমরা ওভারপেমেন্ট করেছি। ষড়যন্ত্রের সাথে একাধিক লোক জড়িত...'

রানা বলল, 'ইয়েস, অ্যান ইন্টারন্যাশনাল স্টীলিং কনসোর্টিয়াম।'

গগল হাসল, তার সাথে বাকি অনেকেও। কিন্তু ব্যারনেস লিনার চেহারা আগের মতই থমথমে। 'আমার কাছে ব্যাপারটা সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ বলেই মনে হচ্ছে। কেউ আমাদেরকে ধাঁধায় ফেলে দিয়ে মজা করবে, এ হতে পারে না। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি কোম্পানী আমাদের পুরানো এবং বিশ্বস্ত সাপ্লাইয়ার, তাদের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার দিকটা ভাবতে হবে। আজ সামান্য টাকা বেরিয়ে গেছে–কাল যদি বড় অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যায়, এবং কোথায় আছে জানার আগেই যদি সরিয়ে ফেলা হয়? আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জটা ওরা মি. মাসুদ রানাকে করেছে। আমরা অনুরোধ করতে পারি, তিনি যদি তদন্তের দায়িত্ব নেন...অবশ্য আমার ঠিক জানা নেই তিনি ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর অন্যান্য কাজে ব্যস্ত কিনা...' প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক দূরত্ব এবং আচরণ বিধি মেনে চলে ব্যারনেস ও রানা, প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতার স্বীকৃতি মেলে শুধু নিভৃতে।

মরক্কোর কাজটা শেষ করার পর বি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা। পাবে না জানত, তবু স্রেফ খেয়ালবশত চাইতেই এক মাসের ছুটি পেয়ে গেছে ও। দীর্ঘ ছুটি, মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানে না কিভাবে কাটাবে, এই সময় লিনার ডাক এল। ভেবেছিল জটিল কোন কেস পাবে হাতে, কিন্তু সব শুনে তেমন আগ্রহ বোধ করছে না ও। কয়েকজন অফিস কর্মচারী কমপিউটরের সাহায্যে কিছু টাকা হাতিয়ে নেয়ার তালে আছে, ভদ্রবেশী চোর, বলা যায় ছুঁচো–মারতে গেলে হাতই শুধু গন্ধ হবে। এ-কাজের জন্যে আরও লোক আছে, ওর নাক না গলালেও চলে। কিন্তু এই মুহূর্তে জেদি, অভিজাত, ছটফটে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল, সেই সাথে সিদ্ধান্ত নেয়াটাও সহজ হয়ে গেল পানির মত। ক্যাপিটালিস্ট খোক্কস বলে গাল দিয়েছিল ওকে মেয়েটা, ভোলেনি রানা। তার অকারণ ক্রোধ, ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের জবাব দেয়া হয়নি, সেবারে জরুরী কাজে পেরুর রাজধানী লিমা থেকে ঢাকায় ফিরে আসতে হয়েছিল রানাকে। জুয়েলা মাদ্রে এখনও কি লিমায় আছে, কাজ করছে ইউ.এম.পি-তে?

ছোট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, ব্যারনেস লিনার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসল। কাজটাকে বড় করে দেখছে না ও, বেড়াতেই যাচ্ছে, সেই ফাঁকে যদি সম্ভব হয় আরেকবার দেখে নেয়া হবে জুয়েলা মাদ্রেকে। মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু তার প্রতি শারীরিক কোন আকর্ষণ খুব জোরালভাবে অনুভব করেনি রানা। মেয়েটার চরিত্র বোঝার একটা আগ্রহ বাসা বেঁধেছিল মনে। খুব বেশি ছটফটে বলে? নাকি দেশের ওপর দরদ লক্ষ করে? একটা কথা অবশ্য ঠিক, তার প্রতি মেয়েটার রাগ আর তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেলেও, রানা কিন্তু পাল্টা রাগ করেনি বা বিরূপ ধারণা পোষণ করেনি। কেন, কি কারণ? তবে কি অবচেতন মনে মেয়েটার প্রতি দুর্বল সে?

বোর্ড মীটিঙে এরপর অন্য প্রসঙ্গ উঠল।

*

সন্ধ্যা হব হব, লিমা থেকে সাত মাইল দূরে হোর্গ শাভেজ এয়ারপোর্টে নামল আলফা মার্ক টু। জুরিখ থেকে বিরতিহীন উড়ে এসেছে প্লেনটা। কসমো মাদ্রে, স্থানীয় মিডো এজেন্ট, এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল। দক্ষতার সাথে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ঝামেলা থেকে রানাকে দ্রুত মুক্ত করল সে, গাড়িতে তুলে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের একটা পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিল। রানা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতেই কিচেন থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে, এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি কার্পেটের ওপর। ঢোলা গাউন পরে আছে সে, রঙটা বাদামী, হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করা। 'যে-ক'দিন থাকবেন, আপনার সমস্ত প্রয়োজন মার্ভেলা মেটাবে,' কসমো মাদ্রে বলল। মেয়েটার মধ্যে সশ্রদ্ধ এবং আড়ষ্ট একটা ভাব থাকলেও, কিচেনে পালাবার সময় যখন ঘুরে ছুটল, তার চোখে আনন্দ আর উত্তেজনার ঝিলিক দেখতে পেল রানা। তার ছুটে যাওয়াটা লক্ষ করল ও, বয়স আন্দাজ করল উনিশ কি বিশ। আবার বলাও যায় না, পেরুভিয়ান ইন্ডিয়ানরা খুব তাড়াতাড়ি পরিণত হয়। গাউনটা ঢিলে-ঢালা হলেও মার্ভেলার মনোমুগ্ধকর দেহ-সৌষ্ঠব ঢাকতে পারেনি।

'আপনার কাজিন এখনও কি ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়?' কসমো মাদ্রেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি দেখছি মনে রেখেছেন, মি. রানা। হ্যাঁ, পড়ায়।'

'আপনার আরেক কাজিন...সে-ও কি এখনও ইউ.এম.পি-তে আছে?'

'হ্যাঁ। আবার বলতে হয়, আপনার স্মরণ শক্তি খুব ভাল।'

'আপনার অনেক কাজিন, তাই না, মি. কসমো?'

ঠোঁট টিপে হাসল কসমো মাদ্রে। 'সে তো মার্ভেলারও।'

'কিন্তু মার্ভেলার কাজিনরা তো, ধরে নিতে পারি, সুজকোর চারদিকে উঁচু পাহাড়ে বসবাস করে।'

'আপনার চোখের দৃষ্টিও খুব তীক্ষ্ণ, মি. রানা। লিমা শহরটা বড় হয়ে উঠছে। আমাদের এই দেশ পেরুর উন্নতির ব্যারোমিটার বলতে পারেন লিমাকে। কিন্তু আমার কাছে লিমা? ওটা তো মাদ্রেদের একটা গ্রাম মাত্র। আর সুজকো হলো মার্ভেলাদের গ্রাম।'

রানা জানে মিডোর এজেন্ট হিসেবে বছরে ত্রিশ হাজার পাউন্ডের সমপরিমাণ রোজগার করে কসমো মাদ্রে। মাদ্রেরা একান্নবর্তী পরিবারের মত, এবং বলা চলে প্রায় সকল অর্থে এই পরিবারটিই নিয়ন্ত্রণ করে লিমাকে। সন্দেহ নেই মিডোর হয়ে কাজ করা কসমোর একটা শখ বিশেষ, তবে পদমর্যাদা সবিশেষ গুরুত্ব পায় এমন একটা দেশে কাজটা তাকে এনে দিয়েছে দুর্লভ সম্মান। পুরানো নীতি আর মূল্যবোধ যখন দ্রুত বাতিল হয়ে যাচ্ছে তখন শুধু অভিজাত এবং প্রতিষ্ঠিত একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়। এখন বংশগৌরবের সাথে বাণিজ্যিক তৎপরতাও চাই। সবচেয়ে বড় কথা, লিমায় তোমাকে সবার চোখে ব্যস্ত দেখাতে হবে—মিডো, আই.টি.টি, ইউনিয়ন কার্বাইড, ফোর্ড মটর কোম্পানী, আই.সি.আই, পেরিলি, এ-ধরনের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ককটেল পার্টিতে তুমি যদি নিমন্ত্রণ না পাও তাহলে আর তোমার দাম থাকল কি। লিমায় মিডোর কয়েকশো মিলিয়ন পাউন্ড

পুঁজি খাটছে–খনিজ, প্লাস্টিক, হেভি এঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যালস আর ফিশিং খাতে। কসমো মাদ্রের কাজ মিডোর এ-সব স্বার্থের ওপর নজর রাখা। এত বড় অঙ্কের পুঁজি খাটছে, অথচ রানা কিনা পেরুতে এসেছে চুরি যাওয়া সামান্য ক'টা টাকার খোঁজে।

মন-মানসিকতা বেড়ানোর হলেও রানা এ-ব্যাপারে সচেতন যে কেউ যদি পঞ্চাশ হাজার ডলার বা পাউন্ড অথবা সোল কমপিউটরের মাধ্যমে চুরি করতে পারে তাহলে একই কৌশলে লোকটার পক্ষে আরও শত বা সহস্র গুণ চুরি করাও সম্ভব, কাজেই তদন্তের কাজে ঢিলা দেয়া উচিত হবে না। হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল ও, পেরুতে সাড়ে সাতটা বাজে। সম্ভবত ঠিক এই মুহূর্তে মিডোর প্লাস্টিক অফিস সান মিগুয়েল-এ কর্ডন অ্যান্ড মারফি থেকে একদল ইনভেস্টিগেটর পৌছুচ্ছে, সাথে একজন উদ্বিগ্ন জেনারেল ম্যানেজার ও ফাইন্যানশিয়াল কন্ট্রোলার–স্থানীয় আইন অনুসারে দু'জনেই তারা পেরুর নাগরিক। একই সময়ে মিডো নিউ ইয়র্কের দু'জন কমপিউটর এক্সপার্ট কমপিউটর রুমে ঢুকবে, নিশ্ছিদ্রভাবে সীল করবে কামরাটা, তারপর খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে প্রতিটি ডাটা বেস।

রানা ভাবল, চেচুয়া ভাষায় 'বাঁশ দেয়া' কথাটার অনুবাদ কি হবে? কিন্তু এমন একটা প্রশ্ন কসমো মাদ্রেকে জিজ্ঞেস করা যায় না। 'আমি আপনার কাজিন, প্রফেসর ভদ্রলোকের সাথে দেখা করতে চাই,' বলল ও। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তার সময় হলেই। ইউ.এম.পি-তে আপনার অপর কাজিনের সাথেও দেখা করব। একজনের সাথে ইউনিভার্সিটিতেই, আরেকজনের সাথে এখানে। আপনি ব্যবস্থা করুন, ততক্ষণে আমি শাওয়ারটা সেরে নিই?'

রানা বেডরুমে ঢোকার আগেই ফোনের রিসিভার তুলে নিল কসমো। শোফারের তুলে আনা সুটকেস ইতোমধ্যে খুলেছে মার্ভেলা। ব্রাউন, লাইটওয়েট একটা সুট বেছে নিল রানা, লন্ডনের নামকরা দর্জিকে দিয়ে তৈরি করানো। বালি রঙা সুতী শার্ট নিল, বুয়েনস আয়ার্স থেকে কেনা, সাথে সুলকা টাই আর কাফ লিঙ্কস–টাইটা নিউ ইয়র্ক থেকে দুই ডলারে কেনা, এবং অদ্ভুত শোনালেও কাফ লিঙ্ক জোড়া সুইটজারল্যান্ডের এক গ্যারেজের মালিক তৈরি করে দিয়েছে। কাফ লিঙ্ক দুটো দেখতে ঠিক যেন সোনার ওপর বসানো একজোড়া পালিশ করা চুনি। ওগুলোর ভেতর মিনি মাইক্রোফোন লুকানো রয়েছে, মাইলখানেক দূরের একটা রিসিভিং স্টেশনের উদ্দেশে ট্র্যান্সমিট করতে পারে ওটা। রানার পকেটের ভেতর সোনালি সিগারেট কেসে যে খুদে টেপ রেকর্ডারটা রয়েছে সেটাও মাইক্রোফোনের মেসেজ রিসিভ করতে পারে। বাথরুম থেকে যখন বেরুল, বেডরুমের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল মার্ভেলাকে, সেই ম্যাডোনা ভঙ্গিতে। 'ধন্যবাদ, মার্ভেলা,' বলল রানা। 'সুটকেস খুলে সব কিছু সুন্দর গুছিয়ে রেখেছ।' ত্রস্তা হরিণীর সংক্ষিপ্ত দৌড় আবার একবার দেখার সৌভাগ্য হলো, হঠাৎ লাল হয়ে ওঠা চেহারা নিয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল মেয়েটা।

পাঁচ সেকেন্ড পর মাঝরাত; নিউ ইয়র্ক কমপিউটর রুমে মুহূর্তের জন্যে থেমে আছে হাই-স্পীড প্রিন্টার, প্ল্যাটন-এর পিছনে ভাঁজ হয়ে থাকা নিস্তেজ কাগজ ঝুলছে, নেমে গেছে কার্ডবোর্ড বক্সের ভেতর। তারপর আবার চালু হলো প্রিন্টার, কী-গুলোকে

ছাড়িয়ে এত দ্রুতগতিতে সচল হয়ে উঠল কাগজ যে খালি চোখে ধরা পড়ে না। ছোট এবং বড় অক্ষরগুলো হুবহু একই আদলের. চার ইঞ্চি চওড়া কাগজের ওপর ছোট অক্ষরগুলো ছড়িয়ে পড়ল–

```
ssss   h   h   u   u  lllll     ddd  oooo   w      w   nnn
s      h   h   u   u  ll        d  d o    o  w      w   n n
ssss   hhhh    u   u  ll /////  d  d   o    o  www   w   n n
s      h   h   u   u  ll        d  d o    o  www   w   n n
ssss   h   h   uuuu  ll         ddd  oooo   wwwwww     n n
```

সবশেষে, ক্যাপিটাল লেটারে, ছাপা হলো– G'NITE. G'NITE.

সময় কাঁটায় কাঁটায় মাঝরাত। স্থির এবং স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রিন্টার।

প্রিন্টারের পিছনে চলে এল ডিকসন আর জন, প্রিন্টআউটের বাক্সগুলো রবারের চাকা লাগানো ট্রলিতে তুলল। ডাস্ট লক-এর দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ডিকসন, সামনে ট্রলি নিয়ে এগিয়ে এল জন। দু'জনেই অপেক্ষায় থাকল যতক্ষণ না লাল আলো বদলে সবুজ আলো জ্বলে ওঠে। সাথে করে ওরা যে বাতাস নিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সেটা পরিষ্কার হবার পর সবুজ আলো জ্বলে উঠল, এবার ওরা বেরিয়ে এসে ইনার ডাস্ট লক-এর দিকে এগোল, পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করা হলো এখানেও। কমপিউটর রুম এখন খালি, নিস্তব্ধ, এবং সম্পূর্ণ স্থির; কমপিউটর এখন সাময়িক বিশ্রামের মধ্যে রয়েছে।

রোজ রাতে এক ঘণ্টার জন্যে কমপিউটর রুম খালি করা হয়, এই ফাঁকে ভেতরের বাতাস বের করে নিয়ে নতুন করে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত ধুলোবিহীন বাতাস ভরা হয়। কামরাটার ওপর নজর রাখে একজোড়া ক্লোজড সার্কিট টিভি সিস্টেম, যেগুলো রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে মাঝরাতে চালু হয়। এই মুহূর্তে স্থির কমপিউটর রুমটাকে দুটো ক্যামেরার সাহায্যে দেখা যাচ্ছে, দু'দিকের দেয়ালে ফিট করা রয়েছে ওগুলো, একটা করে আউটপুট যোগান দিচ্ছে তিন জায়গায়–ডিউটি কন্ট্রোলারের অফিস, নাইট ওয়াচম্যানের ডেস্ক আর টেলিফোন সুইচবোর্ড রুমে।

পরস্পরের সাথে সংযুক্ত, স্লেভ এবং মাস্টার, দুটো 1151মিডো কমপিউটর রয়েছে কামরাটায়। দুটোরই আলাদা আলাদা কনসোল রয়েছে, সাথে ডিস্ক আর টেপ ইনপুট মেশিনের উঁচু স্তর, আরও আছে হাই এবং লো স্পীড প্রিন্টারের উপস্থিতি। দেয়াল আর সিলিঙে অ্যালুমিনিয়ামের অবলম্বনসহ শব্দ-নিরোধক প্যানেল রয়েছে, সুড়ঙ্গবহুল কংক্রিটের মেঝে, খানিক পর পর তিন বর্গ ফুট আকারের একটা করে চ্যানেল, রবার মোড়া স্টীল প্লেট দিয়ে ঢাকা। কংক্রিটের সুড়ঙ্গ এয়ার কন্ডিশনিঙের ডাক্ট হিসেবে কাজ করে, তাছাড়া ভেতরে রয়েছে কয়েকশো মাইল লম্বা ওয়্যারিং, কামরার প্রতিটি অংশের প্রতিটি অ্যাপারেটাসকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করেছে। চার্লি ফ্রানসি গুড়ি মেরে বসে রয়েছে কামরার শেষ প্রান্তে, চ্যানেলের ভেতর, একটা ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরার পিছনে। ক্যামেরার তার দেয়ালের ভেতর দিয়ে নেমে এসেছে, তারপর চার্লি ফ্রানসির চ্যানেলে ঢুকে আরেক দিকে চলে গেছে। তার হাতে একটা জিনিস দেখা গেল, দেখতে অনেকটা চিমটা বা সাঁড়াশির মত, মাথায় তারের কুণ্ডলী। এই তার একটা প্লাগের সাথে যুক্ত। হাতলে চাপ দিয়ে

চিমটাটা দু'ফাঁক করল সে, ফাঁকের ভেতর আনল টেলিভিশন ক্যামেরার তার, চিমটার মাথার সাথে শক্তভাবে আটকে গেল সেটা। প্লাগ থেকে তার ছাড়তে ছাড়তে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে কামরার আরেক প্রান্তে এসে পকেট থেকে হুবহু একই রকম দেখতে আরেকটা চিমটা বের করল সে, দ্বিতীয় টেলিভিশন ক্যামেরার তারটাকেও একইভাবে চিমটার মাথায় আটকাল। এরপর মেইন সকেটে প্লাগটা ঢোকাল সে, ডায়াল-এর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে সুইচ অন করল। সঙ্কটময় মুহূর্ত, কি হয় বলা যায় না। ক্যামেরার ওয়্যারে চিমটার যে তার সে জড়িয়েছে তার ফলে পিকচার ইমেজ ফেটে গিয়ে ঝাপসা আর অস্পষ্ট দেখানোর কথা। এই মুহূর্তে যারা মনিটর স্ক্রীনে চোখ রেখে বসে আছে তারা ভাববে ত্রুটিটা মনিটরের, কাজেই সেটা অ্যাডজাস্ট করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। কুণ্ডলী পাকানো তারের সাহায্যে চার্লি ফ্রানসি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এফেক্ট সৃষ্টি করেছে তা আবিষ্কার করার জন্যে ক্যামেরার ওয়্যার পরীক্ষা করতে হবে, সন্দেহ না হওয়ায় এখুনি সে-কাজে হাত দেবে না কেউ। মাথার ওপর থেকে স্টীল প্লেটটা সরাল সে, চ্যানেল থেকে উঠে এল কামরায়, হাতে দুটো কার্ডবোর্ড—কমপিউটর রূমের ছবি আঁকা রয়েছে ওগুলোয়, প্রতিটি ক্যামেরা লেন্সের অবস্থান থেকে তাকালে ঠিক যেমনটি দেখাবে। প্রতিটি ছবি সংশ্লিষ্ট ক্যামেরার সামনে আটকাল সে, ত্রিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে। তারপর চ্যানেলে ফিরে গিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কয়েল-এর সুইচ অফ করল। মনিটর স্ক্রীনে এখন পরিষ্কার ছবি ফুটছে, স্ক্রীনের সামনে যারা বসে আছে তারা মনে করবে কমপিউটর রূমই দেখতে পাচ্ছে।

আগামী পঞ্চাশ মিনিটের জন্যে কমপিউটর রূমের ভেতর সম্পূর্ণ স্বাধীন চার্লি ফ্রানসি, যা খুশি করতে পারে, কেউ তাকে দেখতে পাবে না। ডিকসন আর জন খেতে গেছে, হঠাৎ করে তারা ফিরে আসবে সে সম্ভাবনা নেই।

হাতে প্রচুর সময় থাকলেও দ্রুত কাজ শুরু করল চার্লি ফ্রানসি, ঠিক কি করতে হবে ভাল করেই জানা আছে তার। ওভার-রাইড সুইচ অন করল সে, সাথে সাথে জ্যান্ত হয়ে উঠল কমপিউটর, ছোট কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল কনসোলে। ইনপুট ব্যাংকের সামনে চলে এল সে, খালি এক বাক্স ডিস্ক বেছে নিয়ে মেশিনে চড়াল। চ্যানেলে নেমে গিয়ে নিজের সুটকেসটা আনল চার্লি। মেগা-বক্সটা রয়েছে ভেতরে, এরইমধ্যে টিউন করা আছে ক্যারিয়ার ওয়েভের দিকে। ক্যারিয়ার ওয়েভের উৎস হলো পিলমোর সেন্ট্রাল অফিস লিস্বন আর শহরের বাইরে পিলমোর ফ্যাক্টরি, ওয়েভটা বেছে নিয়েছে চার্লি আর্লি বার্ড স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে। কর্ম দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত বিরতিহীন সক্রিয় রাখা হয় ক্যারিয়ার ওয়েভ, ওটার সাথে পিলমোর কোম্পানীর সমস্ত অ্যাকাউন্ট ঝুলতে থাকে। চার্লি শুধু তার মেগা-বক্সের সাহায্যে ওই ক্যারিয়ার ট্যাপ করল, অ্যাকটিভেট করল পিলমোর অ্যাকাউন্টে ডাটা বেস, কপি করল নিউ ইয়র্ক কমপিউটরের সাহায্যে—মেশিনে সদ্য চড়ানো ডিস্কে, শুধু যে অংশটুকু তার দরকার। সে যে-ধরনের ডিস্কের বাক্স ব্যবহার করছে, ওতে পাঁচশো মিলিয়ন বাইট স্টোর করা যায়। গোটা পিলমোর অ্যাকাউন্ট আর তার অ্যাকটিভেটিং সিস্টেম রেকর্ড করতে চার্লির মাত্র বিশ মিলিয়ন দরকার। কাজটা শেষ করতে সময় লাগল তিন মিনিট।

এরপর সে একে একে ইউনিক প্রিন্টিং ইংল্যান্ড, ডেল্টা টিউবস নিউ জার্সি, ও ফ্যাবরিক ফ্যাবরিক মিউনিক-এর সিস্টেম ও অ্যাকাউন্ট কপি করল। আবার মেগা-বক্সের বোতামে চাপ দিল সে, পেরুর রাজধানী লিমার সাথে যোগাযোগ করা দরকার। লিমা আর টোয়েমেনকো টোকিওর মাঝখানে একটা ক্যারিয়ার ওয়েভ আছে, প্রাইভেট ওয়েভ, সেটা ব্যবহার করতে হবে তাকে। প্যাসিফিক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে টোকিও থেকে সাড়া পেল সে, সঙ্কেত পরিষ্কার এবং জোরাল-খুশি মনে ইউ.এম.পি. লিমা থেকে ইনফরমেশন পাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। কিন্তু না। কোন তথ্য আসছে না। ইউ.এম.পি. ক্যারিয়ার কাজ করছে না। হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল সে। ধেত্তেরি, কাজ না করার কি কারণ ঘটল! ঠিক এই সময়ে এখানে তার আসার কারণই হলো রাত্রিকালীন বিরতির পর লিমা কমপিউটর আবার চালু হয়েছে। আবার বোতামে চাপ দিল সে। নাহ্। সুটকেস থেকে ছোট একটা বই বের করে পাতা ওল্টাল। ইউ.এম.পি. ফ্যাক্টরি সান মিগুয়েল আর মিভো প্লাস্টিক অফিসের মাঝখানে লিঙ্ক আছে, খুঁজে বের করল টেলিফোন কোডটা। কোডটাকে ইলেকট্রনিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে ট্র্যান্সমিট করল। কিছু না। ডাটা বেস আগের মতই অপারেট করতে ব্যর্থ হলো। এদিকে সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, কমপিউটর রূমটাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হাতে আর মাত্র পনেরো মিনিটের মত পাওয়া যাবে। আরেকবার চেষ্টা করে দেখল-উঁহু। সান মিগুয়েলের কমপিউটর কাঠের মত মৃত একটা ব্যাপার। রাগে গজ গজ করতে করতে ডাটা বেস বক্সে সাঁটার জন্যে দ্রুত একটা লেবেল লিখল চার্লি ফ্রানসি-EXPERIMENTAL-HOLD FOR S-2.মেশিন থেকে ডাটা বেস বের করে নিল, বাক্সে ভরল, তারপর বাক্সটা শেলফের ওপর প্রকাশ্যে রেখে দিল। এক্সপেরিমেন্টাল এস-টু লেবেল থাকায় কেউ ওটায় হাত দেবে না। সুইচ টিপে কমপিউটর বন্ধ করল সে, চ্যানেলে নেমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সুইচ অন করল। মনিটর স্ক্রীনে আবার এখন ছবির বদলে এলোমেলো আর আঁকাবাঁকা রেখা ও রঙ ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না, ধরা পড়ার কোন ঝুঁকি ছাড়াই ফটো কার্ডগুলো সরিয়ে নিতে পারে সে। কার্ডবোর্ড দুটো নিয়ে আবার চ্যানেলে নেমে এল, চ্যানেলের মাথায় জায়গা মত বসিয়ে দিল স্টীল প্লেট ঢাকনি, তার আগে কমপিউটর রূমের চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিতে ভোলেনি। না, নিজের উপস্থিতির কোন চিহ্ন সে রেখে যাচ্ছে না।

ঢাকনি বন্ধ করে টর্চ জ্বালল সে। ইলেকট্রোম্যাগনেটের সুইচ অফ করল, তারগুলো জড়াল, তারপর সুড়ঙ্গের ভেতর শুয়ে লিমার অদ্ভুত ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড পরই কমপিউটর রূমে ঢুকল ডিকসন আর জন। ঢুকেই তারা কমপিউটর চালু করল। কনসোলের আলোগুলো ওদের উদ্দেশে চোখ টিপল আর হাই স্পীড প্রিন্টআউট জানাল G'MORN, G'MORN.

কমপিউটর মেধা চার্লি ফ্রানসি জানল না তার কাজে এরইমধ্যে বাধা সৃষ্টি করে বসেছে মাসুদ রানা নামের সাধারণ এক এসপিওনাজ এজেন্ট। রানার একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলেই ইউ.এম.পি. লিমার সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

ছয়

কমপিউটর একটা মেশিন ছাড়া কিছুই নয়, ওটা ইলেকট্রনিকের সাহায্যে নির্দেশ পালন করে, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই। নির্দেশগুলো প্রোগ্রামের ভেতর থাকে, আর ইনফরমেশনগুলো থাকে একটা ডাটা ব্যাংকের ডাটা বেস-এ। মিডো হেডকোয়ার্টার জুরিখের একটা ডাটা বেসে এই বিশাল করপোরেশনের সব ক'জন কর্মচারীর প্রাসঙ্গিক সমস্ত ইনফরমেশন রেকর্ড করা আছে। উদাহরণ হিসেবে, একটা প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব, যা কিনা কমপিউটরকে নির্দেশ দিয়ে বলবে কর্মচারীদের সবার সবগুলো ফাইল 'পড়ো' এবং তাদের মধ্যে যারা ফরাসী ভাষা জানে তাদের নামগুলো প্রিন্ট করো। মানুষের সাথে তুলনায় কমপিউটরের শ্রেষ্ঠত্ব হলো মানুষের ভুল হয়, কিন্তু কমপিউটরের হয় না, কাজেই প্রতিবার প্রতি মুহূর্তে শতকরা একশো ভাগ নির্ভুলতার জন্যে তার ওপর নির্ভর করা যায়, তাছাড়া কমপিউটর কাজ করে মানুষের চেয়ে অনেক অনেক দ্রুতগতিতে। সকল কর্মচারীর সব ক'টা ফাইল পরীক্ষা করতে মিডো কমপিউটরের লাগবে পাঁচ সেকেন্ডেরও কম সময়, তারপর বের করে আনা ইনফরমেশনটা ছাপা শেষ করবে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে। মাসুদ রানার লিখিত অনুমতি-পত্র নিয়ে হেডকোয়ার্টার জুরিখ কমপিউটর রুমে হাজির হলো পাপিয়া রহমান। হেড প্রোগ্রামার একজন কানাডিয়ান মেয়ে, হেলেন জার্মান, বয়স পঁচিশ, স্বর্ণকেশী। কমপিউটর সম্পর্কে কিছুই জানে না পাপিয়া, কাজেই কি তার দরকার ব্যাখ্যা করতে হলো, 'যাদের ফাইল দেখে ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন না কোন সময় কমপিউটর নাড়াচাড়া করেছে বা কমপিউটর সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছে—তাদের একটা তালিকা।'

'সে তালিকায় আমার নামও থাকবে,' বলল হেলেন জার্মান।

'জানি।'

'কাজেই, ধরো, আমার জানার অধিকার আছে কেন তুমি তালিকাটা চাইছ?'

'হ্যাঁ, আমিও একমত, জানতে চাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়,' জবাব দিল পাপিয়া।

'কিন্তু এরবেশি আর কিছু তুমি বলবে না?'

'মুশকিল হলো শুধু এটুকু বলারই অধিকার দেয়া হয়েছে আমাকে।'

একটা তথ্য-উদ্ধার প্রোগ্রাম তৈরি করতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল হেলেন জার্মানের। আরও পাঁচ মিনিট লাগল নির্দিষ্ট ডাটা বেসগুলো মেশিনে চড়াতে। তারপর কমপিউটর রুমের একটা কনসোলে বসল সে। 'ফিলিপস আইন্ডহোভেন-এর কনসোল ডিজাইন আমাদের চেয়ে ভাল,' গল্প শুরু করল হেলেন জার্মান, কিন্তু হাত থেমে নেই। কী-বোর্ডে প্রজাপতির মত উড়ছে তার আঙুল, সেটা দেখতে সাধারণ একটা টাইপরাইটারের মত, কিন্তু সচল কোন প্ল্যাটন নেই, পাশে রয়েছে ছয় ইঞ্চি কিউবিক একটা বাক্স। কাজ শেষ করার পর বাক্স থেকে অক্সাইড মোড়া ব্রাউন একটা কার্ড বের করল সে। 'সাধারণত আরেকজন অপারেটরকে দিয়ে এটা

ভেরিফাই করিয়ে নেয়ার নিয়ম,' বলে হাসল একটু। 'তবে এক্ষেত্রে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি।' পাপিয়াকে দেয়া রানার অনুমতি-পত্রে যে কোড নম্বর লেখা আছে তার অর্থ হলো এই ইনফরমেশন টপ সিক্রেট এবং টপ প্রায়োরিটি। পাপিয়া ছাড়া আর শুধু হেলেন জার্মান এই কার্ড দেখতে পারবে।

'অনেকেই আজকাল পিওর ক্রোমিয়াম কার্ড ব্যবহার করছে,' বলল সে। 'নতুন টেপ রেকর্ডারে যেমন দেখা যায়...' কথা বলে গেলেও আসল কাজে তার গভীর মনোযোগ রয়েছে। একটা রিডার-এ কার্ড ঢোকাল সে, কার্ডের ইলেকট্রনিক প্রতীকগুলো বিশ্লেষণ করে কমপিউটরে ট্র্যান্সফার করতে সময় লাগল রিডারের মাত্র এক মাইক্রোসেকেন্ড। কমপিউটর এখন জানে কি তাকে করতে হবে, এবং বোতাম টিপে হেলেন জার্মান কাজ শুরু করার নির্দেশ দিতেই, বোতাম থেকে হাত সরাবার আগেই কাজটা শেষ করে ফেলল। 'এবার চলো ওদিকে যাই,' বলল হেলেন জার্মান, হেঁটে প্রিন্টিং সেকশনে চলে এল ওরা দু'জন। এখানে মেশিনগুলো আকারে বড়, স্ট্যান্ডের ওপর বসানো রয়েছে টাইপরাইটার-টাইপ প্ল্যাটন, স্ট্যান্ডগুলো আকারে তিন বর্গ ফুট, লম্বায় চার ফুট। স্ট্যান্ডের সাথে কাগজও রয়েছে, মেশিনের পিছন দিককার একটা বাক্স থেকে আসছে ওগুলো, দাঁত-লাগানো চাকার মাধ্যমে প্ল্যাটন হয়ে ফিরে যাচ্ছে মেশিনের পিছনদিককার আরেক বাক্সে। হেলেন জার্মান যে প্রোগ্রাম লিখেছে সেটা একটা 'হোল্ড কোড' সম্বলিত, সে না চাইলে প্রিন্টআউট বেরুবে না। একজন লোক ট্রলি ভরা বাক্স না নামানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে।

'সি.আই. কেনেথ।'

কাজ থামাল কেনেথ, ধীর পায়ে প্রিন্টআউট সেকশন থেকে বেরিয়ে গেল, হাত-ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল আরও দু'জন অপারেটরকে। কামরার এদিকের অংশটুকু খালি হবার পরই শুধু মেশিনে কার্ডটা ঢোকাল হেলেন জার্মান, এটাই প্রিন্টআউট শুরু করার নির্দেশ হিসেবে কাজ করবে। কাগজের উদ্গিরণ শুরু হলো, গতি এত দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা যায় না, ছাপা হয়ে যাচ্ছে নামের একটা তালিকা, স্টাফ নাম্বার, লোকেশন, কমপিউটর সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। পরিষ্কার ঝকঝকে ছাপা, ছক কাটা ঘরের ভেতর কলামগুলো নির্দিষ্ট মাপের—তালিকার নামগুলো এল বর্ণানুক্রমিক নিয়মে, কর্মস্থলের নামও সেভাবে এল। জুরিখ হেডিঙের নিচে ইনফরমেশনগুলো ছাপা শেষ হতে প্রিন্টারের সুইচ অফ করে দিল কমপিউটর, তারপর আবার শুরু করল তার দৈনন্দিন রুটিন বাঁধা কাজ—অ্যাকাউন্টিং, স্টক কন্ট্রোল, সেলস অ্যানালাইসিস।

পাপিয়া বিষম বিস্মিত। 'এরইমধ্যে পেয়ে গেছ?' জানতে চাইল সে। 'মাত্র দশ মিনিট হলো এখানে এসেছি আমি।'

একটা কার্ড তুলে নিল হেলেন জার্মান। 'শেষ নেই এমন সব সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত আমরা,' হেসে উঠে বলল সে। 'কথাটার মধ্যে যদি আত্মপ্রসাদের ভাব টের পেয়ে থাকো, বলব ঠিক ধরেছ, এইমাত্র আমরা সাতচল্লিশ মিলিয়ন বাইট-এর ভেতর অনুসন্ধান চালিয়েছি...'

'বাইট কি?'

'ইনফরমেশনের একটা ইউনিট। আমার নাম, জার্মান, মানে ছয় বাইট—সাত,

যদি আমি প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিট্যাল লেটারে চাই।'

'বলছ, এইমাত্র আমরা সাতচল্লিশ মিলিয়ন বাইটের ভেতর অনুসন্ধান চালিয়েছি?'

'হ্যাঁ। আর ছেপেছি দু'লাখেরও বেশি।'

মেশিন থেকে কাগজ বের করে নিয়েছে হেলেন জার্মান। সেটা একটা মেটাল কেসে ভরল, বন্ধ করে লক করল কেস, দেরাজ থেকে লেড সীল বের করে লকের ওপর বসাল, সীল ক্লিপার দিয়ে আটকে দিল শক্ত করে। 'এরপর কি?' জানতে চাইল সে।

'আমরা জানতে চাই–ক, তালিকার লোকদের মধ্যে কাদের বুক-কিপিং বা অ্যাকাউন্টিং এক্সপিরিয়েন্স আছে। কিংবা–খ, কারা জার্মান, স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে পারে। কিংবা–গ, কোম্পানীর তরফ থেকে অফিশিয়ালি যাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, অথবা প্রমোশন আটকে রাখা হয়েছে। যারা ক খ গ এই তিন শ্রেণীতেই পড়বে তাদের আলাদা একটা তালিকা চাই।'

'আমি তাহলে বাদ পড়লাম,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল হেলেন জার্মান। 'স্প্যানিশ বা জার্মান জানি না, বুক-কিপিং বা অ্যাকাউন্টিঙের অভিজ্ঞতাও আমার নেই, তাছাড়া সদ্য প্রমোশন পেয়েছি...'

কথা বলছে, কিন্তু কাজ তার থেমে নেই। মনটাকে একাধিক কাজে ব্যস্ত রাখার এই কৃতিত্ব লক্ষ করে মুগ্ধ হলো পাপিয়া। সে লক্ষ করল, একদিকে কথা বলছে হেলেন জার্মান, আরেকদিকে জটিল কমপিউটর প্রোগ্রাম তৈরি করছে, অথচ যখনই কোন কাজে কনসোলটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে কেনেথ অ্যান্ডারসন, যেন নিজের অজান্তে অভ্যেসবশত তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছে সে, হাত তুলে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে চুল। কেনেথ অ্যান্ডারসনের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয়নি, দেখতেও সুপুরুষ। হেলেন জার্মান দক্ষ কমপিউটর প্রোগ্রামার হলে কি হবে, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্র হারায়নি।

দু'জন হেঁটে এল প্রিন্টার সেকশনে। ওরা অপেক্ষা করছে, আবার একবার সেকশন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হলো কেনেথকে। মন্থরগতি একটা প্রিন্টারে কাজ হচ্ছিল, হঠাৎ করে কী-র ছন্দবদ্ধ ক্ল্যাক-ক্ল্যাক-ক্ল্যাক শব্দ মুহূর্তের জন্যে বিরতি নিল। হেলেন জার্মান অলসভঙ্গিতে সেদিকে একবার তাকাল, তারপরই তার ভুরু কুঁচকে উঠল। প্রিন্টারটা ইনভয়েস প্রিন্ট করছে, প্রতিটি কাগজের শীটে একটা করে ইনভয়েস, সাথে কোম্পানীর নাম, সরবরাহ করা পণ্যের বর্ণনা, ইউনিট প্রতি মূল্য, এবং চূড়ান্ত হিসেবে সর্বসাকুল্যে দেয় মূল্য। ইনভয়েসগুলো মেশিন থেকে নামানো হলে আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে ঢুকে যাবে উইন্ডো এনভেলাপে, তারপর চলে যাবে ডাকবাক্সে। কিন্তু খানিক পরপর, মনে হলো, প্রিন্টারটা যেন হেঁচকি তুলছে, আর একবার হেঁচকি তুললেই গোটা একটা পাতা বাদ পড়ছে–থামছে একমুহূর্ত, তারপর লাফ দিয়ে চলে যচ্ছে পরবর্তী পাতায় অর্থাৎ পরবর্তী ইনভয়েসে, এবং দেখে মনে হলো একেবারে নিখুঁত ছাপা হচ্ছে সেটা।

'অদ্ভুত তো,' বলল সে, চেহারায় শুধু কৌতূহল নয়, উদ্বেগও ফুটে আছে।

হাই-স্পীড মেশিনে কার্ড ঢোকাল সে, পাপিয়ার চাওয়া তথ্যগুলো উগরে দিল

মেশিন।

ক খ গ, এই তিন শ্রেণীতেই পড়ে এমন কেউ মিডোয় নেই। তবে যে-কোন দুটো শ্রেণীতে পড়ে এমন লোকের সংখ্যা প্রচুর। বহু লোক কমপিউটর সম্পর্কে জ্ঞান রাখে আবার অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওর সম্পর্কেও জানে। বহু লোক জার্মান, ফ্রেঞ্চ আর স্প্যানিশ ভাষা বলতে পারে। সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এমন কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। ব্যাপারটা স্বাভাবিক, ব্যারনেস লিনা কড়া শৃঙ্খলার সাথে কোম্পানী পরিচালনা করে, নিরপেক্ষ সততার সাথে যার প্রাপ্য তাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং একইভাবে প্রয়োজনে ও সুনির্দিষ্ট কারণে কারও কারও পদাবনতি ঘটানো হয়।

না পড়েই লক করে প্রিন্টআউট সীল মারল হেলেন জার্মান। ডকুমেন্ট কেসটা তার হাত থেকে নিল পাপিয়া, রসিদে সই করল। সে লক্ষ করল, লো স্পীড প্রিন্টারকে হেঁচকি তুলতে দেখার পর থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে হেলেন জার্মান, এখন আর সে একই সময়ে একাধিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছে না। এমনকি কেসটা সীল করা হয়েছে দেখে কেনেথ যখন তার কাজে এদিকে ফিরে এল, তার দিকে তাকিয়ে হাসার কথা ভুলে গেল হেলেন জার্মান, চুলে হাতও উঠল না। মেশিনটার দিকে তাকিয়ে আছে সে, নিজের খেয়ালে ইনভয়েস ছেপে যাচ্ছে ওটা। প্রতি সাত সেকেন্ডে একটা করে ইনভয়েস ছাপা হলেও, হাই-স্পীড প্রিন্টারের সাথে তুলনায় ওটাকে কুঁড়ের বাদশা বলা যেতে পারে। আবার ওটা হেঁচকি তুলল, আবার একটা খালি পাতা বেরুল। দ্রুত প্রিন্টআউট থামাল হেলেন জার্মান, খালি পাতার আগের এবং পরের সিকোয়েন্স নাম্বার পড়ল। মিল আছে, কিছুই বাদ পড়েনি।

'ধেত্তেরি ছাই, আমাকে জানতে হবে কেন ওটা ওরকম করছে…' বিড়বিড় করে বলল সে। সুইচ টিপে আবার চালু করল প্রিন্টআউট, কিন্তু তার আগেই পাপিয়া দেখে ফেলেছে বিরতির পরে যে ইনভয়েসটা ছাপা হয়েছে সেটা লিয়নস, ফ্রান্সের পিলমোর কোম্পানীর নামে।

লিমায় মাঝরাত, অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রূমে বসে রয়েছে রানা, জানালার কাচ লাগানো থাকায় অ্যাভেনিডা অ্যাবানসে থেকে যান-বাহনের কোন শব্দ ভেতরে ঢুকছে না। সোফা ছেড়ে উঠল ও, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কবাট সামান্য একটু ফাঁক করতেই যান্ত্রিক শব্দজট হামলা চালাল কর্ণকুহরে। ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাতে যাবে, মিষ্টি ডোর-বেলের আওয়াজ হলো। জানালার দিকে পিছন ফিরে অপেক্ষায় থাকল ও। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মার্ভেলা।

'সিনর মাদ্রে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন, সিনর রানা,' বলল সে, তার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল সিনর কসমো মাদ্রের কাজিন, প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি ইউ. এম. পি-তে কাজ করে। অ্যালকোহলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সে, মার্ভেলার হাত থেকে গ্রহণ করল এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস, বসল জানালার পাশের একটা চেয়ারে।

'ব্যাপারটা কি নিয়ে আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাদের ইনভয়েসে ওভারপেমেন্ট। অঙ্কটা আমার কাজিন আমাকে জানিয়েছে, সাথে করে আমি চেক বই-ও নিয়ে এসেছি। মি. রানা, দয়া করে আমাকে এই কথাটা বলার সুযোগ দিন যে আমি মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করিনি

আমরা আপনাদের কোম্পানী থেকে পাওনার চেয়ে বেশি টাকা আদায় করছি…'

'আপনাদের সততা সম্পর্কে কারও মনে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তবে কেউ একজন দায়ী, আমরা তাকে ধরতে চাই। আপনাদের কমপিউটর অপারেশনে ক'জন স্টাফ রয়েছে?'

'সব মিলিয়ে বারোজন।'

'ওদের মধ্যে ক'জন প্রোগ্রাম লিখতে পারে?'

'মাত্র চারজন। ডিরেক্টর, অবশ্যই; ডিরেক্টরের অ্যাসিস্ট্যান্ট, অবশ্যই; আর দু'জন প্রোগ্রামার।'

'বাকি আটজন?'

'ওরা অধস্তন সাধারণ অফিস কর্মচারী, সিনর, নির্দেশ পালন ছাড়া কাজের ধরন বা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না।'

'ওদের কেউ কমপিউটর সম্পর্কে ট্রেনিং নিয়েছে, সম্ভব?'

'না, সিনর রানা—ওদের সম্পর্কে জানি আমি। গোটা সেকশনটা চালুই হয়েছে মাত্র এক বছর হলো। ট্রেনিং নিয়ে পাকা হবার সময় কোথায়!'

'ওদের চারজন সম্পর্কে আপনি আমাকে কি জানাতে পারেন?'

'ডিরেক্টর একজন মাদ্রে…'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল রানা। পুরানো রীতিনীতি বদলাচ্ছে, কিন্তু তারপরও কেউ কেউ সেগুলো আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। 'আমি রূঢ় হতে চাইছি না, সিনর, কিন্তু জিজ্ঞেস না করেও পারছি না যে কেউ মাদ্রে হলেই ধরে নিতে হবে তার দ্বারা কোন অন্যায় অপরাধ সম্ভব নয়?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সিনর মাদ্রে। 'আছে, ধরে নেয়ার কারণ আছে,' বলল সে। 'অন্তত এই একটা কারণ আছে। মাদ্রেরা যারা ইউ.এম.পি-তে কাজ করে, সব মিলিয়ে পাঁচজন, সবাই নিঃসন্দেহে এ-কথা জানে যে তাদের একজনও যদি সদ্ব্যবহারের সীমা লঙ্ঘন করে তারা সবাই একযোগে পদত্যাগ করবে। মাদ্রে পরিবারের ঐক্য এতই…'

'ঠিক যেরকম নিউ ইয়র্কে ইটালিয়ান পরিবারগুলো…?'

'আপনি যদি মাফিয়াদের কথা বলেন…'

'তিক্ততার মধ্যে যেতে চাই না, সিনর মাদ্রে…যদি আপনার কথা মেনে নিই, তাহলে তালিকায় থাকছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আর দু'জন প্রোগ্রামার। আপনার কাজিনকে বাদ দিয়ে এদেরকে সন্দেহ করা হলে আপনি খুশি হন?'

'আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, প্রত্যেকের ব্যাপারে তদন্ত চালানো হোক, আমার "কাজিন"-কেও বাদ দেয়ার দরকার নেই—সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা পাবেন আপনি। ভাল কথা, ডিরেক্টর আমার ভাগ্নী, কাজিন নয়।'

মিডো প্লাস্টিক আর ইউ. এম. পি-র মধ্যে যে-ক'টা চুক্তি বা ব্যবসা হয়েছে তার সবগুলোর অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করল ওরা। অনিয়ম পাওয়া গেল মাত্র এক জায়গায়। মিডোর কাছ থেকে তিন লাখ সোল ওভারপেমেন্ট পেয়েছে ইউ.এম.পি.। গোলমালটা লিখিত মূল্যে—মূল্য ডলারে উল্লেখ করা হলেও মিডো পেমেন্ট করেছে স্টার্লিঙে। ব্যক্তিগত নোটবুকে একটা মন্তব্য লিখল রানা, 'মিডো নির্দিষ্ট একটা

কারেন্সিকে যদি বেছে নেয় এবং তারপর শুধুমাত্র ওই কারেন্সি যদি কোট করা হয় তাহলে এ-ধরনের বিপদ থেকে বাঁচার একটা স্থায়ী উপায় বেরিয়ে আসবে।'

ও বলল, 'আজ সন্ধেটা আমি ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়েছি আপনার আরেক কাজিনের সাথে।'

'কমপিউটর ডিপার্টমেন্টের হেড...?'

'হ্যাঁ।'

'সাকসেসফুল মীটিং ছিল...?'

রানা জানে ভদ্রতার খাতিরে মীটিঙের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইছে না সিনর মাদ্রে, তবে বিষয়টা সম্পর্কে তাকে বলতে চায় ও। 'সিনর কসমো মাদ্রের সাথে পরামর্শ করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনাদের কমপিউটর সেকশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আপাতত ইউনিভার্সিটির কমপিউটর আর তাদের স্টাফরা আপনাদের সমস্ত ট্র্যানজ্যাকশন সামলাবে। আপনার কমপিউটর স্টাফদের ওপর এই মুহূর্তে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে।'

'তাদের মধ্যে কি ডিরেক্টরও আছে?'

'তাদের মধ্যে ডিরেক্টরও আছেন।'

'আপনি কি পুলিস ডাকছেন?'

'এখুনি নয়।'

'লিমার পুলিস চীফও আমার একজন কাজিন...'

'তা আমি জানি। সিনর কসমো মাদ্রের ধারণা, লিমা একটা গ্রাম...'

'তার ধারণা মিথ্যে নয়।'

'গ্রাম হোক আর শহর, এই অন্যায় লেনদেনের জন্যে যে দায়ী তাকে আমরা ধরব...'

'এবং তারপর?'

'তারপর আপনার কাজিন লিমার পুলিস চীফকে খবর দেব।'

'কিন্তু যদি দেখা যায়, ধরুন, দায়ী আসলে আমার ভাগ্নী?'

'তবু আমরা আপনার কাজিনকে খবর দেব, তবে তিনি যদি...' কথা শেষ করার আগে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, ওকে বাধা দিল সিনর মাদ্রে।

'সিনর রানা, আপনার কাছে আমার শুধু একটা উপকার চাওয়ার আছে।' রানা উপলব্ধি করল, একজন মাদ্রের পক্ষে উপকার প্রার্থনা করা খুব কঠিন ব্যাপার, তবে মনের কথা গোপন রাখল ও, সাহায্যের হাত বাড়াল না। নিজেদের পরিবারে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব ওদেরই। 'কোন কুক্ষণে আপনি যদি আবিষ্কার করে বসেন যে আমার ভাগ্নীই দায়ী, তাহলে আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ পুলিস চীফকে খবর দেয়ার আগে দয়া করে আমাকে একটু সময় দেবেন।'

'পারিবারিক একটা সভা ডাকবেন?'

'আমাদের যে-টুকু সম্মান আছে তা রক্ষা বা উদ্ধার করার চেষ্টা করব।'

সোজা কথা কঠিন সুরে বলার সময় হয়েছে। 'দেখুন, সিনর মাদ্রে। আমি মিডোর প্রতিনিধিত্ব করছি, কাজেই শুধু তাদের স্বার্থই দেখব আমি। সময় চেয়ে আপনি আসলে...'

'কিন্তু সিনর, আপনি একজন সমঝদার ব্যক্তিও তো বটেন।'

'শুধু মনে রাখবেন, প্লীজ, আপনি যার সাথে কথা বলতে এসেছেন তিনি বিশ্বস্ততা বিক্রি করেন না। আপনি কোন রকম নোংরা ইঙ্গিত দিয়ে ফেলতে পারেন সেই ভয়ে কথাটা আমাকে বলতে হলো।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, সিনর রানা। মাদ্রে পরিবারে এমন অনেকেই আছে যারা আমাদের পারিবারিক রীতিনীতি অনুসারে সৌজন্য দেখানোর সুযোগ পেলে সম্মানিত বোধ করবে। বিশ্বস্ততার কথা যদি বলেন, মাদ্রে পরিবারের বিশ্বস্ততা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং আনন্দময়। আমার যতটুকু জানা আছে, আপনি এখনও বিয়ে করেননি, সিনর।' সরাসরি না হলেও, প্রস্তাবটা ঘুষের। কোন মাদ্রে যদি দায়ী হয়, আসুন, পরিবারে যোগ দিন...

পেরুতে মিত্রের বিরাট ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে, কাজেই মাথা গরম করা ঠিক হবে না। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে বের করে দেয়ার ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দমন করল রানা। বলল, 'আপনি গুলিয়ে ফেলছেন। ব্যক্তিগত বিষয় আর অফিশিয়াল দায়িত্ব দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

সবিনয়ে মাথা নিচু করে বাউ করল সিনর মাদ্রে। 'আপনি একটা ক্ষুর, সিনর রানা।'

মাদ্রেকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল মার্ভেলা। এটা তার জন্যে একটা সম্মান এবং সুযোগ, দায়িত্বের অংশ নয়। সিনর মাদ্রে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সলজ্জভঙ্গিতে তার শার্টের আস্তিন স্পর্শ করল মার্ভেলা। সিনর মৃদু হাসল।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর রানাও বেরিয়ে এল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। একটা বেজে গেছে, রাস্তা প্রায় খালি। চীনা এলাকায় পাঁচ-সাতটা আর মাঝ শহরে গোটা দুয়েক ইন্টারন্যাশনাল রেস্তোরাঁ খোলা রয়েছে, আলো আর নড়াচড়া দেখা গেল কয়েকটা নাইট ক্লাবে, এগুলো বাদ দিয়ে লিমাকে এই মুহূর্তে মফস্বল শহর বলেই মনে হলো। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রানা বেরুবার পর থেকেই এক লোক অনুসরণ করছে ওকে। অ্যাভেনিডা অ্যাবানসে পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে এগোল রানা, রাস্তার মোড়ে ইউনিফর্ম পরা দু'জন পুলিস, ওর আপাদমস্তক পরখ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। অ্যাভেনিডা রুজভেল্টে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, সরাসরি হেঁটে এসে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। অনুসরণরত লোকটা বসল প্যাসেঞ্জার সীটে।

'হ্যালো, মি. কেভিন।'

'আমাকে গুয়াম বলেই ডাকবেন, স্যার,' গুয়াম ম্যাককেভিন হেঁড়ে গলায় অনুরোধ জানাল। তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় পেরুর সুজকো গোত্রের লোক সে, চেহারায় ইন্ডিয়ানদের ভাবসাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তবে বেশিরভাগ সময় নিউ ইয়র্কে থাকে সে। 'আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যিনি বেরুলেন, তাঁর পেছনে একজনকে পাঠিয়েছি, স্যার।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রুজভেল্ট ধরে অ্যাভেনিডা বলিভিয়াতে চলে এল রানা। ডান দিকে বাঁক নিয়ে ঢুকল অ্যাভেনিডা উইলসনে, মাইক্রোবাস থামাল অ্যাভেনিডা টাকনায়, হোটেল ক্রিলন-এর কাছে। এই মুহূর্তে রাস্তায় যানবাহন যা আছে তার বেশিরভাগই হোটেল ক্রিলনের সামনে। এই জায়গা ছাড়া শহরের অন্য যে-

কোনখানে মাইক্রোবাসটাকে সন্দেহজনক বলে মনে হবে।

একটা বেজে সতেরো মিনিট, ট্র্যানসিভার অন করল রানা, সাময়িকভাবে ওর সীটের পিছনে ফিট করা হয়েছে। লাউডস্পীকার ওর সামনে, ড্যাশবোর্ডের নিচে, নব ঘুরিয়ে মৃদু করে রাখা হয়েছে আওয়াজ। ঠিক একটা আঠারো মিনিটে রিপোর্ট আসতে শুরু করল। জুয়েলা মাদ্রে, ইউ.এম.পি. কমপিউটারের ডিরেক্টর, ব্রিজের অপর দিকের একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সাপার খাচ্ছে। তার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও রয়েছে।

'যাক, স্যার, খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল,' মন্তব্য করল গুয়াম।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'দু'জনকে আলাদা ভাবে ছারপোকা দান করা হয়েছে, স্যার। জুয়েলা মাদ্রে বহন করছেন তাঁর হ্যান্ডব্যাগের হ্যান্ডেলে, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তার সিগারেটের প্যাকেটে।'

'সিগারেটের প্যাকেট খালি হয়ে গেলে ফেলে দেবে,' আবার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'সারা দিনে তিনটের বেশি খান না, স্যার।' এক গাল হাসল গুয়াম।

তবু রানা খুশি হতে পারল না। 'ভাল হত যদি ওর শরীরের সাথে কোথাও...'

'জানি, মি. রানা। কিন্তু কোনভাবে পারা যায়নি। ভদ্রলোক ভারি সৌখিন, স্যার। প্রতি এক দেড় ঘণ্টা পর পর কাপড় পাল্টান। তাছাড়া, ভদ্রলোক নামকরা কেমসার, স্যার। সকালে বিকালে দু'বার খেলেন। কাজের সময় ছারপোকা লাগানো সম্ভব নয়। আজ রাতে ভাগ্য আমাদের ভাল, খেলছেন না।'

প্রোগ্রামার দু'জনই বাড়িতে রয়েছে, একজন এরইমধ্যে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অপরজন তার বান্ধবীকে সঙ্গ দান করছে—সংশ্লিষ্ট অপারেটর হাঁ করে ওদের প্রেমালাপ শুনছে, ঢোক গিলছে ঘন ঘন। তার পাঁজরে মৃদু একটা খোঁচা মারল গুয়াম। চমকে উঠে কুঁকড়ে গেল সে, তাজ্জব হয়ে বলল, 'বিয়ে করেছি দশ বছর, দেখছি কিছুই আমার শেখা হয়নি!'

পেশার এই অংশটুকু সবচেয়ে অপছন্দ করে রানা, নির্দোষ লোকজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজের এই সব অন্তর্ঘাত, চুরি, কারচুপি, জালিয়াতি ইত্যাদি ব্যাপারে সুরুচি প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই।

প্রথম অপারেটর লাউডস্পীকারে বলল, 'মনে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে খানিকটা ফাঁকি দিচ্ছেন জুয়েলা মাদ্রে। বাথরুমে যাচ্ছি বলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন বারে, কথা বলছেন টীনা মালিকের সাথে, ফোনটা ব্যবহার করতে চান। লং ডিসট্যান্স কল, মাইক্রোফোন থেকে কড়কড়ে নোটের আওয়াজ শুনে বুঝেছি টাকাও দিয়েছেন তিনি। ফোনে এবার কথা হবে, আশা করি সব শুনতে পাব।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অ্যাভেনিডা টাকনায় চলে এল রানা, রিমাক নদীর দিকে যাচ্ছে মাইক্রোবাস। ক্যালে লিমায় পৌঁছে থামল গাড়ি, অদূরে রিমাক ব্রিজ।

লাউডস্পীকারে অপারেটরের গলা ভেসে এল, 'ফোনে কথা হতে যাচ্ছে।'

'জায়গার নাম আর নম্বর কি?' গাড়ি চালিয়ে আসার সময় লাউডস্পীকারের দিকে

রানার মন ছিল না, জানে কথাগুলো টেপ করা হচ্ছে।

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল অপারেটর, 'দুঃখিত, স্যার। রেস্তোরাঁ মালিকের সাথে বারে কথা বলে ফোন বুথে যখন ঢুকলেন জুয়েলা মাস্ত্রে, তাঁর সাথে হাতব্যাগটা ছিল না। মালিক পরে সেটা দেখতে পেয়ে বুথে এসে দিয়ে গেছে। ফোনের পাশে শেলফেই বোধহয় রাখা হয়েছে, কারণ দু'দিকের আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি। তবে একটা কথা বলতে পারি, স্যার। জুয়েলা মাস্ত্রে নিউ ইয়র্কের সাথে কথা বলছেন।'

ভাগ্যের ওপর রাগ হলেও, মুখে কিছু বলল না রানা। সাবজেক্টের শরীরে মাইক্রোফোন না থাকলে এই-ই হয়। ঠিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে অন্য কোথাও ফেলে রেখে আসা হয় জিনিসটা।

'অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে,' বলল অপারেটর। সবাই ওরা অপেক্ষা করছে, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী, যে-কোন মুহূর্তে অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে। যাকে ফোন করা হয়েছে, ভাগ্য ভাল হলে, নিজের নম্বরটা উচ্চারণ করতে পারে সে।

কিন্তু আবারও অপারেটরের গলাই পাওয়া গেল, 'কোন সাড়া মেলেনি। জুয়েলা মাস্ত্রে অপারেটরকে বললেন, পরে আরেকবার চেষ্টা করবেন তিনি।'

সখেদে ভাবল রানা, শুধু যদি হাতব্যাগটা পিছনে ফেলে না যেত! আবার এক্সিন স্টার্ট দিয়ে ব্রিজের দিকে এগোল ও।

বেঁড়ে গলায় ওয়াম বলল, 'মেয়েমানুষ হলে আরও ঝামেলা, মাইক্রোফোন গছানো ভারি ঝামেলার কাজ। কাপড়, হাতব্যাগ, জুয়েলারি, এমনকি উইগ পর্যন্ত ওরা ঘন ঘন বদলাচ্ছে আজকাল...'

'ফোন কোম্পানীতে একবার খোঁজ নিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুলিসকে ঘুষ না দিয়ে কর্তৃপক্ষের কারও সাথে দেখাই করতে পারবেন না, স্যার। তাছাড়া, গত পনেরো মিনিটে অন্তত পঞ্চাশটা কল গেছে নিউ ইয়র্কে।'

অপারেটর এবং ওয়াম দু'জনেই, দিমাবাসীদের রীতি অনুসারে, ব্যর্থতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

হেসে ফেলে রানা বলল, 'আরে না, আমি অভিযোগ করছি না। অল্প সময়ের নোটিসে যথেষ্ট করেছ তোমরা।'

এবার ক্যালে ক্যাপন-এ মাইক্রোবাস থামাল রানা, সাউথইন্ড্যাল কার এখানেই পার্ক করা হয়েছে। মাইক্রোবাস থেকে নেমে চারদিকে তাকাল ও। শান্ত পরিবেশ, রাস্তায় কোন লোকজন নেই। মাত্র দুটো চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এখনও আলো জ্বলছে। দুটোর একটায় জুয়েলা মাস্ত্রে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর খানিক আগে সাপার খেয়েছে, অপর রেস্তোরাঁটা মাথায় ড্রাগন নিয়ে রাস্তার ওপারে, নিঃশ্বাসের সাথে কমলা শিখা বেরিয়ে আসছে। ড্রাগন সাইনের নিওন আংশিক ভাঙা, অগ্নিশিখার পুরো আকৃতি বুঝতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। আশপাশের গেট বা দরজার সামনে ও ভেতরে অন্ধকার, দু'দিকের মোড়ে এবং দু'পাশের গলিমুখে কিছু নড়ছে না। একটা গলির মুখে, একধারে বেতের একটা চেয়ার দেখা গেল, কাপড় দিয়ে আংশিক ঢাকা—কাল আবার বসবে ওটায় অন্ধ ফকির, মোজা বোনায় ব্যস্ত থাকবে

কোনখানে মাইক্রোবাসটাকে সন্দেহজনক বলে মনে হবে।

একটা বেজে সতেরো মিনিট, ট্র্যানসিভার অন করল রানা, সাময়িকভাবে ওর সীটের পিছনে ফিট করা হয়েছে। লাউডস্পীকার ওর সামনে, ড্যাশবোর্ডের নিচে, নব ঘুরিয়ে মৃদু করে রাখা হয়েছে আওয়াজ। ঠিক একটা আঠারো মিনিটে রিপোর্ট আসতে শুরু করল। জুয়েলা মাদ্রে, ইউ.এম.পি. কমপিউটরের ডিরেক্টর, ব্রিজের অপর দিকের একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সাপার খাচ্ছে। তার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরও রয়েছে।

'যাক, স্যার, খানিকটা স্বস্তি পাওয়া গেল,' মন্তব্য করল গুয়াম।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'দু'জনকে আলাদা ভাবে ছারপোকা দান করা হয়েছে, স্যার। জুয়েলা মাদ্রে বহন করছেন তাঁর হাতব্যাগের হাতলে, আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তাঁর সিগারেটের প্যাকেটে।'

'সিগারেটের প্যাকেট খালি হয়ে গেলে ফেলে দেবে,' আবার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'সারা দিনে তিনটের বেশি খান না, স্যার।' এক গাল হাসল গুয়াম।

তবু রানা খুশি হতে পারল না। 'ভাল হত যদি ওর শরীরের সাথে কোথাও...'

'জানি, মি. রানা। কিন্তু কোনভাবে পারা যায়নি। ভদ্রলোক ভারি সৌখিন, স্যার। প্রতি এক দেড় ঘণ্টা পর পর কাপড় পাল্টান। তাছাড়া, ভদ্রলোক নামকরা ফেনসার, স্যার। সকালে বিকালে দু'বার খেলেন। কাজের সময় ছারপোকা লাগানো সম্ভব নয়। আজ রাতে ভাগ্য আমাদের ভাল, খেলছেন না।'

প্রোগ্রামার দু'জনই বাড়িতে রয়েছে, একজন এরইমধ্যে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, অপরজন তার বান্ধবীকে সঙ্গ দান করছে–সংশ্লিষ্ট অপারেটর হাঁ করে ওদের প্রেমালাপ শুনছে, ঢোক গিলছে ঘন ঘন। তার পাঁজরে মৃদু একটা খোঁচা মারল গুয়াম। চমকে উঠে কুঁকড়ে গেল সে, তাজ্জব হয়ে বলল, 'বিয়ে করেছি দশ বছর, দেখছি কিছুই আমার শেখা হয়নি!'

পেশার এই অংশটুকু সবচেয়ে অপছন্দ করে রানা, নির্দোষ লোকজনের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজের এই সব অন্তর্ঘাত, চুরি, কারচুপি, জালিয়াতি ইত্যাদি ব্যাপারে সুরুচি প্রদর্শনের কোন অবকাশ নেই।

প্রথম অপারেটর লাউডস্পীকারে বলল, 'মনে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে খানিকটা ফাঁকি দিচ্ছেন জুয়েলা মাদ্রে। বাথরূমে যাচ্ছি বলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছেন বারে, কথা বলছেন চীনা মালিকের সাথে, ফোনটা ব্যবহার করতে চান। লং ডিসট্যান্স কল, মাইক্রোফোন থেকে কড়কড়ে নোটের আওয়াজ শুনে বুঝেছি টাকাও দিয়েছেন তিনি। ফোনে এবার কথা হবে, আশা করি সব শুনতে পাব।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে অ্যাভেনিডা টাকনায় চলে এল রানা, রিমাক নদীর দিকে যাচ্ছে মাইক্রোবাস। ক্যালে লিমায় পৌঁছে থামল গাড়ি, অদূরে রিমাক ব্রিজ।

লাউডস্পীকারে অপারেটরের গলা ভেসে এল, 'ফোনে কথা হতে যাচ্ছে।'

'জায়গার নাম আর নম্বর কি?' গাড়ি চালিয়ে আসার সময় লাউডস্পীকারের দিকে

রানার মন ছিল না, জানে কথাগুলো টেপ করা হচ্ছে।

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল অপারেটর, 'দুঃখিত, স্যার। রেস্তোরাঁ মালিকের সাথে বারে কথা বলে ফোন বুদে যখন ঢুকলেন জুয়েলা মাদ্রে, তাঁর সাথে হাতব্যাগটা ছিল না। মালিক পরে সেটা দেখতে পেয়ে বুদে এসে দিয়ে গেছে। ফোনের পাশে শেলফেই বোধহয় রাখা হয়েছে, কারণ দু'দিকের আওয়াজই শুনতে পাচ্ছি। তবে একটা কথা বলতে পারি, স্যার। জুয়েলা মাদ্রে নিউ ইয়র্কের সাথে কথা বলছেন।'

ভাগ্যের ওপর রাগ হলেও, মুখে কিছু বলল না রানা। সাবজেক্টের শরীরে মাইক্রোফোন না থাকলে এই-ই হয়। ঠিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে অন্য কোথাও ফেলে রেখে আসা হয় জিনিসটা।

'অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে,' বলল অপারেটর। সবাই ওরা অপেক্ষা করছে, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী, যে-কোন মুহূর্তে অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যাবে। যাকে ফোন করা হয়েছে, ভাগ্য ভাল হলে, নিজের নম্বরটা উচ্চারণ করতে পারে সে।

কিন্তু আবারও অপারেটরের গলাই পাওয়া গেল, 'কোন সাড়া মেলেনি। জুয়েলা মাদ্রে অপারেটরকে বললেন, পরে আরেকবার চেষ্টা করবেন তিনি।'

সখেদে ভাবল রানা, শুধু যদি হাতব্যাগটা পিছনে ফেলে না যেত! আবার এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ব্রিজের দিকে এগোল ও।

হেঁড়ে গলায় গুয়াম বলল, 'মেয়েমানুষ হলে আরও জ্বালা, মাইক্রোফোন গছানো ভারি ঝামেলার কাজ। কাপড়, হাতব্যাগ, জুয়েলারি, এমনকি উইগ পর্যন্ত ওরা ঘন ঘন বদলাচ্ছে আজকাল...'

'ফোন কোম্পানীতে একবার খোঁজ নিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পুলিসকে ঘুষ না দিয়ে কর্তৃপক্ষের কারও সাথে দেখাই করতে পারবেন না, স্যার। তাছাড়া, গত পনেরো মিনিটে অন্তত পঞ্চাশটা কল গেছে নিউ ইয়র্কে।'

অপারেটর এবং গুয়াম দু'জনেই, লিমাবাসীদের রীতি অনুসারে, ব্যর্থতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করল।

হেসে ফেলে রানা বলল, 'আরে না, আমি অভিযোগ করছি না। অল্প সময়ের নোটিসে যথেষ্ট করেছ তোমরা।'

এবার ক্যালে ক্যাপন-এ মাইক্রোবাস থামাল রানা, সার্ভেইল্যান্স কার এখানেই পার্ক করা হয়েছে। মাইক্রোবাস থেকে নেমে চারদিকে তাকাল ও। শান্ত পরিবেশ, রাস্তায় কোন লোকজন নেই। মাত্র দুটো চাইনিজ রেস্তোরাঁয় এখনও আলো জ্বলছে। দুটোর একটায় জুয়েলা মাদ্রে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর খানিক আগে সাপার খেয়েছে, অপর রেস্তোরাঁটা মাথায় ড্রাগন নিয়ে রাস্তার ওপারে, নিঃশ্বাসের সাথে কমলা শিখা বেরিয়ে আসছে। ড্রাগন সাইনের নিওন আংশিক ভাঙা, অগ্নিশিখার পুরো আকৃতি বুঝতে হলে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। আশপাশের গেট বা দরজার সামনে ও ভেতরে অন্ধকার, দু'দিকের মোড়ে এবং দু'পাশের গলিমুখে কিছু নড়ছে না। একটা গলির মুখে, একধারে বেতের একটা চেয়ার দেখা গেল, কাপড় দিয়ে আংশিক ঢাকা—কাল আবার বসবে ওটায় অন্ধ ফকির, মোজা বোনায় ব্যস্ত থাকবে

বিবর্ণ হাত দুটো, ভাষাহীন দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকবে রাস্তার দিকে।

সার্ভেইল্যান্স কার শেভ্রোলের পিছনের সীটে উঠে বসল রানা। লাউডস্পীকারে জুয়েলা মাদ্রে আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কথা শোনা যাচ্ছে। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে ওরা, ধন্যবাদ জানাচ্ছে ওয়েটার আর রেস্তোরাঁ মালিককে। লিফট দেয়ার প্রস্তাব করল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল জুয়েলা মাদ্রে। দু'জন একসাথে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা, রাস্তার দু'দিকে তাকাল।

অপারেটর, সানসেজ, একজন ইন্ডিয়ান, কাজ করে মিডো মেক্সিকো সিটিতে, স্পীকারের আওয়াজ এত কমিয়ে দিল যে প্রায় শোনাই যায় না। সঙ্গীর সাথে ত্রিশ গজ দূরে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, অথচ কানের কাছে ওদের ফিসফাস কথাবার্তা অদ্ভুত লাগল রানার। ফুটপাথের নিচে দাঁড়িয়ে থাকল জুয়েলা মাদ্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তার গাড়িতে চড়ল। গাড়িটা টয়োটা, স্টার্ট নিল এঞ্জিন, চলে গেল। তারপর, যেন আগে থেকে ঠিক করা সঙ্কেত পেয়ে, গলিমুখ থেকে বেরিয়ে এসে জুয়েলা মাদ্রের সামনে সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা পন্টিয়াক। মাত্র এক সেকেন্ড থামল গাড়িটা, তারপর আবার ছুটল। সামনের রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়েছে জুয়েলা মাদ্রে। ক্ষিপ্রতার সাথে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠেছে সে।

রানার দিকে ফিরল মেক্সিকান অপারেটর। 'কিভাবে ফলো করব, স্যার? কাছ থেকে, নাকি দূর থেকে?'

'খুব কাছ থেকে নয়।'

গাড়ির পিছু নিতে অভ্যস্ত লোকটা, আগেই দেখে রেখেছে কোন দিকে বাঁক নিয়েছে পন্টিয়াক। 'ব্রিজের দিকে যাচ্ছে ওরা,' বলল সে। দ্রুত একটা ইউ টার্ন নিল সে, এমব্যাঙ্কমেন্ট রোডে পৌঁছুবার পর দেখা গেল উল্টোদিক থেকে ছুটে এসে ব্রিজে চড়ছে পন্টিয়াক।

ব্রিজ পেরিয়ে ট্যাকনা, ডান দিকে মোড় ঘুরে ক্যালাও, বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে আরিকায়। পন্টিয়াক দাঁড়িয়ে পড়েছে, প্রায় অন্ধকার চার্চের সামনে।

'কি করব, স্যার?' মেক্সিকান ইন্ডিয়ান জিজ্ঞেস করল।

'সোজা যেতে থাকো,' বলল রানা, হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা ধরে কাছে আনল। 'ওরা দাঁড়িয়েছে, গুয়াম। আরিকায়, চার্চের সামনে।'

'অ্যারিকুয়েপায় ঢুকে পন্টিয়াককে স্যান্ডউইচের ভেতর আনব?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ক্যানে কাইলোমা হয়ে ক্যালে হুয়ানকাভেলিকায় ঢুকব আমরা।'

'মাই গড! কোথায় সেটা, স্যার?'

'ম্যাপে দেখে নাও।'

খানিক পর গুয়াম বলল, 'পেয়েছি।'

'আমরা অ্যাভেনিডা ট্যাকনার দিকে মুখ করে থাকব, তুমি উল্টোদিকে। ওরা ট্যাকনা বা নদীর দিকে গেলে আমরা ফলো করব, উল্টোদিকে গেলে তুমি,' বলল রানা।

শেভ্রোলেটাকে ফুটপাথের কিনারা ঘেঁষে, একটা জুতোর দোকানের সামনে থামাল মেক্সিকান সানসেজ। সময় বয়ে চলল, পন্টিয়াক নড়ে না। দশ মিনিট ধরে

অপেক্ষা করছে ওরা। এক এক করে কয়েকজন পাশ কাটাল শেভ্রোলেকে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও জুয়েলা মাদ্রে বলে মনে হলো না। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল একটা পুলিস কার, আরোহীরা নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত। এগারো মিনিটের মাথায় ক্লারিজ হোটেলের সামনে মিউনিসিপ্যালিটির একটা ট্রাক থামল, ঢাকনি থাকলেও সেটা এই মুহূর্তে খোলা। কোদাল ইত্যাদি নিয়ে পৌর-কর্মীরা নেমে এল রাস্তায়, হোটেলের আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যাবে। লাইডস্পীকারের আওয়াজ বাড়াল অপারেটর, ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ আর পৌর-কর্মীদের চেঁচামেচি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। পনেরো মিনিটের মাথায় পন্টিয়াকের দরজা খোলার আওয়াজ শুনল ওরা, শব্দ শুনে বোঝা গেল কয়েকজন লোক গাড়িতে চড়ল।

হঠাৎ করে ঘোষণা করল রানা, 'মিস জুয়েলা মাদ্রে চার্চে গিয়েছিল।'

'কিভাবে বুঝলেন, স্যার?'

'চার্চই একমাত্র জায়গা যেখানে কোন মেয়ে তার হাতব্যাগ নিয়ে যাবে না।'

পন্টিয়াক স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ শুনল ওরা, দেখল এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিচ্ছে ক্যালে অ্যারিকুয়েপার দিকে।

গুয়ামের গলা পাওয়া গেল মাইক্রোফোনে, 'ওদেরকে আমি পেয়েছি।'

'বাঁ দিকে ঘুরে টাকনায় ঢুকব আমরা,' বলল রানা, সানসেজ তার নির্দেশ পালন করল। রানা বিস্মিত। 'রেস্তোরাঁ থেকে চার্চে আসার সময় গাড়িতে ওরা দু'জন ছিল, এখন পাঁচজন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়?'

'ওরা হয়তো কয়েকজনকে লিফ্ট দিচ্ছে, স্যার।'

'অদ্ভুত নয়? এত রাতে চার্চে লোকজন থাকা?'

'আমাদের দেশে,' বলল মেক্সিকান ইন্ডিয়ান, 'রাতদিন সব সময় চার্চে যাই আমরা।'

কিন্তু রানা সন্তুষ্ট হতে পারল না। সান ক্রিস্টোবাল-এর পাহাড়ের সুন্দর একটা বাড়িতে থাকে জুয়েলা মাদ্রে। 'আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছ?'

'জ্বী, স্যার,' বলল সানসেজ। 'জুয়েলা মাদ্রে বাড়ি ফিরছে না। সান ক্রিস্টোবাল উল্টোদিকে।'

শুরু হলো অনুসরণ, কখনও মাইক্রোবাস কখনও শেভ্রোলের সাহায্যে, যখন যেমন সুবিধে। তবে সব সময় নিরাপদ দূরত্বে থাকল ওরা। অবশেষে শহরের বাইরে, নোংরা একটা এলাকায় পৌঁছুল। পন্টিয়াকের আরোহীরা কেউ কোন কথা বলছে না, ওরা শুধু তাদের কাপড়চোপড়ের খসখস আর মাঝে মধ্যে একজনের মৃদু শিস দেয়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। প্রায় পরিত্যক্ত একটা প্লাজায় ঢুকল পন্টিয়াক। রাস্তার পাশের জায়গা দখল করে রেখেছে সার সার ট্রাক, অচল ঠেলাগাড়ি, বাতিল লোহা-লক্কড়, ইত্যাদি। আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। অনেক দোরগোড়ায়, যেখানে আলো আছে, লোকজনের নড়াচড়া টের পাওয়া গেল। কেউ কেউ দরজার সামনে বসে আছে। একটা বার দেখা গেল, জানালায় আলো। রাস্তার ধারেও লোকজন রয়েছে, পাঁচ-সাতজনের একটা করে দল দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা কার দাঁড়িয়ে আছে, দু'একটা এঞ্জিন বন্ধ করা হয়নি। দুটো কার উল্টোদিক থেকে এসে

দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার কিনারায়। আড়ষ্টভঙ্গিতে নামল লোকজন। তাদের মধ্যে একজন দেয়ালের দিকে মুখ করে ট্রাউজারের চেইন খুলে ফেলল। রাস্তায় দাঁড়ানো লোকজনদের দেখে মনে হলো বেশিরভাগই মাতাল। ইঁটের দেয়াল ঘেরা একটা বাড়ির সামনে থামল পন্টিয়াক, বারের ঠিক সামনে। ঘরের দরজা প্রতি মুহূর্তে খুলে যাচ্ছে, আবার বন্ধ হচ্ছে। লোকজন যেমন ঢুকছে, তেমনি বেরিয়েও আসছে। পন্টিয়াক থেকে পাঁচজন নামল, গাড়ির দরজায় তালা লাগাল একজন। কেউ কোন কথা বলল না। সরু ফুটপাথ পেরিয়ে, আবর্জনার স্তূপ টপকে, দরজার ভেতরে ঢোকার জন্যে যারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিছনে দাঁড়াল সবাই।

যেন মনে হলো ভেতরে ঢোকার জন্যে টিকেট লাগে, সেটা দরজা থেকেই সরবরাহ করা হচ্ছে। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং দীনহীন বলে মনে হলো রানার। 'ধ্যেৎ, আবার হাতব্যাগটা ফেলে গেছে সে।'

দেখা গেল জুয়েলা মাদ্রে লাইনে দাঁড়ালেও, তার সঙ্গীরা তাকে নিজেদের শরীর দিয়ে প্রায় ঢেকে রেখেছে। আরও একটা কাজ করছে তারা–অস্থিরদৃষ্টিতে রাস্তার দু'দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কিন্তু ওদের দিকে বিশেষভাবে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। মাতালরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত।

'হাতব্যাগ রেখে গেছেন দেখে আমি কিন্তু, স্যার, একটুও অবাক হচ্ছি না,' সানসেজ বলল। 'ভেবে দেখুন, কোথায় এসেছেন তিনি।'

'কোথায়?'

'পঞ্চাশ সেন্টাভো দিলে সারারাত কাটানো যায়, স্যার,' মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল সানসেজ। 'বেশ্যাপাড়া, স্যার।'

প্রায় আঁতকে উঠল রানা।

'আপনি তো ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনে গেছেন, তাই না, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'এই বেশ্যাপাড়ার নাম, মানে এখানকার লোকেরা এটাকে "লন্ডন" বলে ডাকে।'

সাত

মিডো নিউ ইয়র্কের কমপিউটর রুম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টে চলে এল চার্লি ফ্রানসি, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্সের একটা মিডো আলফা ধরল, ছয় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল মিউনিকে। নিউ ইয়র্ক ছাড়ল স্থানীয় সময় ভোর চারটেয়, পৌঁছল স্থানীয় সময় ভোর চারটেয়। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি ছোট একটা হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল সে। 'মি. পারকার,' হোটেল ক্লার্ককে বলল। 'কামরা বুক করা আছে।'

'মি. পারকার, হ্যাঁ, বুক করা আছে বটে। এই কার্ডটা পূরণ করুন, প্লীজ।' মহিলা ক্লার্ক, বয়স চল্লিশ, মেকআপ করা চেহারা, কলপ লাগানো চুল; চোখে ক্ষুধার্ত

'সকালে, কেমন? আমি খুব ক্লান্ত, একটু সাঁতার কেটে বিছানায় উঠতে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সকালে হলেও ক্ষতি নেই।'

নিজের কামরায় ঢুকে সুটকেস খোলার ঝামেলায় গেল না, ফোনের রিসিভার তুলল সে। কোন কথা না বলে মহিলা ক্লার্ক তাকে বাইরের লাইন পাইয়ে দিল, ছয় ডিজিটের এক সংখ্যা ডায়াল করল সে–লোকাল কল। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে, হাতঘড়ির দিকে চোখ, ঠিক সাত সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মেগ ফিলিপ, রিঙ হচ্ছে শোনার পর সে-ও সাত সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল হোটেলে। ইতোমধ্যে কাপড় ছেড়েছে চার্লি ফ্রানসি, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটছে হোটেলের বেসমেন্ট পুলে। বড়সড় একটা ঘরের ভেতর পুলটা, চারদিকে কৃত্রিম পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে, কামরায় আরও রয়েছে ছোট আকারের তিনটে সনা কিউবিক্‌ল্‌, একটা এক্সারসাইজ রুম। মেগ ফিলিপ পিছনের দরজা দিয়ে এল, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে একটা সনা কিউবিক্‌ল্‌-এ লুকাতে হলো তাকে, কারণ করিডরে পায়ের শব্দ, এদিকেই এগিয়ে আসছে।

'কি ভাই, সব ঠিক আছে তো?' মহিলা ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল চার্লি ফ্রানসি ওরফে পারকারকে।

পুলের ওপর থেকে চিৎকার করল সে, 'সব কুছ ঠিক হ্যায়।'

প্রয়োজনের চেয়ে জোরে হেসে উঠল মহিলা। 'বলুন আপনার জন্যে আর কি করতে পারি। কফি লাগবে? কিংবা আরামদায়ক ম্যাসেজ? আমাকেও আপনি পেতে পারেন–ম্যাসেজ করানোর জন্য।'

'ওরে-ওরে, এ যে দেখছি আস্ত একটা ডাইনী!' ভাবল চার্লি ফ্রানসি। বলল, 'না, ধন্যবাদ। কাল সকালে হয়তো লাগতে পারে, কেমন?'

চোখে প্রত্যাশার আলো নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ক্লার্ক। পুল থেকে উঠে সনা কিউবিকলে ঢুকল চার্লি ফ্রানসি, মেগ ফিলিপকে বলল, 'পেত্নীটা চলে গেছে।'

'তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে,' দাঁত বের করে হাসল মেগ ফিলিপ, তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা নিরাপদ তো?'

'পেত্নীটার কথা বাদ দিলে সব ঠিক হ্যায়।'

'ওর কথা ভেবো না,' আশ্বস্ত করল মেগ ফিলিপ। 'শেষ রাতের দিকে অন্তত বিশবার এসেছি এখানে সাঁতার কাটতে, এর আগে কখনও ওকে নিচে নামতে দেখিনি। যাই হোক, যেটার কথা বলেছিলাম–এদিকে দেখো।' ঝুঁকে কাঠের একটা তক্তা সরাল সে, ছয় ফুট লম্বা দুই ফুট চওড়া একটা ফাঁক সৃষ্টি হলো। নিচে একটা ডাক্ট, পানি আসার পথ। দেয়ালের গোড়ায় একটা চৌকো গর্ত, আড়াই ফুট। 'গর্তটা আট ফুট গভীর,' মেগ ফিলিপ বলল। 'আমরা যদি প্লাস্টিক ব্যাগে মুড়ে নিই তাহলে যে-কোন জিনিস ওখানে লুকিয়ে রাখতে পারব–সুটকেস বলো, ডিস্ক ভর্তি বাক্স বলো...'

'ঠিক বলেছ,' অন্যমনস্কভাবে সায় দিলো চার্লি ফ্রানসি, তাকিয়ে আছে ডাক্টের

দিকে ঝুঁকে থাকা মেগ ফিলিপের দিকে। ছোট একটা লোহার বার তার খুলির গোড়ায় সজোরে বসিয়ে দিল সে। জিনিসটা এক্সারসাইজ রুম থেকে আগেই এখানে এনে রেখেছিল, সাধারণত পেশী শক্ত করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। মেরুদণ্ড যেখানে খুলির সাথে যুক্ত হয়েছে, আঘাতটা সেখানে লাগল। একেবারে গুঁড়িয়ে গেল হাড়গুলো। মেগ ফিলিপের লাশ ডাক্টের ভেতর পড়ে গেল। ঝুঁকল চার্লি ফ্রানসি, ধাক্কা দিয়ে দেয়ালের গোড়ার দিকে ঠেলে ফেলে দিল গর্তের ভেতর। এক্সারসাইজ রুম থেকে আরও একটা জিনিস এনে রেখেছিল সে–পাঁচটা দশ কিলো ওয়েট। মেগ ফিলিপের গায়ের ওপর এক এক করে সেগুলোও নামাল, ছোট বারটা সহ। ভারের ফলে ডুবে গেল লাশ, একসময় লাশ আর ওয়েট ঘোলা পানির নিচে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা ব্রীফকেস ছাড়া মেগ ফিলিপ যে এখানে এসেছিল তার আর কোন চিহ্ন নেই।

কিউবিক্ল্-এর বেঞ্চের ওপর রয়েছে সেটা। চার্লি ফ্রানসি জানে কোহ্‌ল জি এম বি এইচ-এর কমপিউটরের জন্যে তৈরি করা সমস্ত অ্যাকাউন্টিং প্রসিডিওর প্রিন্টআউট আকারে রয়েছে ওটার ভেতর, আরও আছে সিকিউরিটি প্রসিডিওর, যেটা মিডো মিউনিক অফিসের সাথে মিল রেখে তৈরি করেছে কোহ্‌ল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল চার্লি ফ্রানসি, ডেস্ক ক্লার্ককে পাশ কাটাল, ব্রীফকেসটা কোটের ভেতর লুকানো।

'সাঁতার ভাল লাগল?' জিজ্ঞেস করল ক্লার্ক।

'খুব। ঘুমোবার আগে সামান্য হেঁটে আসব।'

'দারুণ আইডিয়া। আপনি ফিরে এলে দু'জনের জন্যে কফি বানাব।'

'বেশ তো। আর তারপর নাহয় আপনার সেই ম্যাসেজ সম্পর্কে নতুন করে ভাবা যাবে, কি বলেন?'

উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল মহিলার চোখ।

চার্লি ফ্রানসিকে সামনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল সে। রাস্তা ধরে ধীর পায়ে হাঁটছে চার্লি ফ্রানসি, তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লার্ক, জানে না, পালিয়ে যাচ্ছে একজন খুনী।

অল্প পথ, হেঁটেই এয়ারপোর্টে পৌঁছুল চার্লি ফ্রানসি, স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টায় লিয়নস ফ্লাইট।

মাসুদ রানার নির্দেশে তিনজনের দলটা থেকে যে দু'জন লোক মেগ ফিলিপকে অনুসরণ করে হোটেল পর্যন্ত পৌঁচেছিল, তারা দেখল ডেস্ক ক্লার্ক এক ভদ্রলোককে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, ধারণা করল ভদ্রলোক তার প্রেমিক হতে পারে। দলের বাকি লোকটা আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকে বেসমেন্টে নামল, এই পথই ব্যবহার করেছিল মেগ ফিলিপ। কিন্তু আতিপাতি করে খুঁজেও মেগ ফিলিপের দেখা পেল না সে। তিনজন আবার মিলিত হলো তারা, পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল। তৃতীয় লোকের বক্তব্য, মহিলা ক্লার্কের দিকে নজর থাকায় সামনের দরজা দিয়ে মেগ ফিলিপ বেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায়নি ওরা। বাকি দু'জনের বক্তব্য, তুমি শালা সিগারেট ফোঁকার সময় পেচ্ছাব করতে বসেছিলে, সেই ফাঁকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে লোকটা। ক্লার্ককে প্রশ্ন

করেও কিছু জানা গেল না। মেগ ফিলিপ এখনও যে হোটেলের ভেতর থাকতে পারে, এ-ধারণাটা তাদের কারও মাথায় ঢুকল না।

বাড়ির ছাদ অবিকল ছাতার মত, লোহার কাঠামোর ওপর ঢেউ খেলানো টিন, দেয়ালগুলো ইঁটের। সব মিলিয়ে দশটা সারি, প্রতি সারিতে দশটা করে খুপরি, দুই খুপরির মাঝখানে আটফুট উঁচু দেয়াল। দরজাগুলোর কবাট নিচে এবং ওপরে খোলা যায়। চারদিকে ঘাম, প্রস্রাব আর পচা আবর্জনার গন্ধ। পনেরো বছরের নিচে একদল কিশোর অবিরাম সারিগুলোর এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হন হন করে আসা-যাওয়া করছে, কারও হাতে পানিভর্তি বালতি, কারও হাতে গরম চা ভরা কেটলি বা ইনকাকোলা, স্যান্ডউইচ, তুলো, সিগারেট ইত্যাদি।

মেয়েরা হয় কাজ করছে নয়তো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরার চেষ্টা করছে। মেয়েটি যত বেশি সুন্দরী তার দরজা তত কম খোলা থাকছে। কয়েকটা খোলা দরজার সামনে তিন চার জন করে লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন সারি সারি খুপরির সামনে হাঁটাচলা করছে, কেউ কেউ মাতাল, প্রায় সবার ঠোঁটে সিগারেট। মাঝে মধ্যে পরিচিত কারও সাথে দেখা হয়ে গেলে কেউ তারা লজ্জাবোধ করছে না। কত নম্বর থেকে বেরুল বা কত নম্বরে ঢুকতে চায়, চলতি হপ্তায় ক'বার আসা হলো, কে কেমন খেল্ দেয় ইত্যাদি বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা চলছে। খুপরিগুলোর কাছাকাছি আসা-মাত্র সঙ্গীরা আবার তাদের শরীর দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেলল জুয়েলা মাদ্রেকে। ট্রাউজার স্যুট পরে থাকায়, তাছাড়া মাথায় হ্যাটও রয়েছে, জুয়েলা মাদ্রেকে হঠাৎ দেখে মেয়ে বলে চেনা কঠিন। লোকজনের মিছিলে মিশে সামনে এগোল পাঁচজনের দলটা। এক সারি থেকে আরেক সারিতে আসতে প্রচুর সময় লাগল ওদের, অবশেষে দলটা সাঁইত্রিশ নম্বর খুপরির কাছাকাছি পৌঁছুল। আশপাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের মধ্যে অনেকেই পাহাড়ী গোত্রগুলো থেকে এসেছে, তাদের ছোটখাট দেহ-কাঠামো আর বিশাল বুক দেখে সহজেই চেনা যায়। খুপরির ভেতর নারী-পুরুষের হাসি আর রেডিও থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। পাঁচজনের দলটা থেকে এক লোক হঠাৎ ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল পঁয়ত্রিশ নম্বর খুপরির দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক খদ্দের, ভেতরে চোখ পড়তেই গা ঘিন ঘিন করে উঠল তার। খুপরির মেয়েটা, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, একটা বালতির ওপর বসতে যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে বাইরে। লোকটার সাথে চোখাচোখি হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল সে, 'একজন একজন করে কিংবা সবাই একসাথে, যেমন আপনাদের খুশি—ঢুকে পড়ুন।'

সাঁইত্রিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে এল বড়সড় একটা অ্যালসেশিয়ান, ধীর পায়ে ওদের দিকেই এগিয়ে এল সেটা। হঠাৎ করে থামল, নাকটা জুয়েলা মাদ্রের পায়ের দিকে তাক করে গন্ধ শুঁকল। গর গর করে উঠল অ্যালসেশিয়ান, জুয়েলা মাদ্রের পায়ে নাক ঠেকাল। জুয়েলা মাদ্রে, আতঙ্কে নীল, পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাঁইত্রিশ নম্বরের নিচের দরজা আরও একটু খুলল, দড়াম করে উন্মুক্ত হলো ওপরের অংশ, বেরিয়ে এল রাইফেল কাঁধে এক পুলিস, ট্রাউজারের ভেতর শার্ট গলাচ্ছে। দরজার বাইরে এক লোক অপেক্ষা করছিল, পুলিস দেখে শশব্যস্ত হয়ে সরে দাঁড়াল

সে।

'আধ ঘণ্টার জন্যে ওটা কারও কোন কাজে আসবে না,' সগর্বে ঘোষণা করল পুলিস লোকটা, কোমরে বেল্ট পরছে সে।

অপেক্ষারত লোকটা অপ্রতিভ হাসল, বলল, 'বিশ্বাস করলাম, সিনর।'

কুকুরটাকে দেখতে পেল পুলিস, জুয়েলা মাদ্রের পা শুঁকছে। 'টাইগার!' ধমকে উঠল সে, কিন্তু অ্যালসেশিয়ান মনিবের কথায় কান দিল না।

জুয়েলা মাদ্রের পিছনের লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'নড়বে না,' ফিসফিস করে বলল সে, ঝুঁকে জুয়েলা মাদ্রের জুতো থেকে মাংসের একটা টুকরো দু'আঙুলে ধরে তুলে ফেলল। টুকরোটা লক্ষ্য করে লাফ দিল অ্যালসেশিয়ান, ঠিক তখুনি সেটা ছেড়ে দিল লোকটা। মাংস পেয়ে মুখে পুরল টাইগার, এক ঢোকে গিলে ফেলল, ফিরে গেল পুলিসের কাছে।

'তোমাকে কামড়ে দেয়নি তো?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল জুয়েলা মাদ্রে। মাথা নাড়ল লোকটা।

খুপরিগুলোকে পাশ কাটিয়ে হাঁটছে পুলিস, ওদের দিকে তাকাল না। তেত্রিশ নম্বরের সামনে মুহূর্তের জন্যে থামল সে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল দরজায়। 'এরপর তুমি,' বলল সে। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব।'

দরজার ওপরের অংশ খুলে গেল, উঁকি দিল একটা কিশোরী মেয়ের মুখ। দেখেই বোঝা যায়, পাহাড়ী মেয়ে। 'আমার সৌভাগ্য, কর্তা!' দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি নিয়ে চলে গেল পুলিস।

পাঁচজনের দলটা এবার সাঁইত্রিশ নম্বরের সামনে পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। পুলিসের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যে লোকটা ওখানে অপেক্ষা করছিল, সে লাইনের মাথায় থাকার জন্যে সামনে বাড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু জুয়েলা মাদ্রের সামনে দাঁড়ানো লোকটা কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে দিল তাকে। প্রতিবাদ করল লোকটা, যে-কোন মুহূর্তে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। 'সারারাতের জন্যে মেয়েটাকে আমরা ভাড়া করেছি,' বলল জুয়েলার পাশ থেকে একজন। 'গোলমাল করলে এমন প্যাঁদানি দেব যে বাপের নাম ভুলে যাবে।'

দলে ওরা পাঁচজন দেখে পিছিয়ে গেল লোকটা, উনচল্লিশ নম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাঝখানে জুয়েলা মাদ্রেকে নিয়ে অপেক্ষায় থাকল ওরা চারজন। দরজা খুলে গেল, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ল জুয়েলা মাদ্রে, সাথে সাথে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সিক্সটিনা বালতির পাশে চেয়ারে বসে আছে, ঠোঁটের কোণ থেকে রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা গড়াচ্ছে। 'বেজন্মা স্যাডিস্ট,' বিড়বিড় করে বলল সে, জুয়েলা মাদ্রের দিকে তাকাল না। বিছানার এক কোণে বসল জুয়েলা মাদ্রে, হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল, যেন বমি পাবে। নগ্ন সিক্সটিনার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'দুনিয়াটা অত্যাচারী স্বার্থপরদের দখলে, যে অবস্থাতেই থাকো সাহস আর বুদ্ধি হারিয়ো না।'

হঠাৎ ফোঁস করে উঠে সাপের মত ফণা তুলল সিক্সটিনা। দামী কাপড় পরা জুয়েলা মাদ্রেকে দেখে তার পিত্তি জ্বলে উঠল। 'এ-সব নরম গরম উপদেশ আমাকে শোনাতে হবে না। তোমাকে যদি প্রতিদিন বিশ-পঁচিশ জন লোকের জন্যে শুতে হত

তাহলে বুঝতে সাহস আর বুদ্ধি কোন কাজে আসে কিনা!'

চিন্তাটাই অসুস্থ করে তুলল জুয়েলা মাদ্রেকে, এখনও সে কুমারী। এবং এর জন্যে, ভাবল সে, পেরুর বিধ্বস্ত অর্থনীতিই দায়ী। সিক্সটিনা একা নয়, ওর মত আরও বহু মেয়ে যৌতুকের টাকা সংগ্রহের জন্যে 'লন্ডনে' চলে আসে। যৌতুক দিতে না পারলে ভাল বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। এদের সম্পর্কে এটুকুই জানে জুয়েলা মাদ্রে। তার কল্পনা করতে ইচ্ছে হলো, সিক্সটিনার প্রেমিক লন্ডনের বাইরে অপেক্ষা করছে, যৌতুক দেয়ার মত যথেষ্ট টাকা নিয়ে মেয়েটা উপস্থিত হলেই চার্চে গিয়ে বিয়ে করবে ওরা।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বাকি চারজন। চেয়ারটা জুয়েলা মাদ্রেকে ছেড়ে দিয়ে উল্টো করে রাখা একটা বালতির ওপর ওদের দিকে পিছন ফিরে বসল সিক্সটিনা, এখনও সে কাপড় পরেনি। ভাঙা আয়নাটা ম্যাডোনার ছবির নিচে লটকানো, সেদিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকল সে। অরবিটাস, ওদের মধ্যে ওরই শুধু গোঁফ আছে, বসে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রের পাশে বিছানার ওপর, সে-ই সিক্সটিনার সাথে কথা বলে গোপন বৈঠকের জন্যে এই খুপরিটার ব্যবস্থা করেছে। 'আমরা শুধু তোমার ঘরটা মীটিং করার জন্যে ব্যবহার করব,' সিক্সটিনাকে বলেছে সে। 'লন্ডনে কেউ আমাদেরকে সন্দেহ করবে না।' সিক্সটিনা রাজি হয়েছে শুধু একটা কারণে, যে-টাকা ওরা দেবে তাতে তিন মাস আগে এই নরক থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে সে। ঘরে বসে ওরা কি করবে না করবে সেটা ওদের ব্যাপার, তার কিছু আসে যায় না।

জুয়েলার চারপাশে ওরা যারা রয়েছে তারা সবাই নিবেদিতপ্রাণ জাতীয়তাবাদী। বেশ ক'বছর হলো লিমার প্রধান পরিবারটিকে জুয়েলা মাদ্রে বোঝাবার চেষ্টা করছে পেরুর অর্থনীতি বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে দিলে তার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে। অল্প কিছু পেরুবাসীর বিপুল অর্থ এবং সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। পশ্চিম দুনিয়া কিভাবে উন্নতি করছে বা বাণিজ্য করছে সে-সম্পর্কে তাদের তেমন কোন ধারণা নেই। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে জুয়েলা মাদ্রে, সে যেটাকে পেরুর জন্যে জীবন-মরণ সমস্যা বলে মনে করছে তার সমাধানে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। পেরুর অর্থনীতিতে বিদেশীরা অনুপ্রবেশ করেছে, যে-কোন মূল্যে সে তাদেরকে বিতাড়িত করতে চায়। সংশ্লিষ্ট মহলকে জুয়েলা মাদ্রে চিলির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অল্প ক'জন তরুণ বাদে কেউ তার কথায় গুরুত্ব দেয়নি।

তরুণদের মধ্যে একজন হলো অরবিটাস, বিছানায় তার পাশে যে বসে রয়েছে। তীক্ষ্ণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি সম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর একজন অ্যাটর্নি সে, পেরুর ফিশিং ইন্ডাস্ট্রিতে তার পরিবারের রয়েছে বিরাট স্বার্থ। বিউমাচার, এই মাত্র যে চেয়ারে বসল, জুয়েলা মাদ্রের জুতো থেকে মাংসের টুকরো তুলে নিয়েছিল, আমেরিকান ইউনিয়ন কার্বাইডের একজন কর্মচারী–এঞ্জিনিয়ার। কসমো বৈবাহিক সূত্রে দূর সম্পর্কীয় কাজিন, একদিন সে বানকো পেরুয়ানো ডেল সোল-এর মালিক হবে, তখনও যদি কোন ব্যাংকের মালিক হওয়ার পরিস্থিতি থাকে। অপর তরুণ, যাকে ওরা তার ডাকনাম পাকো বলে সম্বোধন করে, পলিটিক্যাল ইকোনমিক্সের ছাত্র, সদ্য ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই একদিন নামকরা

রাজনীতিবিদ হবে সে। কে জানে, হয়তো প্রেসিডেন্ট হওয়াও অসম্ভব নয়।

পাকোর দিকে ফিরে আড়ষ্ট একটু হাসল জুয়েলা মাদ্রে। 'কল্পনাও করিনি এ-ধরনের পরিবেশে বসতে হবে আমাদের। জানা থাকলে আসতাম না।'

উৎসাহ দিয়ে হাসল পাকো। 'কেন ভাবছ দুনিয়ার সবটুকুই নীল আকাশ! যাদের অবস্থার উন্নতি দেখতে চাও তারা কিভাবে বেঁচে আছে এখানে না এলে টের পেতে?'

ঠিক তখুনি বালতি নিয়ে দরজায় হাজির হলো এক কিশোর, কড়া নাড়ছে আর পানি পানি বলে চিৎকার করছে। প্রায় লাফ দিয়ে দরজার সামনে পৌছুল সিক্সটিনা, অমনি খুলে গেল নিচের কবাট। ঘরের ভেতরটা আড়াল করে দাঁড়াল সিক্সটিনা। 'একজন খদ্দের পেয়েছি সারারাত থাকবে। অন্যরকম মানুষ, কেউ এলে লজ্জা পায়। রাতে আর এসো না, কেমন?' ছেলেটাকে ক'টা টাকা ধরিয়ে দিল সে, এই মাত্র তাড়াতাড়ি তার হাতে যেগুলো গুঁজে দিয়েছে অরবিটাস।

'খুব মালদার মক্কেল, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'তোমার ভাগ্যটা তাহলে ভাল আজ।' জিভ আর টাকরা সহযোগে আনন্দসূচক আওয়াজ করে চলে গেল সে।

'গলা চড়াবেন না,' ওদেরকে পরামর্শ দিল সিক্সটিনা।

বিছানা থেকে চাদরটা তুলে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল জুয়েলা। 'এটা জড়িয়ে শুয়ে পড়ো–তোমার ঘুম পেয়েছে।'

এরপর ওদের বৈঠক শুরু হলো। অরবিটাস রিপোর্ট করল, তাদের উদ্দেশ্য পূরণে আইনগত যে-সব ব্যবস্থা নেয়া যায় তার সবগুলো চিহ্নিত করেছে সে। মাঝপথে রয়েছে সে, তাকে বাধা দিল বিউমাচার–তার বক্তব্য, প্রচলিত আইন দিয়ে ঘণ্টা হবে। সে অ্যাকশন চায়। একজন এঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার ধারণা বিদেশীদের কলে-কারখানায় যদি স্যাবোটাজ চালানো যায়, শালারা পালাতে দিশে পাবে না। অন্তত নতুন বিদেশী পুঁজি যে বিপুলগতিতে আসছে সেটা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। 'এসো,' উদাত্ত আহ্বান জানাল সে, 'কিভাবে স্যাবোটাজ করা যায় তার একটা স্কীম তৈরি করি আমরা। দরকার হলে আমরা বিদেশী ব্যবসায়ীদের দু'একজনকে গায়েব করে দেব।'

কসমো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলল, পেরুর বিপুল সম্পদ কিভাবে অবহেলায় পড়ে আছে, এবং যদি তা প্রচলিত ব্যবস্থায় কাজে লাগানো হয় তাহলেও সাধারণ মানুষের কোন উপকারে আসবে না। 'হ্যাঁ, ধনীরা চিরকালই ভাল থাকবে।'

জুয়েলা মাদ্রে বলল, 'এই মুহূর্তে শান্তিপূর্ণ রাজনীতি নিয়ে আমাদের দেশটা শান্ত রয়েছে, কারণ দেশের সাধারণ মানুষ নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু ধনীরা যদি চিরকাল ধনী থাকে, আর গরীবরা যদি বিধ্বস্ত অর্থনীতির কারণে আধপেটা থাকে, কেউ বলতে পারে না হঠাৎ করে আমরা কখন ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে বা চিলিয়ান টাইপ বিপ্লবের শিকার হব। কে যেন বলেছিল, "দারিদ্র্য আর ক্ষুধা মার্ক্সিজমের প্রজননক্ষেত্র"?'

কেউ ওরা বিপ্লব চায় না। ওরা জাতীয়তাবাদী একটা গ্রুপ, ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য পেরুকে পেরুবাসীদের উন্নতির জন্যে পরিচালিত করা। সেটা সম্ভব জাতীয় অর্থনীতিকে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা গেলে।

বিউমাচারের মারমুখো বক্তব্য আর অরবিটাসের আইন আঁকড়ে ধরে থাকার

জেদ উত্তপ্ত করে তুলল গোপন সভার পরিবেশ। ঘণ্টাখানেক বাক্‌যুদ্ধের পর সবাই ক্লান্ত। মিনিট দশেক হলো কথা বলেনি জুয়েলা মাদ্রে, শুধু শুনে গেছে। সে বুঝতে পারল, ওরা দু'জন কখনোই একমত হতে পারবে না।

কাজেই, অবশেষে, সে ওদেরকে পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট সম্পর্কে বলল।

আট

লিয়নে প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্ট বাসে করে শহরে চলে এল চার্লি ফ্রানসি। বাস টার্মিনাল থেকে হাঁটা পথে ব্যাংক এগ্রিকোল অল্প দূরত্ব। কাউন্টারের পিছনে বসা মেয়েটাকে এক হাজার ডলারের একটা বিল দিল সে, কিন্তু সবিনয় হাসির সাথে মেয়েটা বলল, 'এখানে টাকা ভাঙানোর সুযোগ নেই, মশিয়ে। আপনাকে ক্রেডিট লিয়নাইস-এ বা ব্যুরো দ্য চেঞ্জ-এ যেতে হবে।' তার পিছন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কি ঘটছে জানতে চাইল সে

সব শুনে বলল, 'আপনার টাকা আমরা ভাঙিয়ে দিতে পারি, মশিয়ে।' এক হাজার ডলার, রেটের চেয়ে দু'পার্সেন্ট কম পাবে চার্লি ফ্রানসি, একটু হেঁটে ব্যুরো দ্য চেঞ্জ থেকে ভাঙিয়ে এনে দিলেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পকেটে চলে আসবে দশ ডলার।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসার সময় চার্লি ফ্রানসি আশা করল ওর দেয়া ঠিকানাটা যে ভুয়া সেটা খুব তাড়াতাড়ি ওরা জানতে পারবে না। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে খুঁজছিল সে, পেয়েও গেল একটা-খেলাধুলার দোকান। শো-কেসে সাজানো বাইসাইকেলটা খুঁটিয়ে দেখল-হ্যাঁ, ঠিক এ-ধরনেরই একটা দরকার তার। মডেলটার ফ্রেমে দাম লেখা রয়েছে ফ্রাঙ্কে-দেড়শো ডলারের সমপরিমাণ। দোকানে ঢুকল সে। 'শো-কেসের লাল বাইসাইকেলটা।'

'আহ্, আপনার পছন্দের প্রশংসা করি!' সেলসম্যান বিনয়ে বিগলিত।

'তাড়াতাড়ি।'

সেলসম্যান সাইকেলটার গুণাগুণ বর্ণনা শুরু করল। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি। 'আমার খুব তাড়া আছে।'

স্টোর থেকে একই মডেলের অন্য একটা সাইকেল নিয়ে আসা হলো। বলা হলো, বহু ধরনের হুইল আছে, যে-কোন একটা বেছে নিতে পারে সে।

বিরক্ত হয়ে চার্লি ফ্রানসি বলল, 'শো-কেসেরটায় যা আছে আমি তাই চাই।'

সেলসম্যান হতবাক । 'কিন্তু মশিয়ে, ওটা তো একটা কমবিনেশন নাইন স্পীড ডিরেইলার গিয়ার, রেসিং-এর জন্যে!'

'আমার ওটাই চাই,' বলল চার্লি ফ্রানসি, মনে মনে কুত্তার বাচ্চা বলছে সেলসম্যানকে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা মানেই লোকটা ওর চেহারা বেশ ক'দিন মনে রাখবে। এরপর সেলসম্যানের দিকে পিছন ফিরে শো-কেসের দিকে মনোযোগ দিল সে। নাইলন ট্র্যাক স্যুট, সাইক্লিং গ্লাভস, সাইক্লিং শু আর একটা সাইক্লিং ক্যাপ

কিনল। উৎসাহী হয়ে উঠে ট্যুর দ্য ফ্রান্স সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে শুরু করল সেলসম্যান, কিন্তু তার কথায় কান থাকলেও তার দিকে ফিরল না চার্লি ফ্রানসি। সবশেষে ইস্পাতের ব্যারেল লাগানো একটা পাম্প কিনতে চাইল সে।

'কিন্তু মশিয়ে!' সেলসম্যান আবারও হতভম্ব। 'আপনার দরকার হালকা ব্যারেল, ঠিক এই পলিপ্রোপাইলিন...'

চার্লি ফ্রানসি মাথা নাড়ল। 'ক্রোমিয়াম প্লেট স্টীল ব্যারেল চাই আমার।' সাইকেল নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে সে, বিড়বিড় করে তাকে গাল দিল সেলসম্যান, 'ভালগারিয়ান!'

শহরের অলিগলি দিয়ে এক কিলোমিটারের মত হেঁটে এল চার্লি ফ্রানসি, মনের মত নির্জন একটা জায়গা খুঁজে পেয়ে প্যাকেট থেকে বের করল লাইট-ওয়েট ট্র্যাক স্যুট, পরে থাকা স্যুটের ওপরই পরল সেটা। একটু আঁটসাঁট হলো, তাতে কিছু আসে যায় না। রেসিং ও পরল, ওয়াকিং ও রেখে দিল সীটের তলায়। ক্যাপ মাথায় চাপিয়ে যখন সে প্যাডেল মেরে রওনা হলো, এক কোটি বিশ লক্ষ সাইক্লিং প্রিয় ফরাসীদের মধ্যে থেকে তাকে আলাদা ভাবে চেনার কোন উপায় থাকল না, মহড়া দিতে বেরিয়েছে, মনে আশা: বেলজিয়ানদের একদিন পরাস্ত করবে।

শহরতলিতে পৌছুতে এক ঘণ্টার মত লাগল তার, ইতোমধ্যে নিতম্ব ব্যথা করতে শুরু করেছে আর ঘামে সারা শরীর জবজবে। বড় বড় মিল-ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে এল সে। একটা খালের কিনারা ঘেঁষে সাইকেল চালাল, সামনে হালকা জঙ্গল। গতি কমাল সে, হাতঘড়ির ওপর চোখ। দশটা বাজে। সাইকেল থামিয়ে সীটের পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকানো ব্যাগটা তুলে বগলের নিচে নিল, তারপর প্যাডেলে চাপ দিল আবার। পাঁচ মিনিট পর আরেক সাইকেলের টুং-টুং ঘণ্টা শুনতে পেল সে। দু'পাশে বনভূমি, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে, ওর পাশে সমান্তরাল রেখায় চলে এল কেকারিয়া উইলিয়ামস, বাড়িয়ে দিল হাতটা। দুটো ব্যাগ এত দ্রুত হাতবদল হলো যে আশপাশে কেউ থাকলেও দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। সাইকেল না থামিয়ে নতুন ব্যাগটা সীটের পিছনে ক্লিপ দিয়ে আটকে নিল চার্লি ফ্রানসি। কেকারিয়া উইলিয়ামসও, বিশ ফুট সামনে, ঠিক তাই করল। তারপর আবার ওরা পাশাপাশি হলো।

'চমৎকার, তাই না—জায়গাটা?' জিজ্ঞেস করল কেকারিয়া উইলিয়ামস।

'বেছেছ ভালই। ব্যাগে সব আছে তো?'

'হ্যাঁ,' আশ্বস্ত করল কেকারিয়া উইলিয়ামস। 'তোমার যা দরকার সব।'

'শুভ।'

এরপর সামনের রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে, এক কিলোমিটারের মত। হন হন করে এক চাষা ওদের দিকে হেঁটে আসছে, তাছাড়া চারদিকে আর কোন জন-প্রাণী নেই। এখনই সময়, কেউ দেখতে পাবে না। চাষা লোকটাকে ওদের পিছনে অদৃশ্য হবার সময় দিল চার্লি ফ্রানসি, তারপর বলল, 'এসো, দেখা যাক তুমি আমাকে পেছনে ফেলতে পারো কিনা।'

'চ্যালেঞ্জ করছ? বেশ তো...'

শুরু হলো প্রতিযোগিতা। প্যাডেলের ওপর জোরে চাপ পড়ল, ফুলে ফুলে উঠল

পেশী। শুরুটা ভাল হলো চার্লি ফ্রানসির, কারণ আগে থেকে প্রস্তুতি ছিল তার। কেকারিয়া তার চার ফুট পিছনে থাকল, তবে ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্যে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে। যদিও চার্লি ফ্রানসি একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

হ্যান্ডেল বারের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, যেন বাতাস তাকে গতি তুলতে বাধা না দেয়। ঘন্টায় যখন সে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটছে, হঠাৎ প্যাডেল থেকে পিছলে গেল পা। সুযোগটা সাথে সাথে গ্রহণ করল কেকারিয়া উইলিয়ামস, চার্লি ফ্রানসির পা আবার প্যাডেলে ফিরে আসার আগেই তার পাশে চলে এল সে, ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে, কপালের ঘাম চোখে পড়ায় আপাতত অন্ধ। চার্লি ফ্রানসির পাশে চলে আসায় আরেকটা অসুবিধে দেখা দিল তার, এতক্ষণ পিছনে ছিল বলে বাতাসের ধাক্কা টের পায়নি, এখন পাচ্ছে। সে বুঝল চার্লি ফ্রানসিকে পিছনে ফেলতে হলে এই বাধা তাকে টপকাতে হবে। সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, দ্রুত প্যাডেল ঘোরাচ্ছে।

একটু একটু করে চার্লি ফ্রানসিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে কেকারিয়া উইলিয়ামস। কিন্তু না, চার্লি ফ্রানসি আবার তাকে ধরে ফেলছে। দুটো সাইকেল এখন আবার পাশাপাশি চলে এল। হ্যান্ডেল বারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে চার্লি ফ্রানসি। তার একটা হাত ব্রেক হ্যান্ডেলে, অপর হাতটা দিয়ে ক্লিপ খুলে স্টীল পাম্পটা ধরল, এবং কোন বিরতি ছাড়াই ছুঁড়ে দিল কেকারিয়া উইলিয়ামসের সামনের হুইল লক্ষ্য করে, একই সাথে ব্রেক কষে থামিয়ে ফেলল নিজের সাইকেল।

পাম্পটা আটকে গেল হুইলে, হুইলের গা থেকে টেনে বের করে আনল স্পোকগুলোকে। সাইকেলের পিছনটা ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত উঁচু হলো, হ্যান্ডেল বারের ওপর দিয়ে সামনের দিকে নিক্ষিপ্ত হলো কেকারিয়া উইলিয়ামস, শক্ত পাথুরে রাস্তার ওপর মাথা দিয়ে পড়ল সে। তার সাইকেল আধুনিক প্রতীকধর্মী ভাস্কর্যের মত কিম্ভূতকিমাকার হয়েছে দেখতে। মোচড়ানো তোবড়ানো সাইকেলটাকে কেকারিয়া উইলিয়ামসের শরীরের পাশে নিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি। বন্ধুবর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কপালের একটা বীভৎস গর্ত থেকে কুল কুল করে রক্ত বেরুচ্ছে। প্লাস্টিক মোড়া স্টীল ব্রেক কর্ডটা তার গলায় পেঁচিয়ে মোচড়াল সে।

তিন মিনিটের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল কেকারিয়া উইলিয়ামস। ঠিক যেখানে পড়েছিল সেখানেই তাকে ফেলে রেখে গেল চার্লি ফ্রানসি। বিধ্বস্ত সাইকেলের হুইল থেকে পাম্পটা বের করে নিয়েছে সে, জঙ্গলে ঢুকে মাটিতে পুঁতে রাখল সেটা, শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিল বন্ধ করা গর্তের ওপরে।

ধীরে সুস্থে ফিরে এল চার্লি ফ্রানসি। স্টেশনের সামনে পঞ্চাশ-ষাটটা সাইকেলের সাথে রাখল নিজেরটা। ওখানে দাঁড়িয়েই সাইক্লিং শু, ক্যাপ, ট্র্যাক স্যুট খুলে সব স্যাডল ব্যাগে ভরল, পরে নিল ওয়াকিং শু। কেকারিয়া উইলিয়ামসের দেয়া ব্যাগে রয়েছে পিলমোর কোম্পানীর কমপিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমের জ্ঞাতব্য সমস্ত খুঁটিনাটি। ব্যাগটা বগলদাবা করে একটা লোকাল ট্রেনে উঠল সে, ফিরে এল লিয়নে, প্ল্যাটফর্ম না ছেড়ে খানিক পর প্যারিস এক্সপ্রেসে চড়ে বসল।

*

জুয়েলা মাদ্রে পতিতালয়ে অদৃশ্য হবার পরপরই শেভ্রোলে থেকে মাইক্রোবাসে ফিরে এল রানা, নজর রাখার দায়িত্ব মেক্সিকানের ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে এল পাহাড়ী এলাকা সান ক্রিস্টোবালে। খানিক পরপর রেডিওতে রিপোর্ট করছে মেক্সিকান, যদিও কিছুই ঘটছে না। দু'জন প্রোগ্রামার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, তিনজনই যে যার অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমাচ্ছে।

র‍্যাঞ্চ-এর আদলে তৈরি গাঢ় পালিশ করা কাঠের নতুন একটা বাড়িতে থাকে জুয়েলা মাদ্রে, সাথে দীর্ঘ বারান্দা, ছাদে সবুজ টালি। তিন বছর লিমায় কোন বৃষ্টি হয়নি, তার আগে হয়নি পঁচিশ বছর, তারমানে ছাদটা আসলে বাড়ির অঙ্গসজ্জা হিসেবে কাজ করছে, এবং সন্দেহ ব্যতিরেকেই ধরে নিতে হয় বাড়ির মালিক বিপুল বিত্তের অধিকারী। পাইন গাছের বৃত্তের ভেতর তিন একর জায়গা, মাঝখানে বাড়িটা। প্রতিটি গাছের গোড়ায় গর্ত করা আছে, পাহাড়ের ওপর বসানো ট্যাংক থেকে পাইপের সাহায্যে পানি এনে ভরা হয় ওগুলো। শব্দ শুনে রানা বুঝল বাড়ির পিছন দিকে কোথাও ডিজেল এঞ্জিন চালু করা হয়েছে। বাড়ির সব ক'টা কামরা এবং সামনের অংশ আলোকিত। সর্বডানের কামরাটা, রানার নাইট গ্লাসের সাহায্যে জানা গেল, কাঠের প্যানেল দিয়ে মোড়া, বুকশেলফে অসংখ্য বই। একটা মেয়েকে দেখা গেল, এ-ঘর ও-ঘর করছে নার্ভাস ভঙ্গিতে। জুয়েলা মাদ্রের হাউসকীপার; ধারণা করল রানা। 'বোধহয় সেজন্যেই জ্বলছে আলোগুলো,' বলল গুয়াম। 'এই পাহাড়ী মেয়েগুলো খোলা জায়গায় সাপ আর হিংস্র পশুদের ভয় পায় না, কিন্তু বাড়ির ভেতর আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকে। জুয়েলা মাদ্রে না ফেরা পর্যন্ত মেয়েটা বসবে না।'

জুয়েলা মাদ্রের বাড়ির কাছে কেন এসেছে নিজেও রানা ভাল করে জানে না। চুপিসারে ভেতরে ঢোকার কোন ইচ্ছেই ওর নেই। মিডো থেকে সামান্য অঙ্কের টাকা চুরি করেছে জুয়েলা মাদ্রে এটা মেনে নিতে কঠিন লাগছে ওর। সবাই জানে জুয়েলা মাদ্রে বিপুল সম্পত্তির মালিক। 'মাদ্রে মাত্রই অপরাধের ঊর্ধ্বে' এ-কথা অবশ্য বিশ্বাস করতে রাজি নয় ও। কিন্তু কেন কে জানে মেয়েটার ওপর নজর রাখার এই কাজটায় ভেতর থেকে উৎসাহ পাচ্ছে না। ব্রথেলে ঢোকার সময় জুয়েলা মাদ্রে তার হাতব্যাগ গাড়িতে ফেলে রেখে যাওয়ায় মনে মনে স্বস্তিবোধ করেছিল ও। হয়তো অপ্রীতিকর বা অবিশ্বাস্য কিছু শোনার বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে গেছে। তদন্তে যে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে জানে, কিন্তু তবু স্বস্তিবোধটুকু মিথ্যে নয়। সন্দেহ নেই, মেয়েটার আচরণ ভারি অদ্ভুত। রহস্যময় কোন কারণে নিউ ইয়র্কে ফোন করার চেষ্টা করেছিল, অসময়ে একটা চার্চের ভেতর ছিল কিছুক্ষণ, সেখান থেকে চারজন লোককে নিয়ে একটা পতিতালয়ে ঢুকেছে। বুঝতে পারছে মেয়েটাকে সন্দেহ করার সব রকম কারণ আছে, অথচ স্বভাবসুলভ জেদ বা উৎসাহ কোনটাই অনুভব করছে না রানা।

'চলো ফিরে যাই,' গুয়ামকে বলল ও। 'আমাকে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিয়ে আজ রাতের মত সার্ভেইল্যান্স বাতিল করো।'

'কিন্তু সানসেজ যে ব্রথেলে রয়েছে...?'

'সে-ও বাড়ি ফিরে যেতে পারে...'

অ্যান্তোনিতা অ্যাবামসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে দেখল সবগুলো আলো জ্বলছে। দরজার তালা খুলছে, কাছে এসে দাঁড়াল মার্ভেলা। 'রাত জেগে আমার জন্যে তোমার অপেক্ষা করা উচিত হয়নি,' বলল ও।

মার্ভেলা মাথা হেঁট করে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল রানা যেন তাকে শাসন করছে। 'এতে আমি আনন্দ পাই, সিনর।'

বেডরুমে ঢুকল রানা, কাপড় ছেড়ে বাথরুমে চলে এল, দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। প্রথমে গরম, তারপর ঠাণ্ডা পানি ঢালল গায়ে, তবু যেন প্রাণ জুড়াল না। পানি ঘোলা আর লবণাক্ত। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বিছানার ওপর একজোড়া পা'জামা মেলে রেখেছে মার্ভেলা। ধীরেসুস্থে কাপড় পরল ও—লাইট-ওয়েট কটন রোব। লিভিং রুমে ঢুকল, একই সময় কিচেন থেকে ঢুকল মার্ভেলা। তার হাতে একটা ট্রে, তাতে আধ প্লেট আঙুর, টুকরো করা আপেল, এক গ্লাস ওভালটিন, সাথে দুধ আর চিনি। আরেকটা প্লেটে কি যেন রয়েছে, রানা দেখেও ঠিক চিনতে পারল না রানা।

'পরিজ,' সগর্বে বলল মার্ভেলা।

শব্দ করে হেসে উঠল রানা। 'মার্ভেলা,' বলল ও। 'তোমার দেখছি সব দিকে খেয়াল।'

জানালার পাশে ছোট একটা সাইড টেবিলে ট্রে-টা রাখল মার্ভেলা, টেবিলটা সে আগেই একগাদা কাটলারি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল। টেবিলে বসে পরিজ খেলো রানা। লবণ দিয়ে খেতে ভালবাসে, কিন্তু মার্ভেলা চিনি ব্যবহার করলেও খারাপ লাগল স্বাদটা। কিচেন থেকে ফিরে এল মার্ভেলা, এবার তার ট্রে-তে মাটন, ওমলেট, টোস্ট আর মসলা সহযোগে গরম সসেজ। সসেজে সাধারণত মসলা ব্যবহার করা হয় না, তবে মার্ভেলা মনে দুঃখ পাবে ভেবে কথাটা চেপে গেল রানা।

'ব্রেকফাস্ট আপনার পছন্দ হয়েছে, সিনর?' রানার শেষ হতে জিজ্ঞেস করল মার্ভেলা।

'মার্ভেলা,' বলল ও, 'ক্লারিজও আমাকে এর কাছাকাছি কিছু দিতে পারত না।'

'ক্লারিজ হোটেল?' মার্ভেলা বিস্মিত। 'ওটা তো বাজে একটা হোটেল।'

'আমি লন্ডন বা নিউ ইয়র্কের ক্লারিজ সম্পর্কে বলছি।'

'ও, আচ্ছা, তারমানে আপনি খুশি হয়েছেন!' প্রায় হাততালি দিয়ে ফেলে মার্ভেলা। 'সিনর, নিয়মিত পত্রিকা পড়ি আমি, শিখতে চেষ্টা করি নামীদামী লোকেরা কি খেতে পছন্দ করেন। সিনর, আপনাকে খুশি করার জন্যে সব কিছু করতে পারি আমি।'

হেসে উঠল রানা। 'তোমার প্রতিটি কাজ নিখুঁত, খুব খুশি হয়েছি আমি।' টেবিল পরিষ্কার করল মার্ভেলা, রয়ে গেল শুধু জগ ভর্তি গরম কফি আর কাপ। কফি ঢালল রানা কাপে, চিনি-দুধ ছাড়াই চুমুক দিল। লক্ষ করে চিনি আর ক্রীম কিচেনে রেখে এল মার্ভেলা।

'এবার তুমি শুয়ে পড়ো,' বলল রানা।

ঠিক আছে, সিনর। কিন্তু তার আগে, আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একবার শাওয়ারের নিচে দাঁড়াতে চাই, প্লীজ?'

'বেশ তো,' বলল রানা। 'যাও।' আহা বেচারি, ক্ষীণ একটু অপরাধবোধ জাগল রানার মনে–কিচেন যা গরম, একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেছে। 'বাথরুমে এক বোতল বাডেডাস রাখা আছে,' আবার বলল ও, 'ব্যবহার করতে পারো। গন্ধটা দারুণ, মনে শান্তি এনে দেয়।'

'আমিও চাই, সিনর, আমিও সুগন্ধ বিলাতে চাই।' কিচেনে চলে গেল মার্তেলা।

জুয়েলা মাদ্রে আর মার্তেলার মধ্যে কি দুস্তর পার্থক্য, ভাবল রানা। একজন সোনার চামচ মুখে নিয়ে শহরে জন্মেছে, অভিজাতদের জন্যে আলাদা করা সেরা স্কুল আর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে, সন্দেহ নেই পড়াশোনা শেষ করেছে সুইটজারল্যান্ডে এবং অবশেষে শখ করে দায়িত্ব নিয়েছে একটা কমপিউটর ডিপার্টমেন্টের। আর মার্তেলা? সুজকোর কোথাও একটা পাহাড়ে জন্ম হয়েছে তার, ছেলেবেলা কেটেছে বেপরোয়া স্বাধীন, চোদ্দ বছর বয়সে শহরে এসেছে ধনী কারও বাড়িতে বাকি জীবন ঝি-গিরি করে কাটানোর নিয়তি নিয়ে। তবু তার ভাগ্যটাকে 'লন্ডনে' যারা রয়েছে তাদের চেয়ে ভালই বলতে হয়। জায়গাটার কথা মনে হতে গা ঘিন ঘিন করে উঠল আবার। প্রশ্ন হলো, জুয়েলা মাদ্রে ওখানে কি করতে গিয়েছে?

কয়েকটা সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করল রানা। হতে পারে জুয়েলা মাদ্রে বিকৃতির শিকার–লেসবিয়ান বা ওই ধরনের কিছু। অভিজাত বংশীয় ভদ্রমহিলাদের কথা শুনেছে ও, যারা মান-সম্মান খোয়াবার ঝুঁকি নিয়েও পতিতার ভূমিকা গ্রহণ করে স্রেফ নোংরা উত্তেজনা পাবার আশায়। কিন্তু এ-সব চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিল রানা। 'গোপন পরামর্শ-সভা ধরনের কিছু একটা হতে পারে,' ভাবল ও। গোপন বৈঠকের জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে? জুয়েলা মাদ্রের বাড়িটা খুব সুন্দর, কিন্তু লক্ষ করেছে, বাড়ির চারদিকে কোন রকম পাঁচিল বা বেড়া নেই। ইচ্ছে করলে যে-কেউ জানতে পারে বাড়িটায় কারা আছে বা কি হচ্ছে।

চার্চটাকে ব্যবহার করা হয়েছে সাক্ষাতের জায়গা হিসেবে। সবাই ওখানে জড়ো হবার পর আলোচনার জন্যে গিয়েছিল পতিতালয়ে। জুয়েলা মাদ্রেকে সেখানে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হয়নি, দলের লোক ছাড়া কেউ তাকে মেয়ে বলে চিনতেই পারেনি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিসের মীটিং? ব্যাপারটা যখন গোপনীয়, রাজনৈতিক মীটিং হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। পেরু শান্ত একটা দেশ, বৈপ্লবিক স্লোগান শুনতে পাওয়া যায় না। শেষবার যখন অভ্যুত্থান ঘটল, ঘটার সময় কেউ টেরও পায়নি। রিপোর্ট অনুসারে, প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রাসাদে শান্তভাবে বসেছিলেন এমন সময় একজন মেরিন মেজর দরজায় মৃদু নক করে ভেতরে ঢোকে, এবং প্রেসিডেন্টকে জানায় যে তিনি ক্ষমতা হারিয়েছেন। সরকার শক্তিশালী এবং স্থায়ী, এ-ধরনের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট না পেয়ে মিডো এ-দেশে এত বড় পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। তারমানে ধরে নেয়া যায় মীটিংটা গোপন হলেও জুয়েলা মাদ্রে বিপ্লবের কোন পরিকল্পনা করছে না। বিপ্লবের জন্যে পরিবেশ দরকার, পেরুতে সেটা অনুপস্থিত। তাছাড়া, জুয়েলা মাদ্রে আর বিপ্লব, দুটো ঠিক যেন তেল আর পানি, মিশ খায় না। তাহলে? দেহ-ব্যবসার আখড়ায় গিয়ে কি করছিল সে? তার এই রহস্যময় আচরণের সাথে কমপিউটর-

ঘটিত চুরির কি সম্পর্ক?

শেষ আরেক কাপ কফি খেয়ে কফি পট নিয়ে কিচেনে ঢুকল রানা। বোঝাই যাচ্ছে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মার্ভেলা। কফি পট রেখে নিজের বেডরুমে ফিরে এল ও, আসার পথে এক এক করে সবগুলো আলো নিভিয়ে দিল। বিছানার পাশে ছোট একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, শেডটা একদিকে নামানো। স্লীপিং গাউন খুলে ওয়ার্ডরোবে রেখে দিল। বিছানার কিনারায় বসে পা থেকে স্লিপার খুলল। লম্বা হয়ে শুয়ে গলা পর্যন্ত টেনে নিল চাদরটা।

'আমি কি সুগন্ধ ছড়াচ্ছি?' রানার কানের কাছে একটা আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি পাশ ফিরল রানা। মার্ভেলা, যতদূর বোঝা যাচ্ছে, সম্পূর্ণ নগ্ন, ওর পাশে শুয়ে রয়েছে।

'কি ব্যাপার, মার্ভেলা? তুমি…!'

'আপনি আমাকে শুতে বলেছিলেন, সিনর,' বলল মার্ভেলা, রানার আরও কাছে সরে এল।

'আমি তোমাকে শুতে যেতে বলেছি, শুতে আসতে বলিনি,' বলল রানা, রীতিমত অপ্রতিভ। পরমুহূর্তে অবশ্য শিথিল হলো পেশী। মার্ভেলা যে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা হাত তুলে মাথার পিছনে নিয়ে গেল রানা, বিছানার একেবারে কিনারায় সরে এল, কিন্তু ওকে অনুসরণ করে সরে এল মার্ভেলাও। মুখ তুলল মেয়েটা, তার কালো রেশমের মত চুল ছড়িয়ে পড়ল রানার বুকে।

এবার কঠিন হলো রানা। 'মার্ভেলা, এই মুহূর্তে যদি তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, তাহলে ভাবব, ছেলেমানুষ, একটা ভুল করে ফেলেছ, মাফ করে দেয়া যায়। আর যদি না যাও, তোমাকে আমি…'

'আমি ছেলেমানুষ সেটাই কি আমার অযোগ্যতা, সিনর? নাকি আমি পাহাড়ী মেয়ে সেটাই আমার অপরাধ?'

'অযোগ্যতা বা অপরাধ নয়,' বলল রানা। 'প্রশ্নটা নৈতিকতার। বিশেষ কিছু জিনিস আছে যা নিতে হলে কিছু দিতেও হয়। তোমাকে যদি ভালবাসতাম তাহলে তোমার এই দান নিতে আমার বিবেকে বাধত না।'

'কিন্তু আমি তো, সিনর, ভালবেসেই নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে চাইছি।'

'বেশ বুঝতে পারছি, ভালবাসা কাকে বলে তুমি তা বোঝো না। সেবা আর ভালবাসা, দুটো তোমার কাছে একই জিনিস। কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়।'

'কিন্তু, সিনর, আপনি তাহলে আমার সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করুন,' মার্ভেলা সিরিয়াস। 'হয় এ-বাড়িতে নাহয় অন্য কোন বাড়িতে ঝি-র কাজ করে জীবন কাটাতে হবে আমাকে। আমি আমার কাজে ফাঁকি দিতে চাই না, তাই যে-কোন সেবা দান করার জন্যে আমাকে তৈরি থাকতে হবে। যে-কোন সেবা বলতে দেহদানও বোঝায়, অন্তত এখানকার মানুষ তাই বোঝে। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু গ্রহীতাকে আমি যদি ভাল না বাসি তাহলে দান করা সম্ভব হবে না। আর দেহদান করা সম্ভব না হলে সেবা দান করায় খুঁত থেকে যাবে। অর্থাৎ আমি বলতে

চাইছি. সেবা আর ভালবাসা যে একই জিনিস, অন্তত আমার কাছে, কিভাবে আপনি তা অস্বীকার করবেন?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'অস্বীকার করি না। তবে তোমার এসব যুক্তি আমার বেলায় খাটে না। আমি এখানকার লোক নই। যে সেবা আমার দরকার নেই, সেটা তুমি আমাকে দিতে পারো না।'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেলল মার্ভেলা। 'দরকার নেই, সিনর?'

'না···মানে, হ্যাঁ, আমি তোমার কাছ থেকে চাই না,' আমতা আমতা করে বলল রানা। 'এখন তুমি যাও, মার্ভেলা, প্লীজ।'

ঠিক তখুনি ডোরবেল বেজে উঠল।

'সর্বনাশ, সিনর!' বিছানা থেকে লাফ দিল মার্ভেলা।

মেঝেতে দাঁড়াল রানা, স্লীপিং গাউন পরছে, আবার বেজে উঠল ডোরবেল। অন্ধকারে আলোর সুইচ খুঁজতে গিয়ে হোঁচট খেলো টেবিলের সাথে। আবার ডোরবেল বাজল। 'ধেত্তেরি,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা, মার্ভেলা কি করছে কোন ধারণাই নেই।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কবাট উন্মুক্ত করল রানা। গাঢ় একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে, বেলের বোতামে আঙুল। হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ পেল রানা, আলোয় ভরে উঠল কামরা। দরজার ভেতর দিকে পতন শুরু হলো মেক্সিকান লোকটার, তার হাত দুটো রানার গাউন খামচে ধরার ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। ধপাস করে আওয়াজের সাথে পড়ে গেল সে মেঝেতে, লাফ দিয়ে সরে এসেছে রানা। মেক্সিকানের ট্রাউজার রক্তে ভেজা, রানার পায়ের কাছে পড়ে থাকা দেহটা নড়ছে একটু একটু। হাঁটু গেড়ে বসল রানা, অস্পষ্টভাবে কানে এল পায়ের আওয়াজ, এলিভেটরের সামনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর একটা এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ ভেসে এল।

'মার্ভেলা! মার্ভেলা!' রানার চিৎকার শুনে ছুটে এল নগ্ন মার্ভেলা, বুকের কাছে খামচে ধরে আছে নাইটগাউনটা। মেক্সিকানকে দেখে আঁতকে উঠল সে, রানার পাশে বসে লোকটার মুখ থেকে রক্ত মুছল নাইটগাউন দিয়ে, ফোঁপাতে শুরু করেছে। মেক্সিকানকে চোখ মেলতে দেখে ঠোঁটের দিকে কান নামাল রানা। সানসেজ কথা বলতে চাইছে, কিন্তু মুখের ভেতর রক্ত থাকায় পারছে না। আবার তার ঠোঁটের রক্ত মুছে দিল মার্ভেলা, মুখটা নিচু করে শোনার চেষ্টা করল কি বলছে। কয়েক সেকেন্ড পর মারা গেল সানসেজ।

সিধে হলো রানা। ঘামছে ও। ঠিক কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারল। গুয়াম বাড়ি ফিরে যেতে বললেও, বাড়ি না ফিরে ব্রথেলে গিয়েছিল সানসেজ। এখানেই তার মারাত্মক ভুল হয়েছে। ব্যাকআপ টীম ছাড়া একা তদন্ত করতে যাওয়া উচিত হয়নি। ওরা তার টেসটিকল কেটে নিয়েছে, তারপর রানার অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় দাঁড় করিয়ে ছুরি মেরেছে পিঠে।

'দা প্রিন্টআউট পেরুয়ানা,' বলল মার্ভেলা, হতভম্ব। 'শুধু এই কথাটাই বলল। দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট···' আবার ফুঁপিয়ে উঠে কান্না জুড়ে দিল সে।

নয়

'তোমাকে আমি পাগলের মত খুঁজছি!' অবশেষে চার্লি ফ্রানসির গলা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল টিনা সিরিল। 'অফিসে খবর দিয়েছ তুমি নাকি অসুস্থ। শুনে চিন্তায় আমি অস্থির...'

'তেমন কিছু হয়নি,' আশ্বস্ত করল চার্লি ফ্রানসি। 'সামান্য পেট ব্যথা।'

'এত বার ফোন করলাম, ধরোনি কেন? আমি তোমাকে ওষুধ...'

'এখানে থাকলে তো ধরব,' বলল চার্লি ফ্রানসি, টিনা সিরিলের মাত্রা ছাড়ানো উদ্বেগ লক্ষ করে অস্বস্তিবোধ করছে সে। 'আমি আসলে পশুর মত, বুঝলে। অসুস্থ হয়ে পড়লে হামাগুড়ি দিয়ে গোপন একটা গর্তে আশ্রয় নিই...'

'এখন তুমি সুস্থ তো?'

'পুরোপুরি। কাল থেকে অফিসে যাব।'

'তোমার কিছু দরকার? মানে, ঘরে খাবারদাবার আছে তো? তুমি বললে আমি গিয়ে রান্নাবান্না করে দিতে পারি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল চার্লি ফ্রানসি। হ্যাঁ, টিনা সিরিলের জন্যে প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে ফেলেছে সে। 'মন্দ হয় না, চলে এসো। তবে কেনাকাটার জন্যে কোথাও থেমো না–ফ্রিজে প্রচুর আছে।'

'আমি রওনা হয়ে গেছি,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল টিনা সিরিল।

উন্মুখ, তাই না? এ-ধরনের মেয়েদেরকেই পছন্দ তার, ক্ষুধার্ত আর উন্মুখ।

ফ্রিজ খুলে নিজেই দু'জনের মত খাবারদাবার বের করল চার্লি ফ্রানসি, পরিবেশনের উপযোগী করে রাখল সব, যাতে তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করেই বিছানায় উঠতে পারে। টেবিলে আর সব কিছুর সাথে এক বোতল ক্যালিফোর্নিয়া হোয়াইট ওয়াইন-ও রাখল। মদ খেলে তার উত্তেজনা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

গ্লাসগো, সচিহল স্ট্রীটের কাছাকাছি নোংরা একটা বস্তিতে জন্ম চার্লি ফ্রানসির। তার প্রথম এগারো বছর বস্তির আর দশটা ছেলের মতই কেটেছে, ভাল করে খেতে পরতে না পেলেও চতুর এবং সুযোগসন্ধানী। তার বয়স যখন এগারো, এক স্কুল মাস্টার অঙ্কে তার মনোযোগ আর মেধা আবিষ্কার করে বসেন। তাঁর চেষ্টাতেই হাইস্কুলে পড়ার একটা স্কলারশিপ পেয়ে গেল চার্লি ফ্রানসি। পরে দেখা গেল অঙ্কে তো বটেই, প্রতিটি সাবজেক্টেই অসম্ভব ভাল রেজাল্ট করছে সে। ও এবং এ লেভেলে তারচেয়ে ভাল রেজাল্ট করা আর কারও পক্ষে সম্ভব হলো না। গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী নিল সে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর লন্ডনে বেড়াতে এল চার্লি ফ্রানসি, প্রতিভাশিকারী এক আমেরিকান তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের দু'হপ্তার মধ্যে ব্রেন-ড্রেনের স্রোতে ভেসে চলে এল আমেরিকায়। চার্লি ফ্রানসি দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত যে-কোন সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা আছে–কমপিউটার ট্রেনিঙেও আশ্চর্য ভালভাবে উতরে গেল সে। কোন সন্দেহ নেই

মিডো নিউ ইয়র্কের কমপিউটার সেকশনের প্রধান হিসেবে তালিকায় তার নামই সবার আগে আছে। কিন্তু সেকশন প্রধান হওয়া বা আরও উঁচুতে ওঠার পথে একটাই বাধা আছে চার্লি ফ্রানসির। আটাশ বছরে পড়ার আগেই এক মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে চায় সে, ইউরোপের কোন সমুদ্র তীরবর্তী শহরে বাড়ি বানিয়ে সুস্থির হতে চায়, যাতে অ্যাডভান্সড্ ম্যাথামেটিক্স-এর ওপর বই লিখতে পারে। কমপিউটার অফিসে বসে রুটিন কাজ করা, এ তো স্রেফ মেধার অপচয়! এমন সব সমস্যা তার সামনে সমাধানের জন্যে হাজির করা হয় যা পানির মত সহজ, একটাতেও কোন চ্যালেঞ্জ নেই। আর যাদের সাথে কাজ করতে হয়, তারা এককেটা গো-মূর্খ, মাথায় গোবর ভরা। এই পরিবেশ তার জন্যে নারকীয় বলে মনে হয়। এখান থেকে মুক্তি পেতে হবে তাকে, তা সে যে-কোনভাবেই হোক না কেন। সমস্ত বাঁধাধরা চিন্তা-ভাবনা থেকে মনটাকে নিষ্কৃতি দিতে চায় সে, অঙ্ক শাস্ত্রের সীমানা আরও বহুদূর বাড়াবার জন্যে গবেষণায় মগ্ন হতে চায়, সেই সাথে শরীরটাকে দিতে চায় সম্ভাব্য সমস্ত বিলাস উপকরণ। সুন্দরী নারী, দামী মদ, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স, এসব তার না হলে চলবে না। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট অবশ্যই বুঝতেন যে চার্লি ফ্রানসি আসলে তার বঞ্চিত বাল্যকালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে মাত্র, গ্লাসগোয় অভুক্ত অর্ধভুক্ত অবস্থায় বেঁচে থাকার সময় তার মানসিক এবং শারীরিক পুষ্টির চাহিদা মেটেনি। ,

ছোট ঝুল-বারান্দায়, চারা আর ফুলগাছের মাঝখানে সাজানো হয়েছে টেবিল। টেবিলের দু'দিকে দুটো বেতের চেয়ার। চারাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বুঝে নিয়েছে টিনা সিরিল, একজন সৌখিন লোকের প্রেমে পড়েছে সে। টেবিলের খাবারগুলো তাকে জানিয়ে দিল, লোকটা ভোগী। টিউনা মাছের খানিকটা ভেঙে মুখে পুরল সে। আনন্দ ঝিক্ করে উঠল তার চোখে। 'মাই গড, চার্লি ফ্রানসি, একটানে তুমি দেখছি আমাকে স্বর্গে এনে ফেললে!'

'তুমি বললে তোমার জন্যে হ্যামবার্গারের ব্যবস্থাও করতে পারি।'

'না-না, আমাকে তুমি মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

'কিংবা রাম বা কোক?'

ওয়াইনের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল টিনা সিরিল। পানীয়টুকু গলা দিয়ে নামার সময় জানিয়ে দিয়ে গেল বোতলটা যোগাড় করতে চার্লি ফ্রানসির পকেট যথেষ্ট হালকা হয়েছে। ওয়াইনের সাথে মিটবল খেলো ওরা। পরিবেশিত খাবারদাবার মাত্র অর্ধেক শেষ হয়েছে, হাস্যমুখর টিনা সিরিল প্রত্যাখ্যান করার মত জোরাল কোন কারণ খুঁজে পাবার আগেই আবিষ্কার করল চার্লি ফ্রানসির বিছানায় শুয়ে রয়েছে সে।

'ধ্যেৎ, মাথা খারাপ নাকি, খাবার পর দাঁত না মেজে আমি...'

'পরে।'

প্রেমিক হিসেবে চার্লি ফ্রানসিকে একটু রুক্ষ, অত্যন্ত শক্তিশালী, খানিকটা অত্যাচারী বলা যেতে পারে। তবে ঠিক তার মেজাজের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার মত মানসিক প্রবৃত্তি ছিল টিনা সিরিলের। আনন্দ এবং তৃপ্তি একতরফা হলো না। দু'জনের কেউই ঠিক রোমান্টিক টাইপের নয়, দু'জনেরই রয়েছে ভোগ করার উদগ্র কামনা। ছলনা বা মিছিমিছি লজ্জা না দেখিয়ে পরস্পরের চাহিদা উপলব্ধি করল

ওরা এবং ব্যাকুল ব্যস্ততার সাথে সেগুলো পূরণ করল। পরে বিছানায় পিঠ দিয়ে পড়ে থাকল টিনা সিরিল, আর চার্লি ফ্রানসি চোখে চশমা পরল।

'তুমি আর আমি, দু'জনের আমাদের জমবে ভাল, কি বলো?' জিজ্ঞেস করল সে।

তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল টিনা সিরিল।

'খুশি হলাম।'

আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল টিনা সিরিল।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

ফিরল টিনা সিরিল, দেখল সিলিঙের দিকে তাকিয়ে রয়েছে প্রেমিকপ্রবর। 'কি প্রস্তাব?'

'চাকরি ছাড়াও আরও কিছু কাজ করি আমি,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

'যেমন?'

'কনসালট্যান্সি ধরনের আর কি।'

'ভালই তো। ইনকামের আরেকটা রাস্তা।'

'ওখানেই তো মুশকিল। বেশি ইনকাম থাকলেই বেশি ট্যাক্স দিতে হয়।'

'মুশকিল আবার কি। ইনকরপরেট অর্থাৎ একটা সংস্থা গঠন করো, ট্যাক্স কমে যাবে।'

'হ্যাঁ, জানি, কিন্তু তাতেই তো সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি যদি ইনকরপরেট করি, আমার মার্কেন্টি অ্যাকাউন্ট আমি হারাব। করপোরেশনকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে ওদের একটা রুল আছে…'

'কেন, নিজের নামে করার দরকার কি।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, আমাদের সম্পর্কটা তো বেশ মিষ্টি, তাই না। এতটাই যখন ঘনিষ্ঠ আমরা, তোমার নামে যদি করি তুমি আপত্তি করবে? তোমাকে আমি অবশ্য টাকা দেব। ট্যাক্স দিতে যাব কেন, বরং সে-টাকাটা তোমার ব্যাগে গেলে আমার লাভ। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'অনেক বড় দায়িত্ব নিতে বলছ আমাকে, তবে এরজন্যে আমি কোন টাকা নেব না। তোমার সাথে আমার টাকার সম্পর্ক নয়। কিন্তু কিভাবে বুঝছ যে আমাকে বিশ্বাস করা যায়?'

পাশ ফিরল চার্লি ফ্রানসি, টিনা সিরিলের গলায় নাক ঘষল। 'কিভাবে বুঝেছি তুমি জানো। দু'জনের মাঝখানে কোন ফাঁক নেই।'

তবু ইতস্তত করতে লাগল টিনা সিরিল, যদিও তাকে রাজি করাতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না চার্লি ফ্রানসির। দ্বিতীয় বারও তৃপ্তি অর্জিত হলো। ক্লান্তিতে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর টিনা সিরিল বলল, 'ইনকরপরেট করা হলেও ট্যাক্সের সমস্যা থাকবে।'

'যদি বলি চলো সাপ্তাহিক ছুটিটা দূরে কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি?'

'প্রসঙ্গ থেকে সোরো না…'

'সরছি কোথায়! চলো না, বারমুডা থেকে ঘুরে আসি? ওখানে আমরা ইনকরপরেট…'

বিছানার ওপর উঠে বসল টিনা সিরিল। 'ওয়ান্ডারফুল আইডিয়া! বারমুডায় করলে আংকল স্যামকে ট্যাক্স দিতে হবে না!'

'এই তো বুঝেছ!' হাসতে লাগল চার্লি ফ্রানসি।

'কবে নিয়ে যাবে বলে ভাবছ?'

'এই হপ্তার ছুটিতে।'

'মাই গড, সে তো কাল!' আনন্দে কপালে উঠে গেল টিনা সিরিলের চোখ।

'আমি জানি।'

বারমুডার ওয়ান্ডারল্যান্ড হোটেলে উঠল ওরা। ব্যবসায়িক কাজকারবার এত দ্রুত শুরু হয়ে গেল যে বিস্মিত না হয়ে পারল না টিনা সিরিল। ওরা হোটেলে ওঠার আধঘণ্টার মধ্যে মি. ওয়েলডন হাজির হলো, সাথে চার্লি ফ্রানসির নির্দেশে এরইমধ্যে তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বারমুডান লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানীগুলোর একটা তালিকা। এ-সব ব্যাপার অবশ্য টিনা সিরিল জানে না। মি. ওয়েলডনের দু'জন অফিস স্টাফ বোর্ড অভ ডিরেক্টর পদের জন্যে নমিনি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে, বারমুডার আইন যেমন দাবি করে। কোম্পানীগুলো রেজিস্ট্রি করার জন্যে যা খরচ হয়েছে, বারোশো ডলার, সাথে সাথে মি. ওয়েলডনকে দিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি, একই সাথে পেরেন্ট কোম্পানীর ইনকরপরেশন সার্টিফিকেটটা গ্রহণ করে টিনা সিরিলের হাতে তুলে দিল সে। মি. ওয়েলডন পঁচিশ বছর ধরে দ্বীপটায় বসবাস করছে, সবাইকে চেনে সে। নিজের গাড়িতে করে ওদেরকে একটা ব্যাংকে নিয়ে এল, ওখানে চার্লি ফ্রানসির কাছ থেকে পাওয়া পনেরো হাজার ডলার জমা করল টিনা সিরিল, স্বাক্ষরের একটা নমুনা দিতে হলো তাকে। তারপর, ব্যাংকের বাইরে, গাড়ির ভেতর বোর্ড মীটিং-এ বসল ওরা–সভায় মি. ওয়েলডন যোগ দিল ডিরেক্টর এবং সেক্রেটারি হিসেবে, টিনা সিরিল ডিরেক্টর হিসেবে। নয়শো সাতানব্বইটি শেয়ার সার্টিফিকেট গ্রহণ করল টিনা সিরিল। চার্লি ফ্রানসি তাকে আরও পনেরোশো ডলার দিল সরকারী কোম্পানী ট্যাক্স মেটাবার জন্যে। আবার ওদেরকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল মি. ওয়েলডন। বিদায়ের আগে টিনা সিরিলের সাথে করমর্দন করল সে, বলল, 'আপনার সাথে ব্যবসা করে ভারি আনন্দ পেলাম, মিস সিরিল।'

'কনসালট্যান্সি নিশ্চয়ই খুব লাভজনক ব্যবসা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল টিনা সিরিল, কামরার চাবি নেয়ার জন্যে ডেস্কের সামনে অপেক্ষা করছে ওরা। 'তোমাকে হুড়হুড় করে টাকা খরচ করতে দেখে আমার তো ভয়ই করছিল।'

মৃদু হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল চার্লি ফ্রানসি। টিনা সিরিলকে সে বলেনি টাকাগুলো এসেছে ডেল্টা টিউবস-এর স্যালারিজ অ্যাকাউন্ট থেকে, যা কিনা কমপিউটরের দ্বারা ইউনিয়ন সিটি, নিউ জার্সির একটা ব্যাংকে পাঠানো হয়–সেখান থেকে টি. সিরিলের অ্যাকাউন্টে ট্র্যান্সফার করা হয়েছে। খুব বেশি দেরি হবে না, সময় মত নিজেই সব জানতে পারবে, বোকা মেয়েটা।

শান্ত সাগরে সাঁতার কেটে সময় কাটাল ওরা। বেআইনী হলেও গভীর পানিতে ডুব দিয়ে টিনা সিরিলের জন্যে রঙিন প্রবাল তুলে আনল চার্লি ফ্রানসি। শুধু ওকে খুশি করার জন্যে প্রেমিকপ্রবরকে এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে

উঠল টিনা সিরিল। এরপর চার্লি ফ্রানসি দু'হাতে টাকা ওড়াবার একটা অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। টিনা সিরিল প্রায় স্তম্ভিত, আচরণটা ঠিক যেন চার্লি ফ্রানসিকে মানায় না। টিনা সিরিলের জন্যে অসংখ্য উপহার কেনা হলো, চার্লি ফ্রানসির জন্যেও প্রচুর কেনাকাটা করল সে। আরেকটা ব্যাপার বিস্মিত করল টিনা সিরিলকে। ফুরিয়ে গেলেই টিনার ব্যাগে গোছা গোছা টাকা ভরে দিল চার্লি ফ্রানসি, তার জেদ সব কিছুই টিনা নিজের হাতে কিনবে। সাপারের সময় আরও অনেকগুলো শ্যাম্পেনের বোতল কিনল ওরা, সারা রাত ধরে খেলেও শেষ করতে পারবে না। মেন্যুর সবচেয়ে দামী খাবারগুলো অর্ডার দিল, প্রায় সব ক'জন ওয়েটারকে মোটা বকশিশ দিল। টাকা-পয়সার ব্যাপারে চিরকালই সতর্ক টিনা সিরিল, তারই হাত থেকে এভাবে পানির মত ওগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে সত্যিকার ব্যথা অনুভব করল সে। এক অর্থে এ-সবই তো বাজে খরচ। রেস্তোরাঁয় যতক্ষণ থাকল ওরা, টিনা সিরিলের প্রতি গভীর ভালবাসা আর মনোযোগ থাকল চার্লি ফ্রানসির। ভাবটা যেন টিনা সিরিলের অন্ধ ভক্ত সে, তার দয়াতেই বেঁচে আছে। খানিক আগে এক দোকানে একটা সোনার হাতঘড়ি দেখে এসেছে ওরা, আবদারের সুরে টিনা সিরিলকে সে বলল, ওটা তাকে কিনে দেয়া হলে ভীষণ খুশি হবে সে। কথাটা বলা হলো এমনভাবে যাতে আশপাশে যারা আছে তারা যেন শুনতে পায়। টাকাটা তারই, কিন্তু সে-কথা তো আর ওয়েটার ম্যানেজারের জানার কথা নয়। সাপারের বিলও মেটাল টিনা। তারপর ডিনারের সময়, একই রেস্তোরাঁয়, ওয়েটারদের ডেকে চার্লি ফ্রানসি সোনার ঘড়িটা দেখাল, 'দেখো, আমার স্ত্রী আমাকে কি কিনে দিয়েছে দেখো!' ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখল তারা।

সে রাতে বিছানায় খেপে ওঠা সিংহ আর চার্লি ফ্রানসির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। বার বার প্রেম করল সে, টিনা সিরিলের ঘুম ভাঙিয়ে আরও বেশি দাবি করল, মেয়েটার ওপর এমনভাবে প্র্যাকটিস শুরু করল যেন সেক্স অলিম্পিকে নাম লিখিয়েছে। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টে বসল ওরা, ওয়েটাররা ওদের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। টিনা সিরিল বুঝতে পারল, ওদের চেহারায় রাত্রি জাগরণের চিহ্ন দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে তারা।

বিল মেটাল টিনা সিরিল। ম্যানেজার দেখল, আবারও মোটা বকশিশ দেয়া হলো ওয়েটারদেরকে। তার আর কোন সন্দেহ থাকল না, টাকাগুলো নিশ্চয়ই কোথাও থেকে চুরি করা। চার্লি ফ্রানসিও চাইছে এই সন্দেহই করা হোক।

কোম্পানীর সমস্ত ডকুমেন্ট সাথে নিয়ে আবার হাজির হলো মি. ওয়েলডন, হোটেলের বারে একটা মীটিঙে বসল ওরা। 'কি অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখো দেখি,' মীটিঙ শেষে বলল টিনা সিরিল, 'ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, আমি আস্ত একটা কোম্পানীর ম্যানেজার!'

'ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিস,' সংশোধন করে দিল মি. ওয়েলডন।

সেদিন বিকেলে নিউ ইয়র্কে ফিরে এল ওরা। ট্যাক্সি করে টিনা সিরিলকে তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিল চার্লি ফ্রানসি। 'ওপরে একবার উঠবে নাকি,' জিজ্ঞেস করল টিনা সিরিল। 'শুধু কফির জন্যে, আগেই সাবধান করে দিচ্ছি।'

হালকা সুরে বললেও, চার্লি ফ্রানসিকে কাছছাড়া করতে মন চাইছে না তার। চার্লি ফ্রানসি যেভাবে তাকে আকৃষ্ট করছে, তার নিজের কাছেই ব্যাপারটা অদ্ভুত আর

অবিশ্বাস্য লাগছে। এতদিনে বোধহয় সত্যিকার প্রেমে পড়েছে সে। বারমুডায় শেষ রাতটার কথা বাদ দিলে চার্লি ফ্রানসি তার সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছে। কিভাবে একটা মেয়েকে মর্যাদা দিতে হয়, লোকটা জানে বটে। টিনা সিরিল উপলব্ধি করল, চার্লি ফ্রানসিকে পাগলের মত ভালবাসে সে। গত ক'দিনে তার মনেই পড়েনি কি কাজের জন্যে চার্লি ফ্রানসির সাথে পরিচিত হয়েছিল সে। ভুলে গেছে কমপিউটর ট্রেনিং সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাকে, তার অ্যাকাউন্ট নিয়ে যে লোকটা গোলমাল করেছে তাকে ধরতে হবে। তার মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা, কিভাবে তার পাশে ধরে রাখা যায় চার্লি ফ্রানসিকে। তাকে সে ভালবাসতে চায়, তার যত্ন নিতে চায়, তাকে নিজের হাতে খাওয়াতে চায়, তার কথা শুনতে চায়, তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে চায়। কাছে পিঠে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট থাকলে তিনি ব্যাখ্যা করতে পারতেন আসলে কি ঘটেছে। একজন নারী হিসেবে টিনা সিরিলের মধ্যে অঢেল মাতৃস্নেহ রয়েছে। চার্লির সদয় ব্যবহার পেয়ে তার সেই মাতৃস্নেহ উথলে উঠেছে নিজেরই অজান্তে। প্রথম যৌবনে গর্ভের সন্তানটিকে নষ্ট করে দিতে বাধ্য হয়েছিল টিনা সিরিল, মাতৃস্নেহ উথলে ওঠার পথ খুঁজে পায়নি। দু'বাহুতে জড়িয়ে বুকে তুলে নিতে পারেনি সন্তানকে, তার সেই হারানো সন্তানের বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে চার্লি ফ্রানসি।

আরও কাছে সরে এসে অকারণে হাসতে লাগল চার্লি ফ্রানসি, অপ্রয়োজনে বার বার অ্যাডজাস্ট করল চোখের চশমা। 'না, ওপরে যাব না। কোম্পানী থেকে যদি টাকা পেতে চাও, আমাকে কাজ করতে হবে।'

'বেশি রাত জাগবে না,' বলল টিনা সিরিল। সাময়িক বিচ্ছেদও তার বুকে কাঁটার মত বিঁধছে।

বাড়ি ফিরে বারমুডান লিমিটেড লায়াবিলিটি কোম্পানীর কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করল চার্লি ফ্রানসি। টিনা সিরিল জানে না ব্যাপারটা, সে শুধু এই একটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর নয়, এ-ধরনের আরও বারোটা কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টরও বটে। কোম্পানীগুলো এখন সাংঘাতিক ব্যস্ততার মধ্যে থাকবে।

এরপর এক ঘণ্টা ধরে টিনা সিরিলের সই নকল করার কাজে মগ্ন থাকল সে। ভাগ্যটা ভালই, টিনা সিরিল সই করেছে সংক্ষেপে–টি. সিরিল। সইটা হুবহু নকল করতে পারছে সে। আগামী কয়েকদিন টি. সিরিল অসংখ্য চেক কাটতে যাচ্ছে।

সিনর কসমো মাদ্রে তার কাজিন লিমার পুলিস চীফের সাথে কথা বলল, প্রায় কোন হৈ-চৈ ছাড়াই রানার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মেক্সিকান সানসেজের লাশ স্থানান্তর করা হলো মর্গে। সিনর মাদ্রে যে গল্পটা ব্যাখ্যা হিসেবে দিল, তাতে উল্লেখ করা হয়নি যে সানসেজ মিডোর কর্মচারী ছিল। ভাব দেখানো হলো ছিনতাইকারী বা ডাকাতের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে সে। পুলিসের লোকজন চলে যাবার পর দুপুরের দিকে পুলিস চীফ স্বয়ং ওর অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলেন। ইতোমধ্যে দোরগোড়া থেকে সমস্ত রক্ত মুছে ফেলেছে মার্ভেলা, খানিক পর পর এখনও সে কাঁদছে।

সময় বের করে নিয়ে জুরিখে ফোন করেছে রানা, মিডোর ডিরেক্টর ব্যারনেস লিনা, হেলেন জার্মান ও পাপিয়ার সাথে কথা বলেছে। ওদের সাথে কথা শেষ করে

যোগাযোগ করেছে মিডোর হেড অভ অপারেশনস, মেক্সিকো সিটির সাথে, সানসেজের সদ্য বিধবা স্ত্রীর সাথে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছে তাকে। মহিলা দু'ধরনের পেনশন পাবে। একটা মিডোর অফিশিয়াল পেনশন, আরেকটা রানার নিজস্ব ডিপার্টমেন্টের ফান্ড থেকে। মিডোয় ওর অধীনে যারা কাজ করে তাদের সবার বিপদে-আপদে আর্থিক সাহায্য যোগান দেয়ার জন্যেই এই ফান্ড কাজে লাগানো হয়। প্রিয় কাউকে হারানোর কি যে ব্যথা রানা উপলব্ধি করতে পারে, জানে টাকা দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। তবে এ-কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে টাকা জাগতিক বহু সমস্যার সমাধান এনে দেয়।

'দ্বিতীয়–না, প্রথম আঘাতটা সম্পর্কে কোথাও কোন রিপোর্ট করা হবে না,' লিমার পুলিস চীফ বললেন। 'আমার কাজিন মাদ্রে বিশেষভাবে আমাকে অনুরোধ করেছে, আমি তার কথা ফেলতে পারিনি।'

'সে আপনার কাজিন।'

'ঠিক তাই।' পুলিস চীফের চেহারা তাঁর পেশার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দেখে মনে হয় একজন ব্যাংকার বা স্টকব্রোকার। ধূসর রঙের ডাবল ব্রেস্টেড স্যুট, সাদা শার্ট, গাঢ় রঙের টাই পরেছেন তিনি। গত বিশ বছর ধরে তাঁর জুতো প্রতিদিন দু'বেলা পালিশ করা হয়, ট্রাউজারের ভাঁজ কখনও নষ্ট হয় না। মাথার চুল ধবধবে সাদা, সাদা গোঁফ ছোট করে ছাঁটা। 'আমার কাজিন আপনার সম্পর্কে বলেছে আমাকে, সিনর রানা,' বললেন তিনি। 'তার ভাষায় আপনি এখানে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। খুব খুশি হব আপনি যদি এই বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে একটা ব্যাখ্যা দেন।' ভদ্রলোকের ইংরেজী অত্যন্ত ভাল।

'আমি সেলস ডিপার্টমেন্টের হেড,' বলল রানা।

'অযথা সময় নষ্ট করার কি দরকার, সিনর রানা?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তাহলে বলি, আমি আপনারই মত একজন পুলিস অফিসার। আপনার কাজ সিভিল ক্রিমিনালদের ধরা, আমার কাজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রিমিনালদের ধরা।'

'চমৎকার, এই তো কি সুন্দর পারস্পরিক সমঝোতার পথে অগ্রসর হচ্ছি আমরা। দয়া করে আমাকে জানাবেন কি নিহত ভদ্রলোক কি উদ্দেশ্যে এই দেশে এসেছিলেন?'

'একটা নির্দিষ্ট কোম্পানীর স্টাফদের ওপর নজর রাখার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে এসেছিল সানসেজ।'

'ইউ.এম.পি?'

'হ্যাঁ।'

'অথচ আপনাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনারা আমাকে কিছুই জানাননি!' পুলিস চীফ বিস্মিত।

'প্রয়োজন বোধ করিনি, সেটা একটা কারণ,' বলল রানা। 'সময়ের অভাব আরেকটা কারণ। খুব তাড়াতাড়ি একটা ব্যাপার জানার ছিল আমার। তাছাড়া, এমন কিছু পদক্ষেপ আমাকে নিতে হয়েছে, যা আপনার পক্ষে নেয়া কঠিন হত।'

'যেমন আমার কাজিনকে অনুসরণ করা?'

'শুধু আপনার কাজিনকে নয়, দু'জন প্রোগ্রামার সহ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকেও অনুসরণ করা হচ্ছিল। তবে আমরা তাদের কারও কোন ক্ষতি করিনি।'

'তারমানে কি আমি ধরে নেব আপনি শপথ করে বলতে রাজি আছেন যে আপনারা বেআইনী কিছু করেননি?'

রোপণ করা মাইক্রোফোনগুলোর কথা ভাবল রানা। ব্যাপারটা খুব নাজুক। আড়ি পেতে কারও কথা শোনা কি বেআইনী? কোন সন্দেহ নেই ইউরোপ বা আমেরিকায় শুধু মাইক্রোফোন রোপণ করাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আবার এমন অনেক দেশও আছে যেখানে এটা আইনভঙ্গের আওতায় পড়ে না। 'আপনাদের আইন সম্পর্কে আমার চেয়ে ভাল জানে এমন কারও পরামর্শ দরকার আমার,' বলল রানা। 'একজন আইনজ্ঞের সাথে কথা না বলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন লিমার পুলিস চীফ। 'আপনাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি, সিনর মাসুদ রানা, এ-দেশের মাটিতে আপনার আপত্তিকর তৎপরতা এই মুহূর্তে বন্ধ করুন। আপনার যদি মনে হয় এ-দেশের কোন লোক কোন অপরাধ করেছে বা করতে যাচ্ছে, আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে আমার সাথে কথা বলুন। আমার অফিস আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। লিমায় একটাই মাত্র পুলিস ফোর্স রয়েছে, সিনর রানা, আর আমি সেই ফোর্সের চীফ। আমার শহরে প্রাইভেট কোন পুলিস ফোর্সের অস্তিত্ব আমি মেনে নিতে পারি না।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানাও, মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল।

'এবার, অন্য প্রসঙ্গে একটা কথা, সিনর রানা। বিউমাচার নামে এক লোক, একজন এঞ্জিনিয়ার, কাজ করত ইউনিয়ন কার্বাইডে, আজ সকালে রিমাক নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সে-ও তার ম্যানহুড হারিয়েছে। এবং ছুরি খেয়েছে পিঠে। সানসেজ আর বিউমাচার, দুটো হত্যাকাণ্ডের সাথে কোন সম্পর্ক নেই এ-কথা মেনে নিতে আমি রাজি নই। এবার বলুন, এ-সম্পর্কে কতটুকু কি জানেন আপনি, সিনর রানা?'

'আমি কিছুই জানি না, সিনর মাদ্রে,' অকপটে সত্যি কথা বলল রানা, ওর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার ছোঁয়া লক্ষ করে পুলিস চীফ তা বিশ্বাসও করলেন।

সেদিন বিকেলে মিডোর আলফায় চড়ে লিমা ত্যাগ করল রানা, গন্তব্য জুরিখ। এক এক করে তার সব লোক ফিরে গেল যে যার লোকাল অফিসে। ইউ.এম.পি-র স্টাফদের ওপর নজর রাখার কাজটা স্থগিত রাখা হলো আপাতত।

ক্যালে আরিকার চার্চে হাজির হলো জুয়েলা মাদ্রে। কনফেশন্যাল বক্সে ঢুকে ফাদারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল সে, বলল, 'আমি পাপ করেছি, ফাদার। দু'জন লোকের অঙ্গহানি ও মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেছি।'

দশ

লিমা থেকে মিডো হেডকোয়ার্টারে ফেরার পর ব্যারনেস লিনার সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলো রানার, তারপর পাপিয়া ওকে কমপিউটর রুমে নিয়ে এল। ব্যারনেস লিনা ইতোমধ্যে টেলিফোনের সাহায্যে সানসেজের বিধবা স্ত্রী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিল, কাজেই মহিলাকে মিডোর মেক্সিকো সিটি অফিসে ছোট একটা চাকরি দেয়ার প্রস্তাবটা রানার কাছ থেকে পেয়ে খুশিই হলো সে।

রানা আর পাপিয়ার জন্যে নিজের অফিসে অপেক্ষা করছিল হেলেন জার্মান। সাদা নাইলন ইউনিফর্ম পরে আছে সে, স্টাফ নার্স বা ডেন্টাল সার্জেনের মত লাগছে তাকে। একটু যেন নার্ভাসও মনে হলো, স্তূপ করা কমপিউটর প্রিন্টআউট নাড়াচাড়া করছে। টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসল পাপিয়া, হাতব্যাগ সাইজের একটা ইলেকট্রনিক শর্টহ্যান্ড রাইটিং মেশিন রয়েছে তার হাঁটুর ওপর।

আড়ষ্ট একটু হাসি নিয়ে মুখ তুলল হেলেন জার্মান, তাকাল রানার দিকে। 'কি জানি, আমি হয়তো অযথা আপনার সময় নষ্ট করছি, মি. রানা!'

'হাতে আমার প্রচুর সময়,' আশ্বস্ত করল রানা।

'এর হয়তো বিরাট তাৎপর্য থাকতে পারে, আবার হয়তো কিছুই নয়। দুর্বোধ্য কোডিং টেকনিক হওয়াও বিচিত্র নয়, কিংবা এমনও হতে পারে মেশিনটায় কোন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে...'

'প্রথমে শান্ত হও,' বলল রানা। 'তারপর যা জানো সব বলো আমাকে। বিচারের ভার ছেড়ে দাও আমার ওপর।'

কাউকে চাকরি দেয়ার সময় সে মেয়ে নাকি পুরুষ মিডো কর্তৃপক্ষ সেটা বিবেচনার মধ্যে রাখে না। এখানে শুধু যোগ্যতার দাম দেয়া হয়, যদিও পুরানো ধ্যান-ধারণা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। মিডোর মেয়েরাও মাঝেমধ্যেই হীনম্মন্যতায় ভোগে, ভয় পায় মেয়ে বলে না আবার তাদেরকে ছোট করে দেখা হয়।

'তুমি আমাকে বলছিলে,' শুরু করল পাপিয়া, হেলেন জার্মানের ইতস্তত ভাবটা কাটাতে সাহায্য করতে চাইছে সে, 'ডাটা বেস-এ কারিগরি ফলানো হয়ে থাকতে পারে—যদিও ডাটা বেস বলতে কি বোঝায় আমার ঠিক জানা নেই।'

'সবগুলো ডাটা বেস নয়,' বলল হেলেন জার্মান। 'শুধু যেটা অ্যাকাউন্টস ডিল করে। তাও সবগুলো অ্যাকাউন্ট নয়, মাত্র কয়েকটা।'

'নামগুলো আমি আন্দাজ করতে চেষ্টা করি?' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'ইংল্যান্ডের ইউনিক প্রিন্টিং, লিয়নের পিলমোর, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস?'

প্রতিটি নাম উচ্চারিত হবার পর মাথা ঝাঁকাল হেলেন জার্মান। 'তারমানে এর ভেতর কিছু একটা আছে?' জিজ্ঞেস করল সে, এবার রানার মাথা ঝাঁকানোর পালা। 'তারমানে আমি আপনার সময় নষ্ট করছি না?'

'মোটেও না। এবার বলো, অ্যাকাউন্টগুলোয় কিভাবে কারিগরি ফলানো হয়েছে?'

হেলেন জার্মানকে হতভম্ব দেখাল। সে জানে অ্যাকাউন্টগুলোয় গোলমাল করা হয়েছে, কিন্তু কিভাবে কাজটা করা হয়েছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। অ্যাকাউন্ট গোলমাল করার পিছনে কি কারণ, তাও তার মাথায় ঢুকছে না। উদাহরণ হিসেবে ইউনিক প্রিন্টিঙের প্রসঙ্গ তুলল সে। তার সামনে একটা কাগজ রয়েছে, রানাকে সেটা দেখাল। 'এটা স্রেফ একটা প্রিন্টআউট,' বলল সে। কাগজটা দশ ইঞ্চি লম্বা দশ ইঞ্চি চওড়া। 'এই কাগজে যত ইনফরমেশন দেখছেন তার সবই একটা ম্যাগনেটিক টেপে রেকর্ড করা আছে, সেটাই স্বাভাবিক।' কাগজের গায়ে টাইপরাইটার ক্যারেক্টর দিয়ে সাজানো অনেকগুলো লাইন ছড়িয়ে রয়েছে। 'প্রথম লাইনে,' পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করল সেটা, 'রয়েছে কোম্পানীর নাম, পোস্টাল অ্যাড্রেস ইত্যাদি। পরের লাইনে,' বলল হেলেন জার্মান, 'রয়েছে ইউনিকের সাথে আমাদের সমস্ত ট্র্যানজ্যাকশনের কোড রেফারেন্স। পরেরটায় বিশেষ বিলিং ইন্সট্রাকশনস।' মুখ তুলে রানার চেহারা লক্ষ করল সে। 'আপনি যদি কমপিউটরের ভাষা বোঝেন তাহলে,' হাসছে সে, 'বুঝতে পারবেন ইউনিক প্রিন্টিং প্রতি মাসের সাতাশ তারিখে মাসিক পেমেন্ট পেতে পছন্দ করে, যদি না সেদিনটা রোববার হয়। রোববার হলে পরদিন পেমেন্ট আশা করে তারা···অবশ্য এ-ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনাকে বিরক্ত না করলেও চলে···'

'মনে হচ্ছে যেন ঘোরের মধ্যে আছি,' স্বীকারোক্তি করল রানা। কমপিউটর ওর কাছে আলাদা একটা জগৎ, মানুষ সেখানে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে কোড আর সিম্বলের সাহায্যে।

'কাগজের বাকি অংশে ইউনিকের সাথে কিভাবে ডিল করা হবে সে-সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড ইন্সট্রাকশন রয়েছে। ওদের সাথে যে সব চুক্তি হয়েছে তার রেফারেন্স, ডেলিভারি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ, বিশেষ স্পেসিফিকেশন, সিকিউরিটি ইন্সট্রাকশন। উদাহরণ হিসেবে এই লেখাগুলো পড়ছি আমি–ইউনিক প্রিন্টিং মিডো সাউথ ওয়েলস-এর জন্যে ব্যালেন্স শীট ছেপেছে, এবং ছাপা শীটগুলো এক-দুই-তিন-চারজন বাদে আর কারও কাছে যাবে না। বাকি যে শীটগুলো থাকবে সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হবে। ওগুলো যে নষ্ট করা হয়েছে তার একটা সার্টিফিকেট তৈরি করা হবে, একটা কপির সাথে সার্টিফিকেটটা চলে যাবে মি. ভিক্টর মার্জিনের কাছে।'

'একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্যে নির্দিষ্ট ইন্সট্রাকশন থাকে, সেটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাগজের নিচের দিকে একটা লাইনের ওপর পেন্সিলের ডগা ঠেকাল হেলেন জার্মান। 'যে-কোন চুক্তি,' বলল সে, 'কমপিউটরকে দিয়ে পড়ানো হয়, এবং এখানে তার উল্লেখ থাকে। চুক্তি অনুসারে সমস্ত লেনদেন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডাটা বেসে থেকে যায় ওটা, তারপর আপনাআপনি চলে যায় আরেক ডাটা বেসে, স্রেফ রেকর্ড হিসেবে থাকার জন্যে।'

'আর পেমেন্ট?'

'পেমেন্ট করা হয় কমপিউটরের মাধ্যমে। প্রিন্টআউট মেশিনে স্পেশাল চেক

রোলস ঢোকানো হয়। এটা একটা ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি জব,' বলল হেলেন জার্মান, 'আর স্পেশাল চেকগুলোর রোলস সি পি এল গ্রেডের। এর মানে আপনি জানেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, ওগুলো শুধু সোরিন বাবি নিজে হাতে করে নিয়ে আসবে।'

'শুধু তাই নয়, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখবেন ওগুলো প্রিন্টআউট প্ল্যাটনে তোলা হলো। ছাপা হবার পর রোলসের যদি কোন অংশ থেকে যায়, সেটুকুও তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন।'

সংখ্যা লেখা পরবর্তী লাইনটা দেখাল রানা। 'ওগুলো কি?'

সামান্য একটু লালচে হলো হেলেন জার্মান, চট্ করে একবার তাকাল পাপিয়ার দিকে। 'ওটা, স্যার, আপনার ডিপার্টমেন্টের জন্যে–স্পেশাল সেলস ইনফরমেশন।' হেসে উঠল রানা। তার সাথে যোগ দিল পাপিয়া আর হেলেন জার্মান। তিনজনই ওরা বুঝতে পারল, ডিপার্টমেন্টটা রানার হলেও, কমপিউটরের ভাষা জানা না থাকায় প্রিন্টআউটে ছাপা তথ্যগুলোর মর্ম উদ্ধার করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

'আর এই শেষ লাইনটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এটা নিয়েই আপনার সাথে আলাপ করতে চেয়েছি, মি. রানা, স্যার,' হেলেন জার্মান হঠাৎ গম্ভীর হলো।

'পড়তে পারো, তাই না?'

'পড়তে পারি এই সেন্সে যে আমি ওটা ইন্টারপ্রেট করতে পারি, কিন্তু ওটার কি যে মানে, বা কি উদ্দেশ্য পূরণ করছে, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ওখানে ওটার থাকার কথা নয়। এক সেট ইনস্ট্রাকশন, সন্দেহ নেই। কমপিউটরকে একটা কিছু করতে বলছে...'

'কি...?'

'হেঁচকি তুলতে। একটা পাতা বাদ দিয়ে যেতে। শুনুন, প্রতিটি ইনভয়েস বা স্টেটমেন্ট, প্রতিটি পে-স্লিপ মাত্র একটা করে আলাদাভাবে ছাপা হয়। নির্দেশ অনুসারে যা যা দরকার সব ইনফরমেশন জড়ো করে কমপিউটর, তারপর ওটা যখন কাজ শুরু করার জন্যে তৈরি হয়, প্রিন্টআউট মেশিনকে নির্দেশ দেয় পরিষ্কার নতুন একটা কাগজের শীট নিয়ে আসার জন্যে, সেই কাগজে একটা ইনভয়েস বা একটা স্টেটমেন্ট ছাপে ওটা। অথবা, সি পি এল-এর ক্ষেত্রে, যখন ওটায় স্পেশাল চেক রোলস থাকে, তখন ওটা চেক লেখে এবং সই করে। কিন্তু এই লাইনের নির্দেশে কমপিউটরকে বলা হচ্ছে, একটা পাতা বাদ দিয়ে যাও।'

'ডাটা বেস থেকে ওই লাইনটা মুছে ফেলা যায়?'

'হ্যাঁ, খুব সহজেই। ম্যাগনেটিক ডিস্ক থেকে মুছে ফেলতে পারি আমরা, ঠিক যেভাবে একটা টেপ রেকর্ডার থেকে কণ্ঠস্বর মোছা হয়।'

'নির্দেশটা মুছে ফেলার পর কি ঘটবে?'

'কমপিউটর স্বাভাবিক আচরণ করবে।' ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল হেলেন জার্মান, পায়চারি শুরু করল। 'ওটাই তো আমার কাছে ফ্যানটাসটিক লাগছে,' বলল সে। 'এক লাইনের একটা নির্দেশ, ফলে একটা করে পাতা বাদ দিয়ে যাচ্ছে প্রিন্টআউট মেশিন।'

'অথচ তোমার কোন ধারণা নেই কে ওটা ওখানে ঢোকাল?'

'নেই।'

'কে পারে, কার দ্বারা সম্ভব?'

'যদি ধরে নিই এর একটা উদ্দেশ্য আছে এবং কেউ ইচ্ছে করে ওটা ওখানে ঢুকিয়েছে তাহলে আমার স্টাফদের সবাইকে সন্দেহ করতে হয়, তারা প্রসিডিওর সম্পর্কে জানে এবং বোঝে। আরেক হতে পারে, দুর্ঘটনাবশত ওখানে ঢুকে পড়েছে।'

'তা কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ, ভুল করে হতে পারে, তবে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। একটা মেয়ে টাইপরাইটার কী-বোর্ডে ইনফরমেশন পাঞ্চ করছে। তার মনোযোগ অন্য দিকে থাকায় অতিরিক্ত কয়েকটা ক্যারেক্টার ছাপা হয়ে গেল। সে যদি কোন কাগজে টাইপ করে তাহলে অতিরিক্ত ক্যারেক্টারগুলো দেখতে পাবে, সেক্ষেত্রে ঘষে সেগুলো মুছে ফেলবে সে, নয়তো কাগজটা ছিড়ে ফেলে আবার নতুন করে শুরু করবে। কিন্তু আমার মেয়েরা টাইপ করছে টেপে, ফলে সাথে সাথে ফলাফল দেখতে পাচ্ছে না। এ-ধরনের দুর্ঘটনাবশত একটা ইনস্ট্রাকশন ছাপা হয়ে গিয়ে থাকতে পারে–আপনি নিজেই বুঝে দেখুন, সম্ভাবনা কতটুকু।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, তবে কোন মন্তব্য করল না।

'টেপটা ভেরিফায়ারের মধ্যে দিয়ে যাবে,' বলে চলল হেলেন জার্মান, 'নির্দেশটা থাকায় একটা করে পাতা বাদ পড়বে। ফলাফল, কোথাও কোন ত্রুটি ধরা পড়বে না। আমার মতে, এ-ধরনের ভুল হবার সম্ভাবনা দশ লক্ষ বারের মধ্যে একবার।'

'তারমানে তুমি বিশ্বাস করতে রাজি নও যে ভুল করে নির্দেশটা ওখানে ঢুকে পড়েছে।'

আবার চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল হেলেন জার্মান।

'কি একটা কথা যেন তুমি আমাকে বলোনি,' হেলেন জার্মানের অস্থির ভাব লক্ষ করে আন্দাজ করল রানা।

পায়চারি থামাল হেলেন জার্মান, কপালের দু'পাশ থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'আপনি হয়তো ভাববেন, স্যার, আমি পাগল হয়ে গেছি। এবার আপনি হয়তো আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবার কথা ভাববেন। কাল রাতে, আমি, স্যার, ডাটা বেস থেকে ওই ক্যারেক্টারগুলো মুছে দিয়েছিলাম। আজ সকালে কাজে এসে প্রথমেই আমি ডাটা বেসটা আবার চালাই। বিশ্বাস করবেন, স্যার, ভৌতিক ক্যারেক্টারগুলো আবার ডাটা বেসে ফিরে এসেছে!'

তাড়াতাড়ি ডেস্কের কাছে ফিরে এল হেলেন জার্মান, প্রিন্টআউটটা তুলে নিল। 'এই লাইনটা, কমপিউটর অপারেশনের সমস্ত আইন অনুসারে, এখানে থাকার কোন অধিকার রাখে না। কাল রাতে আমি নিজে ওগুলো মুছে রেখে গেছি–নিজের হাতে। অথচ আজ সকালে আবার ওগুলো...'

হেলেন জার্মানের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, মেয়েটার আবেগ লক্ষ করে বিচলিত বোধ করছে। উত্তরটা সহজ। মোছার পর কেউ একজন আবার ওগুলো রেকর্ড করে রেখেছে। 'তারমানে রাতে কেউ ওগুলো আবার...?'

'সেজন্যেই তো গোটা ব্যাপারটা ভৌতিক লাগছে আমার কাছে,' বলল হেলেন জার্মান। 'প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার রেকর্ড করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না, স্যার। আবার ওগুলো ওখানে রাখতে হলে অর্থাৎ কোন ডাটা বেসে একটা মেসেজ রাখতে হলে আপনার একটা কোডার দরকার হবে। সেই কোডার একটা সিগন্যাল দেবে, যেটা ইনপুট কনসোলের মাধ্যমে যাবে। আমাদের কোডার রয়েছে কয়েকশো।' কাগজ-পত্রের স্তূপ একপাশে সরিয়ে টাইপরাইটারের মত দেখতে একটা কী-বোর্ড বের করল সে, ডেস্কের সাথে সংযুক্ত। 'এরকম আপনারও একটা আছে,' বলল সে, 'বা বলা চলে মিস পাপিয়ার আছে, আপনার বিশেষ ফোনকলগুলো করার জন্যে...কিন্তু,' এরপর প্রতিটি শব্দ বিরতি নিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, শব্দগুলোর ওপর জোর দেয়ার জন্যে, 'ইনপুট...কনসোল... রয়েছে...মাত্র...তিনটে। মাত্র তিনটে। এবং কাল রাতে তিনটেকেই আমরা অফ করে রেখেছিলাম।'

সবাই চুপ, তাকিয়ে আছে হেলান জার্মানের দিকে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটা।

আবার সে শুরু করল, 'অনেকদিন থেকে চাইছিলাম, অবশেষে কাল রাতে সিমেন্স ইনপুট কনসোল পেয়েছি আমি। কাল রাতেই ওগুলো বসানো হয়েছে। যাবার আগে দেখে গেছি পুরানো সবগুলো কনসোল অফ করে রাখা হয়েছে, দেখে গেছি এঞ্জিনিয়াররা নতুন কনসোলে কাজ করছে। আজ সকালে আমারই প্রথম নতুন কনসোল ব্যবহারের কথা। সকালে এলাম, এখানে এসে এঞ্জিনিয়াররা খবর দিল আমাকে, আমি কমপিউটর রুমে গেলাম, নিজে পরীক্ষা করলাম কনসোলগুলো। এঞ্জিনিয়াররা চলে যাবার পরপরই আমি কাল রাতে মুছে পরিষ্কার করা ডাটা বেসটা চালালাম। কি দেখলাম? ভৌতিক ক্যারেক্টারগুলো আবার ফিরে এসেছে।'

রানার শিরদাঁড়ার কাছে শিরশিরে একটা ভাব। পাপিয়ার চেহারাতেও অস্বস্তি। 'ভৌতিক ক্যারেক্টার?' নিজের অজান্তে হেলেন জার্মানের শব্দগুলোই প্রতিধ্বনির মত বেরিয়ে এল রানার গলা থেকে।

মাথা ঝাঁকাল হেলেন জার্মান। 'ভৌতিক নয় কোন্ অর্থে, বলুন? একটা কমপিউটর, কিছু ভুলে যেতে অস্বীকার করছে।'

মুহূর্তের জন্যে এমন একটা কমপিউটরের কথা কল্পনা করল রানা, সমস্ত নির্দেশ অমান্য করছে, কোন ইনফরমেশন বাতিল করছে না, কিছুই ভুলে যেতে রাজি হচ্ছে না...এমন একটা কমপিউটর, যে ওটাকে তৈরি করেছে তারই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে...শিউরে উঠল ও। তারপরই অবশ্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে বাতিল করে দিল, অকারণ দুঃস্বপ্ন দেখায় তিরস্কার করল নিজেকে। 'যুক্তিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য,' বলল ও।

'ডিটেকটিভ গল্প তো পড়েছেন, স্যার? বন্ধ একটা কামরা। কেউ একজন ভেতরে ঢুকে বেরিয়ে গেছে, পিছনে রেখে গেছে একটা মৃতদেহ। কাল রাতে ডাটা বেসটা ছিল বন্ধ একটা কামরা। সে কামরায় না কোন জানালা ছিল, না ছিল গোপন দরজা, ছাদটাও কোন ভাবে সরানোর উপায় ছিল না। কামরায় ছিল তিনটে "দরজা", মানে তিনটে ইনপুট কনসোল। দরজাগুলো ছিল বন্ধ, তালা মারা।' হেলেন

জার্মানের কণ্ঠস্বর চড়ছে। 'আমি নিজের হাতে ইনপুট কনসোলগুলো অকেজো করে দিয়েছি অর্থাৎ তালা লাগিয়ে দিয়েছি। অথচ তারপরও, রাতে কোন এক সময়, কেউ একজন ওই ডাটা বেসে ঢুকেছিল, রেখে গেছে একটা কলিং কার্ড। ইনস্ট্রাকশন সহ একটা লাইন, আমি পড়তে পারি, কিন্তু বুঝতে পারি না। এই উদ্ভট, অবাস্তব, অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা আমাকে, স্যার, পাগল করে তুলছে...'

রানা এবং হেলেন জার্মান দু'জনেই ওরা আবার ডেস্কে বসল। ধীরে ধীরে, শান্ত ভাবে, কমপিউটর অপারেশন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল মেয়েটা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হলেও, খানিক পরেই ঝিম ঝিম করতে শুরু করল রানার মাথা। কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওদের জন্যে কফি বানিয়ে আনল পাপিয়া, প্রতি এক ঘণ্টা পরপর। বেলা তিনটের সময় বেরিয়ে এসে ক্যান্টিন থেকে সামান্য কিছু মুখে দিল তিনজন, তারপর আবার ঢুকল কমপিউটর রুমে। পাঁচটা বাজল, তারপর ছ'টা, সাতটা। উঠে দাঁড়াল রানা, আঙুল চালাল মাথার চুলে। 'আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়!'

'আর তেমন কিছু বলার নেই-ও,' বলল হেলেন জার্মান, ম্যাগনেটিক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। এতক্ষণ ওটায় বড় বড় কাগজের শীট ঢুকিয়েছে, ব্যাখ্যা করেছে সিস্টেমস ডায়াগ্রামস, পাথস প্যারামিটার ইত্যাদি।

এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের সামনে দাঁড়াল রানা, কাগজগুলো নাড়চাড়া করল, বলল, 'আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে...'

এই সময় মৃদু নক হলো দরজায়। এগিয়ে গেল হেলেন জার্মান। দরজা খুলে কবাট সামান্য একটু ফাঁক করল সে। 'পরে তোমাকে ডাকব আমি,' দরজায় দাঁড়ানো ব্যক্তিটি যে-ই হোক, কামরার ভেতর থেকে তাকে ওরা দেখতে পেল না।

হেলেন জার্মান দরজা বন্ধ করার পর বোর্ডের দিক থেকে মুখ ফেরাল রানা। 'আবার কাল শুরু করা যাবে, কি বলো?'

'সমস্যাটার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বলল হেলেন জার্মান।

'তোমার একটা ডেট আছে বলে মনে হচ্ছে,' বলল রানা, তাকাল পাপিয়ার দিকে। 'বোধ হয় তোমারও?'

হঠাৎ এ-ধরনের একটা প্রশ্নের মুখে পড়ে লজ্জা পেল পাপিয়া। 'না। তবে আমার মাথা ধরেছে, খোলা মাঠে একটু হাঁটতে চাই আমি।'

রানা আর পাপিয়া মিডো হেডকোয়ার্টার থেকে একসাথে বেরিয়ে এল, সাঁঝের ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটতে ভালই লাগছে ওদের। বাঁক ঘুরল ওরা, কনসার্ট হলকে পাশ কাটাল, চলে এল লেকের ধারে। বড় করে শ্বাস টানল রানা, তাজা বাতাস টনিক হিসেবে কাজ করল মাথার ভেতর। মিডো থেকে বেরুবার পর প্রায় কোন কথাই হয়নি ওদের মধ্যে। পাঁচটায় অফিস ছুটির পর রাস্তায় যে ভিড় দেখা যায় তা এখন অনুপস্থিত, লেকের কাছাকাছি রাস্তাগুলোয় অল্প দু'একজন হাঁটা-চলা করছে। অবশ্য একটু পরই ভিড় বাড়বে, তাজা বাতাসের লোভে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে দম্পতিরা বেরিয়ে আসবে দলে দলে। ল্যান্ড করার আগে মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে একটা প্লেন, আলোগুলো পিট পিট করছে।

মিডোতে পাপিয়াকে রানাই নিয়ে এসেছে, যদিও মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়নি ওর। রানার প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধার ভাব রয়েছে পাপিয়ার আচরণে, ফলে দূরত্বটা এতদিনেও কমেনি এবং রানাও কখনও কমাতে চায়নি। 'ইচ্ছে করলে তুমি আমার সাথে কিছুক্ষণ থাকতে পারো,' তাকে বলল রানা। 'আমরা একসাথে রয়েছি, কারণ দু'জনই আমরা হাঁটাহাঁটি করতে চেয়েছিলাম।'

'মাসুদ ভাই,' হেসে উঠে বলল পাপিয়া, 'কোন ব্যাখ্যা দরকার হবে না।' যদিও তার হাসিটা আড়ষ্টই বলা চলে।

'বন্ধ একটা কামরা,' বলল রানা, হেলেন জার্মানের কথাটা মনে পড়ে গেছে। 'তিনটে দরজা–তিনটে তালা লাগানো দরজা।'

'হেলেনের কথাগুলো আমিও শুনেছি,' বলল পাপিয়া, লেকের কিনারা ঘেঁষে কংক্রিটের সরু পথ ধরে হাঁটছে ওরা। 'কথাটা আরেক ভাবে বলা যায়, তাই না? একটা কামরা, ভেতরে আলোর তিনটে সুইচ। প্রতিটি সুইচ অফ করে রাখা হয়েছে, অথচ অল্প সময়ের জন্যে কামরার ভেতর আলো জ্বলে উঠেছিল।'

একটা বেঞ্চে বসল ওরা। রানা একটা সিগারেট ধরাল, অন্যমনস্ক।

'আপনার খিদে পায়নি, মাসুদ ভাই?'

'কিছু বললে?' এত কাছে, তবু শুনতে পায়নি রানা।

আবার হেসে উঠল পাপিয়া। 'আপনি এখনও কমপিউটর জগতে রয়েছেন।'

রানা কোন জবাব দিল না।

খানিক পর পাপিয়া বলল, 'মাসুদ ভাই, কিছু যদি মনে না করেন, আপনার সাথে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে যাব আমি?'

এবার শুনতে ভুল করেনি রানা, এবং প্রায় চমকে উঠল। 'কেন?'

হাসি চেপে রাখল পাপিয়া। 'ভাবছি আপনার পার্সোনাল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বের পরিধি আজ খানিকটা বাড়িয়ে নেয়া উচিত কিনা। আপনার ফ্রিজে যদি কিছু থাকে তো যা হোক একটা কিছু রেঁধে দিয়ে আসতাম। আপনি জানেন, মাসুদ ভাই, আমি খুব ভাল রান্না করতে পারি?'

সেই মুহূর্তে মার্ভেলার কথা মনে পড়ে গেল রানার। সাথে সাথে জবাব দিল ও, 'না, পাপিয়া, তুমি কেন কষ্ট করতে যাবে।'

'আপনি শুধু শুধু আপত্তি করছেন। কি হবে গেলে?' জেদ ধরল পাপিয়া। 'রোজই তো হোটেলে খান, আজ না হয় আমার হাতের রান্না খেলেন। আমি যাব।'

বেঞ্চ ছেড়ে আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা, ফেরার পথে রানা কোন কথা বলল না। রাস্তায় উঠে এসে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল পাপিয়া, ড্রাইভারকে নিজের ঠিকানা দিল।

'তুমি না বললে আমার সাথে...?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল পাপিয়া। 'কখনও কখনও একা থাকতে ভাল লাগে, উচিতও। আপনার সেরকম একটা সময় যাচ্ছে, মাসুদ ভাই। আপনাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না আমার। আমাকে নামিয়ে দিয়ে আপনি চলে যাবেন।'

অন্যমনস্ক হলেও নিজের আচরণের জন্যে খানিকটা অপরাধবোধ জাগল রানার মনে। পাপিয়াকে আহত করেছে ও। কিন্তু তবু ক্ষতটা সারাবার জন্যে তাকে নিজের

অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। পাপিয়া সুন্দরী, পাপিয়া যুবতী, দু'জন খালি একটা অ্যাপার্টমেন্টে একসাথে হলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, পরে দু'জনেই হয়তো আরও বড় কোন অপরাধবোধে ভুগবে। না, দরকার নেই।

রানা পাল্টা কিছু না বললেও পাপিয়া টের পেল ভদ্রলোক স্বস্তিবোধ করছেন। ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হলো, নিভে গেল কার্টসি লাইট। ট্যাক্সি একশো গজের মত এগিয়েছে, এই সময় হঠাৎ করে রানা বলল, 'ব্যাপারটা লক্ষ করলে, পাপিয়া?'

'কি লক্ষ করব?'

'আরে আলোটা। দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে ওটাও নিভে গেল। আবার জ্বলবে দরজা খোলা হলে। বন্ধ কামরা সম্পর্কে কি বলছিলে তুমি, মনে আছে? হেলেনের বন্ধ দরজা সম্পর্কে? তিনটে দরজার বদলে উদাহরণ হিসেবে তুমি তিনটে আলোর সুইচ ব্যবহার করতে চাইছিলে। ওই দেখো, ওখানে একটা আলোর সুইচ রয়েছে...' দরজার ওপর ক্যাবের একটা পাশ হাত তুলে দেখাল পাপিয়াকে, ওখানে জলপাই আকারের একটা বালব ঝুলছে, পাশেই একটা সুইচ। 'কেউ ওই সুইচে হাত দিচ্ছে না অথচ আলো জ্বলে এবং নেভে।'

বাকি পথটুকু চুপচাপ বসে থাকল রানা। বিরক্ত করা হবে ভেবে এমনকি নড়াচড়াও করল না পাপিয়া। বস্, যাকে সে মাসুদ ভাই বলে, তার প্রতি শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, শ্রদ্ধাবোধও রয়েছে তার। আর কিছু নয়, শুধু রানার সান্নিধ্য পাওয়াই তার জন্যে অনেক বেশি। পাপিয়ার ধারণা, লোক চিনতে তার ভুল হয় না। মাসুদ রানার মত লোক জীবনে একবারই সত্যিকার অর্থে কাউকে ভালবাসতে পারে, এবং সে ভালবাসা ইতোমধ্যে কেউ না কেউ পেয়েছে, পরিণতি তার যাই হোক না কেন। এ-ব্যাপারে পাপিয়ার মনে এমনকি কোন কৌতূহল পর্যন্ত নেই। না, অবাস্তব স্বপ্ন দেখে না সে। মাসুদ ভাইয়ের সাথে এক বিছানায় রয়েছে সে, কিংবা মাসুদ ভাইয়ের গলা ধরে ঝুলে পড়েছে, এ-ধরনের দৃশ্য তার কল্পনায় কখনও আসে না। তবে লোকটার প্রতি তার দুর্বলতা আছে বটে। সে অন্য ধরনের দুর্বলতা। মাঝে মধ্যেই নীরব সঙ্গিনী হিসেবে সঙ্গ দিতে ইচ্ছে হয়, মনে হয় মাসুদ ভাইয়ের বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিতে পারলে কিংবা কিছু রান্না করে খাওয়াতে পারলে অদ্ভুত একটা শান্তি পেত সে। ব্যস, এইটুকুই, তার বেশি কিছু নয়।

পাপিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি চলে এল ট্যাক্সি, তার কজি একবার মাত্র ছুঁয়ে হাতটা সরিয়ে নিল রানা, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তুমি সত্যি খুব ভাল মেয়ে। এমন বোবা হয়ে আছ, অন্য কোন মেয়ে হলে রেগে আগুন হয়ে যেত।'

'আমি অন্য কোন মেয়ে নই,' বলল পাপিয়া।

'তা আমি জানি...'

পাপিয়াকে নামিয়ে দিল রানা, ড্রাইভারকে বলল আবার মিডো অফিসে ফিরে যাবে সে। পথে সারাক্ষণ হেলেন জার্মানের কাছ থেকে শোনা কমপিউটর অপারেশন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে অফিস বিল্ডিঙে ঢুকল ও। ওর অধিকারে যতগুলো আইডেনটিফিকেশন আছে তার সবগুলো লাগবে যদি কমপিউটর বেসমেন্টে নামতে চায় ও। কমপিউটর রূমের দরজার বাইরে থামানো হলো ওকে। রূমে ঢোকার বিশেষ পাসটা রয়ে গেছে ওর অফিসের সেফে। কমপিউটর রূমের

নাইট গার্ড ওকে চিনতে পরল। রানার কথা শুনে মাথা নাড়ল সে। একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'দুঃখিত, স্যার, মাফ করবেন। পাস ছাড়া আপনাকে ঢুকতে দিলে আমাকে চাকরি হারাতে হতে পারে। কাল সকালে আপনিই হয়তো আমার চাকরিটা নট্ করে দেবেন।'

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, ডাস্ট লকের মধ্যে দিয়ে কামরার ভেতর তাকিয়ে থাকল। জোড়া কমপিউটরের কনসোলগুলো দেখতে পাচ্ছে ও, দেখতে পাচ্ছে প্রিন্টআউট সেকশন, ইনপুট সেকশন–ডাটা বেসগুলো মেশিনে চড়ানো রয়েছে। তিনটে ইনপুট কনসোল-ও দেখতে পাচ্ছে, আগের দিন সন্ধ্যায় যেগুলো বদলানো হয়েছে।

'আজ রাতে কাজ হচ্ছে না,' গার্ডকে বলল ও।

'মিস জার্মান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, স্টাফদের ছুটি দিয়ে গেছেন,' বলল গার্ড। 'একা তো, পরিবেশটা ভৌতিক লাগছে, স্যার।'

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানারও তাই মনে হলো। এতগুলো মৌন কাঠামো আর আকৃতি, এক অর্থে সবগুলোর প্রাণ আছে, অন্তত সচল হয়ে উঠতে পারে, আর সচল অবস্থায় হজম করতে পারে কোটি কোটি ইনফরমেশন বাইট মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে, প্রায় একই দ্রুততার সাথে আবার একই পরিমাণ ইনফরমেশন বাইট উগরেও দিতে পারে।

'ভাগ্য ভাল যে পালাবদলের আগে মাত্র তিন ঘণ্টা এখানে থাকতে হবে আমাকে,' বলল নাইটগার্ড, কিন্তু তার কথায় কান নেই রানার। কমপিউটরের কনসোলে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। কাঁপতে শুরু করল সেগুলো। মাউন্টেড ডাটা বেসের একটা স্তরেও একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। কমপিউটর কনসোলের আলোগুলোর কাঁপা থামল, স্ট্যান্ডবাই পজিশনে ফিরে এল ঠিক যে-অবস্থায় কমপিউটরগুলোকে সব সময় রেখে যাওয়া হয়। গোটা ব্যাপারটা ঘটতে দু'সেকেন্ডেরও কম সময় লেগেছে, সরাসরি তাকিয়ে না থাকলে রানার চোখে ধরাই পড়ত না।

নাইটগার্ডের দিকে ফিরল রানা, হাসছে ও। 'ফোনটা কোথায়? নিশ্চয়ই তোমার সাথে একটা আছে?' জিজ্ঞেস করল ও। কোটের পকেট থেকে ছোট একটা রেডিও ফোন বের করল গার্ড। সেটা নিয়ে ডায়াল করল রানা।

পাপিয়ার গলা ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে।

'এখনও খাওনি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না। ভাবছি আবার বেরুব, নয়তো লিজাকে ফোন করে বলব চলে আসুক, নিজেরাই রান্না করি...কেন, মাসুদ ভাই?'

'এখনও আমাকে খাওয়াতে পারলে খুশি হও?'

এক মুহূর্ত কথা বলল না পাপিয়া। মাসুদ ভাই কি তার ওপর দয়া দেখাচ্ছেন? উনি কি ভেবেছেন ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়ায় অপমানবোধ করেছে ও?

আবার রানাই বলল, 'ভাবনার কিছু নেই, পাপিয়া। আমরা আর টেনশনে না ভুগলেও পারি। কিভাবে কাজটা করা হয়েছে আমি বুঝে ফেলেছি...'

এগারো

আবার সোমবারে কাজে এল না চার্লি ফ্রানসি। সে ছুটি নিলে তার বস্ কিছু মনে করে না। কারণ প্রায়ই চার্লি ফ্রানসি ওভারটাইম খাটে, তাছাড়া ইদানীং তার সেকশন তেমন একটা ব্যস্ত নয়। আরও একটা কারণ আছে। চার্লি ফ্রানসি যে প্রোগ্রাম তৈরি করে দিয়েছে, কাজের পরিমাণ তাতে আপনাআপনি কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। তার বস্ জানে, তাকে সরিয়ে দিয়ে চেয়ারটা দখল করারও কোন ইচ্ছে চার্লির নেই। কাজেই চার্লি ফ্রানসি অনুপস্থিত থাকলে মোটেই বেজার হয় না সে।

কাজে এসেই চার্লি ফ্রানসির খোঁজে টেলিফোন করল টিনা সিরিল, ইচ্ছে একসাথে কফি খাবে। যখন শুনল অসুস্থতাজনিত ছুটিতে আছে, সাথে সাথে তার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করল সে। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। ধেত্তেরি, লোকটা আবার পেটের অসুখে ভুগছে নাকি? বারমুডায় তো ভালই খাওয়াদাওয়া করেছে, বরং বলা চলে অতিভোজনই হয়ে গেছে। টিনা সিরিল ধরে নিল চার্লি ফ্রানসি আবার কোথাও মুখ লুকিয়েছে। বুঝল, দিন দুয়েক তার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে ওকে।

আসলে কি করছে চার্লি ফ্রানসি?

একের পর এক কয়েকটা ব্যাংকে ঢুকছে সে। প্রতিটি ব্যাংকে ঢুকে একই কাহিনী আওড়াচ্ছে। 'আমাদের কোম্পানী আশা করছে এই শহরে এসে ব্যবসা করবে। আপনাদের এখানে আমাদের অ্যাকাউন্ট করার কথা ভাবছি আমরা। আমরা ব্যবসা করি এমন একটা কোম্পানীর একটা চেক রয়েছে আমার কাছে, আমার পক্ষ থেকে ওটা ক্লিয়ার করে আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা রাখবেন, প্লীজ?' অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটা চেইন তৈরি করল সে, লিঙ্ক হিসেবে থাকল আলাদা এক একটা ব্যাংক, চেক লিখল বারমুডায় রেজিস্ট্রি করা প্রতিটি কোম্পানীর তরফ থেকে একটা করে। আসলে সে একই চেকের দশ হাজার ডলার এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে পাঠাচ্ছে মাত্র, প্রতিটি চেকে সই করছে টি. সিরিল। চেইনের প্রথম চেকটা সাউথ উইলিয়ামসবার্গ, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস-এর অ্যাকাউন্টস কমপিউটর থেকে এসেছে।

জুরিখে তার নিজের অফিসে বসে আছে হেনরি নামফি, চেহারায় দিশেহারা ভাব। ডেস্কের ওপর তার সামনে পড়ে রয়েছে মিডো লিয়ন অফিসের জিন করপোরেল-এর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টসের একটা কপি। আরও খানিক চিন্তা-ভাবনা করে কমপিউটারাইজড টেলিফোনটা তুলে নিল সে। ফোনের বেল যখন বাজল, জিন করপোরেল মিডোর লিয়ন অফিসে তার ডেস্কে বসে রয়েছে।

'হেনরি নামফি বলছি, জুরিখের অ্যাকাউন্টস স্ক্রুটিনি। তোমার সর্বশেষ এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট, জিন।'

'হ্যাঁ, বলুন, মি. নামফি। কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে?'

'পিলমোরের জাঁ পল রুঁদ। তাকে কমপিউটর অপারেশনস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে উল্লেখ করছ তুমি। এন্টারটেইনমেন্ট খাতে কিছু খরচ দেখিয়েছ। আমার স্মরণশক্তি যদি ভুল না করে, ওই পদে রয়েছে কেকারিয়া উইলিয়ামস। এর আগের একটা ভাউচারে তুমি দেখিয়েছ, দাঁড়াও, তারিখটা মনে করি···হ্যাঁ, সেপ্টেম্বরের সাতাশ তারিখে তাকে তুমি লাঞ্চ খাইয়েছ···'

'মি. নামফি, আপনার স্মরণশক্তি বোধহয় কমপিউটরকেও হার মানাবে। তবে দুঃখজনক হলো, আপনার তথ্য আপ-টু-ডেট নয়। কেকারিয়া উইলিয়ামস দিন কয়েক হলো রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে—সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে। আমি ভাবলাম ওদের নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিচিত হওয়া দরকার, কারণ ওরা আমাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে সফট-ওয়্যার কেনে···'

'ঠিকই করছ, জিন—তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি কোন প্রশ্ন করছি না। নামটা নতুন লাগল তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'ভারি দুঃখজনক ঘটনা, মি. নামফি। কেকারিয়া উইলিয়ামস সাইকেল থেকে পড়ে যায়, ব্রেক কেবলে তার গলা জড়িয়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে মারা যায় বেচারা।'

তথ্যটা টুকে রাখল হেনরি নামফি। 'ধন্যবাদ, জিন,' বলল সে। 'ভাল কথা, বেস থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কাজ করছ তুমি, তাই না? ভাউচার যা লিখেছ তার চেয়ে দৈনিক একশো ফ্রাঙ্ক বেশি পাওয়া উচিত তোমার। আমি বরং এটা ফেরত পাঠাই, তুমি অ্যাডজাস্ট করে দিয়ো, কেমন?'

'আপনার দয়া, মি. নামফি···'

'দয়া নয়, তোমার পাওনা, জিন···'

টেলিফোনের সুইচ অফ করে দিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল হেনরি নামফি, ওখানে পিকাসোর আঁকা ডন কুইক্সোট আর সাঙ্কো পাঞ্জা প্রিন্ট রয়েছে। সাধারণ কয়েকটা লাইন, অথচ সমস্ত কিছুই রয়েছে ওখানে—দু'জন আরোহীর ব্যক্তিত্ব, ঘোড়ার করুণ অবস্থা, পিছনে দৃশ্যমান উইন্ডমিল-এর দুর্দশা।

হেনরি নামফি উদ্বিগ্ন। মিডো হেডকোয়ার্টার জুরিখ কয়েকটা কোম্পানীর সাথে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। ওই কোম্পানীগুলোয় উত্তেজনাকর কিছু ঘটলে মিডো স্বভাবতই মাথা না ঘামিয়ে পারে না। কোম্পানীগুলোর কয়েকটি হলো—ইংল্যান্ডের ইউনিক প্রিন্টিং, লিয়নের পিলমোর, নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস, আর মিউনিকের কোহল। কোন সন্দেহ নেই, কোম্পানীগুলোতে ভয়ানক কিছু একটা ঘটছে। এই মুহূর্তে কয়েকটা সরলরেখা বলে মনে হচ্ছে, পিকাসোর প্রিন্টের মত, কিন্তু এগুলোর ভেতর গভীর তাৎপর্য না থেকেই পারে না। ওই কোম্পানীগুলোর অ্যাকাউন্ট যখনই ছাপছে তখনই হেঁচকি তুলছে কমপিউটর, কোহলের মেগ ফিলিপ নিখোঁজ, পিলমোরের কেকারিয়া উইলিয়ামস রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, লিমায় মি. মাসুদ রানাকে তদন্তে সাহায্য করার সময় খুন হয়েছে মেক্সিকান সানসেজ, ডেল্টা টিউবস-এর বব হপকিন্স বাড়িতে মেরামতের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে, পত্র-বোমার বিস্ফোরণে খুন হয়েছে ইউনিক প্রিন্টিঙের মাইকেল

ডিকসন।

হেলেন জার্মানের সাথে দেখা করতে এল হেনরি নামফি। কমপিউটর রূমে ঢুকতে ভারি ভাল লাগে তার। তাকে দেখে খুশি হলো হেলেন জার্মান। যাদের সাথে নিয়মিত মেলামেশা করে মেয়েটা, নামফি তাদের অন্যতম। কে জানে, অবশেষে হয়তো জীবনসঙ্গী হিসেবে হেনরিকেই বেছে নেবে সে। আর যাই হোক, স্বামী হিসেবে নিজেকে হীন বা ছোট ভাববে না হেনরি নামফি। হেলেন জার্মান যেমন তার মেধা আর বুদ্ধির স্বীকৃতি পেয়েছে, হেনরি নামফিও তার স্মরণশক্তির জন্যে মিডোর একটা গর্ব হিসেবে চিহ্নিত।

নিজের সন্দেহের কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল হেনরি নামফি। তার কথা শেষ হতেই ফোন তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করল হেলেন জার্মান, পাপিয়াকে বলল, 'কথাগুলো উনি একটু শুনবেন?'

ডেস্ক মাইক্রোফোনের সুইচ অন করল পাপিয়া, বলল, 'হ্যাঁ, আমরা শুনছি, হেলেন।'

চেয়ারে হেলান দিল মাসুদ রানা, পা তুলল ডেস্কের ওপর, কান খাড়া।

কি কি জানতে পেরেছে সব বলল হেনরি নামফি। ওদের সাথে ব্যবসা আছে এমন চারটে কোম্পানীর চারজন লোকের মধ্যে তিনজন মারা গেছে, বাকি একজন নিখোঁজ রয়েছে–তারা সবাই কমপিউটর অপারেশনের সাথে জড়িত ছিল।

হেনরি নামফির কথা শোনার পরপরই হেলেন জার্মানের সাথে কথা বলল রানা। সংক্ষিপ্ত, নির্দিষ্ট কয়েকটা নির্দেশ দেয়া হলো তাকে।

রানা থামতে হেলেন জার্মান বলল, 'ছাত্র হিসেবে আপনি দারুণ, মি. রানা, স্যার। সত্যি আপনি কমপিউটর অপারেশন বোঝেন।'

পাঁচটা টেলিফোন করল হেলেন জার্মান। তথ্য জমা করতে লাগল এক মিনিট, সেখান থেকে বাছাই করে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন বের করতে লাগল দুই মাইক্রোসেকেন্ড। ফোন করল রানাকে।

'আপনি যে ইনফরমেশন চেয়েছিলেন, যোগাড় হয়েছে, মি. রানা,' বলল সে। 'চার কোম্পানীর স্টাফ ফাইলে উঁকি দিতে হয়েছে। এক বছর আগে, ওরা চারজনই, অ্যামস্টারডামে একটা কমপিউটর সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছিল। ইউ.এম.পি. লিমার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ডিরেক্টর অভ কমপিউটর অপারেশন্স মিস জুয়েলা মাদ্রে।'

শুল্ক সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে ভিক্টর মার্জিনকে নিয়ে জাপানে গেছে ব্যারনেস লিনা। মার্ক টু মিডো আলফা নিয়ে গেছে ওরা। অপর আলফা নিয়ে ব্রাজিলের সান্টোস-এ গেছে ভিনসেন্ট গগল। সান্টোসে নিজের প্রাসাদোপম অট্টালিকা রয়েছে গগলের, তবে সেটায় নতুন অঙ্গসজ্জার কাজ শুরু হওয়ায় তার ব্যক্তিগত বন্ধুর বাগান-বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছে সে। প্রসঙ্গত রানা জানতে পেরেছে, গগলের ব্যক্তিগত বন্ধু স্বয়ং ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। টেলিফোনে তার সাথে যোগাযোগ করল রানা। 'গগল, লিমায় তোমাকে আমার দরকার।'

'আমি এখানে খুব ব্যস্ত, রানা। জেনারেলের সাথে কাল আমার জরুরী মীটিং।

আমাদের অনুকূলে ব্রাজিলিয়ান ল বদলাতে রাজি করাতে হবে তাঁকে। ধরে নাও প্রতিটি শব্দের পিছনে হাজার পাউন্ড করে খরচা পড়বে।'

'কাজটা পরে করলে হয় না, গগল? তোমাকে যদি লিমায় না পাই, গোটা একটা আলোচনা বৈঠকের জন্যে হাজার পাউন্ড খরচা করার সামর্থ্যও হয়তো আমাদের থাকবে না। তোমাকে আমার দরকার, কারণ পেরুর প্রেসিডেন্টের সাথে তোমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।'

গগল জানে, একান্ত প্রয়োজন না থাকলে এ-ধরনের অনুরোধ করার বান্দা মাসুদ রানা নয়। খানিক চিন্তা-ভাবনা করে সে বলল, 'ঠিক আছে। চার ঘণ্টার মধ্যে লিমায় পৌঁছুতে পারি আমি...'

'তাড়াহুড়ো কোরো না,' বলল রানা। 'আগামীকাল স্থানীয় সময় সাতটার আগে ওখানে আমি পৌঁছুতে পারছি না।' ওর কথা শুনছে, এবং সেই সাথে এরইমধ্যে কমপিউটরের বোতাম টিপে স্ক্রীনে বিশ্বব্যাপী কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্স শিডিউল ফুটিয়ে তুলেছে পাপিয়া, ব্যস্ততার সাথে কথা বলছে টেলিফোনে, অবশেষে ছোট্ট একটা কাগজ রাখল সে রানার সামনে। তাতে লেখা–আপনি লিমায় পৌঁছুবেন স্থানীয় সময় সাড়ে সাতটায়। রানা জানে, সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে ওকে লিমায় পাঠানোর জন্যে দুনিয়ার অর্ধেকটা ঘুরে যাবার ব্যবস্থা করেছে পাপিয়া। এরইমধ্যে একজন শোফারকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, ওর হাউজকীপার যে ব্যাগটা সব সময় তৈরি অবস্থায় রাখে সেটা আনার জন্যে। এই অফিস কামরা ত্যাগ করার আগে পাপিয়া ওকে একটা বডি-বেল্ট দেবে, তাতে থাকবে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার, এক হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক, আর ইংলিশ বিশ পাউন্ডের পঞ্চাশটা নোট। মিডোর কাজে যখনই রানা কোন কমার্শিয়াল প্লেনে চড়ে, ওর প্রাইভেসী রক্ষার জন্যে আশপাশের সব ক'টা সীট বুক করা হয়। যেখানেই কোন প্লেন থেকে নামে ও, দেখা যায় একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে স্থানীয় এজেন্টদের একজন। যতদূরেই যাক না কেন, জুরিখ আর ওর মাঝখানে একটা লাইন সব সময় খোলা রাখা হয়, লাইনের মাথায় ওর সাথে কথা বলার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা উপস্থিত থাকবে পাপিয়া।

এই মুহূর্তে আরও জটিল একটা প্লট বাড়িয়ে দিল পাপিয়া রানার দিকে। কাগজে লেখা রয়েছে–চার্টার টু কোপেনহেগেন। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ওয়ান-হানড্রেড টু লস অ্যাঞ্জেলস ইউজিং এ মিডো আলফা এয়ারক্রাফট। চার্টার দ্য সেম প্লেন টু টেক ইউ অন টু লিমা। মুখে বলল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হচ্ছেন, মাসুদ ভাই।'

আবার হেলেন জার্মানের সাথে ফোনে কথা বলল রানা। 'নিউ ইয়র্কের সেরা কমপিউটর টেকনিশিয়ানকে লিমার ক্রিলন হোটেলে চাই আমি, কাল সকালে অর সাথে ব্রেকফাস্ট করব।'

'ঠিক আছে, মি. রানা,' বলল হেলেন জার্মান। 'ইউ.এম.পি-র ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছেন, তাই না?'

রানাকে আরও ভাল করে চেনা থাকলে প্রশ্নটা সে করত না।

'লোকটার নাম কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চার্লি ফ্রানসি।'

চার্লি ফ্রানসি লিমার উদ্দেশে রওনা হবার আগে মিডোর জুরিখ কমপিউটর পঞ্চাশবার হেঁচকি তুলল। কমপিউটরে ছাপা চেকগুলোর সংখ্যা পড়ল সোরিন বাবি, কিন্তু হেঁচকি তোলা চেকগুলো কমপিউটর উল্লেখ করেনি, সেগুলো সেদিন সকাল দশটায় জুরিখের ক্লিয়ারিং ব্যাংকে জমা করা হলো। প্রতিটি চেকে 'স্পেশাল ক্লিয়ার‍্যান্স' লেখা রয়েছে। এই ব্যাংকই মিডোর বেশিরভাগ ফরেন ট্র্যানজ্যাকশন সামলায়। দুপুরের মধ্যে চেকগুলো ক্লিয়ার‍্যান্স পেয়ে গেল, চেকে উল্লেখ করা টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেসে খবরও পৌঁছে দেয়া হলো। সবগুলো টেলিগ্রাম নিউ ইয়র্কে পৌঁছুল ঠিক ব্যাংক খোলার মুহূর্তে। এক এক করে ব্যাংকগুলোয় ঢুকে টাকাগুলো তুলে নিল চার্লি ফ্রানসি। নিউ ইয়র্ক সময় বারোটার মধ্যে তার একটা সুটকেস পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে ভরে উঠল, প্রতিটি এক হাজার ডলারের নোট। ম্যানহাটন সিটি ব্যাংকে ঢুকল সে, খোঁজ নিয়ে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের ডেস্কের সামনে পৌঁছুল। মহিলার বয়স হবে পঞ্চান্ন, চোখে চকচক করছে সোনালি ফ্রেমের চশমা, চুলে হালকা সবুজ রঙ।

'আপনাদের ব্যাংকে আমি কিছু টাকা জমা রাখতে চাই, ম্যাডাম,' বলল চার্লি ফ্রানসি। ডিপোজিট স্লিপ নিয়ে সেটা পূরণ করল সে, বাড়িয়ে দিল ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল মহিলার। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকালেন তিনি। 'ঠাট্টা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'নাকি ডাকাতি?'

সুটকেসের ঢাকনি খুলল চার্লি ফ্রানসি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট চিৎকার করে উঠলেন।

সিকিউরিটি গার্ডকে আশ্বাস দিল চার্লি ফ্রানসি, টাকা রাখতে এসেছে সে, নিতে নয়। এক লাখ ডলার নিজের কাছে রাখল সে, নিরানব্বুইটা হাজার ডলারের নোট, বাকিটা বিশ পঞ্চাশ একশো ডলারের নোট। ব্যাংক তাকে নতুন নোট, লেটার অভ ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, কিংবা ট্রেজারি বন্ড দিতে চাইল। কিন্তু না, পুরানো নোট এবং নগদ টাকা ছাড়া কিছু নেবে না সে। টাকাটা কোত্থেকে এল সে-সম্পর্কে আভাসে প্রশ্ন করা হলেও শুনতে না পাবার ভান করে থাকল সে। একজন একজিকিউটিভ ভাইস-প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দিল, অবশ্যই চার্লি ফ্রানসির অগোচরে, এফ.বি.আই-কে একটা খবর দিলে হত। অপর একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলল, 'মাথা খারাপ! এত বড় একজন মক্কেল হারাতে চাও নাকি? শুধু কি তাই, ভদ্রলোক যদি মানহানির কেস করে বসেন?'

নোটগুলো জাল কিনা পরীক্ষা করা হলো। চুরি যাওয়া টাকার সংখ্যা ছাপা তালিকার সাথে মেলানো হলো। চার্লি ফ্রানসিকে দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ানোর পর তাকে আটকে রাখার আর কোন অজুহাত খুঁজে পাওয়া গেল না, কাজেই সসম্মানে বিদায় জানানো হলো। ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সোজা টি.ডব্লিউ.এ. অফিসে চলে এল চার্লি ফ্রানসি, একটা রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড টিকেট কিনল সে, ফার্স্ট ক্লাস। ব্যাগের দোকানে ঢুকে একটা ট্রাভেল কেস কিনল। কেসটা এত দামী, গত এক বছরে আর মাত্র একটা বিক্রি করতে পেরেছে দোকানদার। লোকটা বলল, 'স্যার, হ্যান্ডেলের নিচে আপনার নামটা এমবস করে দিই। নামটা যেন আভিজাত্য আর স্বাতন্ত্র্যের

প্রতীক, স্যার,–লী হার্ভে!'

চার্টার প্লেন যখন পৌঁছুল, লিমার পুলিস চীফ এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করছিলেন। একটা গাড়িতে চড়ে টারমাকে এলেন তিনি, প্লেনে চড়লেন। তাঁর বিচক্ষণ ড্রাইভার বুদ্ধি করে গাড়িটাকে খানিক চালিয়ে প্লেনের সামনে এনে দাঁড় করাল, জানালার কাচ তুলে দিয়ে আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরাল, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

প্লেনের ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের সব ক'টা সীট তুলে ফেলা হয়েছে, সেগুলোর বদলে জায়গা করে নিয়েছে ইজি চেয়ার, একটা সোফা আর দুটো টেবিল। লস অ্যাঞ্জেলসে প্লেনটাকে এভাবে তৈরি করতে এক ঘন্টা সময় লেগেছে।

'অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন?' মৃদু হাসির সাথে জিজ্ঞেস করল রানা, ক্ষীণ ব্যঙ্গের রেশ থাকলেও ধরা সহজ নয়।

নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন পুলিস চীফ।

'ডিউটিতে রয়েছেন? ইউনিফর্ম নেই দেখে ভাবলাম সৌজন্যের খাতিরে...'

পুলিস চীফ কিছু বলার আগেই ইন্টারকমে পাইলটের গলা ভেসে এল, 'আমি আপনার একটা কেবল্ রিসিভ করছি, মি. রানা।'

'কেউ একজন আনবে ওটা, প্লীজ?'

কন্ট্রোল রুমের দরজা খুলে গেল। নিক, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের ভি.আই.পি পার্সার, রুপোর একটা ট্রেতে করে একটুকরো কাগজ নিয়ে এল। কাগজটার দিকে এমনকি তাকালও না রানা, তবে পার্সারকে ধন্যবাদ দিল।

'পেরুতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি জানতে পারি, মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ।

'সাধারণত যে-কারণে আসি, সিনর মাদ্রে। বিজনেস অ্যান্ড প্লেজার।'

পুলিস চীফ তাঁর পকেট থেকে ছোট আকারের কালো একটা জিনিস বের করলেন–জিনিসটা আধ ইঞ্চি লম্বা, চওড়ায় এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ। 'গতবার আপনি লিমা ত্যাগ করার পর এটা আমরা পেয়েছি। জিনিসটা কি, আপনি জানেন, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনি এ-ও জানেন এটা কোথায় আমরা পেয়েছি, তাই না?'

'আন্দাজ করতে পারি,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'আপনি এ-ও কি জানেন কে এটা আমার কাজিনের হাতব্যাগে রেখেছিল?'

উঠে দাঁড়াল রানা, হেঁটে গেল এন্ট্রান্স ডোরের দিকে, দরজার পাশের পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল। পুলিস চীফ ঢোকার পর পর এন্ট্রান্স ডোরটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, এয়ারকন্ডিশনিঙের সুবিধে ষোলোআনা পাবার স্বার্থে। বাইরেটায় চোখ বুলিয়ে রানা বুঝল, আজ খুব গরম পড়েছে। ঘুরল ও, প্লেনের গায়ে হেলান দিল, বলল, 'ইচ্ছে করলে আমরা ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে পারি, সিনর মাদ্রে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে, অন্তত আমি তাই বিশ্বাস করি। মাইক্রোফোনটা আমার কোন লোকের মাধ্যমে আমার নির্দেশে আপনার কাজিনের ব্যাগে রাখা হয়েছিল, এটা আপনি আমাকে দিয়ে স্বীকার করাতে পারবেন না।'

পুলিস চীফের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটল। তিনিও একজন সভ্য মানুষ। 'ঠিক আছে, সিনর রানা। প্রশ্নের ধারা বদলানো যাক। আপনি আমাকে সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। লিমায় আপনি ফিরে এলেন কেন?'

'খুব সহজ উত্তর। সন্দেহ করছি আমাদের কোম্পানী থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে।'

'সত্যিই কি কোন টাকা চুরি গেছে?'

'তা যায়নি, তবে অন্যায়ভাবে সরানো হয়েছে। এই মুহূর্তে টাকাগুলো কোথায় তা আমরা জানি, ইচ্ছে করলেই ফেরত পেতে পারি। এখানে আমার আসার উদ্দেশ্য, টাকাগুলো ফেরত পাওয়া এবং দেখা আর যেন কোন টাকা সরানো না হয়।'

'এবং আপনি আমার কাজিনকে সন্দেহ করেন?'

'এখানেই আমাদের দহরম-মহরমের সমাপ্তি, সিনর মাদ্রে। আমি কাকে সন্দেহ করি সেটা কাউকে জানাবার বিষয় নয়...'

'কারণ যেহেতু সে একজন মাদ্রে? কারণ আপনি মনে করেন একজন মাদ্রেকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে প্রভাব খাটাব আমি? আমি, লিমার চীফ কনস্টেবল, একজন আত্মীয়ার জন্যে আমার পেশাগত মর্যাদা বিসর্জন দেব?' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, আহত কিন্তু উত্তেজিত নন।

'পেশাগত মর্যাদা, পারিবারিক মর্যাদা, সঙ্কটের সময় কোনটার কতটুকু গুরুত্ব কে বলতে পারে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'দুটোর মধ্যে একটা বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত যাকে নিতে হয় তার ওপর দিয়ে নরক যন্ত্রণা বয়ে যায়। আমি আপনাকে সেই কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চাই না, সিনর মাদ্রে।'

'আমার সম্মান রক্ষার স্বার্থে?'

'না, আমাদের টাকার নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে।'

'আমার শহরে আমি কোন গুপ্ত পুলিসী তৎপরতা চালাতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু আপনি আমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন।'

এবার পুলিস চীফের ব্যক্তিগত মর্যাদায় আঘাত লাগল। 'আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব?' গর্জে উঠলেন তিনি। 'নিজেকে আপনি কি মনে করেন? জানেন...!'

তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'কয়েকটা কথা আপনার কানে থাকা দরকার, সিনর মাদ্রে। আমার কোম্পানী আপনার দেশে কয়েকশো মিলিয়ন পাউন্ড ইনভেস্ট করেছে। সেই ইনভেস্টমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অধিকার আমরা সংরক্ষণ করি।'

'সে অধিকার আমি অস্বীকার করছি না। কোথায় কি অপরাধ ঘটেছে আমাকে জানান, সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। কথা দিচ্ছি কোন রকম দুর্নীতি হবে না, স্বজনপ্রীতির অবকাশ থাকবে না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'প্রয়োজনীয় এভিডেন্স আমার হাতে আসুক, তখন আপনার কাছে গিয়ে আইনের সাহায্য চাওয়া যাবে। তখন আপনি আমাকে দেখাবার সুযোগ পাবেন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে সুবিচার নিশ্চিত করার মহত্ত্ব আপনার সত্যিই আছে। তার আগে পর্যন্ত...'

ইতোমধ্যে দরজার কাছে পৌঁছে গেছেন পুলিস চীফ। 'দরজা খুলে দেয়া হোক,' প্লেনের ভেতর গমগম করে উঠল তাঁর বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর। 'প্লেনটা যাতে আপনাকে নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে এই দেশ ত্যাগ করে তার ব্যবস্থা আমি করছি।'

অসহায়ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস ত্যাগ করল রানা, এগিয়ে গিয়ে পুলিস চীফের হাতে গুঁজে দিল টেলিগ্রামটা। ঠিকানার জায়গায় লেখা রয়েছে–টু হুম ইট মে কনসার্ন। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন মেসেজ পেপারের ওপর ক্যাপটেন গোটা গোটা অক্ষরে মেসেজটা লিখেছে। মেসেজটা হুবহু এরকম:

'টু হুম সো এভার ইট মে কনসার্ন। প্লীজ অ্যাওয়ার্ড ফুল কার্টেসি অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স টু মাই গুড ফ্রেন্ডস ভিনসেন্ট গগল অ্যান্ড শেভ্যালিয়ার মাসুদ রানা, ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন লিমা অ্যাজ মাই পার্সোনাল গেস্ট, ফর দি অনার অভ আওয়ার কান্ট্রি।'

মেসেজের নিচে প্রেসিডেন্টের নাম।

রানার জানা আছে, বছর দুই আগে মিডো ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিঙের পঞ্চাশ হাজার শেয়ার সার্টিফিকেট কিনেছেন প্রেসিডেন্ট, অবসর গ্রহণের পর আর্থিক সহায়তা পাবার আশায়। জানা কথা, শেয়ার কেনার পরামর্শটা ভিনসেন্ট গগলের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। তার কথা তিনি যে ফেলতে পারেন না, আজ আরেকবার সেটা প্রমাণিত হলো।

ডকুমেন্টটা দ্বিতীয়বার পড়লেন পুলিস চীফ। 'আমার ফাইলে রাখার জন্যে এর একটা কপি দেবেন আমাকে, সিনর রানা?'

'অরিজিন্যালটাই রেখে দিন,' বলল রানা। 'আমাদের সবারই দরকার হতে পারে।'

ক্রিলনে ব্রেকফাস্টের জন্যে মিলিত হলো ওরা, দু'জনই পরস্পরকে খুঁটিয়ে দেখে নিল। চার্লি ফ্রানসির মধ্যে ধোপদুরস্ত একটা ভাব দেখতে পেল রানা, রানার শান্ত মায়াভরা চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লক্ষ করল চার্লি ফ্রানসি। চোখ বুলানোর মুহূর্তেই উপলব্ধি করল রানা তার সামনে দৃঢ়চেতা এক তরুণ বসে রয়েছে। আর চার্লি ফ্রানসি বুঝতে পারল, মাসুদ রানাকে ছোট করে দেখলে পস্তাতে হবে।

'কামরাটা ভাল?' পরিচয় পর্ব শেষ হতে জিজ্ঞেস করল রানা, ইতোমধ্যে ব্রেকফাস্টের জন্যে অর্ডার দেয়া হয়েছে।

'খুব ভাল। আমাকে একটা স্যুইট দেয়া হয়েছে। আমার গ্রেড বি-এস-থ্রী, সাধারণত ফার্স্ট ক্লাস ফ্লাইট বা স্যুইট দেয়া হয় না...'

'আমার জুরিখ অফিস তোমাকে একটা এ-এস-ওয়ান অথোরাইজেশন দেবে,' বলল রানা।

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চার্লি ফ্রানসির চেহারা। 'টেকনিক্যাল সেলসের সবাই মনে করবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসাইনমেন্ট, মি. রানা। আমি তো স্রেফ একজন কমপিউটর টেকনিশিয়ান...'

সরাসরি তার দিকে তাকাল রানা। 'স্রেফ একজন কমিপউটর টেকনিশিয়ান, ফ্রানসি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। 'যে ব্লেজারটা পরে আছ সেটার দাম দেড়শো ডলার,

ইংল্যান্ড থেকে আমদানী করা জুতোটার দাম ষাট ডলার, হাতে রোলেক্স ঘড়ি। হতে পারো তুমি একজন কমপিউটর টেকনিশিয়ান, কিন্তু শুধু বা স্রেফ একজন কমপিউটর টেকনিশিয়ান নও।'

চার্লি ফ্রানসি তার মুখে হাসিটুকু ধরে রাখল। যা ভেবেছে তাই, লোকটাকে ছোট করে দেখার কোন উপায় নেই। 'ভাগ্য ভাল, এক জায়গায় কিছু ইনভেস্ট করে ভাল লাভ পেয়েছি।'

হাত তুলে তাকে থামাল রানা। 'ভুল বুঝো না, ফ্রানসি। তোমার আয়ের উৎস কি তা আমি জানতে চাইছি না। আমি শুধু বলতে চাইছি নিজেকে "শুধু" বা "স্রেফ" মনে করাটা ঠিক নয়। তোমার পেশা বা পদ যাই হোক, সেটা সম্পর্কে তোমার মধ্যে গর্বের অভাব থাকবে কেন…?'

'কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাব, মি. রানা।'

হাসল রানা। 'সে অভাব যে তোমার নেই, বেশ বোঝা যায়,' বলল ও। 'এই অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?'

'কিছুই জানি না, মি. রানা। জুরিখ অফিস থেকে ফোন করে মিস জার্মান এখানে আসতে বলল আমাকে। হাতে প্লেনের টিকেট দেয়া হলো, একটা গাড়ি পৌঁছে দিল এয়ারপোর্টে, আরেকটা গাড়ি পৌঁছে দিল হোটেলে, এই মুহূর্তে স্যুইটে আপনার সামনে বসে বিস্মিত আর মুগ্ধ হচ্ছি।'

'তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি জন্মসূত্রে ব্রিটিশ।'

'স্কটিশ।'

'এখনও পার্থক্য করো?'

'কমপিউটর ট্রেনিং নেয়ার সময় প্রতিটি জিনিস আলাদাভাবে সনাক্ত করতে শিখেছি আমি।'

'জন্মস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইছি এই জন্যে যে আমি হয়তো তোমাকে নির্দিষ্ট কয়েকটা ঝুঁকি নিতে বলতে পারি–তোমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে প্রশ্ন তৈরি করতে সুবিধে হবে।'

'কমপিউটর অপারেশনে সাধারণত কোন ঝুঁকির ব্যাপার তো থাকে না, মি. রানা।'

'তা ঠিক। এবার তাহলে সমস্যাটা তোমাকে বলা দরকার। কেউ একজন, তার পরিচয় আমাদের জানা নেই, আমাদের কমপিউটর অপারেশনে এমন কারিগরি ফলিয়েছে যাতে ডাটা বেসকে দুই সেট ইনফরমেশন রাখতে বলা যায়…'

'এক ধরনের কার্ডের মত–দিনের আলোয় এক লেখা পড়া যাবে, কৃত্রিম আলোয় বা ইনফ্রা-রেডে আরেক লেখা?'

'হ্যাঁ। আমরা ইতিমধ্যে পাঁচটা সেন্টার আবিষ্কার করেছি, তার মধ্যে একটা লিমায়। আমাকে সাহায্য করার জন্যে ছোট একটা দল কাজ করছে। তোমাকে আমার হাতের কাছে দরকার কারণ জরুরী কোন সঙ্কটের সময় কমপিউটর সম্পর্কে আমার জ্ঞান যথেষ্ট বিবেচিত না-ও হতে পারে।'

'আপনি ঝুঁকির কথা বলছিলেন…'

'বাকি চারটে সেন্টারে, কমপিউটর অপারেশনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত

চারজন লোক, হঠাৎ করে মারা গেছে। কেউ কেউ শুধু মারা যায়নি, খুন হয়েছে। দেয়ার ইট ইজ, কার্ডস অন দ্য টেবল।'

'আপনি আমাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে বলছেন?'

'এখুনি বলছি না। তবে এমন সময় আসতে পারে…'

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল চার্লি ফ্রানসি। 'ইন্টারনাল স্টাফ ফাইলে, মি. রানা, বলা হয়েছে আপনি টেকনিক্যাল সেলসের ডিরেক্টর।'

'হ্যাঁ।'

'কার্ডস অন দ্য টেবল, মি. রানা?'

'জাস্ট দ্য হ্যান্ড উই আর প্লেইং, ফ্রানসি, নট দ্য এন্টায়ার ডেক। নট ইয়েট।'

'ড্র পোকার আমার প্রিয় খেলা নয়, মি. রানা,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

জুরিখ ডাটা বেস সম্পর্কে হেলেন জার্মান কি আবিষ্কার করেছে চার্লি ফ্রানসিকে জানাল রানা। ভৌতিক ক্যারেক্টারগুলোর কথাও বলল। তবে ক্যারেক্টারগুলো কিভাবে ম্যাগনেটিক ডিস্কে রাখা হয়েছে সে-ব্যাপারে মুখ খুলল না। 'আমি চাই ইউ. এম. পি. কমপিউটর নিয়ে মাথা ঘামাও তুমি,' বলল ও। 'ওদের প্রতিটি ডিস্ক চেক করে দেখো। তোমাকে দেখতে হবে জুরিখে যা ঘটছে এখানেও সেরকম কিছু ঘটছে কিনা।'

ব্রেকফাস্টের পর দু'জন দু'দিকে চলে গেল। পরিচয়-পত্র নিয়ে ইউ. এম. পি-তে গেল চার্লি ফ্রানসি, আর রানা গেল গগলের সাথে কথা বলতে।

কোম্পানীর গাড়িতে চড়ে ইউ. এম. পি-তে যাচ্ছে চার্লি ফ্রানসি, তার মাথার ভেতর ঝড় বইছে। কি ভাগ্য, এত থাকতে অ্যাসাইনমেন্টটার জন্যে তাকেই বেছে নিয়েছে মাসুদ রানা। নাকি ভাগ্য নয়, মাসুদ রানার তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির প্রমাণ? নিউ ইয়র্কে টিনা সিরিল যখন তাকে বেছে নিয়েছিল, ব্যাপারটাকে সে সৌভাগ্য বলে মনে করেছিল। এখানেও প্রশ্ন আছে—টিনা সিরিলকে বোকার মত খেলিয়েছে সে, নাকি উল্টোটা সত্যি? এমন নয় তো যে সরলতার ভান করে তার সাথে বারমুডায় গিয়েছিল টিনা সিরিল, সেখানে যা যা ঘটেছে সব রিপোর্ট করেছে জুরিখে তার বসের কাছে? মাসুদ রানা কি তার বস্? বোঝাই যাচ্ছে, সিকিউরিটির খুব বড়সড় চাকা এই মাসুদ রানা, কিন্তু কতটুকু কি জানে ও, কতটুকু? টু-ওয়ে ডাটা বেস সম্পর্কে জানে, কিন্তু কথা শুনে মনে হলো না এর পুরোটা তাৎপর্য ধরতে পেরেছে। অনেক কিছুই ও জানে না এখনও, যেমন—নিউ ইয়র্ক কমপিউটরে এমন কৌশল করেছে সে যে প্রতিদিন ওটা যখন জুরিখ হেডকোয়ার্টারে রাত্রিকালীন খোরাক যোগান দিতে শুরু করে তখন টু-ওয়ে ডাটা বেসটা রি-চেক করে নেয়। টু-ওয়ে ডাটা বেসের উদ্দেশ্য কি জুরিখ তা এখনও জানে বলে মনে হয় না।

আসলে কতটুকু জানে মাসুদ রানা? খুনগুলোর একটার সাথে আরেকটার সম্পর্ক আছে, এটা আবিষ্কার করেছে ও, কিন্তু ওগুলোর সাথে চার্লি ফ্রানসিকে জড়াতে পারেনি। নাকি পেরেছে? তুমি, মাসুদ রানা, কি তোমার পরিচয়, কতটুকু বুদ্ধি রাখো তুমি? অ্যাসাইনমেন্টটার জন্যে আমাকে কেন বেছে নিলে? স্মার্টনেস, নাকি কোইন্সিডেন্স?

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। চার্লি ফ্রানসির আর বেশিদিন বাঁচা চলবে না। জুয়েলা মাদ্রেকে খুন করার প্ল্যানটা তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপ দিতে হবে, আর তারপর পরলোক থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে লী হার্ডেকে।

অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে মিলিত হলো ওরা। ওদেরকে দেখে খুশি হলো মার্ভেলা, তবে অনুভূতিটা গোপন রাখার জন্যে চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপতে দিল না।

কমপিউটর স্কীম সম্পর্কে যতটুকু জানে সংক্ষেপে গগলকে বলল রানা। টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার ভাল বোঝে না গগল, তবে সাধারণ একটা ধারণা পেয়ে গেল। 'কেউ একজন মিডোর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নিচ্ছে, এই তো?'

'হ্যাঁ। করার মধ্যে এইটুকু করেছে যে টাকাগুলো দুনিয়ার বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নিয়ে গেছে। খুব বড় অঙ্কের কিছু না। তবে আমরা জেনে ফেলেছি, সিকিউরিটির ব্যবস্থাও করা হয়েছে যাতে পদ্ধতিটা কাজ না করে। এখন থেকে প্রতিটি ইনভয়েস দু'বার করে চেক করা হচ্ছে, কমপিউটর যদি কোন গোলমাল করে...'

'তবে তোমার ধারণা বড় ধরনের চুরির এটা আসলে প্রাথমিক পর্যায়?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কেউ একজন চাইছে আমাদের কোম্পানীর যা কিছু আছে সব টেনে নেবে–দেখে মনে হবে তরল সম্পদ নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'মাই গড!'

'হ্যাঁ, মাই গড!'

'তোমার কোন ধারণা নেই কে, কেন, কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল গগল।

'আইডিয়া আছে কিভাবে, আর কিছু জানি না। আমার বিশ্বাস, আমাদের সমস্ত কমপিউটর অপারেশনে এমন কৌশল করা হয়েছে যে মি. এক্স তৈরি হয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেই আমাদের সব কিছু হাতিয়ে নিতে পারবে। কি করেছে যখন জানতে পারব, সে তার ফেলে যাওয়া সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলবে ততক্ষণে–প্রমাণ করতে পারব না সে আমাদের টাকা চুরি করেছে।'

'লিমা প্রসঙ্গ। তোমার ধারণা জুয়েলা মাদ্রে এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, গগল। এটা স্রেফ আমার একটা সন্দেহ, কাজেই কোন সিদ্ধান্তে এসো না। তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে, আমরা পাঁচটা অ্যাকাউন্ট আবিষ্কার করেছি, যেখানে সরানো হয়েছে টাকাগুলো? ওই পাঁচটা অ্যাকাউন্টের একটা লিমায়...'

'তা আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম...'

'বাকি চারটের সাথে জড়িত চারজন লোক হয় মারা গেছে, নয়তো নিখোঁজ...'

'রয়ে গেল শুধু মিস জুয়েলা মাদ্রে।'

'হ্যাঁ। আরেকজনের কথা ধরতে পারো। মেগ ফিলিপ, মিউনিকের জার্মান লোকটা, তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার ফাইল পড়েছি আমি, এত বড় পরিকল্পনা তার মাথায় খেলবে না। নিস্তেজ এক লোক, নির্বিরোধী, সাধারণ কমপিউটর অপারেটর, তার বেশি কিছু না।'

'কিন্তু সে নিখোঁজ, আর মিস জুয়েলা বহাল তবিয়তে…'
'জুয়েলা মাদ্রেকে প্রতিভা বলা যেতে পারে, এ-ধরনের স্কীম তৈরি করা তার দ্বারা সম্ভব।'
মাথা নাড়ল গগল। 'মেলে না, রানা,' বলল সে। 'কেন সে এটা করতে যাবে? একজন মাদ্রে হিসেবে অগাধ ধন-সম্পদের মালিক সে। পারিবারিক সম্মান, সামাজিক প্রভাব, কিসের তার অভাব? কোন্ যুক্তিতে তাকে তুমি চোর বলো? আর খুনী…দূর!'
'লোভ ক্যানসার, গগল। সমস্ত পাপের মধ্যে ভয়ঙ্করতম।'
'লোভ কোন আবেগ নয়, রানা। প্রেম, ঘৃণা, ভয়, ঈর্ষা–হ্যাঁ, এসব কারণে একজন মাদ্রে খুন করতে পারে, কিন্তু লোভের কারণে…উঁহুঁ।'
'মেয়েটা যদি মাদ্রে না হত, গগল?'
'যার কোনদিনই খুব বেশি কিছু ছিল না তার ভেতর লোভ বাড়তে বাড়তে একটা অবসেশন হয়ে উঠতে পারে, ইচ্ছে করলে সেটাকে তুমি প্যাশন্ বলতে পারো। কিন্তু মাদ্রে পরিবার খুবই সম্ভ্রান্ত এবং প্রাচীন…'
'আর তাদের কুয়ার ভেতর কোন কঙ্কাল নেই…?'
'হ্যাঁ, আছে বৈকি, কিন্তু সে-সবের পিছনে আসল কারণ মহৎ আবেগ, নগ্ন লোভ নয়।'

বারো

মার্সেডিজ নিয়ে একজন শোফার এসে কাল দিয়ে গেছে আমন্ত্রণলিপিটি। তাতে লেখা: 'ভিনসেন্ট গগল অত্যন্ত প্রীত হবেন সিনোরিটা জুয়েলা মাদ্রে যদি আগামী বুধবার দুপুরে গ্র্যান্ড ফাইভ স্টার হোটেলে তাঁর সাথে লাঞ্চ খেতে সম্মত হন।'
সাথে সাথে কাজিন, লিমার পুলিস চীফকে টেলিফোন করল জুয়েলা মাদ্রে। 'কে এই ভিনসেন্ট গগল…?'
'…প্রেসিডেন্টের একজন সম্মানিত অতিথি।'
'তিনি কোন কাজ করেন?'
'মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের একজন ডিরেক্টর।'
সামাজিক খবরাখবর সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য একটা উৎস আছে জুয়েলা মাদ্রের, লুসিয়ানা ফেরেল। তার সাথে ফোনে আধ ঘণ্টা আলাপে জানা গেল, ভিনসেন্ট গগল সুপুরুষ এবং সুদর্শন, খুব সম্ভব এখনও সে বিয়ে করেনি, তার সম্পদের সঠিক হিসাব সে নিজেও জানে না, প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ব্যবসায়িক পার্টনার, যদিও তার অতীত সম্পর্কে কেউ তেমন পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে পারে না।
সব শুনে লুসিয়ানাকে খবরটা দিল জুয়েলা মাদ্রে, গ্র্যান্ড হোটেলে তাকে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভিনসেন্ট গগল।
'কে জানে, এতদিনে হয়তো প্রেমের দেবতা মুখ তুলে চাইল,' কৌতুক করে

বলল লুসিয়ানা। 'তুমি এমন একটা ভার্জিন···যতবারই দেখি তোমাকে, ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে এই কথা ভেবে যে ঈশ্বর আমাকে পুরুষ না করে মেয়ে করে কেন পাঠাল দুনিয়ায়!'

খুব সাবধানে সাজল জুয়েলা মাদ্রে। সাধারণ একটা বালমেইন পোশাক পরল সে, এটা আগে কখনও পরার সুযোগ হয়নি। সাথে থাকল ছোট্ট একটা হাতব্যাগ, সরু চেইনের সোনার হাতঘড়িটা ছাড়া কোন অলঙ্কার পরল না। তাকে দেখে প্রিন্সেস বলে মনে হতে পারে, আবার সেক্রেটারি বলেও।

গ্র্যান্ড হোটেলের প্রাইভেট রুমে যখন ঢুকল জুয়েলা মাদ্রে, ভিনসেন্ট গগলকে ঘিরে আটজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল গগল। সোজা তার দিকে হেঁটে এল জুয়েলা মাদ্রে; ওর হাত ধরে, হাতের দিকে মাথা নত করল গগল। 'আপনি জুয়েলা মাদ্রে,' বলল সে, ভাষাটা স্প্যানিশ হলেও বাচনভঙ্গিতে ক্ষীণ ফরাসী টান থাকল।

জুয়েলা মাদ্রে জবাব দিল বিশুদ্ধ ফরাসীতে। 'এবং আপনি, মশিয়ে, ভিনসেন্ট গগল।'

মুখ টিপে হাসল গগল। 'আপনি আসায় আমি ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত বোধ করছি।' আমন্ত্রিত অন্যান্য যুবতীরা ঈর্ষায় ভুগলেও কারও চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। জুয়েলা মাদ্রের হাতটা নিজের মুঠোয় নিল গগল। 'আপনি কি আমার পাশে বসবেন, সিনোরিটা?'

সাথে সাথে সম্মতিদান করল জুয়েলা মাদ্রে, এবং সেই সাথে দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেল গোটা লিমা শহরে ওদের দু'জনকে নিয়ে মুখরোচক গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু হায়, কেউ যদি জানত এখানে তার আসা, ভিনসেন্ট গগলকে হাত ধরতে দেয়া, তার পাশে বসা, ইত্যাদি সবই আসলে ভান। আসলে তার দরকার মাসুদ রানাকে। আরেকবার তার সাথে কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি সে। জানে, বন্ধুর পার্টিতে উপস্থিত না থেকে পারবে না সে, লিমাতেই যখন রয়েছে। তার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

গগলকে পাশে নিয়ে বসল সে, তার আরেক পাশে রানা। লাঞ্চ পর্ব শুরু হলো। উপাদেয় এবং সুরুচিকর খাদ্যবস্তু চৌকশ নৈপুণ্যের সাথে পরিবেশিত হলেও টেবিলের অন্তত একটা অংশ থেকে আড়ষ্ট ভাব দূর হলো না। গগল ভোজনরসিক, হালকা সুরে কথা বলার ফাঁকে প্রচুর খেলো সে। রানা খেলো বাছবিচার করে, পরিমিত, এবং খাওয়ার সময় কারও সাথেই কোন কথা বলল না। ওর এই নির্লিপ্ত ভাব খেপিয়ে তুলল জুয়েলা মাদ্রেকে। এর আগে আর একবার মাত্র রানার সাথে দেখা হয়েছে, তখনও লোকটার হাবভাব কোন কারণ ব্যতিরেকেই পছন্দ হয়নি তার। আজও তাই। জুয়েলা মাদ্রে উপলব্ধি করল, লোকটা যাই করুক, তার ভাল লাগবে না। এর কারণ কি নিজেও সে বুঝতে পারছে না। ভাল করে লোকটাকে চেনে না পর্যন্ত, তবু কেন এই বিরাগ? মনে পড়ল, প্রথম দিনের আলাপের সময় মিডো কি পরিমাণ টাকা পেরুতে ইনভেস্ট করেছে রানার মুখে শুনে ওকে সে বলেছিল, ক্যাপিটালিস্ট রাক্ষস! লাঞ্চের পর লাউঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল অতিথিরা, প্রায় সবার হাতেই পানীয়। রানা একটা সোফায় বসল, জুয়েলা মাদ্রের হাত ধরে সেখানে হাজির হলো

গগল। রানাকে চুরুট অফার করল সে।

মৃদু মাথা নেড়ে সিগারেট ধরাল রানা। 'বসবেন না, সিনোরিটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ও, আপনি তাহলে আমাকে দেখতে পেয়েছেন?' হেসে উঠল জুয়েলা মাদ্রে, প্রয়োজনের চেয়ে একটু জোরেই। 'কেমন আছেন আপনি?' রানার পাশের সোফাতেই বসল সে। 'খান তো খুব একটা বেশি না, তাহলে প্রফিটের দিকে এত নজর কেন?'

প্রশ্নের ধরন, হাসির মাত্রা ইত্যাদি লক্ষ করে রানা যদি অবাক হয়েও থাকে, চেহারায় তার কোন প্রকাশ ঘটল না। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল ও, 'আপনাদের লিমার সমাজ একটু বোধহয় রক্ষণশীল, তাই না?'

'আমরা তাই থাকতেও চাই,' ঝটপট উত্তর দিল জুয়েলা মাদ্রে।

গগল চুপচাপ বসে চারদিকে তাকাচ্ছে, মাঝে মধ্যে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কির গ্লাসে, চুরুট ফুঁকছে।

'অথচ তবু আমাদের আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করলেন…?'

'এ-ধরনের আমন্ত্রণকে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে থাকি।' হাসি হাসি মুখ জুয়েলা মাদ্রের, সপ্রতিভ এবং সতেজ। 'আমাকে তো চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তাই না?'

'আমি ঠিক আপনার কথা বুঝলাম না…'

'বোঝা উচিত, মি. রানা।' লাউঞ্জের চারদিকে তাকাল জুয়েলা মাদ্রে, বিশাল জায়গা জুড়ে অতিথিরা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, কেউ ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না বা কেউ ওদের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্যও রাখছে না। 'আপনাদের লাঞ্চ পার্টি শুরু হবার ঠিক আগে আমার কাজিন ভাড়া করা হল আর লাউঞ্জে তল্লাশি চালিয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, এখানে আপনি কোন রকম আড়িপাতা যন্ত্র লুকিয়ে রাখেননি।' গগলের দিকে ফিরল সে। 'মশিয়ে ভিনসেন্ট গগল, লাভের জন্যে আপনারা কতটা নীচে তলিয়ে যেতে পারেন উপলব্ধি করতে পেরে সত্যি আমি বিস্মিত।' আবার সে রানার দিকে তাকাল। 'আপনাকে শুধু আমার এইটুকু বলার আছে, আপনি বা আপনার লোক যন্ত্রটা আমার ব্যাগে লুকিয়ে রাখায় দু'জন লোক খুন হয়েছে। একজন আপনাদের কর্মচারী, অপরজন আমার বন্ধু।'

দু'জন লোক খুন হয়েছে? বন্ধু? রানা ঠিক বুঝল না।

'আমার বন্ধুটি, সন্দেহ নেই, চঞ্চল প্রকৃতির এবং নিষ্ঠুর,' শুরু করল আবার জুয়েলা মাদ্রে। 'তার নিষ্ঠুরতা অক্ষমণীয়। সে খুন হলো, কারণ আপনার লোককে সে খুন করেছে। কিন্তু আপনি, মি. মাসুদ রানা,' নামটা চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল সে, 'এই দুই হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।' গগলের দিকে তাকাল সে। 'এবং আপনিও, মশিয়ে ভিনসেন্ট গগল, এই মৃত্যুর দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।'

অন্য দিকে মুখ ফেরাল রানা। মেয়েটা কি সত্যি কথা বলছে? ও, রানা, এই হত্যাকাণ্ডের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে। আড়িপাতার জন্যে মেক্সিকান সানসেজকে নির্দেশ দিয়েছিল ও, সত্যি কথা। ওর এই নির্দেশের কারণেই খুন হয়ে গেছে

লোকটা। জুয়েলা মাদ্রে যা বলছে তা যদি সত্যি হয়, মেয়েটার দলের একজনের হাতেই খুন হয়েছে সানসেজ। গুয়াম তাকে বাড়ি ফিরতে বললেও, সানসেজ আবার ব্রথেলে গিয়েছিল, দলটা তাকে ধরে ফেলে। দলের একজন, মাথা গরম কেউ, সানসেজকে মেরে ফেলে। পরে দলটা সানসেজের খুনীকে হত্যা করে। অনেকগুলো ঘটনার একটা চেইন, চেইনের প্রথম লিঙ্ক জুয়েলা মাদ্রের ব্যাগে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে রানার সিদ্ধান্ত।

খুক্ করে কাশল গগল। ওদের তিনজনের দিকে দু'জন অতিথি এগিয়ে আসছে। সোফা ছেড়ে দাঁড়াল সে, আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে তাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। তাদের সাথে দরজার দিকে এগোল। গগল না থাকায় কথা বলল না জুয়েলা মাদ্রে। মেয়েটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল রানা, সারা মুখে রাগের লালচে আভা ফুটে রয়েছে। আর চোখের দৃষ্টি···রীতিমত অগ্নিঝরা। এই দৃষ্টি আগে লক্ষ করেনি রানা। কি একটা ব্যাপারে মেয়েটা যেন উন্মাদ। এই দৃষ্টি অনেক ফ্যানাটিকের মধ্যে লক্ষ করেছে রানা। জানা কথা মাইক্রোফোনের ব্যাপারে রেগে আছে, কিন্তু এই উন্মাদনার কারণ সেটা হতে পারে না।

'পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট,' মৃদুকণ্ঠে কিন্তু স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল রানা। দেখল, জুয়েলা মাদ্রের চোখের পাতা কেঁপে উঠল একবার। কিন্তু ওইটুকুই, বাকি সব স্বাভাবিক থাকল। চোখের পাতা দ্বিতীয়বার কাঁপল না।

ঠিক এই সময় ফিরে এসে নিজের সোফায় বসল গগল। 'বাধাটা খুব কাজ দিয়েছে,' বলল গগল। 'চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছি। ঝগড়ার মধ্যে না গিয়ে, মিস মাদ্রে, আমি শুধু নিরেট কিছু উদাহরণ পেশ করব। আমরা যে শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে ব্যবসা করছি না তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু সে-সব বলার আগে, আপনারা অর্থাৎ মাদ্রে পরিবার কি করছেন না সে-সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই। এই হোটেল থেকে দু'মাইল দূরে একটা বেড়া আছে, আপনি জানেন। বেড়াটা আন্দেজ পর্বতের দিকে চলে গেছে। বেড়ার ওদিকে কারা থাকে? গরীব, ভুখা-নাঙ্গা আদম সন্তানরা। মাদ্রে পরিবার গত একশো বছরে তাদের জন্যে একটা ফুটো কানা-কড়িও খরচ করেনি। তারা আরও অনেক কিছু করেনি, তার মধ্যে এটা মাত্র একটা।'

জুয়েলা মাদ্রের চেহারা বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠলেও, গগল তাকে মুখ খোলার সুযোগ দিল না। 'ওখানে কারা সাহায্য পৌঁছে দেয়? রেড ক্রস। আর কে দেয়? মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের লিমা শাখা। বেড়ার ওপারে পাঁচতলা বিল্ডিং একটা দুটো নয়, পঞ্চাশটা তৈরি করে দিয়েছি আমরা। শুধু তাই নয়, ওখানকার লোকদের আমরা কাজও দিয়েছি। এবং জানেন, এ-সব আমরা করেছি পেরুতে বসানো আমাদের ফ্যাক্টরিতে কোন রকম উৎপাদন শুরু হবার আগেই। আরও আছে, যারা ওই পাঁচতলা বাড়িগুলোয় থাকছে তারাই ওগুলোর মালিক হয়ে যাবে একদিন। কিস্তিতে যে টাকা ওরা দিচ্ছে, তাতে শুধু বিল্ডিং তৈরির খরচা উঠবে, জায়গার দাম দিচ্ছে মিডো। ছয়শো লিমাবাসী কাজ করছে মিডোতে, আর দু'বছরের মধ্যে সবাইকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয়া হবে। আপনি, বা আপনাদের মত যারা ধনী, তারা স্বদেশীদের জন্যে কি করেছেন, এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু উত্তরটা আমাদের সবারই জানা।' সোফা ছেড়ে উঠে চলে গেল গগল। তার কাছে জুয়েলা মাদ্রে স্রেফ

অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

রানার দিকে ফিরল জুয়েলা মাদ্রে। 'একদিন,' বলল সে, 'ওই কথাগুলোই ওকে আমি গেলাব।'

'কিভাবে তা সম্ভব? কমপিউটরের সাহায্যে? কিন্তু আমার তো ধারণা কমপিউটর নাড়াচাড়া করে দু'চার টাকা নয়ছয় করা সম্ভব হলেও...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত ব্যাপারটা, কিন্তু ঠিক জায়গামত লাগল। জুয়েলা মাদ্রে হাসতে শুরু করল। কোল থেকে হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিয়ে দাঁড়াল সে, গগলের খোঁজে চারদিকে একবার তাকাল, আবার ফিরল রানার দিকে। রানা তারই দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে।

'পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট,' বলল জুয়েলা মাদ্রে। তার সাথে দরজার দিকে এগোল রানা, অতিথিরা বিস্মিত দৃষ্টিতে লক্ষ করল এরইমধ্যে সঙ্গী বদল করেছে মেয়েটা।

জুয়েলা মাদ্রে বিদায় নেয়ার পর উদয় হলো গগল। 'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'যা চেয়েছিলাম তাই ঘটেছে,' বলল রানা। 'খেপেছে। এখন দেখা যাক কি করে সে।'

ইউ.এম.পি. কমপিউটর সহজ একটা ব্যাপার, ওটার ডিজাইন করা হয়েছে বিশেষ করে প্লাস্টিক দ্রব্যাদির অব্যাহত স্রোত 'সামলানো'-র জন্যে। প্লাস্টিক শব্দটা এখানে বিরাট অর্থ বহন করছে। পলিয়েস্টার ফাইবার থেকে কাপড় তৈরি হচ্ছে, পলিপ্রোপ্লিন অ্যাসিটেট থেকে তৈরি হচ্ছে ফিল্ম, অ্যাক্রিলিক রেজিন থেকে মটরগাড়ির পার্টস, এ-ধরনের আরও অনেক কিছু—সবই প্লাস্টিক। বেশিরভাগ এক্সট্রু ডিং, প্রেসিং, হট-স্ট্যাম্পিং, শেপিং এবং ফর্মিং প্রসেস নিয়ন্ত্রণ করে কমপিউটর। তাছাড়া, চাহিদা নিরূপণ, অর্ডার গ্রহণ, স্টক কন্ট্রোল ও কোয়ালিটি চেক করাও কমপিউটরের দায়িত্ব। ইউ. এম. পি. কমপিউটর একাই এক হাজার লোকের কাজ করে। প্রতিটি কাজ এক মুহূর্তে সারে, এবং কাজ করার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা তৈরি থাকে। ওটা কখনও অসুস্থ হয় না, ব্যক্তিগত সমস্যায় ভোগে না, বেতন বাড়াবার বায়না ধরে না। ওটার ক্যানটিন বা মেডিকেল সুবিধে লাগে না, পোষ্যদের জন্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই দরকার হয় না। ইউ. এম. পি. কমপিউটর ব্যবসার আয়-ব্যয়ের দিকটাও দেখে। বেতন দেয়, মূল্য নির্ধারণ করে, খরচ হিসেব করে, বিল ছাপে এবং পেমেন্ট করে।

মিডো লিমার রয়েছে আরও বড় কমপিউটর, লিমার ফ্যাক্টরিতেই বসানো হয়েছে সেটা, ফ্যাক্টরির কাজই করে, তবে মিডোর ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া আর ইকুয়েডর শাখাগুলোর ওপরও একটা চোখ রাখে। ইউ. এম. পি. কমপিউটর মিডো থেকেই কেনা হয়েছে, এবং যখনই স্টোরেজ বা প্রিন্টআউট সংক্রান্ত কোন সমস্যায় পড়ে ওটা, মিডোর ডাটা বেস আর প্রিন্টআউট মেশিনের সাহায্য নিতে পারে এবং নেয়। তাই মিডো আর ইউ. এম. পি. কমপিউটরের মাঝখানে একটা লাইন সব সময় খোলা রাখা হয়।

ইউ. এম. পি-র ডাটা বেস 'সার্ভে' করার কাজ শেষ করেছে চার্লি ফ্রানসি।

লিমা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর মাদ্রে তার সাথে থেকে ডাটা বেসগুলো পরীক্ষা করেছেন। তরুণ মেধার কাছ থেকে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ নিয়ে খুব খেটেছেন ভদ্রলোক। প্রথম দিনের আলাপেই তিনি বুঝেছেন, চার্লি ফ্রানসি কমার্শিয়াল অপারেশন সম্পর্কে বিস্তর জানে। তিনি নিজে থিওরি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করেন। বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিটির সাথে কথা বলে আরাম পেয়েছে চার্লি ফ্রানসি, তাঁকে দেখিয়েছে ইউ.এম.পি./মিডো অপারেশনের বেলায় কোন্ থিওরিটাকে গ্রহণ করে বাস্তবে রূপ দেয়া হয়েছে। সে এমনকি ইউ. এম. পি-র গ্রহণ করা ওভারপেমেন্টটাও দেখিয়েছে প্রফেসরকে, এবং চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে বলুন তো দেখি কিভাবে এটা করা হয়েছে? ব্যাপারটা জানতে এক ঘণ্টার মত সময় লাগল প্রফেসরের, তারপর তিনি প্রোগ্রামিং টেপ থেকে সারপ্লাস বাইটস্ ডিকোড করলেন। এরপর চার্লি ফ্রানসি জুরিখের তৈরি করা সিকিউরিটি ইনস্ট্রাকশন টেপ করে ঢুকিয়ে দিল ডাটা বেসে। টাকা সরানোর ওই পদ্ধতিটা অকেজো করে দেয়া হলো।

কাজটা দারুণ উপভোগ করছে চার্লি ফ্রানসি। 'এবার,' বলল সে। 'কিছুক্ষণের জন্যে বাস্তব থেকে সরে আসুন। ধরুন, সিকিউরিটি সিস্টেমকে আমরা কাঁচকলা দেখাতে চাই। ধরুন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাই যাতে মিডো কমপিউটর থেকে এক মিলিয়ন সেন্টাভোস বের করে আপনাকে দেব। কিভাবে তা সম্ভব?' মজাদার অ্যাকাডেমিক সমস্যা, সমাধানের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন প্রফেসর। বিকেল পাঁচটার দিকে পাঁচটা পদ্ধতির কথা জানালেন তিনি, চার্লি ফ্রানসি তাঁকে দেখাল জুরিখ সিকিউরিটি সিস্টেমের দ্বারা কিভাবে সবগুলো পদ্ধতি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা নিজেকে পরাজিত বলে ঘোষণা করলেন প্রফেসর, জোর দিয়ে বললেন, এ কারও দ্বারা সম্ভব নয়।

মুচকি হাসল চার্লি ফ্রানসি। সে উল্টোটা জানে। বিজয়ের আনন্দে তার ভেতর পুলকের ঢেউ উঠল। প্রফেসর মাদ্রে চমৎকার ব্যক্তিত্ব, তাঁর রয়েছে অসাধারণ ব্রেন। কিন্তু সে, চার্লি ফ্রানসি, তাঁর চেয়েও অনেক বড় প্রতিভা।

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে অ্যাসটন মার্টিন ছোটাল জুয়েলা মাদ্রে, রাগে আর ঘৃণায় রি রি করছে সারা শরীর। শহর থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ী পথে পড়ল গাড়ি, সেই সাথে লিমার মাথা থেকে ভাসমান কালো মেঘ সরে যাওয়ায় উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করে উঠল চারদিক। সামনে মন ভোলানো দৃশ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নগ্ন আলটিপ্লানো, পাহাড়শ্রেণীর নিচের স্তরে সান ক্রিস্টোবাল, যেন শান্তির নীড়। নিচের সমতল ভূমির তুলনায় ওখানকার বাতাস পরিষ্কার আর তাজা। সান ক্রিস্টোবাল এবং গোটা আশপাশের এলাকা মাদ্রে পরিবার অনেক আগেই কিনে নিয়েছে। উঁচু-দরের নির্মাণ কাজ চলছে ওদিকে, জমির মালিকদের একক নিয়ন্ত্রণে। প্রতিটি বাড়ির সামনে ইংলিশ-টাইপ বাগান থাকবে। এখানে সেখানে দু'এক জায়গায় ছোট কিছু বাড়ি তৈরির অনুমতি দেয়া হয়েছে শ্রমিক এবং কেরানীদের থাকার জন্যে, অভিজাতদের স্বর্গ তৈরি শেষ হলে সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে।

নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকল জুয়েলা মাদ্রে, এঞ্জিন বন্ধ করেনি। ওটাকে পিছনের গ্যারেজে রেখে আসবে কোরি, তার আগে পানি দিয়ে ধুয়ে

পালিশ করে রাখবে সে। গাড়ি-পথে আগেই অ্যাসটন মার্টিনকে দেখে নিয়েছে এডনা, হন হন করে হেঁটে গিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে সে, নব ঘুরিয়ে শাওয়ার ছেড়েছে। শহর থেকে ফেরামাত্র শাওয়ারের নিচে দাঁড়ানো সিনোরিটার একটা অভ্যেস। তোয়ালে ইত্যাদি সব তৈরি করে সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল জুয়েলা মাদ্রে, বলল, 'একদম পচে গেছি, বুঝলে। প্রথম কাজ, পরিষ্কার হব।'

'সব তৈরি, সিনোরিটা।'

প্যাসেজ ধরে পিছন দিকে তার বেডরুমে চলে এল জুয়েলা মাদ্রে। 'ঘিয়ে ট্রাউজার স্যুট,' বলল সে। 'যেটায় অনেকগুলো পকেট। আর লাইট ব্লু শার্ট, যে-কোন একটা।' বালমেইন ড্রেস খুলে ফেলল সে, আন্ডারওয়্যারের সাথে ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। তারপর, গায়ে কিছু চড়াবার ঝামেলায় না গিয়ে, বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। শাওয়ারের পানি থার্মোস্ট্যাট নিয়ন্ত্রিত, গরম বা ঠাণ্ডা ইচ্ছেমত পাওয়া যায়। শরীর ভিজিয়ে নিয়ে শাওয়ারের নিচ থেকে সরে এল জুয়েলা মাদ্রে। বাথরুমে ঢুকেছে এডনা। কেবিনেট থেকে একবোতল বডি অয়েল নিয়ে সিনোরিটার শরীরে ঢালল সে, ঘষতে শুরু করল, বাথরুমের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল গার্ডেনিয়ার মিষ্টি গন্ধ। বডি অয়েলের সাথে একটা বডি শ্যাম্পু-ও রয়েছে। এডনা ভারী হাতে শরীরে চাপ দিতে শুরু করায় ধীরে ধীরে শিথিল হলো জুয়েলা মাদ্রের পেশী। তোয়ালে দিয়ে ঢাকা গদি মোড়া টেবিলে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল সে, এডনা তার পিঠ আর কাঁধের পেশী ডলতে লাগল। 'কি সুন্দর শরীর,' মনে মনে বলল এডনা। 'কিন্তু একজন পুরুষের অভাবে সবটাই বরবাদ হচ্ছে।'

আবার শাওয়ারের নিচে ফিরে এল জুয়েলা মাদ্রে, সাবানের ফেনা দিয়ে বডি অয়েল ধুয়ে ফেলল। হিম শীতল পানিতে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর পুলকানুভূতি নিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে, সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেছে। 'ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব,' শান্ত সুরে ইংরেজিতে বলল সে।

প্রথমে টেলিফোন করল সে অ্যাটর্নি অরবিটাসকে। তারপর ব্যাংকার মাদ্রেকে। সবশেষে পলিটিক্যাল ইকোনমিস্ট পাকোকে। প্রত্যেকের সাথে মামুলি কথাবার্তা হলো, সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রায়ই এদের সাথে তার দেখা হয়। আজ তিনজনকেই ক্লাব নাসিওন্যাল-এ আসতে বলল জুয়েলা মাদ্রে। লিমার ইউনিয়ন স্ট্রীটে। এই সাধারণ কথাবার্তার ভেতর দিয়ে একটা গোপন বার্তা পেয়ে গেছে তিনজনই। আজ সন্ধ্যায় জরুরী মীটিং আছে।

পর্দা ঢাকা ছায়াময় বেডরুমে এক ঘণ্টার জন্যে শুয়ে পড়ল জুয়েলা মাদ্রে, যেখানে কোন পুরুষ কখনও প্রবেশাধিকার পায়নি।

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল ওরা। টাকা সরানো এবং পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট সম্পর্কে যা জানে সব গগলকে বলল রানা। ডকুমেন্টটার শুধু নাম জানে ও। মারা যাবার আগে মেক্সিকান সানসেজ বলে গিয়েছিল। রানার মুখে শোনার সময় জুয়েলা মাদ্রের একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে, পরে আবার সে নিজেই শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছে। 'কিন্তু পেরুভিয়ান

প্রিন্টআউট আসলে কি বা টাকা সরানোর সাথে তার কি সম্পর্ক আমি জানি না।' জিনিসটা কি হতে পারে তা নিয়ে দু'জনেই খানিক মাথা ঘামাল, কিন্তু অর্থবহ কিছু বেরুল না।

'একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বলল গগল। 'মেয়েদের সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা, তা থেকে বলছি–জুয়েলা মাদ্রে বিপজ্জনক। ভাবাবেগ এত বেশি, নিউরোটিক-ই বলা চলে। সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষমতা ব্যবহারে অভ্যস্ত। সব মিলিয়ে তার চরিত্রে বিপজ্জনক একটা উপাদান তৈরি হয়েছে।'

'পুরুষ শাসিত সমাজে বিদুষী নারী হবার বিড়ম্বনাও তাকে সহ্য করতে হয়,' বলল রানা। 'লিমা এখনও নারী-স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি।'

'আজ যা দেখলাম আর শুনলাম, না পাওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল, ঠিক পাঁচটার সময় হাজির হলো চার্লি ফ্রানসি। সে রিপোর্ট করল, সুইটজারল্যান্ড থেকে রানার নিয়ে আসা সিকিউরিটি প্রসিডিওর সন্তোষজনকভাবে লিমায় সেট করা হয়েছে। সিস্টেমটা ভাঙার জন্যে প্রফেসরকে তার চ্যালেঞ্জ করার কথাটাও বলল সে। 'ভদ্রলোককে আমি আধ ঘণ্টা আগে ছেড়ে এসেছি,' বলল সে। 'তখনও তিনি ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন। প্রফেসর মাদ্রের বক্তব্য, সিস্টেমটা নিশ্ছিদ্র।'

'গুড। এবার শোনো তোমাকে দিয়ে আমি কি করাতে চাই,' বলল রানা, হেলেন জার্মানের কাছ থেকে শেখা কমপিউটর সম্পর্কে জ্ঞানটুকু কাজে লাগাচ্ছে। কমপিউটর অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে একটা প্রোগ্রামের আউটলাইন ব্যাখ্যা করল ও। জাল ফেলছে রানা গভীর জলের মাছ ধরার আশায়। 'টাকা সরানোর যে-সব ঘটনা ঘটেছে, ওগুলো এক অর্থে কিছু না, ফ্রানসি। ওগুলো আসলে চোরের কৌতুক আর এক্সপেরিমেন্ট। সে চেয়েছে আমরা ব্যাপারটা ধরে ফেলি, তারপর ঠেকাবার জন্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা খাড়া করি। আমার ধারণা, লোকটা...'

বাধা দিল গগল, 'কিংবা মেয়েটা...'

'কিংবা মেয়েটা আড়াল থেকে হাসছে। ভাবছে সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে যতই না আমরা মাথা ঘামাই, কমপিউটর সম্পর্কে তার যে জ্ঞান, সমস্ত বাধা গুঁড়িয়ে দিয়ে সে তার উদ্দেশ্য ঠিকই পূরণ করতে পারবে।'

'সে তো প্রায় অসাধ্য সাধনের মত...' বলল চার্লি ফ্রানসি।

'সে চাইছে আমরা তাই ভাবি। চাইছে সিকিউরিটি সিস্টেম চালু করার পর আমরা যেন ধরে নিই আর কোন ভয় নেই...'

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলেও, নিজেকে সামলে রাখল চার্লি ফ্রানসি। খালি চোখে দেখে মাসুদ রানা সম্পর্কে কিছুই তুমি বুঝবে না, ভাবল সে। কমপিউটর সম্পর্কে শুধুমাত্র আবছা একটা ধারণা নিয়ে লোকটা তার প্লট হুবহু আঁচ করতে পেরেছে, অবাক কাণ্ড! তবে চার্লি ফ্রানসি ভয় পাচ্ছে না, বরং খুশি, কারণ মাসুদ রানার চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে আছে সে।

'আমার তাহলে কাজ কি, মি. রানা?'

'তুমি শুধু খুঁজবে কোথায় কি অস্বাভাবিক রয়েছে বা ঘটছে। একজন পুলিস, টহলে বেরিয়েছ, এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় হাঁটছ, চারদিকে সব কিছু স্বাভাবিক দেখতে

পাচ্ছ, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ছ থমকে। কমপিউটর অপারেশন সম্পর্কে জানো তুমি। মিডো আর ইউ.এম.পি. লিঙ্কের মাঝখানে চোখ রাখো, যা যা ঘটছে সবগুলোর ওপর চোখ বুলাও। অস্বাভাবিক কিছু যদি দেখতে পাও, সাথে সাথে বন্ধ করে দেবে কমপিউটর, তারপর তদন্ত চালাবে। প্রফেসর মাদ্রেকে বলা আছে, চাইলেই তার সাহায্য পাবে তুমি। কোন রকম ইতস্তত কোরো না–যদি দরকার মনে করো, গোটা জুরিখ তোমার অধীনে ছেড়ে দেয়া আছে। ইউ. এম. পি. জুরিখ লাইন, জুরিখের সাথে ইংল্যান্ড, লিয়নস, মিউনিক, আর নিউ জার্সির লাইন সব সময় খোলা থাকবে, নিজের ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারবে।'

চার্লি ফ্রানসি চলে যাবার পর গগলকে দেখে উদ্বিগ্ন মনে হলো রানার। 'কি ব্যাপার?'

'মনে হলো লোকটাকে তুমি খুব বেশি দায়িত্ব দিয়ে ফেললে,' বিড়বিড় করে বলল গগল। 'উচিত হলো কি?'

'সব কথা বলেছি তা ভেবো না,' মৃদু হেসে জবাব দিল রানা। 'জুরিখ ডাটা বেস থেকে কোড পিক করেছে হেলেন জার্মান সেটার কথা বলিনি ওকে। বলিনি ভৌতিক ক্যারেক্টরগুলো প্রিন্টআউট মেশিনটাকে হেঁচকি তোলাচ্ছে।'

'তবু, কেমন যেন পছন্দ হচ্ছে না,' বলল গগল। 'তুমি, রানা, ফ্যাক্টের ওপর বেস করে অপারেট করো। আমি অপারেট করি অনুভূতির সাহায্যে। জুয়েলা মাদ্রের ব্যাপারে আমার মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে, একই অনুভূতি হয়েছে তোমার চার্লি ফ্রানসির ব্যাপারে…'

ট্রাউজার স্যুটের সাথে নীল শার্ট পরেছে জুয়েলা মাদ্রে, পায়ে গোড়ালি ঢাকা লেদার বুট, মাথায় একটা কালো বেরেট, সব মিলিয়ে তার চেহারায় পুরুষালি এবং প্রায় সামরিক একটা ভাব এনে দিয়েছে। অ্যাসটন মার্টিন নিয়ে বেরিয়ে এল সে, যে রাস্তাটা ধরল সেটা শুধু লিমার দিকেই গেছে। তৎপর হবার সময় হয়েছে, কাজেই এখন সে শান্ত এবং ঠাণ্ডা। গোমেজ বিউমাচারের কথা মনে পড়ল তার। ছেলেটার জন্যে দুঃখ হয় বটে, কিন্তু এতেও কোন সন্দেহ নেই যে তার অকাল মৃত্যুর জন্যে সে নিজেই দায়ী।

না, গোমেজ বিউমাচারকে তারা খুন করতে চায়নি। এ-কথা ঠিক যে মাসুদ রানার স্পাই লোকটা পেরুভিয়ান প্ল্যান সম্পর্কে আড়াল থেকে বেশ অনেক কথাই শুনেছিল, কিন্তু কারও সাথে পরামর্শ না করে হঠাৎ করে তাকে মেরে ফেলা গোমেজ বিউমাচারের উচিত হয়নি। তাও শুধু খুন করলে কথা ছিল, মেরে ফেলার আগে লোকটার টেস্টিকল্ কেটে নেয় গোমেজ। তার এই বর্বর আচরণ জুয়েলা মাদ্রের ভেতর বিরাট যৌনাবেদন সৃষ্টি করলেও, অনুভূতিটাকে দমন করতে পেরেছে সে। গোমেজের মধ্যে বিদ্রোহ ভাবটা বরাবরই ছিল, ইদানীং সেটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সেদিন রাতে জুয়েলা মাদ্রের নির্দেশ অমান্য করে সে। সানসেজকে খুন করার পর আবার সে সরাসরি আঘাত হানার পক্ষে যুক্তি দেখাতে থাকে। জুয়েলা মাদ্রে এবং তার অন্যান্য সঙ্গীরা তাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয় যে স্যাবোটাজের সাহায্যে কল-কারখানা, অফিস, ইত্যাদি ধ্বংস করলে পেরুর কোন লাভ হবে না। আরও সূক্ষ্ম

পথ বের করতে হবে তাদের, আধুনিক টেকনিক ব্যবহার করতে হবে। মতের অমিল এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছুল, যখন গোমেজ বিউমাচারকে বাঁচিয়ে রাখলে গোটা স্কীম বানচাল হয়ে যায়। সে ওদের সবাইকে চিনত, প্ল্যান সম্পর্কে জানত। কারও সাহায্য না পেলে সে একাই স্যাবোটাজের পথ ধরবে, এটা তার শুধু কথার কথা ছিল না। স্যাবোটাজ করতে গেলে কি হত? নির্ঘাত ধরা পড়ত পুলিসের হাতে। আর ধরা পড়লে, লিমার পুলিস চীফ, জুয়েলা মাদ্রের কাজিন, টিপে টিপে সমস্ত তথ্য বের করে নিত তার কাছ থেকে। কাজেই নিজেদের একজন সঙ্গীকে হারানোর ব্যাপারে সবাই ওরা একমত হয়েছিল। আজও ওদেরকে জুয়েলা মাদ্রের সাথে একমত হতে হবে। তার একটা প্ল্যান আছে···

রাস্তার ধারে একটা গাড়ি দেখতে পেল জুয়েলা মাদ্রে। সন্ধে এখনও গাঢ় হয়নি, তবু হেডলাইট জ্বালল এবং পরমুহূর্তে নেভাল সে, হর্ন-ও বাজাল। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার জানালা দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে এল, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিল অ্যাসটন মার্টিনকে। হুইলের পিছনে বসা ড্রাইভারের দিকে ভাল করে তাকালও না জুয়েলা মাদ্রে, তবে তার চোখে যে চশমা রয়েছে সেটা লক্ষ করল। সম্ভবত কোন আমেরিকান ট্যুরিস্ট, পথ হারিয়ে ফেলেছে।

লোকটার কথা দ্বিতীয়বার হয়তো মনেই পড়ত না তার, যদি না লোকটা হঠাৎ করে হেডলাইট জ্বেলে স্টার্ট দিত এঞ্জিনে। চোখের পলকে অ্যাসটন মার্টিনের পিছনে চলে এল গাড়িটা। ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে ছুটছে অ্যাসটন মার্টিন, এই রাস্তার জন্যে যথেষ্ট গতিবেগ, অথচ ক্যাডিলাকটা ছায়ার মত লেগে থাকল পিছনে। রাস্তার একেবারে কিনারায় সরে এল জুয়েলা মাদ্রে, জানালা দিয়ে হাত বের করে পাশ কাটাবার ইঙ্গিত দিল। কিন্তু ক্যাডিলাক পিছনেই থাকল। রিয়ার ভিউ মিররে জুয়েলা মাদ্রে দেখল মোটা ফ্রেমের সানগ্লাস পরে রয়েছে লোকটা। গাড়িটা ভাড়া করা, এই টাইপের গাড়ি সাধারণত ট্যুরিস্টরাই ব্যবহার করে লিমায়।

সামনে ফাঁকা রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত সোজা। জুয়েলা মাদ্রে গতি বাড়িয়ে সত্তরে তুলল। একই অবস্থা, পিছু ছাড়ছে না ক্যাডিলাক। বরং আগের চেয়ে মাঝখানের দূরত্ব আরও যেন কমেছে। বাঁক নেয়ার সময় ব্রেক স্পর্শ করতে ভয় পেল সে। ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নের মত হয়ে উঠছে ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই নারীমাংসলোভী ট্যুরিস্ট হবে লোকটা, একা একটা মেয়েকে গাড়ি চালাতে দেখে ভেবে নিয়েছে পটাতে পারবে। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি! পায়ের চাপ যতটা সম্ভব বাড়াল সে, সামনের দিকে লাফ দিল অ্যাসটন মার্টিন। এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে পিছিয়ে পড়ল ক্যাডিলাক, কিন্তু তারপরই আবার মাঝখানের দূরত্ব কমে গেল, আগের জায়গায় ফিরে এল দুঃস্বপ্নটা। সামনের রাস্তা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে বহুদূর পর্যন্ত, নামতে শুরু করে ধীরে ধীরে গতি কমাল জুয়েলা মাদ্রে। হঠাৎ করে ব্রেক করতে ভয় পাচ্ছে সে, পিছনের উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে ক্যাডিলাক যদি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে! ওর পিছনে ক্যাডিলাকও গতি কমাল। রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল জুয়েলা মাদ্রে, রাগে হাত কাঁপছে তার। ক্যাডিলাকটাও পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে নিচে নামল সে। 'শুয়োরটাকে আমি এমন শিক্ষা দেব···' ভাবল বটে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখল রিভার্স গিয়ার দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে নিচ্ছে ড্রাইভার। ছুটল জুয়েলা মাদ্রে, কিন্তু ক্যাডিলাকের

পিছু হটার গতি ক্রমশ বাড়তে লাগল, ধরা সম্ভব নয়। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, মুঠো তুলে ঘুসি মারার ভঙ্গি করল, তারপর নিজের গাড়িতে ফিরে এল।

গাড়ি ছাড়ল সে, আধ মাইল পেরোবার আগেই আবার তার পিছনে চলে এল ক্যাডিলাক। কয়েকটা প্রশ্ন জাগল জুয়েলা মাদ্রের মনে। কি ভাবছে লোকটা? সে কি ওর সঙ্গ চায়, হোটেলে নিয়ে তুলতে চায়? সেক্ষেত্রে মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে কেন? ওভাবে পিছিয়ে যাবার কি কারণ থাকতে পারে? লোকটার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল সে, মন দিল গাড়ি চালানোয়, স্বস্তিকর পঞ্চাশ মাইলের ভেতর রাখল গতিবেগ।

জুয়েলা মাদ্রে খুব ভাল ড্রাইভার নয়, প্রায়ই সে শোফারের হাতে গাড়ি ছেড়ে দেয়। গাড়ি চালাতে ভয় পায় না বটে, কিন্তু এত কাছ থেকে কেউ অনুসরণ করতে থাকলে তার নার্ভের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে। আবার একবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল সে, লোকটার মাথা দেখতে পেল, সানগ্লাস জোড়াকে মনে হলো অশ্লীল এবং রহস্যময়। হাত তুলে আয়নাটা ঘুরিয়ে দিল সে, লোকটাকে যেন দেখতে না হয়।

প্রথমে, অনুভূতিটা যখন হলো, বিশ্বাসই করতে পারল না। মৃদু একটা ঝাঁকি, তারপর দুই কি তিন সেকেন্ড স্থায়ী একটা চাপ। কি ঘটছে বিদ্যুৎচমকের মত উপলব্ধি করতে পারল সে, শুয়োরটা তার পিছনের বাম্পারে ধাক্কা মারছে। ভাগ্যিস ওভাররাইডার ফিট করা আছে, তা না হলে গাড়ির বডি তুবড়ে যেত। লোকটা পাগল নাকি! কি চায় সে!

লিমায় পৌঁছুনোর মেইন রোড আর তিনমাইল সামনে। মেইন রোডে উঠে একনাগাড়ে হর্ন বাজাবে সে, দেখা যাবে ভয় পেয়ে লোকটা পালায় কিনা। লোকটা যদি ট্যুরিস্ট হয়, তার জানার কথা নয় যে ওই রাস্তায় কেউ কখনও পুলিস দেখেনি। হর্ন বাজানোতেও যদি কাজ না হয়? সেক্ষেত্রে রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে ব্রাইট সান ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকতে হবে তাকে, টেলিফোন করার জন্যে। ক্যাডিলাকের নম্বরটা মনে গেঁথে রেখেছে সে, তার কাজিনের পক্ষে ম্যানিয়াকটাকে পাকড়াও করা কোন ব্যাপারই না।

আকস্মিক বিস্ময়ের সাথে জুয়েলা মাদ্রে দেখল, পিছন থেকে সরে গিয়ে ওকে পাশ কাটাচ্ছে ক্যাডিলাক। ওভারটেক করার সময় রাস্তার পাশে নেমে গেল গাড়িটা, এক রাশ ধুলো উড়িয়ে সামনের রাস্তা ধরে ছুটল, প্রায় অন্ধ করে দিল ওকে। ধেত্তেরি, গাফিলতি না করে রেডিও টেলিফোনটা লাগিয়ে নেয়া উচিত ছিল, ভাবল সে। আর, ফিদেলকে বলতে হবে রাস্তার কিনারাগুলো যেন পাকা করে। ক্যাডিলাক সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সীটে হেলান দিল সে। সামনে আর মাত্র দুটো বাঁক, সরল একটা বিস্তৃতি, তারপর আরেকটা বাঁক নিলেই ঝর্ণার ওপর ব্রিজ, ব্রিজ পেরোলেই মেইন রোড। লোকটা পিছনে থাকলে তিনটে বাঁক আর ব্রিজ পেরোতে কেমন লাগত তার!

প্রথম বাঁকটা পেরোল সে। পাগলটার কোন চিহ্ন নেই সামনে। দু'পাশে শুকনো পাথুরে দৃশ্য, দু'একটা গাছপালা, বালি। সামনে দ্বিতীয় বাঁক। গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে সানগ্লাস বের করে পরল সে, এই বাঁকটা ঘোরার সময় সামনে আলো থাকলে

চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ব্রেক করে গতি কমাল সে, বাঁক ঘোরার জন্যে তৈরি। সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরল সে, এবার সরল বিস্তৃতিটুকু পেরোতে হবে। ওমা, ওই দেখো, আবার! সরল বিস্তৃতির মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাডিলাক, এদিকে মুখ করে। বুকটা ধুকপুক করছে জুয়েলা মাদ্রের, ভয় পেয়েছে সে। পাগলকে বিশ্বাস কি, সোজা যদি তার দিকে গাড়ি চালিয়ে দেয়! তারপর, হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই বিদ্যুৎ চমকের মত, মাসুদ রানার চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার মুখে একখানা সানগ্লাস এঁটে দাও···হ্যাঁ, হতে পারে, লোকটা মাসুদ রানা হতে পারে!

প্রতিমুহূর্তে ক্যাডিলাকের কাছে চলে আসছে জুয়েলা মাদ্রে। না, লোকটা ধাক্কা মারতে চাইছে না। সেরকম যদি ইচ্ছে থাকে, এখানে নয়। রাস্তাটা সরু হলেও, দু'ধারে পাথর নেই, বিপদ দেখলে রাস্তা থেকে অনেকটা নেমে যেতে পারবে সে। কি করবে সে, কি করা উচিত? গাড়ি থামাবে? লোকটা কি মাসুদ রানা? তার দ্বারা একাজ সম্ভব? একা একটা মেয়েকে নির্জন রাস্তায় পেয়ে এভাবে ভয় দেখাবে, সে কি এতটা ছোট হতে পারবে? একটা ক্যাডিলাকের ওজন কত? সরাসরি একটা ক্যাডিলাকের সাথে ধাক্কা খাওয়া মানে সরাসরি একটা পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খাওয়া। লোকটার এঞ্জিন কি চালু? সম্মোহিতের মত রাস্তার মাঝ বরাবর একটা সরল রেখা ধরে গাড়ি চালাল সে। যদি কিছু করতে চায়, এবার লোকটা নড়বে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে, লোকটা যদি ক্যাডিলাক নিয়ে এগিয়ে আসে, ঝট করে ডান দিকে বা বাম দিকে সরে যাবে। দুটো গাড়ির মাঝখানে আর মাত্র বিশ গজ দূরত্ব, সামনের দিকে ঝুঁকে হুইলের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, গাড়ি থামানো উচিত হবে কিনা ভাবছে। কিন্তু না, দোটানায় পড়ে থামা হলো না, ক্যাডিলাককে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল অ্যাসটন মার্টিন।

রিয়ার ভিউ মিরর অ্যাডজাস্ট করল সে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাডিলাক। সামনে বাঁক, তারপর ব্রিজ, রাস্তার দু'ধারে পাথরের স্তূপ। আবার আয়নায় তাকাল সে, ক্যাডিলাক পিছু নেয়নি।

বাঁক ঘুরছে জুয়েলা মাদ্রে, হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। আরেকটা ক্যাডিলাক, হুবহু একই রকম দেখতে, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অ্যাসটন মার্টিনের পিছু নিল। সেই লোকটাই ড্রাইভ করছে, চোখে সানগ্লাস।

বাঁক ঘোরার সময় প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল জুয়েলা মাদ্রে, কাজেই ঠিক ব্রিজের সামনে স্তূপ করে রাখা পাথরগুলো দেখতে পায়নি সে। স্তূপটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, অ্যাসটন মার্টিনের শুধু ডান চাকা উঁচু হবে, প্রায় আট কি দশ ইঞ্চির মত, ফলে সরল পথ ত্যাগ করবে গাড়ি, দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ধাক্কা খাবে ব্রিজের পিলারে, গাড়ির নাক ঘুরে যাবে তাতে, কিন্তু থামবে না, কয়েক ফুট এগিয়ে কিনারা থেকে খসে পড়বে নিচের নালায়। নালায় পানি খুব কম, তবে স্রোত জোরাল, বড় বড় বোল্ডারগুলোকে কাতুকুতু দিয়ে ছুটে চলেছে। কিনারা থেকে লাফ দিল অ্যাসটন মার্টিন, শূন্যে। শূন্যে ডিগবাজি খেতে শুরু করল ওটা। নালা থেকে বিশ গজ ওপরে একটা ঝুল-পাথর রয়েছে, ট্যাংকের সাথে ধাক্কা খেলো সেটা, কনডেনসর থেকে আগুনের ফুলকি ছুটল। নালায় পড়ার আগেই আগুন ধরে গেল গাড়িটায়। অল্প পানি, আগুন নিভল না।

ভাড়া করা ক্যাডিলাক নিয়ে গ্যারেজে ফিরে এল চার্লি ফ্রানসি, দ্রুত ধাবমান একটা পুলিস কারকে পাশ কাটিয়ে এসেছে। জ্বলন্ত অ্যাসটন মার্টিনের ধোঁয়া উপত্যকার মাথার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছিল, লিমা-সান ক্রিস্টোবাল রোডের মোড় থেকে তা দেখতে পাওয়া গেছে।

'এক উন্মাদ আরব আমার সর্বনাশ করেছে,' গ্যারেজ মেকানিক অস্থির এবং উদ্বিগ্ন। 'কাল সন্ধ্যায় এক ঘণ্টার কথা বলে ভাড়া করল গাড়িটা অথচ দেখুন এখনও ফিরে আসার নাম নেই। লোকটা আপনার মতই দেখতে অনেকটা–মানে একই রকম লম্বা, তবে মাথায় কেজ ছিল, সানগ্লাসটাও আপনার মত। সে-ও একটা ক্যাডিলাক...'

'তাকে দিয়ে ফর্ম পূরণ করাওনি?' নিরীহ ভঙ্গিতে, যেন কিছুই জানে না, জিজ্ঞেস করল চার্লি ফ্রানসি। 'তার ড্রাইভিং লাইসেন্স, লিমার কোন্ হোটেলে উঠেছে...'

'লোভ করলে যে পাপ হয়, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, সিনর,' মাথার চুলে আঙুল চালাল মেকানিক। 'বলল: তোমার বস্ আসার আগেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব গাড়ি। তারপর নাকের সামনে ডলার ধরল...'

'তবু, উচিত ছিল ফর্মটা পূরণ করিয়ে নেয়া...'

'কি লাভ হত? কাল সকালে আপনি যখন গাড়ি বুক করতে এলেন, টের পাননি আমি লেখাপড়া জানি না?'

'শুধু ডলার চেনো, তাই না?' মেকানিকের বুক পকেটে একটা ডলার গুঁজে দিল চার্লি ফ্রানসি, হাসি চেপে বিদায় নিল।

তেরো

প্রথম পুলিস কারের ড্রাইভার অকুস্থলে পৌঁছে দেখল একটা পাথরের গায়ে নেতিয়ে পড়ে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, শরীরের অর্ধেকটা নালার পানিতে ডোবা। জ্ঞান হারায়নি, তবে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। ঢাল বেয়ে লোকটাকে নামতে দেখে আহত পশুর মত দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তারপর ইউনিফর্মটা চিনতে পারল সে, ড্রাইভারকে জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল।

আড়ষ্ট ড্রাইভার শান্ত করার চেষ্টা করল তাকে, তারপর ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দু'জন। আরেকটা পুলিস কার পৌঁছুল, কিনারায় দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে পুড়তে দেখল লোকগুলো। কারও কিছু করার নেই। প্রথম কার রেডিও যোগে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করেছে, জুয়েলা মাদ্রের নাম শুনে রেডিওর অপরপ্রান্তে হাজির হলেন লিমার পুলিস চীফ, লোকজনদের নির্দেশ দিলেন তাঁর কাজিনকে সরাসরি বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

পুলিস চীফ ওদের আগে পৌঁছুলেন জুয়েলা মাদ্রের বাড়িতে, হেলিকপ্টার নিয়ে

এসেছেন তিনি। সদর দরজার সামনে অপেক্ষা করছিলেন, পুলিস কার থেকে নামল জুয়েলা মাদ্রে, এগিয়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন তিনি, প্রায় বুকে জড়িয়ে তুলে নিয়ে এলেন বাড়ির ভেতর। এডনা দোরগোড়ায় ছটফট করছিল, তাকে দূরে সরে থাকার নির্দেশ দিয়ে জুয়েলা মাদ্রেকে নিয়ে সিটিংরূমে ঢুকলেন পুলিস চীফ।

'আমার লোকেরা ঘটনার যে বর্ণনা দিল,' তিনি বললেন, 'স্রেফ ভাগ্য গুণে বেঁচে গেছ তুমি!'

বাড়ি ফেরার পথে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, তবু ছোট্ট করে শুধু মাথা ঝাঁকাল সে, কথা বলল না। পুলিস চীফ সাথে করে একজন ডাক্তারকে এনেছেন। ভদ্রলোক বাথরূম থেকে বেরিয়ে এলেন, ওখানে তিনি বুদ্ধি করে ঢুকে পড়ে হাত ধুয়ে নিয়েছেন। 'দেখা যাক কতটা কি ক্ষতি হয়েছে,' বললেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে জুয়েলা মাদ্রেকে পরীক্ষা করলেন, বললেন, 'না, কোন হাড় ভাঙেনি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী, সিনোরিটা।' ব্যাগ খুলে কয়েকটা স্লীপিং পিল দিলেন তিনি। 'দুটো খেয়ে নেবেন, ঘুম হলে অস্থির ভাবটা কেটে যাবে।'

ডাক্তার বিদায় হওয়ার পর জুয়েলা মাদ্রেকে নিয়ে তার বেডরূমে চলে এলেন পুলিস চীফ। এখানে নিচু স্বরে, ফিসফিস করে কথা হলো।

'আমি ঠিক আছি,' কাজিনকে আশ্বস্ত করল জুয়েলা মাদ্রে। 'তুমি কি জানতে পেরেছ তাই বলো।'

পুলিস চীফ জানালেন, তার লোকেদের ধারণা, ব্রিজের সামনে পাথরগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ওভাবে রাখা হয়েছিল। একটা গাড়ি পাওয়া গেছে, খালি। কোত্থেকে ওটা ভাড়া করা হয়েছে তাও জানা গেছে। যে লোকটা ভাড়া করেছিল তার চেহারার বর্ণনা দিলেন তিনি–প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা, একহারা গড়ন, চোখে সানগ্লাস ছিল। 'তোমাকে শুধু আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই,' বললেন তিনি। 'উত্তর দেয়ার আগে মনে রেখো, মিডোর সেই লোকটা, মাসুদ রানা, তোমাকে অনুসরণ করেছিল, তোমার ব্যাগে মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখেছিল। আজ যা ঘটেছে, পরিষ্কার বোঝা যায়, তোমাকে খুন করতে চাওয়া হয়েছিল। এবার বলো, তুমি কি দেখেছ? এমন কিছু চোখে পড়েছে কি, যাতে মনে হয় লোকটা মাসুদ রানা ছিল? মাসুদ রানা কিংবা তার কোন লোক?'

প্রথম ক্যাডিলাকের কথা বলল জুয়েলা মাদ্রে, কিভাবে তার পিছনে লেগেছিল। তারপর দ্বিতীয় ক্যাডিলাকের কথা। সবশেষে সানগ্লাস পরা লোকটার চেহারার বর্ণনা দিল।

'লোকটা কি মাসুদ রানা, নাকি তার কোন সহকারী?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ।

'আমার ধারণা লোকটা স্বয়ং মাসুদ রানা,' জোর দিয়ে বলল জুয়েলা মাদ্রে।

হেলিকপ্টারে করে লিমায় ফেরার সময় রেডিও টেলিফোনে নিজের লোকদের নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ। প্রথম ক্যাডিলাকটার খবর যে এজেন্সি থেকে পাওয়া গিয়েছিল দ্বিতীয়টার খবরও সেখান থেকে পাওয়া গেল। টি. সিরিল নামে একজন ভাড়া

করেছিল সেটা, ঠিকানা দিয়েছিল নিউ ইয়র্কের। পুলিস সব ক'টা হোটেলে খবর নিয়ে দেখল, না, নিউ ইয়র্কের কোন টি. সিরিলকে বোর্ডার হিসেবে পাওয়া গেল না। ডিটেকটিভ চীফ মিডো লিমায় ফোন করে জানতে চাইলেন, নিউ ইয়র্ক অফিসে টি. সিরিল নামে কেউ আছে কিনা। ক্লার্ক মেয়েটা মিডো ওয়ার্ল্ড স্টাফ ডাইরেক্টরি চেক করে দেখল। 'হ্যাঁ, টি. সিরিল নামে নিউ ইয়র্কে আমাদের একজন আছে।' ডিটেকটিভ চীফের জানা নেই আমেরিকায় সিরিল একটা মেয়ের নামও হতে পারে। 'হ্যাঁ,' পুলিস চীফকে রিপোর্ট করলেন তিনি, 'টি. সিরিল নামে মিডো নিউ ইয়র্কে একজন লোক আছে বটে।'

'আমি মাসুদ রানাকে চাই,' পুলিস চীফ ডিটেকটিভ চীফকে বললেন, স্বভাববিরুদ্ধ প্রচণ্ড রাগে তিনি কাঁপছেন। 'সে যদি তোমার নাকের সামনে প্রেসিডেন্টের কোন টেলিগ্রাম নাড়ে, স্রেফ বলে দেবে তুমি পড়তে জানো না। ধরে আনো তাকে, সাথে ভিনসেন্ট গগলকেও চাই আমি।'

'ওদেরকে কোথায় আপনি চান, চীফ? আপনার অফিসে?'

'না, সেলারে।'

ডিটেকটিভ চীফের গম্ভীর মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল। এর আগে যে ভদ্রলোক পেরুর একনায়ক ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করত তাদেরকে ওই সেলারেই রাখা হত টরচার করার জন্যে।

রানা আর গগল শান্তভাবে এল। ওদেরকে নিয়ে আসার সময় হাপুসনয়নে কান্নাকাটি করল মার্ভেলা। পাহাড়ে থাকার সময় সেলার থেকে ফেরত আসা বিদ্রোহীদের সেবা-যত্ন করেছে সে। ফেরার পর খুব বেশি হলে এক হপ্তা বাঁচত তারা।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের পিছনের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন পুলিস চীফ। ওদেরকে তিনি ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা জানালেন, অনুরোধ করলেন পিছু নেয়ার জন্যে। পিছনের একটা হল হয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। হলে লোকজন বসে আছে, সবাই ইউনিফর্ম পরা। খুব ব্যস্ত, কেউ মুখ তুলে তাকাল না বা উঠে দাঁড়াল না। দু'জন সার্জেন্ট টেলিফোনে কথা বলছে। একটা লেদার মোড়া দরজার সামনে দাঁড়াল তিনজনের দলটা। পুলিস চীফ নিজে দরজা খুলে আলো জ্বাললেন। দরজার ভেতর দীর্ঘ সিঁড়ির পাথুরে ধাপ দেখা গেল। উৎকট দুর্গন্ধ ঘুসির মত লাগল রানার নাকে। সবার আগে থাকলেন পুলিস চীফ, মাঝখানে বন্দীরা, পিছনে ইউনিফর্ম পরা লোকজন, যারা ওদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছে। সিঁড়ির নিচে পৌঁছে নিজের লোকদের কি যেন বিড়বিড় করে বললেন পুলিস চীফ, লোকগুলো ফিরে গেল। সিঁড়ির মাথায় বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ছোট একটা হলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। পুলিস চীফ আরেকটা দরজা খুললেন, এটারও কবাট লেদার দিয়ে মোড়া, পিতলের নবে সবুজ শ্যাওলা জমেছে। আবার ওরা একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল, দু'পাশে পাঁচটা করে দরজা। প্রস্রাবের গন্ধে বমি পেল রানার। নাকে রুমাল চেপেও থাকা যাচ্ছে না। প্যাসেজের মাথায় এসে আরেকটা দরজা খুললেন পুলিস চীফ। একটা কামরায় ঢুকল ওরা, লম্বা এবং চওড়ায়

সেটা পঁচিশ ফুটের মত হবে। দেয়ালগুলো ভেজা ভেজা, বাতাসে গুমোট ভাব। কামরার মাঝখানে কয়েকটা লোহার চেয়ার, মেঝের কংক্রিটের সাথে লোহার পায়াগুলো গাঁথা। প্রতিটি চেয়ারের সাথে রয়েছে লেদার স্ট্র্যাপ। কামরার এক কোণে দুটো টেবিল, প্রতিটি টেবিলে ভোঁতা চেহারার টরচার-ইকুইপমেন্ট। হ্যামার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন, ছুরি-কাঁচি, চামড়া মোড়া ব্ল্যাকজ্যাক, চাবুক, পানি গরম করার স্টোভ, হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, স্টীলের রড ইত্যাদি সবই আছে।

'কামরাটাকে আমরা মিউজিয়াম হিসেবে রেখে দিয়েছি,' পুলিস চীফ বললেন। 'রাজনৈতিক শত্রুদের শায়েস্তা করার জন্যে ডিক্টেটর মহাশয় ব্যবহার করতেন এটা। তাঁর যুগ শেষ হয়েছে, তিনি যাদের ওপর অত্যাচার করতেন তাদেরই একজন এখন ক্ষমতায় রয়েছেন—জানেন আপনারা।' ওদেরকে নিয়ে আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি করিডরে। 'জানি গন্ধের কথা ভাবছেন। নিচের নর্দমায় মাসখানেক হলো একটা লিক দেখা দিয়েছিল, সেটা বন্ধ করার পরও এই অবস্থা।' করিডরের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা খুললেন তিনি, ভেতরে একটা লিফট দেখা গেল। সবাইকে নিয়ে তিনতলার নিজের অফিস স্যুইটে উঠে এলেন। বসতে বললেন ওদেরকে। তারপর বোতাম টিপে ডাকলেন তাঁর সেক্রেটারিকে। সেক্রেটারি মেয়েটা সুন্দরী, বয়স হবে বিশ কি বাইশ, ভেতরে ঢুকল একটা ট্রলি নিয়ে। সবার হাতে কফির কাপ তুলে দিল সে, সিগারেট আর চুরুট অফার করল।

পুলিস কার থেকে নামার পর রানা বা গগল কোন কথাই বলেনি। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে ওরা, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে, অপেক্ষা করছে পুলিস চীফ আর কি বলেন শোনার জন্যে। সন্দেহ নেই, গোটা ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছেন ভদ্রলোক।

'আপনারা আবার যদি আমার কাজিনের পেছনে লাগেন,' বললেন তিনি, 'তাহলে আবার আপনাদেরকে টরচার চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেবার শুধু নিয়ে যাওয়া হবে, বের করে আনা হবে না। ওখানেই আপনাদের অস্তিত্বের ইতি ঘটবে। বুঝতে পারছেন তো কি বলছি?'

'আমরা তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' জবাব দিল রানা। 'কিন্তু আমাদের সরকার বা আপনার প্রেসিডেন্ট বুঝতে চাইবেন বলে মনে হয় না।'

'তাদেরকে জানাচ্ছে কে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন পুলিস চীফ।

'জাস্ট আ মিনিট,' গগল বলল। 'আমার বন্ধুর সাথে একটু আলাপ করতে চাই।' সিনর মাদ্রে বাউ করে অনুমতি দিলেন। গগল তার গলা খাটো করল না, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝছি না, রানা। সিনর মাদ্রে বললেন, আবার। কিন্তু তুমি আমাকে জানিয়েছিলে জুয়েলা মাদ্রের ওপর থেকে সার্ভেইল্যান্স তুলে নেয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, গগল, বলেছিলাম।'

পুলিস চীফের দিকে তাকাল গগল। 'তাহলে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, সিনর মাদ্রে? আমার বন্ধুকে আমি চিনি, তার কথার নড়চড় হয় না কখনও।'

পুলিস চীফ তাঁর চেহারায় শান্ত সমাহিত ভাবটুকু ধরে রাখলেন। 'আপনি কি অস্বীকার করেন, সিনর রানা, আজ সন্ধ্যায় আপনি এবং আপনার নিউ ইয়র্ক অফিসের একজন সঙ্গী, আপনারা দু'জন মিলে আমার কাজিনকে একটা নালায় ফেলে দিয়ে খুন

করার চেষ্টা করেননি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'ঘটনাটা আজ সন্ধ্যায় ঠিক কখন ঘটেছে?'

'ঠিক সাতটা বিশ মিনিটে।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ম্লান হাসল রানা। 'আপনি লুসিয়ানা ফেরেলকে চেনেন, সিনর মাদ্রে?

'খুব ভাল করে চিনি, যদিও সামাজিক অর্থে নয়। আমাদের একটা জাতীয় সাপ্তাহিকের রিপোর্টার সে, নিউজউইক ছাড়াও কয়েকটা ইউরোপিয়ান পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধিও বটে। কেন?'

'লুসিয়ানা ফেরেলের সাথে কথা বলছিলাম, আমার অ্যাপার্টমেন্টে, সাতটা থেকে সাতটা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। তার সাথে একজন ফটোগ্রাফারও ছিল, এবং সে মিনতির সুরে গগলের একটা ফটো তোলার অনুমতি চাইছিল। অবশেষে সাতটা পনেরোয় অগত্যা রাজি হয় গগল। যতদূর মনে করতে পারছি, একটা শো-কেসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গগল, শো-কেসের মাথায় ছিল একটা টেবিল ঘড়ি–ইচ্ছে করলেই জেনে নিতে পারবেন ঠিক সাতটা পনেরোয় ছবিটা তোলা হয়েছে কিনা। ফটোগ্রাফার আমাদের তিনজনের একটা গ্রুপ ছবিও তোলে, হাতে গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। লুসিয়ানা ফেরেল পরে অবশ্য খুব করে চেয়েছিল আরেকটা ছবি তোলা হোক, গগল তার ঠোঁটে চুমো খাচ্ছে...কিন্তু আমার বন্ধু সেই মুহূর্তে তেমন উৎসাহ না দেখানোয়...'

'কারেক্ট, রানা, তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে না,' তাড়াতাড়ি বলল গগল।

সিনর মাদ্রে যেন পাথরের মূর্তি। শুধু তার পুরু, কালচে ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল, 'বেয়াড়া কমপিউটরের কারণে মিডো স্টীল কত টাকা খুইয়েছে, জানতে পারি?'

'মিডো থেকে ইউ.এম.পি-তে সরানো হয়েছে চার লক্ষ সাতান্ন হাজার ছ'শো বিশ সোলস এবং একষট্টি সেন্টাভোস।'

'ফোর ফাইভ সেভেন সিক্স টু ওহ্ পয়েন্ট সিক্স ওয়ান,' বললেন সিনর মাদ্রে, মাথা নিচু করে কিসে যেন সংখ্যাগুলো লিখলেন। তারপর এক টানে একটা সই করলেন বলে মনে হলো। কাগজটা যখন ছিঁড়লেন, ওরা দেখল ওটা একটা চেক। 'আমার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে পুরো টাকাটা মিটিয়ে দিলাম,' বললেন তিনি, বিধ্বস্ত এবং পরাজিত দেখাল তাঁকে। 'এবার দয়া করে আমার কাজিনকে রেহাই দিন, আমাকে রেহাই দিন, আমাদের পরিবারটিকে রেহাই দিন। মাদ্রে পরিবারে যদি কোন কলঙ্ক থাকে, সব ধুয়েমুছে পরিষ্কার করার দায়িত্ব আমরাই নেব।' সিনর মাদ্রে এবার ধনী ও সৌখিন ব্যক্তি হিসেবে নন, নিবেদিতপ্রাণ পুলিস কর্মকর্তা হিসেবে নন, মাদ্রে সাম্রাজ্যের প্রধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

চেকটা নিয়ে গগলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

'বিচ্ছিরি 'দুর্ঘটনা'টা ঘটে যাবার পর,' পুলিস চীফ আবার বললেন, 'আমার কাজিনের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখার জন্যে পুলিসের একটা দলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাকে যদি কোন অপরাধের সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়, আমাদের

আইন অনুসারে তার শাস্তির ব্যবস্থা হবে। যদি দেখা যায় আপনারা বা আপনাদের লোকজন তার পেছনে লেগেছেন, সরাসরি গুলি করার নির্দেশ দেব আমি।'

রানা বুঝতে পারল, সিনর মাদ্রে ঘাবড়ে গেছেন, সম্ভবত এই প্রথমবার পরিবারের একজনের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না তিনি। আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না, এ-ধরনের চিন্তা উদয় হওয়া স্বাভাবিক। তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছেন মাসুদ রানা বা ভিনসেন্ট গগলের মত মানুষ, মিভো স্টীল কনসোর্টিয়ামের মত প্রতিষ্ঠান কোন কারণ ছাড়া কাউকে বিরক্ত করতে পারে না। মাসুদ রানা আর ভিনসেন্ট গগল যদি 'দুর্ঘটনা'-র জন্যে দায়ী না হয়, তাহলে সন্দেহ না করে উপায় থাকে না যে জুয়েলা মাদ্রে কোনভাবে হয়তো পরিবারের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে বসেছে।

'কাউকে বিরক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, সিনর মাদ্রে,' বলল রানা। 'আমরা শুধু একজনকে ধরতে চাই, আমাদের অ্যাকাউন্টে ঘাপলা করছে সে। তদন্তে যদি দেখা যায় সে আপনার কাজিন, আপনাকে আমরা জানাব। চেক অফার করে আপনি যে ভাবটা প্রকাশ করলেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। যখন খুশি ইচ্ছে করলেই ইউ.এম.পি. থেকে আমাদের টাকা আমরা ফিরিয়ে নিতে পারি।' চেকটা গগলের হাত থেকে নিয়ে ডেস্কের ওপর সিনর মাদ্রের সামনে রাখল ও। 'আমরা এখন যাব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সিনর মাদ্রে বললেন। 'আমার গাড়িটা আনতে বলি।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই···'

'নিদেনপক্ষে এইটুকু আমাকে করতে দিন···'

ড্রাইভার সহ পুলিস লিংকন অপেক্ষা করছিল বাইরে। পুলিস চীফের সাথে পিছনের সীটে উঠে বসল ওরা। দুশো গজও এগোয়নি গাড়ি, রেডিও টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যান্ডসেটের দিকে ফিরেও তাকালেন না পুলিস চীফ, কলটা লাউডস্পীকারে তুলে দিল ড্রাইভার। সান ক্রিস্টোবাল থেকে এল মেসেজটা, 'চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে আমাদের সাবজেক্ট।'

চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করলেন পুলিস চীফ, ব্যথায় কাতর। আঙুল দিয়ে কপালের দু'পাশ টিপে ধরলেন তিনি। 'ওদের জিজ্ঞেস করো কিভাবে ঘটল,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

লোকগুলোকে বাড়ির ভেতর আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এডনা। জুয়েলা মাদ্রে ওদের সবাইকে বিয়ার খেতে দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় ঘুমানোর জন্যে। সে-সময় বাড়ির ভেতর দু'জন লোক ছিল, অপরজন ছিল বাড়ির পিছন দিকে, বাইরে। এডনা তার মিসট্রেসের বেডরূম থেকে একবার ঘুরে আসে, দেখে জুয়েলা মাদ্রে ঘুমাচ্ছে। এরপর লোক দু'জনকে নিয়ে কিচেনে ঢোকে সে, ওদের জন্যে সাপার পরিবেশন করে। বাড়ির পিছন থেকে অপর লোকটাও সাপার খাবার জন্যে ভেতরে আসে। ওরা সবাই খাচ্ছে, এই সময় গ্যারেজের ভেতর ফেরারীটা স্টার্ট নেয়। লোকগুলো ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে, কিন্তু ততক্ষণে ফেরারী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। ধাওয়া করা সম্ভব হয়নি, কারণ ওদের কারের চাকা থেকে বাতাস বের করে দেয়া হয়েছে। রেডিওটাও নষ্ট করে রেখে গেছে। জুয়েলা মাদ্রের বাড়ির টেলিফোনের তার ছেঁড়া পাওয়া গেছে। আধ মাইল দৌড়ে এসে নিকটতম প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে টেলিফোন করছে ওরা। এডনা তার মিসট্রেসের প্রতি চিরকাল বিশ্বস্ত, সে-কারণেই

কিনা কে জানে, ফেরারীর নম্বর মনে করতে পারছে না। তবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, ওটার রঙ লাল।

'ওখানেই থাকতে বলো ওদেরকে,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ। 'হেডকোয়ার্টার থেকে চারটে টায়ার নিয়ে ওখানে যেতে বলো কাউকে। সবগুলো স্টেশনকে জানাও, আমরা একটা লাল ফেরারী খুঁজছি, নম্বর পরে জানানো হবে। ফেডারেল ইস্যুরেন্সে লোক পাঠিয়ে খবর নিতে বলো, মাদ্রে পরিবারের সব ধরনের বীমা ওরাই করে–ফাইলে নিশ্চয়ই ফেরারীর নম্বর পাওয়া যাবে। নম্বর লাগবেই, তা নয়–লিমায় ফেরারী আছেই বোধহয় চার কি পাঁচটা, সবগুলো লাল হতে পারে না।'

নির্দেশ শুনছে এবং পালন করছে ড্রাইভার, যদিও গাড়ি থেমে নেই। অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের কাছাকাছি চলে এল ওরা। রানা ইংরেজীতে বলল, 'সিনর মাদ্রে, আপনার ড্রাইভার এক মিনিটের জন্যে আমাদেরকে ছেড়ে যাবে?'

আঞ্চলিক ভাষায় নির্দেশ দিলেন পুলিস চীফ, গাড়ি থেকে নেমে দশ গজ এগোল ড্রাইভার, রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে থাকল, স্থির একটা মূর্তি। পরবর্তী নির্দেশ না পেলে সারারাত ওখান থেকে নড়বে না সে।

'আপনার কাজিন কোথায় যেতে পারে আমি আন্দাজ করতে পারছি,' বলল রানা।

'কোথায়?'

'ইয়ে, মানে, লন্ডনে।'

'তাহলে তাকে আমরা এয়ারপোর্টে ধরব...'

মাথা নাড়ল রানা। 'লন্ডন,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও, 'লিমায়।'

রীতিমত একটা ঝাঁকি খেলেন সিনর মাদ্রে, যেন অদৃশ্য হাতের ঘুসি খেয়েছেন, তাও আবার বেল্টের নিচে। 'তা সম্ভব নয়,' ফিসফিস করলেন তিনি। 'কোন মাদ্রে কখনোই...এমনকি পুরুষরা পর্যন্ত... না, অসম্ভব!'

জুয়েলা মাদ্রেকে অনুসরণ করার ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা।

পুলিস কার থেকে নেমে রানার অ্যাপার্টমেন্টে উঠল ওরা। একটা নম্বরে ডায়াল করল রানা, অপরপ্রান্ত থেকে সাথে সাথে সাড়া পাওয়া গেল। 'ওয়ান টু ফাইভ।'

দ্রুত কথা বলল রানা, 'থ্রী সিক্স। ওয়ান সেভেন, অ্যান ওল্ড ওয়ান, হিয়ার, বাট টোয়েনটি-নাইন টু ওহ্-টু-ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ-থ্রী।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

সিনর মাদ্রে এবং গগল, দু'জনেই ওর কথা শুনেছে। গগল ওর দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে। পুলিস চীফের চেহারায় খানিকটা মুগ্ধ বিস্ময়।

'এত তাড়াতাড়ি এবং সাফল্যের সাথে আপনি যদি একটা টীম তৈরি করে ফেলতে পারেন, বিশেষ করে এই লিমায়,' বললেন তিনি, 'আপনার তাহলে একজন পুলিস চীফ হওয়া উচিত। থ্রী সিক্স মানে, আমি ধরে নিচ্ছি, "অলরাইট, ইট'স মাসুদ রানা" কোড। থ্রী সেভেন হলে তার মানে দাঁড়াত, সম্ভবত, "দিস ইজ মাসুদ রানা বাট আই য়্যাম আন্ডার ডিউরেস"।'

আরেকজন প্রফেশনালকে চিনতে পেরে মিটিমিটি হাসছে রানা। 'সেভেনটিন, সিনর? ব্যাখ্যা করার ঝুঁকি নেবেন?'

'আপনার কোন দোষ নেই, সিনর রানা। আপনি তাড়াহুড়োর মধ্যে রয়েছেন,

কাজেই আমাকে একটা সূত্র দিয়ে ফেলেছেন–'অ্যান ওল্ড-ওয়ান, হিয়ার"। ওয়ান সেভেন হলো একটা গাড়ি, তবে সেটা পুরানো হওয়া দরকার, ডেলিভারি চেয়েছেন আপনার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। টু-নাইন টু ওহ্-টু-ফাইভ–এখানে আমাকে আন্দাজের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, রিয়েলি। টোয়েনটি-নাইন অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু যেহেতু ওটার আগে টু ওহ্-টু-ফাইভ রয়েছে, আমি ধরে নেব টোয়েনটি-নাইন একটা রেডিও, এবং আপনি চান রেডিওটা একটা ওহ্-টু-ফাইভ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। শেষটা সহজ–'ফিফটি-থ্রী"। এর মানে হলো, কাজগুলো আপনি তাড়াতাড়ি করতে বলছেন। সব মিলিয়ে দাঁড়াল–পুরানো একটা গাড়ি দ্রুত ডেলিভারি চান আপনি, তাতে ওহ্-টু-ফাইভ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে একটা রেডিও থাকবে।'

'সংকেতের ভাষা যদি সবাই বুঝেই ফেলে, তার উপকারিতা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল গগল।

'সিনর রানা আমাকে বোঝার সুযোগ দিয়েছেন, তাছাড়া আমার অভিজ্ঞতারও খানিকটা অবদান রয়েছে,' হাসতে হাসতে বললেন পুলিস চীফ। 'ইচ্ছা করলে উনি আমার কাছেও দুর্বোধ্য থাকতে পারতেন। সে যাই হোক, সিনর রানার কাজের পদ্ধতি এবং দক্ষতা দেখে সত্যি আমি মুগ্ধ।'

'কিন্তু সেলারে বেড়াতে নিয়ে যাবার সময়...'

'ভুলে যান, সিনর গগল,' তাড়াতাড়ি বললেন পুলিস চীফ। 'আমি অন্ধকারে ছিলাম, এখন তিক্ত বাস্তবতার মধ্যে আমার ঘুম ভেঙেছে। কোন মাদ্রে, তা সে যে-ই হোক, ওরকম একটা নোংরা জায়গায় যেতে পারে...'

'জায়গাটা এতই যদি খারাপ, বন্ধ করে দেননি কেন?' জিজ্ঞেস করল গগল। 'সে ক্ষমতা আপনাদের আছে।'

'উত্তরটা আমি দেব?' সিনর মাদ্রেকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে রানা। 'অশুভ ব্যাপারস্যাপার সব সমাজেই ছিল, এবং থাকবে। যে-কোন পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞেস করো, সে দ্বিধা না করে বলবে নোংরামি এবং অপরাধকে বরং পরিচিত কোণায় জড়ো হতে দেয়া ভাল। টোকিওতে গিঞ্জা আছে, লন্ডনে আছে সোহো, হ্যামবুর্গে রিপারবান, ঢাকায় কান্দুপট্টি, লিমায় লন্ডন। দেখে মনে হয় বটে ওগুলো থাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, আসলে তা নয়; বরং উল্টোটা সত্যি। অবশ্য কোন সমাজে যদি সবার জন্যে সব ব্যাপারে সমান সুযোগ থাকে, যদি শোষণ-বৈষম্য-অন্যায়-বিধিনিষেধ না থাকে, তাহলে ওগুলো আপনাআপনি উঠে যাবে, তুলে দিতে হবে না।'

নক হলো দরজায়। পুরানো একটা গাড়ি হাজির, রেডিও আর ড্রাইভার সহ। হাম্বার পুলম্যান, দেখে মনে হলো সামনের মোড় পর্যন্তও বোধহয় যেতে পারবে না, তার আগেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। পাঁচটা সীট, অতিরিক্ত দুটো জাম্প সীট-ও আছে। একটা জাম্প সীটের ডালা খোলার পর দেখা গেল রেডিওটা; নতুন, একেবারে ঝকঝক করছে। পুলিস চীফ তাঁর গাড়িটাকে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিলেন, উঠে বসলেন হাম্বার পুলম্যানে। গগল জেদ ধরল, সে-ও ওদের সাথে যাবে।

'জায়গাটা যদি সত্যি এতই খারাপ হয়,' বলল সে, 'আমিও অন্ধকারে থাকতে চাই না।'

পুলিস চীফ রেডিও যোগে হেডকোয়ার্টারকে জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে।

রওনা হয়ে গেল ওরা।

আগের বারের মত চার্চে ওরা মিলিত হলো না, জুয়েলা মাদ্রের লাল ফেরারীটা ওখানে রাখলে বিপদ হতে পারে। ফসেট স্ট্রীটে, হোর্স শাভেজ এয়ার টার্মিনালে পরস্পরের সাথে দেখা করল ওরা, বিল্ডিঙে ঢোকার মুখে ডান দিকের কার পার্কে থাকল ফেরারী, আরও প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা গাড়ির সাথে।

'লন্ডনে' এল ওরা অরবিটাসের পন্টিয়াকে চড়ে, তার ড্রাইভার প্রবেশপথের সামনে গাড়ি থামাল। জুয়েলা মাদ্রে এখনও তার ট্রাউজার স্যুট আর বেরেট পরে আছে। বেরেটের ভেতর চুল ঢেকে নেয়ায়, ওই পোশাকে একজন সৈনিক হিসেবে পার করে দেয়া যায় তাকে। কেউ তার দিকে দ্বিতীয় বার তাকাল না। সিক্সটিনা জানে না ওরা আসছে, কাজেই দলটাকে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো বাইরে। ওদের পিছনে লাইন লম্বা হচ্ছে দেখেও কেউ কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল, ভেতরে ঢোকার পর বন্ধ দরজা আর না খুললেই হবে। চারদিকের দৃশ্য এবং দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল জুয়েলা মাদ্রে। আরেকটা চিন্তা তাকে আড়ষ্ট করে তুলল—পুরুষরা এখানে যে কাজটা সারতে এসেছে। অরবিটাস, মাদ্রে আর পাকোর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না সে। ভাবল, এখানকার মেয়েদেরকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, ওরা কি তাকেও সেভাবে ব্যবহারের স্বপ্ন দেখছে? দু'জন শ্বেতাঙ্গ ট্যুরিস্টকে এদিকে আসতে দেখা গেল। তাদের একজনকে মন্তব্য করতে শোনা গেল, 'এটা নির্ঘাত খাসা একটা মাল হবে, দেখছ না কেমন লম্বা লাইন পড়েছে!' অপরজন তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করল, 'আহ্, আস্তে!'

এই সময় সিক্সটিনার দরজা খুলে গেল, প্রৌঢ় একলোক এক গাল হাসি নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে, বোঝা গেল পিঠে সিক্সটিনার ধাক্কা খেয়েছে। ওদেরকে দেখে কৃত্রিম রাগের বদলে হাসি ফুটল সিক্সটিনার মুখে। 'আপনারা এসে ভালই করেছেন,' ওদেরকে ভেতরে টেনে নিয়ে বলল সে, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। 'এই সুযোগে খানিকটা বিশ্রাম পাব।' বিছানার একধারে শুয়ে পড়ল বেচারি, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে হাঁপাতে লাগল। 'আপনাদের যদি কিছু দরকার হয়...' কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না, ওদের মীটিং শুরু হয়ে গেছে।

'যা করার এখুনি করতে হবে,' বলল জুয়েলা। 'আমার কাজিন আমাকে চোখে চোখে রাখছে। পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। কিন্তু এর জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। সব তৈরি কিনা বলো...'

আইনবিদ অরবিটাস ভারী উদ্বিগ্ন। 'এরকম তাড়াহুড়ো করার বিরোধী আমি,' বলল সে। 'সত্যি সত্যি আরও সময় দরকার আমার। তাছাড়া, গোমেজ বিউমাচারের ব্যাপারটা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত...আরেকজনের কথা ভুললে চলবে না—মেক্সিকান লোকটার কথা বলছি...' অরবিটাস সবসময় অতিরিক্ত সাবধান।

'না, আর দেরি করা চলে না,' জেদ ধরল জুয়েলা মাদ্রে।

এরপর কথা বলল ব্যাংকার মাদ্রে, 'আমার ডিপার্টমেন্টে কোন অসুবিধে নেই। আমাদের যথেষ্ট ফান্ড রয়েছে, তাছাড়া লোকজন রি-ইনভেস্ট করার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রয়োজনে আমরা কালই প্ল্যান্টটা কিনে ফেলতে পারি।'

'যদি ওটার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ না করে,' অরবিটাস বলল।

পাকো বলল, 'আমি যে ইনফরমেশন পেয়েছি, পলিটিক্যাল টেক-ওভারে প্রেসিডেন্ট রাজি নন।'

ব্যস্ততার সাথে তর্ক করতে লাগল ওরা। দশ মিনিট পর জুয়েলা মাদ্রে বলল, 'আমাকে তোমাদের আর দরকার নেই, ওদিকে আমার অনেক কাজ আছে। গাড়ি আর ড্রাইভারকে নিয়ে যাচ্ছি, ফেরত চলে আসবে...'

খুপরি থেকে বেরিয়ে এল সে, ভিড় ঠেলে প্রবেশপথের দিকে এগোল। কেউ একজন শিস দিল তাকে লক্ষ করে, ফিরেও তাকাল না জুয়েলা মাদ্রে। ব্রথেল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল, ড্রাইভারকে বলল, 'চলো।'

রাস্তার শেষ মাথায় হাম্বার পুলম্যানকে পাশ কাটাল পন্টিয়াক, তবে ইতোমধ্যে ব্যাক সীটে কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছে জুয়েলা মাদ্রে, দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা, চেষ্টা করছে যাতে বমি না করে ফেলে।

অনেক গাড়িই আসা-যাওয়া করছে, সামনে থেকে দেখে পন্টিয়াকটাকে চিনতে পারল না রানা। ওর এই ব্যর্থতাকে ছোট করে দেখা যায়, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে রেডিওতে একটা মেসেজ আসতে শুরু করল। 'ওয়্‌-টু-ফাইভ হিয়ার, রিপোর্ট ইওর পজিশন।'

নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানাল রানা। পরমুহূর্তে স্টেশন থেকে ওকে জরুরী একটা খবর দেয়া হলো।

'এই মাত্র প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন আপনি কোথায়!'

চোদ্দ

হাম্বার পুলম্যানে বসে আছে ওরা, পতিতালয়ের সদর দরজার দিকে চোখ, এই সময় ফিরে এল পন্টিয়াক। পিছন থেকে দেখে, তোবড়ানো অংশ আর ভাঙা রিয়ার লাইটের খোপ চিনতে পারল রানা। 'এই গাড়িটাই ওরা ব্যবহার করে।'

'ওতে লোক রয়েছে মাত্র একজন,' সিনর মাদ্রে বললেন।

'বাকি সবাই হয়তো মাথা নিচু করে আছে।'

গাড়িটা থামল, ঘুরল, স্থির হলো রাস্তার একধারে। সীটে হেলান দিয়ে সব আলো নিভিয়ে দিল ড্রাইভার।

'এরপর কি?' জিজ্ঞেস করল গগল।

'আগেই হয়তো ওরা ভেতরে ঢুকেছে,' বলল রানা, বুঝতে পারছে কোথাও ভুল হচ্ছে ওদের।

'ডাক্তার আর পুলিস দেখলে পালাত মেয়েগুলো, তাদের সাথে অর্ধেক খদ্দেরও। তাই নেট দিয়ে পিছনের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে,' বললেন পুলিস চীফ। 'নেটটা প্রতিদিন চেক করা হয়। ভেতরে যারাই থাকুক, সামনের দরজা দিয়েই বেরুতে হবে। আমি যাচ্ছি, ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওকে আপনারা আটকে রাখবেন।'

গাড়ি থেকে নেমে পন্টিয়াকের দিকে এগোলেন তিনি। তাঁর দিকে একটা চোখ রেখে তৈরি হয়ে থাকল রানা, দরকার হলে সাহায্যের জন্যে ছুটে যাবে। ধীর পায়ে পন্টিয়াকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ, ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে দেখালেন তার গাড়ির পার্কিং লাইট জ্বলছে না। এরপর তিনি সরে এসে দাঁড়ালেন জানালার পাশে। ঝুঁকে কি বললেন তিনিই জানেন, পন্টিয়াক থেকে নেমে হাম্বার পুলম্যানের দিকে হেঁটে এল ড্রাইভার। পন্টিয়াকে ঢুকলেন সিনর মাদ্রে, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

সামনের দরজা খুলে দিল রানা, পন্টিয়াকের ড্রাইভার ভেতরে ঢুকল। 'চুপচাপ বসে থাকো,' তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল রানা। 'আমরা তোমাকে ধরার জন্যে আসিনি।'

পন্টিয়াকের ড্রাইভার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখল ওদেরকে, বলল, 'উনি বললেন, আপনারা একটা সাব-মেশিনগান তাক করে আছেন আমার দিকে!'

'চোপ্!'

শুরু হলো আবার অপেক্ষার পালা। প্রায় আধ ঘণ্টা পর জুয়েলা মাদ্রের সঙ্গীরা বেরিয়ে এল দরজা দিয়ে, পন্টিয়াকে উঠল। স্টার্ট নিল পন্টিয়াক, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। লোকগুলোকে কি বলেছেন পুলিস চীফ কে জানে, তবে তারা কেউ দরজা খুলে পালানোর চেষ্টা করল না। হাম্বার পুলম্যানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পন্টিয়াক। নিচে নামল রানা।

'এদের সবাইকে আমি চিনি,' রানার সামনে দাঁড়িয়ে পুলিস চীফ বললেন, ইতোমধ্যে তাঁর চেহারা এবং হাবভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। 'এরা সবাই আমার ক্লাবের সদস্য।'

'আর জুয়েলা মাদ্রে?'

'ওরা বলছে, তাকে ওরা দেখেনি, দেখার প্রশ্নই আসে না...'

'এখানে ওদের আসার কারণ?'

'ওরা লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। লন্ডনের কথা বহুদিন ধরে শুনছে, তাই দেখতে এসেছে পরিবেশটা।'

'আপনি ওদের কথা বিশ্বাস করছেন, সিনর মাদ্রে?'

'একজন পুলিসকে কিছু বিশ্বাস করাতে হলে প্রমাণ দেখাতে হবে, সিনর রানা। এখানে আমি তিন যুবককে পেয়েছি, যারা নিজেদেরকে ছোট করেছে। কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আমার কাজিনকে এখানে পাওয়া যাবে। ওরা তার সম্পর্কে কিছু জানে না বলে দাবি করছে।'

'মনে হচ্ছে আপনি ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' বলল রানা। 'জায়গাটা একবার সার্চ করে দেখবেন না?'

'কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন, আমার কাজিন এখানে আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন পুলিস চীফ।

'না, তা পারি না। এর আগে একবার আপনার কাজিনকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিলাম, এই তিনজন লোকের সাথে গোপন একটা মীটিং করেছিল সে…'

'আপনি ঠিক জানেন, সিনর রানা? এদের আপনি চিনতে পারছেন বলে দাবি করছেন?'

পন্টিয়াকে এইমুহূর্তে যারা রয়েছে, জুয়েলা মাদ্রের সাথে প্রথম দিন কি এদেরকেই দেখেছিল রানা? হলফ করে বলতে পারবে ও? অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নাড়ল রানা। কে জানে, জুয়েলা মাদ্রে হয়তো ব্রথেলের ভেতর নেই। তাকে একা রেখে লোকগুলো বেরিয়ে আসবে, সে সম্ভাবনা কম। হঠাৎ করেই পন্টিয়াকের ফিরে আসার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারল রানা। 'আপনার কাজিন এখানে ছিল,' বলল ও। 'কিন্তু চলে গেছে। তাকে রেখে ফিরে এসেছে গাড়িটা।'

কিন্তু না, সিনর মাদ্রে এখন আর রানার কথা বিশ্বাস করতে রাজি নন। পারিবারিক সম্মান আবার তাঁর চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 'আমি জানি না ঠিক কি চান আপনি, তবে এটুকু বুঝতে পারছি, আমার কাজিনের ওপর আপনার রাগ আছে। এই শেষবারের মত আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, সিনর রানা, ওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আবার যদি আপনি নাক গলান, আমি আপনাকে ছাড়ব না।' পন্টিয়াকে উঠে পড়লেন তিনি, রানা বা গগলের সঙ্গ পরিহার করতে চাইছেন। ঠিক এই সময় হাম্বার পুলম্যানের রেডিও জ্যান্ত হয়ে উঠল।

পন্টিয়াকের এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। পুলম্যান থেকে নেমে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা। জানালার দিকে মাথা নামিয়ে বলল, 'সিনর মাদ্রে, আপনার মেসেজ।'

ছোট্ট, পরিষ্কার মেসেজ। এই মুহূর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছুতে হবে পুলিস চীফকে, প্রেসিডেন্ট তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তিনি যাবেন কিভাবে, পন্টিয়াক স্টার্ট নিচ্ছে না। মিনিট পাঁচেক পর ছুরির মত ধারাল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন তিনি, গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনার গাড়িটা পেতে পারি, সিনর রানা, প্লীজ?'

রানা আর গগল দু'জনেই নেমে পড়ল পুলম্যান থেকে। সিনর মাদ্রেকে নিয়ে গলি থেকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পুলম্যান অদৃশ্য হয়ে যেতেই স্টার্ট নিল পন্টিয়াক, ওটার এগজস্ট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে সেটাও অদৃশ্য হয়ে গেল গলির মাথা থেকে।

'ভেতরে ঢুকবে নাকি হে?' গগলকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি যাচ্ছি, ইচ্ছে করলে তুমিও আসতে পারো।'

'কিন্তু কেন!' আকাশ থেকে পড়ল গগল।

'জুয়েলা মাদ্রে এখানে আজ এসেছিল কিনা জানা দরকার,' বলল রানা। 'কাজটা যখন পুলিস করবে না তখন…'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানার পিছু নিল গগল।

ক্যালে উকাইলির প্রাচীন একটা ইমারতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সতেরোশো পঁয়ত্রিশ

সালে তৈরি, স্থাপত্য রীতিতে আরব প্রভাব স্পষ্ট।

বাঁক নিয়ে ক্যালে উকাইলিতে পৌছুল গাড়ি, পুলিস চীফ দেখলেন তাঁর বাহিনীর অর্ধেক লোকই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে জড়ো হয়েছে। ব্যাপার যে গুরুতর তাতে কোন সন্দেহ নেই। পুলিস বাহিনীর সাথে প্রেসিডেনশিয়াল গার্ডরাও রয়েছে। সামনের দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে নিজের পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো তাঁকে। লম্বা হলঘর পেরিয়ে প্রশস্ত একটা চেম্বারে ঢুকলেন তিনি। সোফা বা আরাম কেদারা নয়, শুধু টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো মাঝখানে একটা ডেস্ক, পিছনে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর পরনে জেনারেল অভ আর্মির পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম। দরজা থেকে আগেই সিনর মাদ্রের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ডেস্কে তাঁর সামনে রাখা কাগজ-পত্র থেকে চোখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, হাত-ইশারায় পুলিস চীফকে সামনে এগোবার নির্দেশ দিলেন। প্রেসিডেন্টের বাঁ দিকে রয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আর কমার্স ও ট্রেড ডিপার্টমেন্টের প্রধান। তাঁর ডান দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাফায়েল পেড্রো। সিনর পেড্রোর অফিশিয়াল পজিশন কি সে-সম্পর্কে কারও কিছু জানা নেই, তবে পুলিস চীফ গোপন সূত্রে শুনেছেন তিনি নাকি প্রেসিডেন্টের বিশেষ বাহিনী সিক্রেট পুলিসের প্রধান। ধীর পায়ে হেঁটে এসে ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ। প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর চাবুকের মত বাতাসে শিস তুলল, 'এই মুহূর্তে বলতে আপনি যদি আধ ঘণ্টা পর বোঝেন,' তিনি বললেন, 'তাহলে ধরে নিতে হয় লিমায় নতুন একজন পুলিস-চীফ প্রয়োজন।'

সিনর মাদ্রে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন, তাঁর চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। তিনি জানেন শক্তিমান লোককে পছন্দ করেন প্রেসিডেন্ট, ঘৃণা করেন দুর্বলকে। তিনি আরও জানেন, নার্ভাস বোধ করলে প্রেসিডেন্ট মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না, কণ্ঠ থেকে অকারণে আগুন ঝরে।

ডেস্কের ওপর রাখা কাগজগুলোর ওপর টোকা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'এগুলো আবিষ্কার করা হয়েছে একটা গাড়িতে। একটা বিদেশী কোম্পানীর পার্কিং লটে ছিল গাড়িটা। অজ্ঞাতনামা এক লোক টেলিফোন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানায়। কাগজগুলো এক সেট ইনস্ট্রাকশন, ব্লু-প্রিন্ট বলতে পারেন, ওই বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বার্থে তৈরি করা, উদ্দেশ্য আমাদের দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়ে দেউলিয়ার পর্যায়ে নামিয়ে আনা। ডকুমেন্টগুলো পাবার পর পরিষ্কার হয়ে গেছে, আলোচ্য বিদেশী কোম্পানীটি শুধু এই দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করতে চাইছে না, ধ্বংস করতে চাইছে এই দেশের সরকারকে, আমার অফিসকে। এ-ব্যাপারে এই মুহূর্ত থেকে তদন্ত পরিচালনা করবেন সিনর রাফায়েল পেড্রো, আপনি তাঁকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করবেন। বুঝতে পারছেন, সিনর মাদ্রে?'

'ইয়েস, এক্সেলেন্সি। বিদেশী কোম্পানীটির নাম জানতে পারি, স্যার?'

'আমাকে বলা হয়েছে ডকুমেন্টটা একটা কমপিউটরের প্রিন্টআউট–মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের সম্পত্তি।' প্রেসিডেন্ট চেয়ারে হেলান দিলেন। 'দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট,' বললেন তিনি। 'অপারেশনের কোড নেম।'

অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে ওরা মাত্র পা রেখেছে, সাদা টেলিফোনটা

ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল। সরাসরি মিডো এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত ওটা। রিসিভার কানে তুলে অপেক্ষায় থাকল রানা, আন্তর্জাতিক লাইনের পরিচিত শব্দকোলাহল শুনতে পেল। ডিকোড বাটনে চাপ দিল ও, পরিষ্কার ভেসে এল হেলেন জার্মানের গলা, যেন পাশের কামরা থেকে কথা বলছে সে।

'মি. রানা,' বলল হেলেন জার্মান, উত্তেজিত, 'কাজটা কিভাবে করা হয়েছে ধরে ফেলেছি আমি।'

'আমাকে আন্দাজ করতে দাও,' বলল রানা। 'ভৌতিক ফিগারস্ যেগুলো বারবার ডাটা বেসে ফিরে আসছিল, তুমি সেগুলো ডিসাইফার করতে পেরেছ?'

'ঠিক তাই, মি. রানা। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত ধরা দেয় ব্যাপারটা। ওই ডিজিটগুলো একটা মেমোরির ইউনিট হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেনি। ওগুলো আসলে...আ প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাকশন প্লাস আ মেমোরি। প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাকশন প্রতিটি ডাটা বেসে আগে থেকেই বসানো ছিল। এই নতুন প্রোগ্রামিং ইনস্ট্রাকশন-বার-এ দাঁড়িয়ে একজন লোক যেমন বলে—শুধু জানায়, সেইম এগেইন। এই ইনস্ট্রাকশন স্থায়ী, শুধুই রিপিট করতে থাকবে।'

'বেশ,' বলল রানা। 'ওটা তাহলে ইনস্ট্রাকশন-প্রোগ্রাম। কিন্তু মেসেজটা কি, ডাটা বেসের ইনফরমেশন?'

'বিভিন্ন ধরনের বটে, কিন্তু ধাঁচটা একই। ফুটকে মিটারে রূপান্তর করো, পাউন্ড ওয়েটকে গ্রাম বা কিলোয় রূপান্তর করো, ডলারকে পাউন্ডে, এরকম। তাছাড়া, সব সময় একটা "ইরেজ" সেকশনও থাকছে—চুক্তির যে অংশে রয়েছে পরিমাণ এক হাজারের বেশি হলে কম রেটে পেমেন্ট হবে, সেটুকু মুছে ফেলো। কিংবা—যে-কোন ধরনের কোয়ানটিটি ডিসকাউন্ট মুছে ফেলো।

'কিন্তু সবচেয়ে চালাকি হলো, মি. রানা, এক সেট বাইটের ওপর আরেক সেট বাইট বসানো হয়েছে, অথচ কোড করা আছে শুধু প্রথম সেটের। যখন আমরা ডাটা বেস পড়তে যাই, শুধু প্রথম সেটের বাইটগুলো পড়ার সুযোগ পাই, দ্বিতীয় সেটের বাইটগুলো বাদ পড়ে যায়। দ্বিতীয় সেটের বাইটগুলো যদি কোড করা থাকত আমাদের, অন্য রকম উত্তর বেরিয়ে আসত। কিন্তু দ্বিতীয় সেটের কথা আমাদের জানা না থাকায় কোড করার প্রশ্নই...'

'দারুণ, জার্মান!' বলল রানা।

'কিন্তু, স্যার, এতে করে বিশেষ কোন লাভ হচ্ছে না। দ্বিতীয় সেট বাইটগুলো শুধু প্রথম সেট বাইটগুলোকে রিপিট করাচ্ছে, শুধু ওভারপেমেন্টের ক্ষেত্রে বাদে। এখনও আমরা জানি না কাজটা কার, তাই না, স্যার? এবং অতিরিক্ত টাকা এখনও ইউনিক প্রিন্টিং, পিলমোর এই সব কোম্পানীতে চলে যাচ্ছে।'

'লিমার ইউ.এম.পি-তেও আসছে, তাই না?'

'এখানে আরেক মজা, স্যার। লিমার সমস্ত বাইট মুছে তুলে ফেলা হয়েছে...লিমা কমপিউটর একদম পরিষ্কার—কোন হেঁচকি নয়, ভুয়া বাইটস নয়, ইউ.এম. পি-তে কোন রকম ভুয়া পেমেন্ট নয়। শুধু রেগুলার রুটিন কাজ। স্ট্যান্ডার্ড অফিস প্রসিডিওর ডাটা বেস বাদে, মিডো প্ল্যান্টের প্রতিটি ডাটা বেস চেক করেছি আমি। সবগুলো নিখুঁত...'

*

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না টিনা সিরিল। কি সাংঘাতিক, অক্টোবর মাসে তুষার পড়ছে নিউ ইয়র্কে! তারপরই তার মনে পড়ে গেল চার্লি ফ্রানসির ঝুল-বারান্দায় যত্ন করে রাখা টবগুলোর কথা। 'কি সর্বনাশ, চারাগুলো সব মারা পড়বে!' চার্লি ফ্রানসি নিউ ইয়র্কে নেই, কে ওগুলোকে সরাবে? মনে যখন পড়েছে, তারই একবার যাওয়া উচিত। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল সে।

কেয়ারটেকার লোকটা প্রৌঢ়, আগেও বেশ কয়েকবার চার্লি ফ্রানসির সাথে দেখেছে টিনা সিরিলকে। মেয়েটা চারাগুলোর কথা এমন আবেগের সাথে বলল, যেন ঝুল-বারান্দায় তার শিশুসন্তানরা তুষারে ভিজছে। একগাল হেসে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিতে রাজি হলো প্রৌঢ়।

ভেতরে ঢুকে ঝুল-বারান্দা থেকে এক এক করে টবগুলো ঘরের ভেতর নিয়ে এল টিনা সিরিল। কাজ শেষ করে ভাবল এই আবহাওয়ায় এক কাপ কফি খেতে পারলে মন্দ হত না। তার আগে অবশ্য গরম দুধ দিয়ে চারাগুলোকে ধুয়ে নেয়া দরকার।

কফি খাওয়ার পর টিনা সিরিল ভাবল, ঘরটা অগোছাল হয়ে রয়েছে, পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমে বাসন-পেয়ালা সব ধুয়ে রাখল সে। তারপর ঘর পরিষ্কার করল। রাইটিং ডেস্কের বই-পত্র এলোমেলো হয়ে ছিল, সব গুছিয়ে রাখল। এই সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল নিউ জার্সির ডেল্টা টিউবস-এর একটা স্টেটমেন্ট। একটা প্রিন্টআউট।

কাগজটা ওল্টাল টিনা সিরিল, ভাবল এটা এখানে এল কিভাবে! চার্লি ফ্রানসির সাথে ডেল্টার ওভারপেমেন্ট নিয়ে কথা হয়নি তার। বলতে চেয়েছিল বটে, ভেবেছিল পরামর্শ চাইবে, কিন্তু প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করায় তার আর সময় হয়নি।

প্রিন্টআউটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টিনা সিরিলের চোখ পানিতে ভরে উঠল। আপনমনে বিড়বিড় করল সে, 'অসম্ভব, এ হতে পারে না!' স্টেটমেন্টে ছাপা সর্বমোট মূল্য পেন্সিল দিয়ে বদলানো হয়েছে, অতিরিক্ত মূল্য ধরে নতুন সংখ্যা বসানো হয়েছে তার জায়গায়। প্রিন্টআউটের পিছনটা হাইঅ্যারোগ্লিফ-এ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। তবে ওগুলোর অর্থ উদ্ধার করার জন্যে কারও মিশরীয় হবার দরকার করে না—কেউ একজন ফুটের জায়গায় মিটার ধরে মূল্যের তারতম্য জানার চেষ্টা করেছে। টিনা সিরিলের হাঁটু কাঁপতে শুরু করল, দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। ডেস্কে আরও কাগজ-পত্র রয়েছে, এক এক করে সব সে ঘাঁটতে শুরু করল। আরেকটা প্রিন্টআউট পেল সে, ইউনিক প্রিন্টিঙের। তৃতীয়টা পিলযোর কোম্পানীর। মাথায় হাত দিয়ে ফোঁপাতে শুরু করল টিনা সিরিল।

অফিসে ফিরে এসে জুরিখে, হেনরি নামকিকে টেলিফোন করল টিনা সিরিল।

লিফটে চড়ে বেসমেন্টে নেমে এসে হেনরি নামফি কথা বলল হেলেন জার্মানের সাথে। হেলেন জার্মান টেলিফোন তুলল, ডায়াল করল একটা নম্বরে, নম্বরটা স্ট্যান্ডার্ড মিডো টেলিফোন ডিরেক্টরীতে নেই, কথা বলল পাপিয়ার সাথে। তিনজন নিহত লোকের কথা মনে আছে পাপিয়ার, মনে আছে নিখোঁজ আরেক লোকের কথা, কাজেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের সাথে সে একটা এ-ওয়ান প্রায়োরিটি যোগাযোগ স্থাপন করল। 'মাসুদ ভাই,' জিজ্ঞেস করল সে। 'আপনি কি একা?'

'ওহ্-থ্রী।' তারমানে রানার সাথে গগল রয়েছে।

'তাহলে ঠিক আছে। চার্লি ফ্রানসি কোথায়?'

'ইউ. এম. পি. আর আমাদের কমপিউটর লিঙ্কের মাঝখানে, ট্রাফিকের ওপর চোখ রাখছে। কেন?'

'ডাবল ওয়ান ওয়ান,' বলল পাপিয়া, 'ডাবল ওয়ান ওয়ান। আপনি...যাকে খুঁজছেন...এ...সেই...লোক...'

ঝড় উঠল রানার মাথায়। চার্লি ফ্রানসি! হ্যাঁ, মেলে। প্রখর বুদ্ধি, কমপিউটর তার কাছে নিজের হাতের উল্টোপিঠের মত পরিচিত। সন্দেহ নেই, ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কেও খুব ভাল জানে সে। সেদিন রাতের কথা মনে পড়ল, হঠাৎ পিটপিট করে উঠেছিল কমপিউটরের আলো। কলকাঠি তাহলে নাড়ছিল চার্লি ফ্রানসি, ডাটা বেসের খোরাক যোগান দিচ্ছিল একটা আউটসাইড লিঙ্কের মাধ্যমে অর্থাৎ ইনপুট কনসোল ব্যবহার করছিল না। এটুকু রানা নিজেই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু কে দায়ী বোঝেনি। ওর আরও একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল–ইলেকট্রিক টেলিফোন সম্পর্কে একটা আর্টিকেল পড়েছিল কোন এক পত্রিকায়, একদল যুবক আমেরিকায় বানিয়েছিল ওগুলো। পরে ওগুলো বেআইনী এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

চার্লি ফ্রানসি সে-ধরনের একটা ইলেকট্রনিক টেলিফোন বানিয়ে থাকলে যে-কোন ক্যারিয়ার ওয়েভ ধরতে পারবে, যে-কোন ডাটা বেস থেকে সমস্ত বাইট তুলে নিতে পারবে যদি সেটায় টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে খোরাক যোগান দেয়ার ব্যবস্থা থাকে। সে ব্যবস্থা ইউ. এম. পি-মিডো লিঙ্কে আছে। আছে ডেল্টা-মিডো নিউ ইয়র্ক লিঙ্কে, ইউনিক প্রিন্টিং-মিডো লেইসটার লিঙ্কে, কোহল-মিডো লিঙ্কে, আর পিলমোর-মিডো জুরিখ লিঙ্কে। চার্লি ফ্রানসি শুধু বিশেষ কয়েকটা জায়গা বেছে নিয়েছে যে-সব জায়গার ক্লায়েন্ট এবং মিডোর কমপিউটর সিস্টেম টেলিফোনের দ্বারা সংযুক্ত, যাতে করে সে তার ইলেকট্রনিক বক্সের সাহায্যে ওই সব ডাটা বেসগুলোর বিষয়বস্তু আমেরিকায় বসে পেতে পারে। পাবার পর নিজের ইচ্ছে মত অদলবদল করে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেয় সব। নিখোঁজ, নিহত লোকগুলোর কথা মনে পড়ে গেল রানার। কেন, কেন? সাথে সাথে উত্তর মিলল। অ্যাকাউন্টস ডাটা বেসগুলো ঠিক কোন্ পদ্ধতি এবং সময় ব্যবহার করে ইত্যাদি প্রাথমিক তথ্য জানার জন্যে স্থানীয় লোকজনের সাহায্য দরকার হয়েছে তার। তথ্যগুলো পাবার পর লোকগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সে একাই নিউ ইয়র্ক থেকে গোটা স্কীমটা অপারেট করতে পারবে। তবে, হ্যাঁ, সে কি করছে তা অপারেটররা জানবে। কাজেই তাদেরকে খুন

করতে বা সরিয়ে দিতে হয়েছে। রানার প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস, মেগ ফিলিপও নিহত হয়েছে, কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার লাশ।

'মাসুদ ভাই?' লাইনে রানা আছে কিনা সন্দেহ হলো পাপিয়ার।

'হ্যাঁ, বলো। ফ্রানসি লোকটা, বুঝলে, ভারি চালাক।'

'মাসুদ ভাই,' উদ্বিগ্ন পাপিয়া ইতস্তত করতে লাগল। 'মানে··· ছোটবোনের পরামর্শ হিসেবে নেবেন, অফিশিয়াল নয়–লোকটা এরইমধ্যে তিনজনকে খুন করেছে। সাবধানে থাকবেন, প্লীজ।'

এখন রানা জানে জুয়েলা মাদ্রেকে কে খুন করতে চেয়েছিল। 'চারজনকে,' বলল ও। 'আরও একজনকে করতে হবে তার। ধন্যবাদ, পাপিয়া। শোনো, জার্মানকে ডেকে দাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোটা ব্যাপারটা আমি ডকুমেন্ট হিসেবে রেকর্ড করে রাখতে চাই। কমপিউটর লিঙ্কের মাধ্যমে পাঠাও, এখানে আমরা ছেপে নেব সব।'

'ঠিক আছে,' বলল পাপিয়া, রানাকে সব বলতে পারায় স্বস্তি এবং হালকা বোধ করছে সে। তারপর সে অনুরোধ করল, 'একটু ধরে থাকুন, প্লীজ, সাদা টেলিফোনটা বাজছে।'

লাইনে অপেক্ষায় থাকল রানা। সাদা টেলিফোনের কল পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে আসতে পারে। সম্ভবত সাধারণ কোন ব্যাপার, আবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছুও হতে পারে, যাই হোক না কেন সাথে সাথে জেনে নিতে হয়।

লাইনে ফিরে এল পাপিয়া।

'কে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হেলেন জার্মান। ও কি বলতে চাইছে আপনি নাকি বুঝবেন–এইমাত্র আবার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডাটা বেস চেক করেছে, আমরা দ্বিতীয় সেট বাইটের মাধ্যমে পেমেন্ট করে দিয়েছি। বুঝতে পারছেন আপনি, মাসুদ ভাই···?'

'হ্যাঁ, পারছি,' ভারী গলায় বলল রানা। 'কত?'

'জার্মান বলছে যোগে সে তেমন ভাল না, তবে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের কম নয়···'

'ওহ্, মাই গড! পাঁচ মিলিয়ন ডলার!' রানার মনে আছে হেলেন জার্মান ওকে রিপিট ফ্যাক্টর সম্পর্কে কি বলেছিল, এই পেমেন্টটা সেই দ্বিতীয় সেট নতুন বাইটের কারসাজি।

'জার্মানকে বলো ওই কমপিউটরের সমস্ত কিছু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাই আমি। ইনভয়েস, অ্যামাউন্টস, পেয়ীস, নেমস অ্যান্ড প্লেইসেস; এভরিথিং।'

'বলছি,' সাথে সাথে জানাল পাপিয়া। 'নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন···'

ধাক্কাটা সামলে নেয়ার পর আবার চার্লি ফ্রানসির অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলো টিনা সিরিল। স্নেহমাখা হাসি দেখা গেল কেয়ারটেকারের মুখে। দ্বিতীয় বার খুঁজতে গিয়ে বারোটা ব্যাংক আর বারোটা কোম্পানীর কাগজ-পত্র পেল টিনা সিরিল, সাথে বারো সেট অথোরাইজেশন–সবগুলোয় তার সই রয়েছে, অথচ ওগুলো এর আগে কখনও

দেখেনি সে বা সই-ও করেনি।

টিনা সিরিল অত্যন্ত দক্ষ বুক-কীপার, চার্লি ফ্রানসি যে পুরানো এবং সহজ একটা পদ্ধতির মাধ্যমে জালিয়াতি করার চেষ্টা করেছে সেটা বুঝতে দেরি হলো না তার। একই অঙ্কের টাকা এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে পাঠিয়েছে ফ্রানসি, এভাবে একটা ক্রেডিট সিস্টেম চালু করেছে সে। তারপর একদিন, একটা ব্যাংকে গিয়ে আরেক ব্যাংকের চেক জমা দিয়ে টাকা চাইবে সে, প্রতিবার যে-টাকা গ্রহণ করে সেই টাকার চেক–দশ হাজার ডলার। ইতোমধ্যে ক্যাশিয়ার তার চেহারা চিনে ফেলেছে, জানে লোকটা প্রায়ই বড় অঙ্কের নগদ টাকা তোলে। চার্লি ফ্রানসি দশ হাজার ডলারের চেকের বিনিময়ে নগদ দশ হাজার ডলার চাইবে, চেকটা ক্লিয়ার হয়ে আসার অপেক্ষায় থাকতে রাজি নয়। লোকটা পরিচিত ক্লায়েন্ট, ক্যাশিয়ার দ্বিধা না করে টাকাটা দিয়ে দেবে। পরে অবশ্য চেকটা বুমেরাঙের মত ফেরত আসবে। বারোটা চেক, প্রতিটি দশ হাজার ডলার। চার্লি ফ্রানসি পালাবে, পকেটে এক লাখ বিশ হাজার ডলার।

ফ্রানসি, ইউ বাস্টার্ড!' ফুঁপিয়ে উঠল টিনা সিরিল।

পনেরো

চার্লি ফ্রানসির খোঁজে মিডো লিমায় এল রানা। ওকে জানানো হলো, সারাদিন তাকে দেখা যায়নি অফিসে। তার খোঁজে এরপর রানা ক্রিলন হোটেলে পৌঁছুল।

'চার্লি ফ্রানসি, স্যার? স্যুইট থারটি? উনি তো কাল সন্ধ্যায় হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।'

হোটেলের লবিতেই রানাকে ধরল ওরা। কৌশলে, লবির লোকজন যাতে কিছু বুঝতে না পারে। দু'জন দু'পাশে, একজন পিছনে, তিনজনই সাদা পোশাকে। একজন ওকে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গুড ইভনিং, সিনর। পুলিস চীফ আপনার সাথে কথা বলতে চান।'

'দেখুন,' ঝাঁঝের সাথে, চাপা সুরে বলল রানা, 'আপনাদের খেলা আর ভাল লাগছে না…'

'খেলা, সিনর?' বাঁ দিকের লোকটা বলল, দ্রুত রানার আরও কাছে সরে এল সে, দেখাদেখি ডান দিকের লোকটাও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে রানা দেখল, হ্যাঁ, ওদিকেও একজন আছে। চেহারাই বলে দেয়, ওরা প্রফেশনাল। রানাকে নিয়ে শান্তভাবে লবি থেকে বেরিয়ে এল দলটা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হাজির করা হলো রানাকে। প্রেসিডেন্ট আগেই বিদায় নিয়েছেন। সিনর রাফায়েল পেড্রো আর পুলিস চীফ সিনর মাদ্রে লম্বা টেবিলের একধারে দুটো চেয়ারে বসে রয়েছেন। প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকল রানা, কারণ আরেকটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে গগলকে, প্রতিবাদ যা করার সেই

করবে।

'বিপদ গুরুতর,' বিড়বিড় করে বলল গগল।

'আমাদের বিপদ জুয়েলা মাদ্রের চেয়ে বেশি নয়,' জবাব দিল রানা। 'পাঁচ মিলিয়ন ডলার নিয়ে গেছে ওরা। বোঝাই যায় নিউ ইয়র্কের লোকটার সাথে সে-ও কাজ করছে, জড়িত।'

মাথা নাড়ল গগল। 'আমার কথা তুমি বুঝতে পারোনি। পেরুতে আমাদের সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট হারানোর কথা বলছি।' টেবিলে রাখা কাগজের স্তূপটার দিকে হাত বাড়াল সে, মুখের চেহারা যেন এইমাত্র চিরতার পানি খেয়েছে। 'মে আই?' জিজ্ঞেস করল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে মৌনতা বজায় রাখলেন সিনর মাদ্রে। কাগজগুলো রানার হাতে ধরিয়ে দিল গগল। টাইটেল রয়েছে—'দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট'। নিঃশব্দে পড়তে শুরু করল রানা।

বিশ মিনিট লাগল। বিষয়বস্তু সতর্কতার সাথে প্রকাশ করা হয়েছে, সহজবোধ্য। কোন সন্দেহ নেই, মিডো স্টীল কনসোর্টিয়ামের আন্তর্জাতিক যে সুখ্যাতি রয়েছে, পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হলে তার বারোটা বেজে যাবে। কাগজগুলো টেবিলে রেখে দিল রানা, চেহারায় স্তম্ভিত একটা ভাব। সিনর রাফায়েল পেদ্রো ওর দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন।

তিনি নিজের নাম উচ্চারণ করে জানালেন, 'আমি মহামান্য প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা। তিনিও ডকুমেন্টটা দেখেছেন। কি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সে-ব্যাপারে একমত হওয়ার জন্যে প্লীজ ডকুমেন্টের সার-সংক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে দিন আমাকে।

'ব্লু প্রিন্টটা তৈরি করা হয়েছে মিডো জুরিখ আর মিডো লিমার টপ ম্যানেজমেন্টের জন্যে। জিনিসটা ছাপা হয়েছে লিমায়, আপনাদের একটা মেশিনে। আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চান আপনারা, সেজন্যে এই ব্লু প্রিন্টে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে, এরইমধ্যে পদক্ষেপগুলো নিতেও শুরু করেছেন। আলোচ্য পণ্যদ্রব্যগুলো আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের সিংহভাগ। বুঝতেই পারছেন আমি আয়রন, স্টীল, সিলভার, কপার, লেড, জিঙ্ক, অ্যানটিমনি, ফিশ-মীল ফার্টিলাইজার, নাইট্রেটস, সুগার আর কটনের কথা বলছি। সংক্ষেপে, করার মধ্যে এইটুকু করেছেন আপনারা—পরিমাণে অতিরিক্ত কিনতে চেয়ে আমাদের উৎপাদকদের আপনারা অতিরিক্ত উৎপাদনে যেতে বাধ্য করেছেন। বিপুল পণ্যদ্রব্যের চাহিদা জানিয়ে বড় বড় অর্ডার দিয়েছেন আপনারা, উৎপাদন সামর্থ্য বাড়াবার জন্যে কারখানা বড় করার প্রস্তাব রেখেছেন, এবং পুঁজি বাড়ানোর জন্যে আমাদের কোম্পানীগুলোকে বিপুল পরিমাণে লোন দিয়েছেন।

'এখন, হঠাৎ করে আপনারা বড় সব অর্ডার বাতিল করে দিয়ে লোন ফেরত চাওয়ার পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন, ফলে আমাদের প্রডিউসারদের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন বিকল্প থাকবে না। আমেরিকা এবং জুরিখে গোপন চুক্তি করেছেন আপনারা, যাতে আমাদের কোম্পানীগুলো বিপদের সময় মানি-মার্কেট থেকে টাকা ধার করতে না পারে। যে-সব পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব আপনারা রেখেছেন তার

মধ্যে আরেকটা হলো, আমাদের মুদ্রা সম্পর্কে জোরাল গুজব ছড়ানো হবে, যার ফলে আমরা মুদ্রামান হ্রাস করতে বাধ্য হব। এই সব পদক্ষেপ যদি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে নতজানু করতে ব্যর্থ হয়, আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সারা দেশে জাল নোট ছড়িয়ে দিয়ে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো। আমরা যখন তলিয়ে গিয়ে হাবুডুবু খাব, আপনারা তখন এগিয়ে এসে আমাদের কোম্পানীতে আপনাদের শেয়ার সম্পর্কিত অধিকার দাবি করবেন অথবা সরাসরি কিনে নেবেন কোম্পানীগুলো, ভাব দেখাবেন জনহিতকর একটা কাজ করছেন।

'এই মুহূর্তে সব কিছু চেক করে দেখা সম্ভব নয়, জানা কথা, তবে ইউ.এম. পি-র ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মেশিনপত্র কেনার জন্যে ইউ.এম.পি-কে আপনারা একশো মিলিয়ন সোলস লোন দিয়েছেন। এগুলো নতুন মেশিন, কেনার দরকার হয় কারণ আপনারা অতিরিক্ত চাহিদার কথা জানিয়ে বড় বড় অর্ডার দিয়েছেন। লোন দেয়ার শর্ত ছিল, চাওয়া মাত্র টাকাটা ইউ.এম.পি. আপনাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে, ঋণস্বীকার পত্রে আপনাদের এই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ইউ.এম.পি-র শেয়ার কিনে নেয়ার অধিকারও আপনাদের দ্বারা সংরক্ষিত থাকবে।

'এই মুহূর্তে, আমাকে জানানো হয়েছে, লোন ফিরে চাওয়ার ব্যাপারে মিডোর সামনে কোন বাধা নেই। এবং ইউ.এম.পি. যদি টাকা ফেরত দিতে না পারে তাহলে অবশ্যই আপনারা হয় কোম্পানীটা দখল করবেন, নাহয় বন্ধ করে দেবেন। আপনাদের কমপিউটরই ইউ.এম.পি-র অ্যাকাউন্টস প্রসেস করে, কাজেই ইউ. এম.পি-র ব্যালেন্স শীট কি অবস্থায় রয়েছে তা আপনারা প্রতিমুহূর্তে জানতে পারছেন, ফলে ইউ.এম.পি-র ফান্ড যখন সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ে থাকবে তখনই আপনারা ধার দেয়া টাকা ফেরত চাইবেন। ইউ.এম.পি. যদি জুরিখ ব্যাংক এবং ওয়ালস্ট্রীট ফান্ডের নাগাল না পায়, এই দেশ যদি মুদ্রাস্ফীতিতে কাহিল হয়ে পড়ে, আমাদেরকে যদি মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘোষণার প্রস্তুতি নিতে হয়, তাহলে ইউ.এম.পি, আমাদের সর্ববৃহৎ প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি, সরাসরি আপনাদের হাতে চলে যাবে। তারমানে মিডো স্টীল কনসোর্টিয়াম তখন এককভাবে পেরুর প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ন্ত্রণ করবে। আর, এটা শুধু একটা মাত্র উদাহরণ। এরকম আরও বহু আছে।'

চেয়ারে হেলান দিলেন সিনর রাফায়েল পেড্রো, দু'হাতের আঙুলগুলো এক করলেন। তাঁর বক্তব্য যে ডকুমেন্টের নিখুঁত সারমর্ম সে-ব্যাপারে ওরা সবাই একমত হলো। গভীর চিন্তামগ্ন চেহারা নিয়ে গগলের দিকে তাকাল রানা। চোখাচোখি হতে মৃদু মাথা ঝাঁকাল গগল। পরস্পরকে বুঝতে পারছে ওরা। যা সাধারণত ঘটে, রানা কথা বলতে শুরু করায় গগল শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল।

'ইউ.এম.পি-র সাথে মিডোর সম্পর্ক চিরকালই অত্যন্ত ভাল,' বলল রানা। 'আমরা ওদের ম্যানেজমেন্ট এবং প্রোডাক্ট পছন্দ করি। চুক্তিটা হয় পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সন্তুষ্টির মধ্যে। ইন্ডাস্ট্রি বড় করার জন্যে পুঁজির দরকার হয় ওদের, আমরা তা যোগান দিই। লোনটা ফেরত চাওয়ার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই, আর কোম্পানীটাকে দখল করে নেয়ারও কোন প্রশ্ন আসে না।'

'আপনি বলছেন বটে আপনাদের কোন ইচ্ছে নেই, সিনর রানা,' সিনর পেড্রো বললেন, 'কিন্তু অস্বীকার করতে পারছেন না যে সে আইনসঙ্গত অধিকার মিডোর রয়েছে–চাওয়া মাত্র লোন ফেরত দিতে না পারলে সেই মুহূর্তে ইউ.এম.পি. আপনাদের দখলে চলে যাবে। আমরা সবাই মরণশীল মানুষ, সিনর রানা। আমি মেনে নিতে রাজি আছি যে মিডোর বর্তমান বোর্ড অভ ডিরেক্টররা সদিচ্ছা থেকেই চুক্তি করেছিল, কিন্তু বর্তমান বোর্ড অভ ডিরেক্টর কতদিনের জন্যে স্থায়ী? আমাকে জানানো হয়েছে আপনি যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করেন তাতে মাঝে মধ্যেই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে শারীরিক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। আমি ভাবতেও কেঁপে উঠছি, যদি পেরুর বদলে ব্রাজিলে ঠিক এই পরিস্থিতিতে পড়তে হত আপনাকে…?'

পেরুতে শ্রমিক অসন্তোষ কম, শ্রমও খুব সস্তা, এবং ইউ.এম.পি. কর্তৃপক্ষের সাথে মিডোর সম্পর্ক প্রথম থেকেই অত্যন্ত মধুর, চুক্তিটা বাস্তবে রূপ নেয়ার পিছনে এ-সবের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মিডো বোর্ড আসলেও চেয়েছিল ইউ.এম.পি. নিজের পায়ে দাঁড়াক। কিন্তু এ-সব রানা ব্যাখ্যা করবে কিভাবে? শুধু যদি চুক্তির ভাষার ওপর চোখ বুলানো হয়, কেউ যদি দুটো কোম্পানীর বিশেষ সম্পর্ক উপলব্ধি করতে না পারে, চুক্তিটাকে সত্যি সন্দেহজনক বলেই মনে হবে। যে-কোন মুহূর্তে লোন ফেরত চাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে মিডো। সমস্ত শেয়ার কিনে নেয়ার অধিকারও। যদিও সেরকম কোন ইচ্ছে মিডোর ছিল না বা নেই।

'প্রিন্টআউটের অন্যান্য সাধারণ ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলা যাক,' বলল রানা। 'তার আগে ধন্যবাদ জানাই, অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে। আমি এবং সিনর ভিনসেন্ট গগল, দু'জনেই আমরা মিডোর ডিরেক্টর, ওই কোম্পানী যদি কোন অন্যায় করে থাকে তার দায়-দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। কিন্তু এই মুহূর্তে, বোর্ডের আর সবার সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না থাকায়, আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলছি, কোম্পানীর তরফ থেকে নয়। যদি প্রয়োজন বোধ করেন, ভিনসেন্ট গগল নিজের বক্তব্য রাখবেন।' কিছু না, স্রেফ কার্টেসি রক্ষার জন্যে কথাগুলো বলা, পেরুভিয়ানরা এ-ধরনের আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার খুব মূল্য দেয়। এ-ব্যাপারে মিডোর তরফ থেকে তার কর্মচারী এবং ডিরেক্টরদের নির্দেশও দেয়া আছে। লিমায় যখন আছ, সব সময় কার্টেসি বজায় রাখবে, বড় বড় পার্টি দেবে, দামী পোশাক পরবে, ভাব দেখাবে যেন বিনয়ের অবতার। 'এই প্রিন্টআউট আগে কখনও দেখিনি আমি। এই কামরায় ঢোকার আগে এর অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমার কিছু জানা ছিল না। এটা তৈরি করার ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা নেই।' গগলের দিকে তাকাল রানা।

একই ভাষায় গগলও রানার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল।

এরপর রানা বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি, মিডো যদি সত্যি কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া ইউ.এম.পি. দখল করে নেয়ার কোন পদক্ষেপ নেয়, আমি পদত্যাগ করব।'

আবার রানার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল গগল।

'আমাকে তাহলে সরাসরি একটা প্রশ্ন করতে দিন,' সিনর রাফায়েল পেড্রো বললেন। 'প্রিন্টআউটটা আপনাদের মেশিনে ছাপা হয়নি বলে দাবি করছেন-

আপনারা?'

টাইটেল পেজটা আলোর সামনে ধরে খুঁটিয়ে দেখল রানা। মিডোতে ওরা ওয়াটারমার্ক দেয়া যে কাগজ ব্যবহার করে, এটা সেই কাগজই। হেডিংগুলো পরীক্ষা করল ও, মিডো যে টাইপফেস ব্যবহার করে এখানেও হুবহু তাই ব্যবহার করা হয়েছে, পাইকা অ্যামব্যাসাডর। তবে অনেক কমপিউটরের টাইপরাইটারই পাইকা অ্যামব্যাসাডর টাইপফেস ব্যবহার করে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভাঁজ খুলল রানা। এটাও একটা প্রিন্টআউট, চার্লি ফ্রানসির পরিষ্কার করা ডাটা বেস থেকে চার্লি ফ্রানসির মাধ্যমেই রানার হাতে এসেছে। দুই সেট টাইপ মেলাল রানা। ওর পার্কার পেনের মাথায় একটা লেন্স তৈরি করা আছে, নমুনাগুলো বড় আকারে দেখতে পাবার জন্যে লেন্সটা ব্যবহার করল ও। এফ অক্ষরটা লাইনের সামান্য ওপরে, ও অক্ষরটা ডান দিকে বাম দিকের চেয়ে একটু বেশি মোটা। 'হ্যাঁ, ডকুমেন্টটা আমাদের প্রিন্টআউট মেশিনেই ছাপা হয়েছে।'

'কমপিউটার মেশিনে কিছু ছাপছে, কখনও তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার,' বললেন রাফায়েল পেড্রো, তাঁর হাবভাব শান্ত এবং নরম। 'যদি ব্যবস্থা করা যেত...'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এখুনি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

গগলের দিকে তাকাল রানা। দু'জনেই ওরা সিনর রাফায়েল পেড্রোর উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারছে। গগল কি আরও সামনে বাড়ার আগে ব্যারনেস লিনার সাথে আলোচনা করে নিতে চায়? রানা হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল। ভিক্টর মার্ভিনকে নিয়ে ব্যারনেস লিনা এই মুহূর্তে মিডোর আলফায় রয়েছে, জাপান থেকে অস্ট্রেলিয়ার পথে। ইচ্ছে করলে ওরা টেলিফোন বা কমপিউটরের সাহায্যে কথা বলতে পারে তার সাথে। আলফায় একটা প্রিন্টআউট মেশিন আছে, মিডোর যে-কোন কমপিউটরের ইনকামিং সিগন্যাল গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে ওরা গোটা পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট 'ট্র্যান্সমিট' করতে পারবে। কিন্তু কল্পনায় রানা দেখতে পেল স্যাটেলাইটে পাঠানো ডকুমেন্টটা মেগা-বক্সের সাহায্যে চার্লি ফ্রানসিও গ্রহণ করছে।

মাথা নাড়ল ও। 'আমার কলিগ যদি রাজি হন, আপনাকে আমাদের একটা মেশিনের কাছে নিয়ে যেতে পারি আমি, সিনর পেড্রো। ওখানে গিয়ে নিজের চোখেই দেখতে পারেন কিভাবে কাজ করে ওটা।'

জুয়েলা মাদ্রেকে খুন করতে যাচ্ছে চার্লি ফ্রানসি, তারপর আপাতঃদৃষ্টিতে নিজেকে খুন করবে সে। সেজন্যে কয়েকজন সাক্ষী দরকার হবে তার। সে জানে, পাঁচ মিলিয়ন ডলার কামাবার জন্যে যে-পথ সে অবলম্বন করেছে তার সন্ধান অচিরেই পেয়ে যাবে মাসুদ রানা, জেনে ফেলবে সে টি. সিরিলের নাম ব্যবহার করেছে। কাজেই ওই নামের একটা সুতো সাবধানে ছেড়ে এসেছে সে গাড়িটা ভাড়া করার সময়। যখন দেখল লিমা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জুয়েলা মাদ্রের গাড়ি, আপনমনে হাসল সে। খোলা রাস্তায় কাজটা করা যাবে না, আশপাশে যথেষ্ট লোকজন থাকার সম্ভাবনা কম, কিন্তু প্যান আমেরিকান হাইওয়ে আঁকড়ে থাকলে জুয়েলা মাদ্রেকে

কোন না কোন শহরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, এবং কোথাও না কোথাও গাড়ি থেকে নামতে হবে তাকে। দীর্ঘ হাইওয়ের কোথাও সুযোগ পাওয়া গেল না, ফেরারীটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে যেন কোন ভূতে পাওয়া উম্মাদিনী। চার্লি ফ্রানসি একটা এমজি এম চালাচ্ছে, কয়েকবারই দৌড় প্রতিযোগিতায় ফেরারীর কাছে হেরে গেল সেটা। পিসকোয় পৌছুল চার্লি ফ্রানসি, ফেরারীটাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। তুফান বেগে এল আইকায়, দেখল স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করল ফেরারী। সম্ভবত মুখে কিছু দেয়ার জন্যে থেমেছিল জুয়েলা মাদ্রে।

অ্যারিকুইপায় পৌছে দেখল, একটা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেরারী। ভেতরে ঢুকে খোঁজ নিয়ে জানল, খাতায় নাম লিখিয়েছে জুয়েলা মাদ্রে। এরপর কষ্টকর একটা রাত কাটাল সে গাড়িতে। গায়ে কম্বল, কখনও ঢুলছে, কখনও চোখ মেলে সিগারেট ধরাচ্ছে, ফেরারীর দিকে নজর। সকালে যদি শহর দেখতে বেরোয় জুয়েলা মাদ্রে, পায়ে হেঁটে, তাহলে একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। সরাসরি তার গায়ের ওপর গাড়ি তুলে দেবে সে, দিনে-দুপুরে এবং লোকজনের সামনে, তারপর চলে যাবে মোলেনডো উপকূলে। ওখানে পৌছে একটা পাহাড়ের মাথা থেকে ফেলে দেবে এমজিএম। পুলিস গাড়িটা উদ্ধার করবে, কিন্তু লাশ পাবে না, ধরে নেবে স্রোতে ভেসে অন্য কোন দিকে চলে গেছে। কিন্তু সে, একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে, সাঁতরে উঠে আসবে তীরে। সেখান থেকে চিলির পথ ধরবে সে, দূরপাল্লার যে-কোন একটা ট্রাক লিফট দেবে তাকে।

রাতটা গাড়ির ভেতর কাটানোয় ধারণার বাইরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল চার্লি ফ্রানসি। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে জুয়েলা মাদ্রে বাজারে পৌঁছুলেও, সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তাকে খুন করতে ব্যর্থ হলো সে। গাড়ি নিয়ে আবার হোটেলের কাছাকাছি ফিরে আসার পর দেখল পুলিস পৌছে গেছে। দেখল পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়ল জুয়েলা মাদ্রে, পুনোর পথ ধরল। অরমানে লেক টিটিকাকা পেরুবার জন্যে হাইড্রোফয়েল-এ চড়বে মেয়েটা।

আপনমনে আবার একবার হাসল চার্লি ফ্রানসি। দেখে যেন মনে হচ্ছে সে কি চায় জুয়েলা মাদ্রে জানে। টিটিকাকার ওপর হাইড্রোফয়েল তার উদ্দেশ্য পূরণে দারুণ সহায়তা করবে। গাড়ি নিয়ে সাগরে লাফিয়ে পড়ার চেয়ে আরও নিরাপদে কাজ সারতে পারবে সে।

মিডোর কমপিউটর সেট-আপ দেখে মুগ্ধ হলেন সিনর রাফায়েল পেড্রো, তবে তাঁর প্রশ্ন শুনে বোঝা গেল যতটুকু ভাব দেখান কমপিউটর সম্পর্কে তারচেয়ে অনেক বেশি জানেন তিনি। 'এটার মত কোন ডকুমেন্ট আছে আপনাদের কাছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'মেশিনটা কিছু ছাপছে দেখতে পেলে খুশি হতাম।'

কমপিউটর প্রোগ্রামার পেরুভিয়ান প্রিন্টআউটের দিকে তাকাল, সাথে করে ওটা নিয়ে এসেছেন সিনর পেড্রো। তবে অবশ্যই খোলা অবস্থায় নয়।

'হ্যাঁ, আছে,' বলল প্রোগ্রামার, 'স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন টু স্টাফ-এর সাইজ বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'সেটা আবার কি জিনিস?'

জবাব দিল রানা, 'মিডো কর্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য আছে বিদেশে কোথাও কর্মচারীরা যেন কারও সাথে বেয়াদপি না করে। কর্মচারীরা কি ধরনের আচরণ করবে তার একটা লিখিত ডকুমেন্ট আছে–"স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন টু স্টাফ"।'

'পেরু, কলম্বিয়া, বলিভিয়া আর ভেনেজুয়েলায় মিডোর যারা কর্মচারী তাদের জন্যে তৈরি করা এক সেট নির্দেশ রয়েছে আমার কাছে,' বলল অপারেটর। 'আপনাকে আমি এটা ছেপে দেখাতে পারি...'

সিনর রাফায়েল পেড্রো মহা খুশি। 'হ্যাঁ, দেখতে চাই।' ইঙ্গিতে হাই-স্পীড প্রিন্টআউট মেশিনটা দেখাল অপারেটর। সংখ্যার একটা তালিকা ছাপছে ওটা, প্রতি মিনিটে একশো লাইন। 'ইউ.এম.পি-র কাজ করছি আমরা,' অপারেটর বলল। এক্স-রে ক্রিসটালোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের প্যারামিটার অ্যানালাইসিস। আধ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর প্রিন্টার থামল। ট্রলি নিয়ে মেশিনের পিছনে হাজির হলো একজন অপারেটর, ছাপা শেষ পাতাটা ছিঁড়ে নিল। ছাপা কাগজগুলো ট্রলিতে করে রেখে এল সে। এরপর লোকটা মেশিনের পিছনে তাকাল যেখানে লেখা রয়েছে পরবর্তী প্রিন্টআউটের জন্যে ক'টা কাগজ লাগবে। চব্বিশটা পাতা। কাগজের দিকে তাকাল সে। হ্যাঁ, যথেষ্ট রয়েছে। মেশিনের পিছনের একটা বোতামে চাপ দিল অপারেটর।

প্রিন্টআউট শুরু হলো, কী-গুলো এত দ্রুত নড়ছে, মনে হলো একবারেই গোটা একটা লাইন ছাপা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম পাতায় থাকল একগাদা কোড নাম্বার আর অক্ষর, যে ডকুমেন্টটা আসছে তার পরিচয় জানিয়ে দিল, জানিয়ে দিল মোট কত বাইট থাকবে ওটায়, ইত্যাদি। দ্বিতীয় পাতায় ডকুমেন্টের টাইটেল। স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন টু স্টাফ। আ মিডো পাবলিকেশন। কপিরাইট রিজার্ভড। ডিসট্রিবিউশন, স্টাফ ওনলি। সিকিউরিটি ক্লাসিফিকেশম এন ফাইভ অ্যান্ড অ্যাবাভ। তারপরই প্রিন্টআউট মেশিন হেঁচকি তুলে একটা পাতা বাদ দিয়ে গেল।

'ফর গডস সেক সুইচ ইট অফ,' চিৎকার করে বলল রানা, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে ও। ওর কথা শেষ হয়নি, চতুর্থ পাতাটা উদয় হলো। টাইটেলে লেখা রয়েছে–দ্য পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট।

সিনর রাফায়েল পেড্রোর হাতে ধরা ডকুমেন্টটার হুবহু নকল ওটা।

সম্মোহিত রানা দেখল, মেশিনে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসছে ডকুমেন্টটা। বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, মেশিনটাকে থামানোর কোন উপায় জানা নেই। প্রিন্টআউট শেষ হতে মাত্র দু'মিনিট লাগল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল মেশিন, নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভেতর।

গগল, হতভম্ব, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল। 'তুমি জানতে, রানা,' অভিযোগ করল সে। 'জানতে ডকুমেন্টটা মেশিনে আছে।'

অস্বীকার করতে পারল না রানা। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ, বোধহয় জানতাম,' বিড়বিড় করে বলল ও।

পুনোর ট্যুরিস্ট অফিসে এল চার্লি ফ্রানসি, টিটিকাকা হাইড্রোফয়েলের ওপর ছাপা একটা পুস্তিকা নিল ওদের কাছ থেকে। জলযানটিকে চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে একটা কোম্পানীকে, সেই কোম্পানীর অফিসে এসে জানাল, সে একজন এঞ্জিনিয়ার, জিজ্ঞেস করল তাদের কাছে হাইড্রোফয়েলের ডিটেলস ড্রইং আছে কিনা। তারা তাকে সবগুলো সার্ভিস প্ল্যান দেখাল, সাথে গাইড দিয়ে পাঠাল বোটটা দেখার জন্যে, এবং বিনা খরচায় খানিকটা ঘুরে আসার প্রস্তাবও দিল।

'আমিও একদিন আপনাদের চড়াব,' বলল চার্লি ফ্রানসি।

সারাটা রাত সিনর পেড্রো, সিনর মাদ্রে আর গগলের সাথে কাটাল রানা; ব্যাখ্যা করল ঠিক কিভাবে কাজটা করা হয়েছে। জুরিখের সাথে একটা লাইন খুলে দিল ও, হেলেন জার্মানের সাথে কথা বললেন রাফায়েল পেড্রো। ওর নির্দেশ পেয়ে হেলেন জার্মান ক্ষতিকর নয় এমন কিছু অ্যাকাউন্টস ইনস্ট্রাকশন দিয়ে একটা ডাটা বেস সাজাল। অ্যামস্টারডামে অনুষ্ঠিত কমপিউটর সিম্পোজিয়াম সম্পর্কে ওর সন্দেহের কথা জানাল ওদেরকে, তারপর অনভ্যস্ত আঙুলের সাহায্যে বোতামে খোঁচা দিয়ে বের করে আনল ইনস্ট্রাকশনগুলো, যেগুলো অ্যাকাউন্টস বদলে দেবে। ইনস্ট্রাকশনগুলো জুরিখে পাঠাল রানা, বদলানো ডাটা বেস ওর কাছে ফেরত পাঠাল হেলেন জার্মান, প্রতিটি বাইটের মাঝখানে ওর দেয়া ইনস্ট্রাকশন ঢোকানো হয়েছে। এরপর প্রিন্টারে অ্যাকাউন্টস ছাপতে দিল রানা, প্রথমে দ্বিতীয় সেট বাইটের সাহায্যে, তারপর প্রথম সেট বাইটের সাহায্যে। দুটো অ্যাকাউন্টের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেল এক লাখ সোলস-এর। দুটো অ্যাকাউন্টই ওদেরকে দেখাল রানা।

প্রতিবাদ জানালেন রাফায়েল পেড্রো। 'কেন কেউ এক লাখ সোলস চুরি করতে যাবে?' তিনি বলতে চাইছেন কেন কোন মাদ্রে।

'গোটা ব্যাপারটা আমি হয়তো আরও আগে জানতে পারতাম,' বলল রানা, 'কিন্তু এই অ্যাকাউন্ট নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়েই সময় নষ্ট করেছি। শুনুন, আপনার কাজিন কমপিউটর সিম্পোজিয়ামে ছিলেন। তাঁর কাছে প্রস্তাবটা আসে যুবকদের একটা গ্রুপ থেকে। তারা তামাশা করার ভাব দেখিয়ে বলে, এসো আমরা এক মিলিয়ন ডলার চুরি করি। গ্রুপের লীডার ছিল মিডোর একজন স্টাফ। একধরনের খেলার মত, মজা হবে ভেবে তাদের সাথে যোগ দিতে রাজি হলেন জুয়েলা মাদ্রে। ওই পর্যায়ে ব্যাপারটা ছিল অ্যাকাডেমিক এক্সপেরিমেন্ট। সবাই মিলে এই ডাবল ইনভয়েস সিস্টেমটা চালু করল ওরা। কিন্তু পরে ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে জুয়েলা মাদ্রে উপলব্ধি করলেন ইনভয়েস ছাড়াও অন্যান্য কাজে সিস্টেমটা ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি হয়তো সম্পূর্ণ নির্দোষ একটা ডকুমেন্টকে বদলে পলিটিক্যাল বোমায় পরিণত করাও সম্ভব, যার সাহায্যে মিডোকে পেরু থেকে উৎখাত করা যাবে।'

'ফর গডস সেক, কেন সে তা করতে চাইবে?'

গগলের দেয়া পার্টিতে জুয়েলা মাদ্রের সাথে কথা হয়েছিল রানার। মেয়েটা যে

জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার অধিকারী তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পেরু পেরুবাসীদের জন্যে, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই নিজেদের চেষ্টায়, বিদেশী পুঁজি আমরা চাই না–কোন সন্দেহ নেই গোপন বৈঠকে এ-সব কথাবার্তাই জোর গলায় উচ্চারণ করা হয়। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলছিলেন, প্রেসিডেন্ট ডকুমেন্টটা পড়েছেন।'

'হ্যাঁ। ইতিমধ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে পৌঁছে গেছে গাদা গাদা ফটোকপি। আজ রাতে মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন প্রেসিডেন্ট।'

'আপনার কাজিন,' সিনর মাদ্রেকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কখনও কি রাজনীতি করেছেন? অ্যাকটিভলি? তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন–লেফট অর রাইট?'

'লেফটিস্ট? একজন মাদ্রে? আমরা লিবারেলস সিনর, তবে অতটা লিবারেল নই!'

নতুন কোন খবর নয়, ভাবল রানা। যার অঢেল আছে বা প্রচুর রোজগার করতে জানে, সে কোন্ দুঃখে সম্পদের সমবন্টনে রাজি হতে যাবে? তবে এদের ভাঁড়ামিটা হলো সমাজের অধোগতি, বৈষম্য, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ইত্যাদি নিয়ে আর সবার চেয়ে বেশি হৈ-হল্লা করা। এদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসও করে যে তার হৃদয়ের গভীরে গরীবদের জন্যে বিপুল দয়ামায়া আছে, এবং টেলিভিশনে বা খবরের কাগজে দুঃস্থদের করুণ ছবি দেখে কেউ কেউ কেঁদেও ফেলে। তুমি গরীবের শত্রু, এ-কথা শুনলেও বোধহয় তারা কেঁদে ফেলবে, রাগে। 'আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনার কাজিন কোন ধরনের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন কিনা।'

'মাদ্রে পরিবারে কোন মেয়ে রাজনীতি করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না…'

কিন্তু রানা জানে জুয়েলা মাদ্রে আর দশটা মেয়ের মত নয়, জানে সিনর মাদ্রে পুরোপুরি সত্যি কথা বলছে না। বিদুষী, কমপিউটর নিয়ে পড়াশোনা করেছে, ঘুরেফিরে দেখা আছে দুনিয়াটা, পাহাড়ের ওপর একটা বাড়িতে একা বাস করে। ডান হোক আর বাম, জুয়েলা মাদ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি একটা না থেকেই পারে না। 'প্রমাণ করতে পারব কিনা সন্দেহ,' বলল ও। 'সে-চেষ্টা করব কিনা তা-ও জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, এই ডাটা বেসে যে কৌশলটা করা হয়েছে তার জন্যে আপনার কাজিন জুয়েলা মাদ্রেই দায়ী, সিনর।'

'উদ্ভট! উদ্ভট এবং অবাস্তব!' তীব্র প্রতিবাদ জানালেন পুলিস চীফ। 'কিসের আশায়, কিসের লোভে এ-ধরনের একটা কাজ করতে যাবে…'

'লোভ নয়, সিনর, লাভ,' বলল রানা। 'এবং যে লাভ তিনি চেয়েছিলেন তা ইতিমধ্যে পেয়েও গেছেন। লাভটা হলো পাবলিসিটি, বিশেষ এক ধরনের পাবলিসিটি। তিনি বুদ্ধিমতী, ভুলে যাবেন না। ইউ.এম.পি-র সাথে আমরা যে চুক্তি করেছি সেটা দেখার সাথে সাথে ওটার সম্ভাব্য তাৎপর্য ধরে ফেলেন তিনি। কথা তো সত্যি, যে-কোন সময় চাইলেই মিডো দখল করে নিতে পারে ইউ.এম.পি., স্রেফ অর্ডার বাতিল করে এবং লোন ফেরত চেয়ে। লোন শোধ করতে সমর্থ হবে না ইউ.এম.পি, তখন আইন অনুসারেই স্টক অপশন প্রয়োগ করে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ

গ্রহণ করব আমরা।

'এটা পেরুর আরও সাতটা কোম্পানীর বেলায়ও সত্যি, যাদের সাথে মিডোর চুক্তি রয়েছে। মেন্ডেজ স্টীল করপোরেশনের কথা ধরুন। ওদেরকে আমরা একটা ব্লাস্ট ফারনেস বসিয়ে দিয়েছি, এখনও ওরা টাকা শোধ দিতে পারেনি। কিংবা ধরুন ফরচুন রিমাক মাইনের কথা। সেপারেটর প্ল্যান্ট আর বল মিল-এর জন্যে লোন দিয়েছি আমরা। কেমিক্যাল প্ল্যান্ট বসিয়ে দিয়েছি...উদাহরণ আরও বাড়ানো যায়। কথা দাঁড়াল, হ্যাঁ, শুধু লোন ফেরত চেয়ে পেরুর প্রধান প্রধান ইন্ডাস্ট্রিগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পারি আমরা।

'আপনার কাজিন ব্যাপারটা উপলব্ধি করেন, এবং সরকারকে সচেতন করার জন্যে সম্ভাব্য নাটকীয় পথ বেছে নেন। তাঁর মাথা থেকে পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট বেরিয়ে এল। ডকুমেন্টটা তিনি নিজে রচনা করেছেন, এবং লিখেছেন আমাদের কমপিউটরে। তার উদ্দেশ্য যে পূরণ হয়েছে, আজ রাতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। মন্ত্রীসভার মীটিঙে, আপনাদের সরকার জরুরী একটা আইন জারি করবে, তাতে আমরা যে-ধরনের চুক্তি ইউ.এম.পি. বা অন্যান্য কোম্পানীর সাথে করেছি সে-ধরনের চুক্তি সম্পাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। বলা হবে, ধার দেয়া টাকা ফেরত পাবার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে স্টক এবং নিয়ন্ত্রণ খরিদ করার অধিকার কোন বিদেশী কোম্পানীর থাকবে না।'

দুই সিনরকে বোঝাতে রাত প্রায় কাবার হয়ে গেল রানার, তারপর গগলকে বোঝাতে হলো ডকুমেন্টটা রচনা করার ব্যাপারে ওর কোন ভূমিকা নেই। ভোর পাঁচটায় মিডো একটা বোর্ড মীটিঙে বসল। মীটিং বসল মিডো লিমার বড়সড় এক অফিস কামরায়, সশরীরে উপস্থিত থাকলেন লিমার পুলিস চীফ, প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী, মাসুদ রানা এবং ভিনসেন্ট গগল। উপস্থিত থাকল মিডোর বোর্ড অভ ডিরেক্টরের চেয়ারপারসন এবং তার বিশেষ উপদেষ্টা ভিক্টর মার্জিন, যদিও সশরীরে নয়। ওরা দু'জন মিডো আলফায় রয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে সরাসরি পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে। মিডো বোর্ড একটা মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট। লোন সংক্রান্ত চুক্তি সংশোধনের প্রস্তাব করা হলো, প্রস্তাবে বলা হলো যে-সব পেরুভিয়ান কোম্পানীকে লোন দেয়া হয়েছে তা চাওয়ামাত্র ফেরত পাওয়ার অধিকার ত্যাগ করবে মিডো, কোম্পানীগুলো তাদের সুবিধে মত সময়ে লোন পরিশোধ করবে, তবে শোধ করতে হবে একশো বছরের মধ্যে। প্রস্তাবটা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে গেল।

সকাল ছ'টায় পেরুর প্রেসিডেন্ট বিশেষ একটা ডিক্রি জারি করলেন, তাতে বলা হলো কোন বিদেশী উৎস থেকে দেশী কোম্পানীর ঋণ গ্রহণ করার চুক্তি যদি স্টক কিনে নেয়ার শর্তযুক্ত হয় তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে, এবং এখন থেকে এ-ধরনের চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এক হাজার মিলিয়ন সোলসের পেরুভিয়ান ন্যাশনাল ফান্ড গঠনের কথাও ঘোষণা করা হলো, ষোলো আনা দেশীয় কোম্পানীগুলো নতুন প্ল্যান্ট বা মেশিনারি বসানোর কাজে ওই ফান্ড থেকে টাকা ধার করতে পারবে।

'এই সিদ্ধান্তের পিছনে আমার কাজিনের যে অবদান,' এক গাল হেসে বললেন সিনর মাদ্রে, 'তা যদি কোনদিন প্রকাশ পায়, ন্যাশনাল হিরোইন হয়ে যাবে সে।' পুলিস চীফ আক্ষরিক অর্থেই আনন্দে বগল বাজাতে শুরু করলেন।

তাকে থামিয়ে দিলেন সিনর রাফায়েল পেড্রো। 'ভবিষ্যতে কখনও পেরুভিয়ান প্রিন্টআউটের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করা হবে না।'

তাঁর সাথে একমত হলেন সিনর মাদ্রে।

'তবে,' সিনর পেড্রো বলে চললেন, 'আমি নিশ্চিত জানি, প্রেসিডেন্টের সামনে আলোচ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ রহস্য উন্মোচিত করায় সিনর মাসুদ রানার প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন। এবং কোন সন্দেহ নেই তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হবেন না।'

'তারমানে, রানা,' ফোড়ন কেটে ফিসফিস করে বলল গগল, 'ওরা তোমাকে 'অর্ডার অভ দি কম্প্যানিয়নস অভ দি সান-এ ভূষিত করবে।' হাসছে সে। 'তারমানে, তোমাকে আমার কম্প্যানিয়ন পেড্যানিয়্যার বলে ডাকতে হবে।'

রানা অন্যান্য বিষয়ে চিন্তা করছে। লিমার চলতি পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ সময় অজ্ঞ রয়েছে ও। 'সিনর মাদ্রে,' পুলিস চীফের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আপনার সাহায্য দরকার আমার। গোটা ব্যাপারটা আমাদের নিউ ইয়র্ক অফিসের এক লোকের মাথা থেকে বেরিয়েছিল, আপনার কাজিন সেটা অ্যাডাপ্ট করে। লোকটা আমাদের কোম্পানী থেকে পাঁচ মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে। পাঁচজন লোক জানত কাজটা কিভাবে করেছে সে। তাদের মধ্যে চারজন হয় মারা গেছে নয়তো নিখোঁজ হয়েছে। বাকি একজন হলেন আপনার কাজিন।'

'আপনার এই লোক, বলছেন, নিউ ইয়র্কে আছে?'

'না, সিনর মাদ্রে। সে এখানে, লিমায়।'

ষোলো

পুলিস হেলিকপ্টারে চড়ে সান ক্রিস্টোবালে পৌঁছুল ওরা। 'আমার মিসট্রেস চলে গেছে,' ছলছল চোখে বলল এডনা। কোথায় তা সে জানে না।

পুলিস স্ফুয়েলা মাদ্রে আর চার্লি ফ্রানসির ফটোগ্রাফ বিলি করল। চার্লি ফ্রানসির ফটোটা আনানো হয়েছে মিডো নিউ ইয়র্কের শীফ ফাইল থেকে। এয়ারপোর্টে লোক পাঠিয়ে চেক করে করে দেখা হলো ইমিগ্রেশন ফাইল। হোর্স শাভেজ এয়ারপোর্ট থেকে যারাই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে চড়ল, তাদের অজ্ঞাতে প্রত্যেকের ফটো তোলা হলো। হাইজ্যাকার বিরোধী ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে ডিপারচার গেটের কাছে লুকিয়ে রাখা ছিল ক্যামেরাটা।

চারজন আবার ওরা পুলিস চীফের অফিসে মিলিত হলো।

'দেশ ছেড়ে পালাতে হবে আপনাকে,' সিনর মাদ্রেকে বলল রানা। 'কিভাবে

পালাবেন?'

'গাড়িপথে হয় ইকুয়েডর নয়তো চিলিতে যাব, প্যান আমেরিকান হাইওয়ে ধরে। লোকাল ফ্লাইটও ধরতে পারি–লিমা থেকে ইকুইটস, সেখান থেকে প্লেন বদলে ব্রাজিল। গাড়িপথে অ্যারিকুইপা যাব, রাতটা থাকব ওখানে, তারপর হাইড্রোফয়েলে চড়ে লেক টিটিকাকা পেরিয়ে বলিভিয়ায় চলে যাব। পালাতে চাইলে, পথের কোন অভাব নেই। সাহস থাকলে পাহাড় টপকেও যেতে পারি আমি। জঙ্গল পেরিয়ে যাওয়া যায়, আমাজনের তীর ধরে, কিন্তু তাতে বিপদ হতে পারে…'

যে লোক পাঁচ মিলিয়ন ডলার চুরি করেছে, বিপদের ঝুঁকি সে নেবে না। নিরাপদে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, তা না হলে টাকাটা খরচ করবে কে!

একের পর এক রিপোর্ট আসছেই। কোনটা বিশ্বাসযোগ্য, কোনটা নয়, সবগুলোই অসমাপ্ত। প্যান আমেরিকান হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখা গেছে জুয়েলা মাদ্রেকে। দেখা গেছে চার্লি ফ্রানসিকে। ক্যালে কাপুনে এক দম্পতি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে, সারারাত ধরে ঝগড়া-ঝাঁটি করেছে তারা, আজ সকালে আর্তচিৎকার শোনা গেছে, তারপর সব চুপচাপ। ফটো দুটোর সাথে তাদের চেহারার মিল আছে। জুয়েলা মাদ্রে এইমাত্র একটা লোকাল প্লেন থেকে ময়য়োবাম্বায় নেমেছে। এ-ধরনের প্রতিটি সূত্র পরীক্ষা করে দেখা হলো, সবই ভুয়া। সকাল দশটার দিকে প্রেসিডেন্টের সামারপ্যালেস থেকে একটা ফোন কল রিসিভ করল রানা। সরকারী গাড়িতে চাপিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়ে আসা হলো ওকে, খাতির করে বসানো হলো কাল যে কামরায় ইন্টারোগেট করা হয়েছিল সেখানে, তারপর প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ওর বুকের ওপর কোটে পিন দিয়ে আটকে দিলেন অর্ডার অভ দি কম্প্যানিয়নস অভ দি সান। তাড়াহুড়ো করে পুলিস হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসার সময় গাড়িতে থাকতেই অর্ডারটা খুলে পকেটে রেখে দিল রানা। না, এখনও কোন আশাপ্রদ খবর আসেনি। জুয়েলা মাদ্রে আর চার্লি ফ্রানসি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে, পিছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি।

দুপুরের দিকে ক্লান্ত শরীর আর মনমরা ভাব নিয়ে অ্যাভেনিডা অ্যাবানসের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল রানা, অনেকদিন পর গভীর দিবানিদ্রায় পার করে দিল দুটো ঘণ্টা, তারপর বেরিয়ে এসে রওনা হলো ক্রিলন হোটেলের উদ্দেশে।

ফটো দেখে সিনর চার্লি ফ্রানসিকে চিনতে পারল ডোরম্যান। সিনরের জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করে এনেছিল সে, তবে সিনরের নির্দেশে গাড়িটা ভাড়া করেছিল টি. সিরিলের নামে। গাড়ি? কেন? কোম্পানীর কয়েক ডজন গাড়ির যে-কোনটা ইচ্ছে করলেই ব্যবহার করতে পারত চার্লি ফ্রানসি, ভাড়া করা গাড়ি তার দরকার হবে কেন? কোন্ এজেন্সির গাড়ি? ডোরম্যান রানাকে একটা কার্ড ধরিয়ে দিল। 'ঝামেলামুক্ত গাড়ি, সিনর।' সন্দেহ নেই এজেন্সিটা তার ভাই বা শ্যালকের। এজেন্সির অফিস অ্যাভেনিডা উইলসনের সরু একটা গলিতে। হ্যাঁ, টি. সিরিলকে তারা গাড়ি ভাড়া দিয়েছে–একটা ব্রিটিশ এমজি স্পোর্টিং কার। কোন ধারণা আছে সিনর টি. সিরিল কোথায় যেতে পারেন? নেই, তবে আন্দাজ করা যায়। নেগ্রায় গেছে? এরকম ধারণা করার কারণ? কারণ ট্র্যাফিকেটর চেক করার জন্যে সিনর টি.

সিরিল যখন এজেন্সি অফিসে ফিরে আসেন, ব্যাক সীটে স্কিন ডাইভিঙের সরঞ্জাম দেখা গেছে। স্কিন ডাইভিঙের জন্যে পুনৃটা নেগ্রার চেয়ে ভাল স্পট আর কি হতে পারে, বলুন?

পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে হেলিকপ্টারে চড়ল রানা, চলে এল পুনৃটা নেগ্রায়। কালো ব্যাসাল্ট পাথরের আধিক্যের কারণেই জায়গাটার নাম পুনৃটা নেগ্রা রাখা হয়েছে, জানানো হলো ওকে। স্থানীয় পুলিসের চোখ ঘুমে ঢুলঢুলু হয়ে আছে, চেহারা নির্লিপ্ত। তবে অর্ডার অভ দি কম্প্যানিয়নস অভ দি সান দেখাতে তৎপর হয়ে উঠল তারা। চার্লি ফ্রানসি আর তার এমজি স্পোর্টিং কারের সন্ধানে সাগরতীর চষে ফেলল। কিন্তু লাভ হলো না কোন, হতাশ হয়ে লিমায় ফিরে এল রানা। পুলিস চীফের কামরায় ঢুকে দেখল সিনর মাদ্রে সাংঘাতিক উত্তেজিত।

'আমরা তাকে পেয়েছি,' বললেন তিনি। 'জুয়েলাকে পাওয়া গেছে। একা এবং নিরাপদে আছে সে।'

'গুড। কোথায় তিনি?'

'অ্যারিকুইপায়।' দেয়ালে সাঁটা একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়ালেন সিনর মাদ্রে। অ্যারিকুইপা লিমার দক্ষিণে, প্যান আমেরিকান হাইওয়ের ধারে। 'জুয়েলা সারারাত গাড়ি চালিয়েছে,' ধারণা করলেন তিনি। 'গাড়িতে পনেরো ঘণ্টার রাস্তা।'

'আপনার কোন ধারণা আছে কেন তিনি ওখানে গেছেন?'

'অনেক মাদ্রে আছে ওখানে। জুয়েলা সম্ভবত কোন আত্মীয়ের সাথে থাকতে গেছে।'

'কিভাবে তার খোঁজ পাওয়া গেল?'

'অদ্ভুত ব্যাপার। সাইকেলের চাকা লাগানো ফলের দোকানগুলো দেখেছেন তো? ধাক্কা দিয়ে তার একটা উল্টে দেয় ও।'

'গাড়ির ধাক্কায়?'

'উঁহুঁ, হাঁটছিল ও। বাঁক পেরিয়ে ছুটে এল একটা গাড়ি, আরেকটু হলে ওকে চাপা দিয়ে চলে যেত। ভাগ্যিস লাফ দিয়ে দোকানটার ওপর পড়ে জুয়েলা। দোকানদার পুলিস ডেকেছে স, জুয়েলার নাম লিখে নেয়। দোকানদারকে অবশ্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছে জুয়েলা...'

'মাদ্রেসুলভ আচরণ, সন্দেহ নেই-কি ধরনের গাড়ি?'

'কোন গাড়ি?' ক্লান্তি দূরীকরণে দিবানিদ্রার আশ্রয় নেননি সিনর মাদ্রে, রাত জাগার শ্রান্তি চেহারায় বিধ্বস্ত ভাব এনে দিয়েছে।

'যেটা জুয়েলা মাদ্রেকে চাপা দিতে যাচ্ছিল?'

'তা তো জানি না। পুলিস খানিক পর পৌঁছায় ওখানে...'

'আপনার কাজিন এখন কোথায়?'

'অ্যারিকুইপার হোটেলে। তার ঘরে। পাঁচমিনিটও হয়নি অ্যারিকুইপা পুলিস চীফের সাথে ফোনে কথা বলেছি আমি।'

'আপনার কাজিনের দরজায় লোক রাখতে বলুন তাকে।'

'সেকি! কেন?'

'আমার ধারণা, গাড়িটা চার্লি ফ্রানসি চালাচ্ছিল।'

'কিন্তু অ্যারিকুইপা পুলিস চীফ বললেন তাঁর ওদিকে ফ্রানসিকে দেখা যায়নি। তাছাড়া, একটা ক্লু পেয়ে মনে হচ্ছে দেশের উল্টোদিকের সীমান্তের কাছে আপনার চার্লি ফ্রানসিকে পাওয়া যাবে...'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওদিকেও তদন্ত করে দেখুন। তবে আমার ধারণা অ্যারিকুইপাতেই পাওয়া যাবে তাকে।'

'ওহ্-ফোর-সিক্স-টু. ওয়ান-ফোর,' বলল রানা।

'রজার। কোথায়? এবং কখন?'

'অ্যারিকুইপা। এখনই।'

'ঠিক আছে।'

ফসেট এয়ারলাইন্স থেকে রানার জন্যে একটা বোয়িং চার্টার করল ওহ্-টু-ফাইভ। মুহূর্তের নোটিশে এরচেয়ে ছোট কোন প্লেন পাওয়া গেল না।

রানা পৌঁছে দেখল, হোটেল আবাটানাকার নয় নম্বর স্যুইটটা দু'জন পুলিস পাহারা দিচ্ছে। খাতায় নাম লিখিয়ে আগের দিন রাতে হোটেলটায় উঠেছে জুয়েলা মাদ্রে। আজ সকালে অল্প কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেরিয়েছিল সে, ফিরে আসে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে, সাদা লিনেনের স্যুটে ধুলো আর টমেটোর রস লেগে ছিল। নিচের তলায়, হোটেলের লবিতে তার সাথে কথা হয় পুলিসের। তারপর সে ওপরতলায় তার স্যুইটে ঢোকে, রুম-সার্ভিসকে বলে দেয়, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। সেই থেকে নিজের স্যুইটেই আছে সে, বেরোয়নি বা খায়নি। লিফটে চড়ে তিনতলায় উঠল রানা, করিডর ধরে হেঁটে স্যুইটের সামনে পৌঁছুল, কথা বলল পুলিসদের সাথে, তারপর নক করল দরজায়।

ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। এবার আগের চেয়ে জোরে নক করল রানা। ডেস্ক ক্লার্কের কাছ থেকে চাবি আনার জন্যে একজন পুলিসকে নিচে পাঠানো হলো। আরও কয়েকবার নক করল রানা। তারপর তালা খুলল ও, সাবধানে উঁকি দিল স্যুইটের ভেতর।

সামনের কামরাটা খালি। এক এক করে সবগুলো কামরা দেখা হলো। বেডরুমের মেঝেতে টমেটোর রস লাগা স্যুটটা পড়ে রয়েছে। বাথরুমে কোন কসমেটিকস পাওয়া গেল না, অন্য কোন কাপড়চোপড়ও রেখে যায়নি জুয়েলা মাদ্রে। তবে স্যুইটের ভেতর একটা সেন্টের গন্ধ রয়েছে। লাঞ্চ পার্টিতে এটা মেখেই গিয়েছিল জুয়েলা মাদ্রে।

পুলিস দু'জনের দিকে কঠিন চোখে তাকাল রানা। 'দরজার সামনে সব সময় ছিলেন আপনারা?'

পরস্পরের দিকে তাকাল তারা, তারপর দু'জন একসাথে বিড়বিড় করে বলল, 'জী, ছিলাম, সিনর।' রেগেমেগে কামরা থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। মিথ্যে কথা বলছে তারা।

*

সারা বছর নৌ চলাচল উপযোগী টিটিকাকা লেক আন্তর্দেশীয় পানির দীর্ঘতম বিস্তৃতি। আকাশের হ্রদ নামে পরিচিত টিটিকাকা বহু যুগ ধরে প্রতিবেশী দেশ বলিভিয়ার সাথে একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। টিটিকাকাকে আন্তর্দেশীয় সাগর বলা যেতে পারে, সী লেভেল থেকে সাড়ে বারো হাজার ফুট ওপরে তার অবস্থান, আয়তনে লেক জেনেভার চেয়ে বিশগুণ বড়। একশো ত্রিশ মাইল লম্বা, নয়শো ফুট গভীর, তার বুকে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ট্রাউট, এক একটা পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড ওজন।

কিংবদন্তী আর রহস্যে ছেয়ে আছে গোটা এলাকা, আর আছে জমাট নিস্তব্ধতা। লেকের দু'পাশে লোক বসতি খুবই কম, গভীর বনভূমিতে শেষ কবে মানুষের পা পড়েছে বা আদৌ কখনও পড়েছে কিনা কে জানে। পুনো থেকে লা পাজ পর্যন্ত যাওয়া আসা করে হাইড্রোফয়েল, ওটাই সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে নিস্তব্ধতা ভাঙার কাজটা সারে। পুনো থেকে হাইড্রোফয়েল ছাড়ে প্রতি বুধ, বৃহস্পতি আর শনিবার, ফিরে আসে প্রতি সোম, মঙ্গল আর শুক্রবার। এঞ্জিনের ভট ভট আওয়াজ শুনে মনে হয় লেকে যুদ্ধ বেধে গেছে।

রানা যখন পৌঁছুল পুনোয় তখন বেশ ঠাণ্ডা। সারা দিন ভাড়া করা একটা ফিয়াট চালিয়ে অ্যারিকুইপা থেকে এল ও, পথে পিছনের সাসপেনশনটা ভেঙে ঝুলে পড়েছিল। পাহাড়ী এলাকার দুর্গম রাস্তা, দুঃস্বপ্নের ভেতর সময় কেটেছে রানার। রাস্তার ধারে কদাচ দু'একটা ঘর দেখা গেছে, প্রতিবার থেমেছে রানা, পাহাড়ী লোকদের প্রশ্ন করেছে।

হ্যাঁ, তারা একটা সাদা মেয়েকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছে। হ্যাঁ, একজন সাদা লোককেও দেখেছে। পাটীর একটা গ্যারেজে থামতে হলো রানাকে, সাসপেনশনটা মেরামত করিয়ে নিল। মেকানিক লোকটাও গাড়ি দুটোকে দেখেছে। মেয়েটা তো পরী, সিনর। হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই তার দোকান থেকে গ্যাসোলিন নিয়েছে। আশপাশে সুগন্ধ ছড়িয়ে গেছে মেয়েটা। গাড়ি? লাল ফেরারী। পুরুষ লোকটা পুরানো একটা এমজিএম চালাচ্ছিল। দুটো গাড়ির মাঝখানে সময়ের ব্যবধান? এক ঘণ্টা, নব্বুই মিনিট, কমবেশি ধরে নিন, সিনর।

ব্রাউন বোলার হ্যাট পরা ইন্ডিয়ান যুবতীরা আশপাশ দিয় হেঁটে যাচ্ছ, পুরুষদের মাথায় সাদা পানামা। অভ্যেসবশত কোকার পাতা চিবোচ্ছে প্রায় সব পুরুষ। কিশোর ছেলেরা ট্রানজিসটর রেডিও কানে ঠেকিয়ে ভাষা শিক্ষার অনুষ্ঠান শুনছে। গ্যারেজ মেকানিক মাটিতে বসে নিজের কাজ করছে আর কথা বলছে রানার সাথে। রাস্তা দিয়ে এক পাল লামা হেঁটে গেল, বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওগুলোকে, পিঠে বোঝা। এদিকের পাহাড়ে ঝাঁক ঝাঁক বন্য লামা ছাগল, ভেড়া আর গরু চরে বেড়ায়। ধরে এনে পোষ মানালেই নিজের সম্পত্তি হয়ে গেল। পেরুর প্রত্যন্ত অঞ্চল দেখে রানা উপলব্ধি করল, ওর নিজের জন্মভূমির সাথে এই দেশটার অন্তত একটা ক্ষেত্রে প্রচুর মিল আছে। বেশিরভাগ মানুষ বুদ্ধির দোষে অধিকার থেকে বঞ্চিত, গা ঝাড়া দিয়ে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে জানে না, খাটাখাটনির কাজকে বড় ভয়। ও কাজ করছে না, আমি কেন করব–এই মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের বিস্তার

ঘটাচ্ছে। মানুষের মধ্যে যে বিপুল উদ্ভাবনী শক্তি আছে, কাজের মধ্যে ডুবে না গেলে কেউ কিভাবে তা আবিষ্কার করবে? সম্পদের অভাবের কথা বলা হয়, শুনতে শুনতে কান পচে যাবার অবস্থা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন রাজনীতিক উঁচু গলায় এই সাধারণ সত্য কথাটা দেশবাসীকে শোনাবার সাহস করেনি–সম্পদ তুমি নিজে, সম্পদ তোমার দুটো হাত। বাংলাদেশী মুদ্রার হিসাবে তিনশো কোটি টাকার মালিক এক জাপানীকে দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা বিরতিহীন পরিশ্রম করতে দেখে রানা তার সাথে আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। কথা প্রসঙ্গে জাপানী যুবক তার হাত দুটো দেখিয়ে রানাকে বলেছিল, 'এই হাত আমার প্রতিপালক।' বুঝতে অসুবিধে হয় না, কাজের প্রতি এ-ধরনের শ্রদ্ধাবোধ আছে বলেই জাপানীরা আজ এই পর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছে। আর পেরুতে বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গৃহপালিত পশুর বড় বড় ডেয়ারি ফার্ম গড়ে ওঠেনি বলেই তৃতীয় বিশ্বের তালিকা থেকে পেরুর নামটা মোছা যাচ্ছে না।

সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে পুনোয় পৌঁছুল রানা। সরাসরি পুলিস চীফের সাথে দেখা করতে এল ও। পুলিস চীফ চারদিকে লোক পাঠিয়েছিলেন। হাইড্রোফয়েল স্টেশনের কাছে একটা গ্যারেজে আড়াল করে রাখা হয়েছিল ফেরারীটাকে। আর হোটেল ট্যুরিস্টাস-এর কাছে একটা গলিতে ছিল এমজিএম। ট্যুরিস্টাসে টি. সিরিল বা চার্লি ফ্রানসি নামে কোন লোক নাম লেখায়নি। তবে জুয়েলা মাদ্রে ওই হোটেলেই উঠেছে।

লিমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করল রানা। সিনর মাদ্রে পুনোর পুলিস চীফকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন সম্মানীয় কম্প্যানিয়ন-এর সাথে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে।

কাল সকাল সাতটায় রওনা হবে হাইড্রোফয়েল, লা পাজ-এর পোর্টে পৌঁছুবে সন্ধ্যা ছ'টায়। সিভিলিয়ান পুলিস ফোর্স ব্যবহার করা ইচ্ছা নয় রানার, অবশ্য কোন বিকল্পও নেই। উঁচু পার্বত্য এলাকায় দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ও, তিরিক্ষি হয়ে উঠছে মেজাজ। হোটেল ট্যুরিস্টাসের দোতলায় উঠে জুয়েলা মাদ্রের কামরার সামনে থামল ও, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। দরজা খুলে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে জুয়েলা মাদ্রে।

বাদামী রঙের উলেন ট্রাউজার স্যুট পরে আছে সে, তার ওপর চড়িয়েছে উলেন পোলো-নেকড সোয়েটার। চুলগুলো টান টান হয়ে আছে পিছন দিকে, ঘাড়ের পিছনে খোঁপা। রানাকে দেখে তার চেহারায় অবাক কোন ভাব ফুটল না। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল সে, রানার পিছনে বন্ধ করল দরজা, কবাটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত।

সোজা জানালার সামনে হেঁটে এল রানা, হোটেলের পিছনের রাস্তাটা দেখল। রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোয় সার সার কাঠের ঝুল-বারান্দা, কোত্থেকে যেন বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসছে। রাস্তাটা ফাঁকা। জানালার দিকে পিছন ফিরল ও।

'বসবেন না, সিনর মাসুদ রানা?' টুংটাং যন্ত্রসঙ্গীতের মত মৃদু কণ্ঠস্বর জুয়েলা মাদ্রের, ঠোঁটের কোণ ক্ষীণ ব্যঙ্গাত্মক হাসি নিয়ে একটু যেন বেঁকে আছে।

একটা সোফায় বসল রানা। 'অনেক ভুগিয়েছেন আমাকে, নিদেনপক্ষে একটা

ড্রিঙ্ক অফার করুন।'

বেল কর্ডটা টানল জুয়েলা মাদ্রে। খানিক পর নক হলো দরজায়। কবাট জোড়া সামান্য ফাঁক করল সে, রুম-সার্ভিসকে আঞ্চলিক ভাষায় দ্রুত কিছু বলল, অর্ডার নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কিশোরী মেয়েটা। রানা চুপ করে থাকল, জুয়েলা মাদ্রেও কথা বলছে না। একটা ট্রে হাতে ফিরে এল কিশোরী, তাতে কয়েকটা বিয়ারের ক্যান আর দুটো গ্লাস।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'প্ল্যানটা ভালই ছিল,' বলল ও। 'উতরেও গেছে।'

'অবশ্যই উতরে গেছে। আপনি বাধা দিতে কসুর করেননি, তারপরও।'

'চার্লি ফ্রানসি নামে কাউকে কখনও চিনতেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, নামটা কখনও শুনিনি,' বলল জুয়েলা মাদ্রে, চোখের পাতা একবার কাঁপল না পর্যন্ত।

'শুনুন, নষ্ট করার মত সময় নেই। রেডিও-টিভি শোনেননি, তাই জানেন না আপনার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। আপনাদের প্রেসিডেন্ট একটা ডিক্রি জারি করেছেন। কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, বুঝতে পারি। বোমা ফাটিয়ে নিরাপদ দূরে সরে থাকতে চাইছেন, তাই তো? পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে ফিরে-গিয়ে পরিবারের সাথে মিলিত হবেন, দেশপ্রেমিকা জুয়েলা মাদ্রেকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেবে দেশবাসী। ঠিক?'

'আপনি অনেক কিছুই বোঝেন,' মুচকি হেসে বলল জুয়েলা মাদ্রে। 'আমি দুঃখিত, আমাদেরকে প্রতিপক্ষ হতে হলো। আমি আমার দেশকে ভালবাসি, সেজন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছি। যদি ভেবে থাকেন প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী মাদ্রে পরিবারের আভিজাত্য আমার কাছে খুব মূল্যবান, আপনি ভুল করবেন। মাদ্রে পরিবার যে-সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গর্ব করে, আমার কাছে সেগুলো কোন গর্বের বিষয় নয়। তা যদি হত, ওদের মত দেশের জন্যে শুধু নাকি কান্নাই কাঁদতাম, সাহস করে কিছু করার কথা ভাবতাম না। আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন, সিনর রানা?'

'হ্যাঁ, বোধ হয় পারছি।'

'আপনার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কিছু নেই আমার,' বলল জুয়েলা মাদ্রে, রানার সামনে একটা আরামকেদারায় বসেছে সে, হাতের গ্লাসে এখনও চুমুক দেয়নি। 'কিংবা আপনার কোম্পানীর বিরুদ্ধেও ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু হঠাৎ যখন জানতে পারলাম আমার দেশকে দেউলিয়া হবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, উপলব্ধি করলাম আমার কিছু না করলেই নয়...'

'আপনি বেছে নিলেন মিডোকে...'

'ইউ.এম.পি-র সাথে আপনাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট নিখুঁত অজুহাত পাইয়ে দিল আমাকে...'

'আর অ্যামস্টারডামের বৈঠক থেকে আপনি পেয়ে গেলেন উপায়।'

'চার্লি ফ্রানসি,' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করল জুয়েলা মাদ্রে। 'মেগ ফিলিপ।

কেকারিয়া উইলিয়ামস। ডেল্টা টিউবসের ওই লোকটা, তার নাম আমি ভুলে গেছি। সবাই চোর, জঘন্য চরিত্র—অল্পসময়ে প্রচুর টাকা কামাবার জন্যে যে-কোন ক্রাইম করতে পারে। টাকা ওরা কামিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, ওদেরকে ধরা খুব সহজ কাজ হবে না…'

'আপনি জানেন না, জুয়েলা?'

'কি জানব?' লোকগুলো সম্পর্কে জুয়েলা মাদ্রের কোন আগ্রহই নেই।

'আপনার কি ধারণা, সান ক্রিস্টোবালে কে আপনার গাড়ি নালায় ফেলে দিয়েছিল?'

'জানা কথা, আপনি। আপনাকে আমি দোষ দিই না। আমরা দু'জন যে যার বিশ্বাস নিয়ে লড়ছিলাম। পেরুভিয়ান প্রিন্টআউট বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে আপনাকে যদি আমার খুনও করতে হত, আমি পিছপা হতাম না।'

'কে আপনাকে অ্যারিকুইপায় গাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল?'

'আপনি ছাড়া কে! সেজন্যেই কি এখানে আপনি আসেননি আবার?' এমন সুরে কথাগুলো বলল জুয়েলা মাদ্রে, যেন গ্রাহ্য করে না সে। 'বুঝতে পারেননি, লিমা থেকে এত দূরে কেন আমি পালিয়ে এসেছি? আপনাকে এড়ানোর জন্যে। ভাবতেও পারিনি এতদূরে আপনি আমার নাগাল পাবেন। ভেবেছিলাম, আমার খোঁজ যদি পানও, প্রেসিডেন্টের ডিক্রি শোনার পর আমার পিছু ধাওয়া না করে আপনি বরং নিজের কোম্পানীর সুখ্যাতি উদ্ধারে ব্যস্ত থাকবেন। কিন্তু আমার ভুল হয়েছে। আপনি প্রতিশোধপরায়ণ মানুষ, তাই না, সিনর রানা?'

জুয়েলা মাদ্রের ব্যাগটা টেবিলের ওপর, তার হাতটা সেদিকে একটু একটু করে এগোল। তার ধারণা, রানা লক্ষ করছে না। সোফা ছেড়ে জানালার দিকে এগোল রানা, পিছন ফিরল জুয়েলা মাদ্রের দিকে। তারপর ঘুরল বিদ্যুৎবেগে, চরকির মত। জুয়েলা মাদ্রের হাত পৌঁছে গেছে ব্যাগে, কিন্তু তার আগে রানাই ছোঁ দিয়ে ছিনিয়ে নিল সেটা।

ব্যাগটা খুলল রানা। যা ভেবেছিল, ভেতরে ছোট্ট একটা বেরাট্টিয়ান অটোমেটিক রয়েছে, ফোর মিলিমিটার বোর। একটা প্রজাপতিকেও থামাতে পারবে না। ব্যাগটা ছুঁড়ে বিছানার ওপর ফেলল ও, ক্লিপ খুলে নিয়ে অটোমেটিকটাও ছুঁড়ে দিল ব্যাগটার দিকে।

'সাবধানে শোনো, বোকা মেয়ে,' বলল রানা, কণ্ঠস্বর কঠিন এবং রূঢ়, 'তোমাকে যে ধাওয়া করছে সে আমি নই। কমপিউটারে কৌশল খাটিয়ে তুমি যা করেছ…'

সবই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। জুয়েলা মাদ্রে যা করেছে তার পিছনে দেশপ্রেম এবং আদর্শ ছিল, স্বীকার করে ও। ব্যক্তিগতভাবে রানা নিজেও ইউ. এম. পি-মিডো চুক্তির ওই বিশেষ শর্তটা পছন্দ করেনি কখনও। মিডোর বদলে অন্য কোন বিদেশী কোম্পানী হলে পেরুর অর্থনীতি হয়তো এতদিনে তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেত। রানার একমাত্র উদ্বেগ ছিল চার্লি ফ্রানসিস চুরি। সর্বশেষ খবর, পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি করেছে সে, এবং তার ধারণা জীবিতদের মধ্যে একমাত্র জুয়েলা

মাদ্রেই তার এই চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে। জুয়েলা মাদ্রেই শুধু বলতে পারবে কিভাবে চুরিটা করেছে সে। সান ক্রিস্টোবাল রোডে রানা নয়, চার্লি ফ্রানসি তাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। অ্যারিকুইপাতেও। সবশেষে রানা বলল, জুয়েলা মাদ্রের কোন গুরুত্ব দেয় না সে, গুরুত্ব দেয় চার্লি ফ্রানসিকে। এই মুহূর্তে আশপাশেই রয়েছে সে, এই হোটেল থেকে এক মাইলের মধ্যে। দুটো উদ্দেশ্য তার। দুনিয়ার বুক থেকে গায়েব হয়ে যাওয়া। এবং জুয়েলা মাদ্রেকে খুন করা।

শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জুয়েলা মাদ্রের চেহারা। দাঁড়িয়ে আছে পাথরের একটা মূর্তি। 'আমি...আ-মি আপনার ক-কথা বিশ্বাস করি না।'

আঙুলের গিটে নখ ঠেকিয়ে গুনতে শুরু করল রানা। 'মেগ ফিলিপ, নিখোঁজ, ধারণা করা হচ্ছে নিহত। কেকারিয়া উইলিয়ামস, গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। ডেল্টা টিউবসের সেই লোকটা, যার নাম তুমি মনে করতে পারছ না, বাড়িতে মেরামতের কাজ করতে গিয়ে ইলেকট্রিক তারে জড়িয়ে মারা গেছে। জুয়েলা মাদ্রে, কি লেখা হবে তার সমাধি ফলকে? সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত?'

সেদিন তো প্রায় মারাই গিয়েছিলাম, ভাবল জুয়েলা মাদ্রে, বেঁচে গেছি গাড়ির টপ খোলা ছিল বলে।

'একটা জিনিস অবশ্য বুঝছি না আমি,' বলল রানা। 'অ্যারিকুইপায় বোকামি করেছে চার্লি ফ্রানসি। বাজারের মধ্যে কেন যে সে তোমাকে গাড়ি চাপা দেয়ার চেষ্টা করল! লিমা থেকে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এলে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা স্বাভাবিক। হয়তো হঠাৎ তোমাকে দেখে সে, সহজ টার্গেট ভেবে সুযোগটা ছাড়তে ইচ্ছে করেনি।'

'আপনি বলতে চাইছেন...'

'আমি বলতে চাইছি,' ধমকের সুরে বলল রানা, 'সাবধান না হলে চার্লি ফ্রানসির হাতে খুন হতে যাচ্ছ তুমি, জুয়েলা মাদ্রে। কাল তুমি হাইড্রোফয়েলে চড়ে টিটিকাকা লেক পেরোতে চাইছ, তাই না? বলিভিয়ায় পৌঁছুনোর শতকরা এক ভাগ সম্ভাবনাও নেই [illegible] এগিয়ে এসে জুয়েলা মাদ্রের কাঁধে হাত রাখল রানা। 'জুয়েলা, চার্লি ফ্রানসি অত্যন্ত চতুর আর হিংস্র লোক। সে এরই মধ্যে অনেকগুলো লোককে খুন করেছে। লোকটা পারফেকশনিস্ট, তার আর নিখুঁত একটা ক্রাইমের মাঝখানে একমাত্র বাধা তুমি। শুধু যদি তার অহমিকার স্বার্থেও হয়, তোমাকে সে বেঁচে থাকতে দিতে পারে না।'

'নিয়তির পরিহাস, তাই নয় কি?' আবার সেই ব্যঙ্গাত্মক ক্ষীণ হাসি নিয়ে ঠোঁটের কোণ সামান্য বাঁকা হলো জুয়েলা মাদ্রের। 'যার বিরুদ্ধে লড়েছি আমি সেই আমাকে সাহায্য করতে চাইছ?'

জুয়েলা মাদ্রের কাঁধের ওপর হাতের চাপ বাড়ল। 'অতীত,' বলল রানা, 'ভুলে যাও। একটা আদর্শের জন্যে কাজ করেছ তুমি। যা করেছ তা আমি সমর্থন করি না, সে-কথা ঠিক। তাছাড়া, সানসেজের মৃত্যুর দায়-দায়িত্ব তুমি এড়িয়ে যেতে পারো না...'

'তার ওপর যারা নির্ভরশীল ছিল তাদের নাম-ঠিকানা পেলে,' বলল জুয়েলা

মাদ্রে, 'আমি আর্থিক সমস্যার সমাধান করব।'

'সে দায়িত্ব ইতিমধ্যে পালিত হয়েছে,' জানাল রানা, 'তুমি যাদেরকে কিক মেরে পেরু থেকে বের করে দিতে চাইছ সেই মিডোর দ্বারা।'

জুয়েলা মাদ্রে মাথা নত করল; লজ্জা তার কাছে নতুন একটা ভাবাবেগ।

'থাক এ-সব কথা,' বলল রানা। 'কাল তুমি হাইড্রোফয়েলে থাকছ। আমি জানি, চার্লি ফ্রানসিও থাকবে। সে তোমাকে খুন করার চেষ্টা করবে, আর তখনই তাকে আমি ধরতে চাই। অবশ্য ইচ্ছে করলে হাইড্রোফয়েলে না-ও তুমি চড়তে পারো...'

'তাহলে সে-ও চড়বে না। তাকে ধরবেন কিভাবে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, এখনও আমি জানি না।'

'তাকে থামানোর কোন উপায় নেই? মানে, বলতে চাইছি, আমার কাছাকাছি পৌঁছুনোর আগে তাকে গ্রেফতার করা যায় না? পুলিস যদি ওত্ পেতে থাকে, হাইড্রোফয়েলে সে যখন চড়তে যাবে...?'

'তুমি ভাবছ আর সব আরোহীর মত প্রকাশ্যে হেঁটে আসবে সে?' হেসে উঠল রানা।

'হাইড্রোফয়েলে চড়তে হলে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরেই তো আসতে হবে তাকে, ওই একটাই তো...'

মাথা নাড়ল রানা। 'চার্লি ফ্রানসি সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না। উদ্ভাবনী ক্ষমতা না থাকলে এতগুলো লোককে এতদিন ধরে ঘোল খাওয়াতে পারত সে?'

আগের দিন রাত তিনটের সময় পুনো থেকে এক মাইল উত্তর-পুবে গাড়ি থামাল চার্লি ফ্রানসি। গাড়ি থেকে নেমে স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল। নিজের ওপর খিঁচড়ে আছে মেজাজ। কারণ হিসেবে তার ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে। আগে থেকে সবই চিন্তা করা ছিল, শুধু মনে ছিল না এত ওপরে অক্সিজেনের অভাব হতে পারে। তার দৃষ্টি ঝাপসা লাগছে, পেশীতে অস্বস্তিকর টান, শরীর অসম্ভব ক্লান্ত, উৎসাহে ভাটা পড়েছে। গাড়ির পিছন থেকে চারটে এয়ার বটল নামাল সে। প্রতিটি বটল নব্বুই মিনিট অক্সিজেন সরবরাহ করবে। তার ইচ্ছে হলো এখুনি খানিকটা অক্সিজেন নেয়, মাথার ভেতরটা তাহলে হালকা আর পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু না, অপব্যয় করা উচিত হবে না লী হার্ভের জন্যে অক্সিজেন মানে জীবন। ওয়েট-স্যুট পরল সে, পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিল বটলগুলো। বাঁকা হয়ে গেল পিঠ, অসম্ভব ভারী লাগল বোঝাটা। সদ্য ছাড়া কাপড়চোপড় একটা ব্যাগে ভরে ফেলল। ব্যাগে আরও রয়েছে ওয়ালেট, কাগজ-পত্র, একটা কোল্ট অটোমেটিক। ক্লিপে রাউন্ড রয়েছে নয়টা; কোল্টটা পয়েন্ট ফরটিফাইভ। দুটোর বেশি গুলি করার দরকার হবে না। একটা জুয়েলা মাদ্রেকে মারার জন্যে, অপরটা নিজের বগলের নিচে করার জন্যে।

মেয়েটা রেস্তোরাঁর এক কোণে বসবে, ভিড় থেকে যতটা সম্ভব দূরে। জুয়েলা মাদ্রে অভিজাত, ভিড় সে পছন্দ করে না। আরও অনেক জিনিস পছন্দ করে না সে।

অ্যামস্টারডামের কথা মনে আছে, যেখানে ওর সাথে পরিচয় হয় তার। কে যেন বলেছিল ল্যাটিন আমেরিকান মেয়েরা উনুনে বসানো কেটলির মত গরম? স্রেফ গালগল্প, অন্তত জুয়েলা মাদ্রের বেলায় কথাটা খাটে না। জুয়েলা মাদ্রে একটা ঠাণ্ডা মাছ, জড়িয়ে ধরতে গিয়ে এমনকি চড়ও খেতে হয়েছে তাকে। মর শালী, তোকে আমার দরকার নেই। পকেটে পাঁচ মিলিয়ন ডলার থাকলে তোর মত অমন কত কাছে ভিড়বে। বরং খেদ জাগে টিনা সিরিলের জন্যে, তাকে সাথে নিতে পারছে না বলে। টিনা সিরিল সত্যি খাসা একটা মাল বটে! সাথে নেবে কি করে, সব জানাজানি হবার পর বেচারিকে চোদ্দ শিকের ভেতর থাকতে হবে যে। পাঁচ মিলিয়ন ডলার চুরির ঘটনাটা ফাঁস হয়ে যাবে, সূত্র ধরে পুলিস জেনে ফেলবে বারমুডা অ্যাকাউন্টের কথা, জেনে ফেলবে টি. সিরিল কোম্পানীগুলো চালু করেছিল। হ্যাঁ, চার্লি ফ্রানসির ব্যাপারটাও টের পাবে পুলিস, তবে কেস-বুকে টিনা সিরিলের সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করা হবে তার নাম।

সাবধানে গাড়িতে উঠল চার্লি ফ্রানসি। শালার গাড়ি বটে এক খানা! আগামী হপ্তায় একটা রোলস রয়েস কিনবে সে। গাড়ি ছেড়ে দিল, খানিকটা উৎসাহ ফিরে এসেছে। মাটি এদিকে উঁচু নিচু, ঘন ঘন ঝাঁকি খেলো সে।

কিনারা থেকে দু'ফুট নিচে লেক, লাফ দিয়ে সরাসরি পানিতে পড়ল এমজিএম। গতি রুদ্ধ হবার আগে পানির কিনারা থেকে খানিকটা দূরে চলে এল গাড়ি, আট ফুট গভীরে ডুবে গেল। বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন।

সীট থেকে উঠে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি। জলজ আগাছা সরিয়ে পানির ওপর মাথা চাড়া দিল। সাঁতরে তীরে এসে উঠল সে। চারটে বাজে। শুকনো ঝোপের ভেতর থেকে বের করল ব্যাগটা, বের করল আন্ডারওয়াটার স্লেজ। জিনিসটা প্রায় তিন ফুট লম্বা, পনেরো ইঞ্চি চওড়া, সামনের দিকে জোড়া ব্যাটারির বড় দুটো খোপ। সুইচ অন করে ব্যাটারি পরীক্ষা করল সে, পুরোপুরি চার্জ করা রয়েছে। স্লেজের নিচে রাবার/প্রোপিলিন প্রপেলার নাইলন বেয়ারিঙের ওপর নিঃশব্দে ঘুরতে শুরু করল। জলজ আগাছা এড়িয়ে লেকের পরিষ্কার পানির দিকে স্লেজ চালাল সে, এয়ার বটল আর ব্যাগটা স্ট্র্যাপ দিয়ে স্লেজের সাথে বেঁধে নিল।

পানির নিচে তলিয়ে গেল স্লেজ, পাম্পের সাহায্যে বয়্যান্সি ব্যাগগুলোয় আরও বাতাস ভরল চার্লি ফ্রানসি। বোঝাসহ স্লেজ ভেসে থাকতে পারছে দেখে বাতাস পাম্প করা বন্ধ করল সে, তারপর স্লেজের পিছু পিছু সাঁতরে বেরিয়ে এল চ্যানেলে।

চ্যানেলে বেরিয়ে এসে অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফেলল সে, স্লেজের ব্যাটারি অফ করল—অক্সিজেন এবং ব্যাটারি দুটোই বাঁচাচ্ছে। ভাসমান স্লেজটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলো খানিকটা অক্সিজেন নেয়, কিন্তু নিল না, জানে প্রয়োজনের সময় না পেলে মারা পড়তে হবে।

জুয়েলা মাদ্রেকে মারার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার না করলেও চলত, কিন্তু অ্যামস্টারডামের সেই রাতটার কথা ভোলেনি চার্লি ফ্রানসি, জানে শুধু খুনের জন্যে খুন নয়, জুয়েলাকে তার মারতে হবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। জুয়েলার বেডরুমে ছিল সে, কৌশলে ঢুকে পড়েছিল, বিছানার ওপর তাকে চেপে ধরে মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা

করছিল রাজি করানোর। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত জুয়েলাকে বলে সে। পাঁচ মিলিয়ন ডলার কিভাবে চুরি করবে মিডো থেকে, কিভাবে এফ.বি.আই-কে ফাঁকি দেবে। জুয়েলা যদি তার সাথে যায়, সুখী হবে ওরা। কিন্তু মন দিয়ে শুনছিল না জুয়েলা, সে তার হাত সরাতেই ব্যস্ত ছিল সারাক্ষণ। তবে বলাও যায় না, হয়তো সবই শুনেছিল, মনেও করতে পারে...। না, ঝুঁকি নেয়া চলে না। জুয়েলাকে খুন করলে তবেই তার পাঁচ মিলিয়ন ডলার নিরাপদ, নিরাপদ তার নতুন পরিচয়। দুনিয়ার আর কেউ জানবে না কিভাবে কি করেছে সে।

আরেক চ্যানেলে চলে এসেছে চার্লি ফ্রানসি, এটাই চলে গেছে পুনোর ডকে। হঠাৎ হাইড্রোফয়েলটাকে আসতে দেখল সে। স্পীড কমল হাইড্রোফয়েলের, ক্যানাডিয়ান গীজের মত নেমে পড়ল পানিতে, তারপর জেটির একটা পাশ লক্ষ করে ভেসে গেল। প্রায় চমকে উঠল চার্লি ফ্রানসি, হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তার। কোথায় গিয়েছিল ওটা? সন্ধ্যায় লা পাজ থেকে এসেছে, সকাল সাতটায় রওনা হওয়ার আগে পর্যন্ত রাতটা জেটিতেই থাকার কথা। তাহলে? কোথায় গিয়েছিল? কোথেকে ঘুরে এল?

বোধহয় এঞ্জিন টেস্ট করতে, হ্যাঁ তাই হবে। হয়তো কিছু মেরামত করা হয়েছে, পরীক্ষা করা হলো।

বাতাস ছেড়ে দিতে ধীরে ধীরে স্লেজটা পানির ওপর থেকে নেমে গেল। এয়ার-রিলিজ বাটন থেকে হাত সরাল চার্লি ফ্রানসি, ঠিক পানির নিচে ভেসে থাকল স্লেজ। চিৎ হলো সে, স্ট্র্যাপের ভেতর হাত গলাল, বটলগুলো সেঁটে গেল পিঠে। কোমরে বেল্ট বেঁধে মাস্ক পরে নিল সে। অক্সিজেনের সরবরাহ পেয়ে স্বস্তিকর একটা ভাব ছড়িয়ে পড়ল তার সারা শরীরে। মাথা আর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল।

পানি থেকে নয় ফুটের মত নিচে রয়েছে, এবার সাঁতার দিয়ে সামনে এগোল, এখনও স্লেজের ব্যাটারি ব্যবহার করছে না। হাইড্রোফয়েল স্থির হয়ে রয়েছে, একটা বাদে সবগুলো এঞ্জিন বন্ধ। বিলজ পাম্প, ইলেকট্রিক জেনারেটর সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস পাবার জন্যে এঞ্জিনটা চালু রাখা হয়েছে। পানিতে সাবধানে ফ্লিপারের ঝাপটা দিয়ে বোট ঘেঁষে এগোল চার্লি ফ্রানসি, সামনে ভেইনগুলো দেখতে পেল, প্লেনের ডানার মত, তবে তার চেয়ে মোটা। গতি নির্দিষ্ট একটা মাত্রায় পৌঁছুনোর পর এই ভেইনগুলোই হাইড্রোফয়েলকে পানি থেকে তোলে। বোটের ভেতর থেকে ভেইনগুলোর আকৃতি বদলানো হয়, এক কোণ থেকে আরেক কোণে দিক বদলানোর দরকার হয়, তার পরই বিশাল আকার এবং বিপুল ওজন সহ জলযানটা পানি ছেড়ে উঠে পড়ে, ছুটে চলে পানির গা ছুঁয়ে।

ভেইনের নিচে ডুব দিল চার্লি ফ্রানসি, লোহার আঙটার সাথে বাঁধল স্লেজটা, জানে আঙটা একটা থাকবে ওখানে। এরপর সেই কাজটা, যার ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করবে। স্লেজ থেকে নাইলন রশি নিল সে, স্লেজের নাকের সাথে শক্ত করে বাঁধল। রশির অপরপ্রান্তটা লোহার আঙটার সাথে আটকাল ফসকা গেরোর সাহায্যে। রশিতে একটু টান পড়তেই স্লেজ ছাড়া পেয়ে যাবে। এরপর লোহার আঙটার সাথে স্লেজকে যে রশি দিয়ে বেঁধেছিল সেটা খুলে নিল। ফসকা গেরোটা পরীক্ষা করে

দেখল, সময় হলে ঠিক মতই কাজ করবে।

ডেইনের নিচে স্থির হলো চার্লি ফ্রানসি, বোট থেকে উঁকি দিয়ে কেউ নিচে তাকালেও তাকে দেখতে পাবে না। হাইড্রোফয়েল যদি সময়মত রওনা হয়, মাত্র এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

সতেরো

বোটের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করল পুলিস, এমনকি পানিতে একজন ডাইভার নামিয়ে লিমপেট মাইন আছে কিনা তা-ও পরীক্ষা করে দেখা হলো।

কিছুই পাওয়া গেল না। এরপর লেক ধরে বেশ খানিক দূর চালানো হলো বোট, নির্দেশ পেয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্কিপার ফুল স্পীড তুলল–তাকে অবশ্য জানানো হয়নি স্যাবোটাজের আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিছুই ঘটল না। কাস্টমস অফিসাররা প্রত্যেক আরোহীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল, বেশিরভাগই তারা ছোটখাট ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি, লা পাজ আর পুনোয় ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখাশোনা করে। দশ-বারো জন ট্যুরিস্টও আছে, আছে দশজন বলিভিয়ান, যারা খনিতে কাজ করতে এসেছিল, ছুটি কাটাতে ফিরে যাচ্ছে দেশে। ক্রুদেরও চেক করা হলো, চেক করা হলো সাপ্লাইয়ারদের, যারা ঘন ঘন বোটে ওঠা-নামা করছে। চার্লি ফ্রানসির ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও, কারও চেহারা তার বর্ণনার সাথে মিলল না। জেটিতে, জেটির দু'পাশে তীরে পুলিস পাহারা থাকল। চ্যানেলে বেশ কয়েকটা লঞ্চ রয়েছে, লঞ্চ বা নৌকো যোগে যাতে কেউ হাইড্রোফয়েলে উঠতে না পারে সেদিকে তাদের তীক্ষ্ণ নজর। অবশেষে মাসুদ রানা ও জুয়েলা মাদ্রে গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক ধরে উঠল বোটে। চার্লি ফ্রানসি বোটে ওঠেনি।

লাইনস্ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে জেটি থেকে সরে এল হাইড্রোফয়েল। আরোহীরা তীরে দাঁড়ানো লোকজনদের উদ্দেশে হাত নাড়ল। একটু পরই চ্যানেলে বেরিয়ে এল বোট। চ্যানেল ধরে দশ মিনিট এগোবার পর টারবাইন খোলা হবে, ডেইনের ওপর ভর করে পানি ছেড়ে ওপরে উঠবে বোট, তখন শুরু হবে সত্যিকার দ্রুতগতি যাত্রা।

রানা আর জুয়েলা ফরওয়ার্ড ডেকে রয়েছে, রেইলিঙে ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে লেকের দিকে। লেকের পানি আয়নার মত মসৃণ। ছোট ছোট বোট নিয়ে উরো নেটিভরা অপেক্ষা করছে, হাইড্রোফয়েল দূরে সরে গেলে আবার তারা মাছ ধরতে শুরু করবে।

রানার দিকে ফিরল জুয়েলা, নিজেও জানে না ওর একটা হাত চেপে ধরে আছে সে। 'তুমি ভুল করেছ,' বলল সে, সম্বোধনে আন্তরিকতার ছোঁয়া। 'তোমার কথা ফলেনি। বোটে নেই সে। কাজেই আমি নিরাপদ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওকে আমি লিমার পুলিস-চীফের হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত

তুমি নিরাপদ নও। কিংবা তার লাশ না দেখা পর্যন্ত।'

শিউরে উঠে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল জুয়েলা। মাসুদ রানা নামের এই বিদেশী লোকটা তার জীবনে একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ এত নিবেদিতপ্রাণ হতে পারে? ওর শক্তির উৎস কি, এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় কি করে! লোকটার চেহারা মনে রাখার মত, ভাব দেখে মনে হয় সব সময় হালকা মেজাজে আছে, কিন্তু বাইরের আবরণ সরে গেলে টের পাওয়া যায় ভেতরটা নিখাদ নিরেট ইস্পাত। এরকম এক পুরুষের ভালবাসা পেলে যে-কোন নারীর জীবন সার্থক হতে পারে, ভাবল সে। শুধু যদি বদ-চরিত্রের চোরগুলোর পরিবর্তে রানার সাথে পরিচয় হত তার, আনন্দময় একটা স্রোতধারা পেয়ে অন্য এক রোমাঞ্চকর খাতে বয়ে যেত জীবনটা। ওরা যদি দু'জনেই দু'জনের প্রেমে পড়ত, কি ঘটত তাহলে? কি ঘটত কল্পনা করতে গিয়ে পুলকে অবশ হয়ে এল জুয়েলার সারা শরীর। তার জীবন থেকে ভয় দূর হত, অনিশ্চয়তার অবসান ঘটত, নিজেকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত সে। হ্যাঁ, তার জীবনে এই একজন পুরুষ এসেছে, যার কাছে নিঃশর্তভাবে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে পারা যায়। কিন্তু তা কি হবার!

তাকে নিয়ে ডাইনিং সেলুনে চলে এল রানা, স্টীল বাল্কহেডের কাছে একটা কোণায় বসাল। সাথে করে পত্র-পত্রিকা নিয়ে এসেছে জুয়েলা। 'এখন থেকে নড়বে না তুমি,' বলল রানা। 'কোন কারণে যদি কোথাও যাবার দরকার হয়, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবে, দাঁড়িয়ে থাকবে এক মিনিট। কিন্তু ওয়াশরুম ছাড়া আর কোথাও যেয়ো না—ওই যে রেস্তোরাঁর কোণে ওটা।'

'তুমি কোথায় থাকবে?' জিজ্ঞেস করল জুয়েলা, চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

মাথা নাড়ল রানা। 'কাছাকাছি কোথাও থাকব, তবে তুমি জানতে পারবে না। তাহলে চার্লি ফ্রানসি রেস্তোরাঁয় যখন ঢুকবে, আমার দিকে তাকাতে পারবে না তুমি।'

'ফ্রানসি? কিন্তু সে তো বোটে নেই। আমরা জানি সে…'

'সত্যিই কি জানি?' প্রশ্ন রেখে বেরিয়ে গেল রানা।

চার্লি ফ্রানসি বোটে আছে। হাইড্রোফয়েল রওনা হবার সাথে সাথে ভেইন হাউজিঙের ভেতর দিয়ে এগোল সে। ভেইনের পিছনে বোটের গা, গা বেয়ে অর্থাৎ ইন্সপেকশন ল্যাডার-এর ধাপে পা দিয়ে ওপরে উঠল। পানির গা থেকে একটু ওপরে, এবং ওভারহ্যাঙের নিচে, যেখানে কাত হয়ে ঝুঁকে থাকা ভেইনের মেকানিজম বোটের সাথে মিলিত হয়েছে, ওখানে দু'ফুট লম্বা একটা ইন্সপেকশন কাভার রয়েছে, বাইরের দিকে একটা হাতল সহ। ঢাকনিটা খুলল সে। ভেতরে লম্বা একটা চেম্বার, মেঝেতে সার সার স্টীল রড, ওগুলো গায়ে খাঁজ কাটা চাকা আকৃতির একটা তিন ফুট উঁচু অ্যাপারেটাসের ভেতর ঢুকে গেছে। চেম্বারে ঢুকল সে, সতর্ক থাকল ওয়েট-স্যুট যাতে কিছুর সাথে আটকে না যায়। রডগুলোর ওপর বসে ওয়েট-স্যুট খুলল সে। ব্যাগ থেকে বের করে পরে নিল স্যুট, মোজা আর জুতো। এখন তাকে

দেখে সাধারণ একজন আরোহী বলেই মনে হবে। নাইলন রশির একটা প্রান্ত রয়েছে তার কাছে, অপরপ্রান্তে বাঁধা রয়েছে বোটের গায়ে স্লেজটা। ওয়েট-স্যুট ভাঁজ করে প্লাস্টিক ব্যাগে ভরল, ব্যাগটা বাঁধল অক্সিজেন বটলগুলোর সাথে। এরপর বটল আর ব্যাগ বাঁধল নাইলন রশির সাথে, যেটার আরেক প্রান্তে রয়েছে স্লেজ। বটল আর ব্যাগ কিনারা থেকে পানিতে ফেলে দিল সে, ওগুলো এখন স্লেজ থেকে ঝুলছে। এবার দ্বিতীয় নাইলন রশিটা নিয়ে কাজ শুরু করল, যেটার সাহায্যে বোটের গায়ে সাঁটিয়ে রাখা হয়েছে স্লেজটাকে। দ্বিতীয় রশির মুক্ত প্রান্তটা ইন্সপেকশন ডোরের ঠিক ভেতরে একটা লোহার বার-এর সাথে বাঁধল, তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা, রশির অবশিষ্ট অংশ কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় ঝুলে থাকল চ্যানেলের পানিতে।

এবার ভেইন গিয়ার রুম থেকে বেরিয়ে এল চার্লি ফ্রানসি, কয়েকটা ধাপ টপকে উঠে পড়ল এঞ্জিনরুমে। এঞ্জিনরুমের দরজা সাবধানে খুলল সে, একটু একটু করে। এঞ্জিনিয়ার হাতে কালো ন্যাকড়া আর অয়েল বটল নিয়ে এঞ্জিনের যত্ন নিচ্ছে। যান্ত্রিক শব্দে কান পাতা দায়, চার্লি ফ্রানসি শব্দ করলেও এঞ্জিনিয়ার শুনতে পাবে না। তবে তার চোখে ধরা না পড়ে কামরাটা পেরোবার কথা ভাবা যায় না। সাহস করে ভেতরে ঢুকল সে, ঝুঁকি নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। যখন বুঝল, এবার এঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিপথে পা ফেলতে হবে তাকে, ঘুরে দাঁড়াল সে, লোকটার দিকে চোখ রেখে পিছু হটতে শুরু করল। চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখতে পেল এঞ্জিনিয়ার, মাথা ঘোরাল তার দিকে।

'দুঃখিত,' বলল চার্লি ফ্রানসি, 'ভুল করে ঢুকে পড়েছি।'

হাত তুলে তাকে বেরিয়ে যাওয়ার দরজাটা দেখিয়ে দিল এঞ্জিনিয়ার। ঘুরল চার্লি ফ্রানসি, শান্তভাবে হেঁটে বেরিয়ে এল এঞ্জিনরুম থেকে। আপনমনে হাসছে সে। পানির মত সহজ।

হাইড্রোফয়েলে উঠেছে সে, পকেটের ভেতর হাতে ধরা রয়েছে পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক। সে জানে তার টার্গেট জুয়েলা মাদ্রেও উঠেছে এই বোটে।

রেস্তোরাঁর বাইরে, বার-এ বসে রয়েছে রানা, বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মধ্যে। বারের পিছনে আয়না রয়েছে, আয়নার ভেতর দিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোকার পথ ও ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে ও। টেবিলের ওপর হাত রেখে বসে রয়েছে জুয়েলা মাদ্রে, ম্যাগাজিন পড়ছে বা পড়ার ভান করছে। তার কাছ থেকে তিন টেবিল দূরে দু'জন বলিভিয়ান বসে রয়েছে। বলিভিয়ানদের একজন রেস্তোরাঁয় ঢোকার পরপরই জুয়েলা মাদ্রেকে দেখে প্রথমে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, তারপর দু'চোখ দিয়ে বুভুক্ষুর মত গিলতে শুরু করেছিল, কিন্তু জুয়েলার আগুন ঝরা দৃষ্টি তাকে সামনে এগোতে বাধা দেয়। চারজন ট্যুরিস্ট বসেছে দেয়াল ঘেঁষে ফেলা লম্বা বেঞ্চের ওপর। চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায়, ওরা ক্যানাডিয়ান।

বারম্যান টের পেল এঞ্জিনের পালস্ দ্রুত হলো। একমাত্র রানাই কিছু পান করছে, ইঙ্গিতে ওকে সতর্ক করে দিল সে। খপ্ করে গ্লাসটা ধরে ফেলল রানা,

বোট ওপর দিকে উঠতে শুরু করায় পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। গ্লাসটা ধরে ফেললেও, কিনারা থেকে ছলকে খানিকটা বিয়ার পড়ল টেবিলে। চোখাচোখি হতে হাসল বারম্যান। 'বিশ্বাস করবেন না, অনেকে জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে।' রানা উপলব্ধি করল পেটে নিরেট কিছু পড়া উচিত ছিল। খেতে বসে সময় হারানোর সাহস হয়নি ওর।

রেস্তোরাঁয় ঢুকল চার্লি ফ্রানসি। চট্ করে একবার বারের দিকে তাকাল সে, কিন্তু রানা বসে আছে মাথা নিচু করে, মুখের অর্ধেকটা হাতে-ধরা গ্লাসে ঢাকা। ঘাড় সোজা করে রেস্তোরাঁর ভেতর তাকাল ফ্রানসি। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে, জুয়েলা মাদ্রের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে। বলিভিয়ানদের অর্ডার নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল ওয়েটার, মুহূর্তের জন্যে ফ্রানসির দৃষ্টি থেকে জুয়েলাকে আড়াল করল সে। জুয়েলা কিছু না বুঝেই, কিংবা মন খুঁত খুঁত করে ওঠায়, মুখ তুলে তাকাল।

চার্লি ফ্রানসিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে, দেখল তার দুটো হাতই পকেটে ঢোকানো। সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকল জুয়েলা, চিৎকার করতে ভুলে গেছে। ইতোমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে রানা, নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে।

'হ্যালো, জুয়েলা,' শান্তভাবে বলল ফ্রানসি, তবে তার গলা রেস্তোরাঁর আরেক প্রান্তে পৌঁছুল। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল জুয়েলা, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু পকেট থেকে হাত বের করার কোন লক্ষণ ফ্রানসির মধ্যে দেখা গেল না।

পকেটের ভেতর আগ্নেয়াস্ত্রের চারদিকে শক্ত হলো ফ্রানসির মুঠো। আর ঠিক তখন ডাকল রানা, ভরাট গলার চিৎকার, 'চার্লি, বিপদ, মাথা নামাও।'

মাথা নামাতে শুরু করে ট্রিগার টেনে দিল ফ্রানসি, গুলিটা বলিভিয়ানদের একজনের কাঁধ উড়িয়ে নিয়ে গেল, যেখানে জ্যাকেট ছিল সেখানে থ্যাতলানো রক্ত মাংসের বীভৎস দৃশ্য ফুটে উঠল, খানিকটা মাংস টেবিলে রাখা প্লেটের ওপর পড়ল। তখনও মাথা নিচু করছে ফ্রানসি, সেই সাথে ঘুরছে, ভাঁজ হয়ে গেছে একটা হাঁটু। ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে উড়ে এল রানা, ফ্রানসির কিডনিতে মাথা ঠুকল, চরকির মত ঘুরে গিয়ে একটা টেবিলের কিনারায় আছাড় খেলো ফ্রানসি, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতায় জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল হাত। পকেটের বাইরের দিকে আগ্নেয়াস্ত্রের রেখা ফুটতে দেখল রানা, কিন্তু সেই মুহূর্তে টের পেল ফ্রানসির ভাঁজ করা হাঁটু ওর দিকে উঠে আসছে।

আঘাতটা মুখে লাগল। হাড়সর্বস্ব শক্ত হাঁটু চোয়ালের ওপর হাতুড়ির বাড়ি মারল, চ্যাপ্টা করে দিল নাক, অক্ষিগোলকের ভেতর দিকে ঠেলে দিল একটা চোখকে। হড়হড় করে পানি বেরিয়ে এল দুই চোখ দিয়ে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজের ওপর সামনের দিকে ঘুসি চালাল রানা, অনুভব করল, অন্তত একটা ঘুসি ফ্রানসির পাঁজরে বাড়ি মারল। গুঙিয়ে উঠে টেবিলের ওপর হেলে পড়ল ফ্রানসি, কিন্তু তার পা উঠে এসে আঘাত করল রানার হাঁটুর নিচে, জুতো ঘষে তুলল হাঁটু পর্যন্ত, কাঁচা চামড়া ছিঁড়ে। পড়ে গেল রানা, দুই হাতে ধরে থাকল ফ্রানসির জ্যাকেট। পকেটের কাছে ধরেছে রানা, টেনে ছিঁড়ছে জ্যাকেটের কাপড়, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রটা

আটকে গেছে লাইনিঙে। তারপর সেটা বেরিয়ে এল, পড়ল টেবিলের পাশে মেঝেতে। টেবিলের আরেক কিনারা দিয়ে ওদিকে পড়ল ফ্রানসি। এতক্ষণে চিৎকার শুরু করেছে জুয়েলা। বলিভিয়ানরাও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। তাদের আহত সঙ্গী টেবিলে মাথা দিয়ে রয়েছে, তার সারা শরীর কাঁপছে থরথর করে। খপ্ করে অটোমেটিকটা ধরতে গেল রানা, আঙুলের ডগায় লেগে নাগালের বাইরে চলে গেল সেটা। টেবিলের তলায় মাথা ঢোকাল রানা, ওর বাড়ানো হাতে কপাল ঠুকল ফ্রানসি। ব্যথায় ডান কাঁধ পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল রানার। অপর হাতটা বাড়িয়ে অটোমেটিকটা ধরে ফেলল ও, কার্পেটে মাজল্ ঠেকিয়ে টেনে দিল ট্রিগার।

বিস্ফোরণের ফাঁপা আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল রেস্তোরাঁটাকে। কার্পেটের ওপর আগেই শুয়ে পড়েছে ওয়েটার, অটোমেটিকের গুলি একশো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কামরার চারদিকে। অটোমেটিক ধরা রানার হাত লক্ষ্য করে পা চালাল ফ্রানসি, টেবিলের লোহার পায়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে রানার কব্জি যেন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও। হাতের মুঠো থেকে অস্ত্রটা ছিটকে বেরিয়ে গেল, কার্পেটের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে দূরে সরে গেল সেটা। দাঁড়াবার জন্যে ঘুরল ও, টেবিলটাকে পাশ কাটিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রানসি। রানার একটা হাত দু'হাতে ধরে কামরার অবলম্বন ইস্পাতের পিলারে আছড়ে ফেলল সে, একই সাথে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিল রানার পেটে। রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। বাতাস টানতে শুরু করে শরীর ঢিল করে দিল রানা, বিস্মিত হয়ে ভাবছে আজ বোধহয় ওর চেয়ে অনেক শক্ত একজনের পাল্লায় পড়েছে সে। না, রানাকে নিচের দিকে পড়তে দিল না ফ্রানসি, কাপড় খামচে ধরে খাড়া রাখল ওকে, ধাক্কা দিল পিলারের দিকে।

দেয়ালে ধাক্কা লাগা বলের মত ফেরত এল রানা, লাফ দিল, শূন্যে উঠে জোড়া পা দিয়ে লাথি মারল ফ্রানসির তলপেটে। ছিটকে কাঁচ লাগানো দরজার ওপর পড়ল ফ্রানসি, ভাঙা কাঁচের ওপর হামাগুড়ি দিল, তারপর সিধে হয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল করিডর ধরে।

ধাওয়া করল রানা, কিন্তু ভাঙা কাঁচে পা পিছলে দোরগোড়ায় আছাড় খেলো, হড়কে বেরিয়ে এল করিডরে। ফ্রানসি ইতোমধ্যে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেছে, লাফ দিল সেখান থেকে, বিশ ধাপ নিচে পড়ল। নিজেকে খাড়া করে করিডর ধরে ছুটল রানা, এক সাথে তিনটে করে ধাপ টপকে নেমে এল নিচে। এক পলক দেখা গেল ফ্রানসিকে, এঞ্জিনরুমের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল, পিছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা।

ভারী লোহার দরজাটা হ্যাঁচকা টানে খুলল রানা। ফ্রানসির সামনে লোহার একটা রড হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এঞ্জিনিয়ার। চোখের কোণ দিয়ে রানাকে ঢুকতে দেখল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সেদিকে। একলাফে সামনে এগিয়ে এঞ্জিনিয়ারের নাকে মুখে থাবড়া মারল ফ্রানসি, রেইলিঙের ওপর পড়ল লোকটা, পা দুটো শূন্যে উঠে গেল, ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়ল রেইলিঙের অপর দিকে। ঘুরল ফ্রানসি, রানার দিকে।

রানা ধীরে ধীরে এগোল, হাত দুটো সামনের দিকে সামান্য বাড়ানো, গোটা শরীর ঝুঁকে আছে। ধীরে ধীরে পিছু হটল ফ্রানসি। এক সময় দরজার গায়ে তার পিঠ ঠেকল। এই পথেই যেতে চায় সে, ভেইন গিয়ার রুম দিয়ে।

ফ্রানসি দাঁড়িয়ে পড়ল, রানা এগোচ্ছে। ক্যাটওয়াক-এর দু'পাশের রেইলিং দু'হাত দিয়ে ধরে তৈরি হলো ফ্রানসি।

কেউ কাউকে কিছু বলছে না। দু'জনেই পরস্পরের হাতের দিকে লক্ষ রাখছে, জানে এই লড়াইয়ের একটাই মাত্র পরিণতি হতে পারে। ফ্রানসির কাছ থেকে চার ফুট দূরে থামল রানা, হাত দুটো কংক্রিট পিলারের মত স্থির। ফ্রানসি দু'দিকের রেইলিং শক্ত করে ধরে আছে, কিন্তু সে লাফ দেবে কিনা বলা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কথা বলল ফ্রানসি, 'ওই পাঁচ মিলিয়ন তুমি কোনদিন খুঁজে পাবে না। একটা আপোষ করতে রাজি আছি আমি। টাকাটা কোথায় আছে বলব। তুমি আমাকে চলে যেতে দেবে।'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা, শত্রু ভীতি প্রকাশ করায় বিজয়ের একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা শরীরে।

এই সুয়োগটাই নিল ফ্রানসি। ধরে নিয়েছিল, এ-ধরনের একটা অনুভূতি হবে রানার। কথা শেষ করেনি তখনও, হঠাৎ এক কদম এগিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিল রানা ডান হাঁটুর ওপর। একেবারে আচমকা। ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো রানার। বুঝতে পারল এরপর কি ঘটবে–তলপেটের ওপর আরেকটা লাথি, গলায় কনুইয়ের গুঁতো, তারপর অন্ধকার এবং মৃত্যু। কিন্তু রানার অতিরিক্ত কাছে সরে এসে ভুল করল ফ্রানসি। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে রানা। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। আশ্চর্য শক্তি লোকটার গায়ে। মরণ পণ লড়ছে সে। কোন কৌশলই খাটছে না ওর ওপর। রানা বুঝল, জুডো জানা আছে ফ্রানসির। ওকে নিয়ে মেঝেতে পড়বার চেষ্টা করল–কিন্তু পড়ল শুধু রানা, রেইলিং ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নিল লোকটা। দরজা খুলে ফেলল ফ্রানসি। একটা পা দরজার ভেতর গলিয়ে দিল রানা, দরজা বন্ধ করা গেল না। ভেইন গিয়ার রডের পাশে চলে গিয়ে ইন্সপেকশন ডোর খোলার চেষ্টা করছে ফ্রানসি।

ক্যাটওয়াকে সিধে হলো রানা, হাতে অসম্ভব ভারী স্টীলের একটা বল। ওটা ওখানে রাখা হয়েছিল ডিজেল এঞ্জিন গভর্নরের জন্যে একটা কাউন্টারওয়েট হিসেবে। বলটা ছুঁড়ে মারল রানা ঠিকমত লাগল না, ফ্রানসির মাথা ছুঁয়ে দরজায় আঘাত করল। তাতেই প্রায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো ফ্রানসির, পড়ে গেল সে, তবে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিতে পারল। দরজা খুলে গেছে বলের ধাক্কায়, খোলা দরজা দিয়ে শরীরটা বের করে দিল সে, কিন্তু হাত দুটো দরজার দু'পাশে আটকে গেল। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল রানা, চোখে যদিও সরষে ফুল দেখছে এখনও।

হাইড্রোফয়েলের পাশ ঘেঁষে সগর্জনে পিছনদিকে ছুটছে বাতাস, সেই তীব্র বায়ু প্রবাহের মধ্যে ধরা পড়ল ফ্রানসি, বাতাস তাকে টেনে নিয়ে হাইড্রোফয়েলের গায়ের সাথে সেঁটে ধরল, কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে গেল তার শরীর। পিঠের হাড়

ভাঙার পরিষ্কার আওয়াজ পেল রানা। তার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল ও, একটা কব্জি চেপে ধরে টান দিল, কিন্তু বাইরের বাতাস আর হাইড্রোফয়েলের পাশে ফুঁসে ওঠা পানির অবিরাম ছিটা আরও জোরে টেনে রাখল তাকে। রানা অনুভব করল, ধীরে ধীরে ওর মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ফ্রানসি। একেবারে শেষমুহূর্তে তাকে ছেড়ে দিল রানা, প্রাণপণ চেষ্টা করে ঝুলন্ত নাইলন রশিটা ধরে ফেলল, কিন্তু তবু ঝুলে থাকতে পারল না। বাতাসের হ্যাঁচকা টানে আগেই লেকের পানিতে অদৃশ্য হয়েছে ফ্রানসি, একই পরিণতি হলো রানারও।

অকস্মাৎ পানিতে পড়ে প্রথম কয়েক সেকেন্ড নাকানিচোবানি খেলো রানা, তারপর নাইলন রশিটা কোমরে জড়িয়ে নিল। পানির ওপর মাথা তুলে দেখল হাইড্রোফয়েল দ্রুত গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে, চারদিকে কোথাও কোন চিহ্ন নেই ফ্রানসির। ধীরে ধীরে ওর চারপাশের পানি শান্ত হয়ে গেল। কোমরে পেঁচিয়ে থাকা রশিটা ওর ফুসফুস থেকে অবশিষ্ট বাতাস বের করে দিয়েছে। মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। ফুসফুসের অর্ধেকটা ভরে আছে পানিতে। আধমরাই বলা যায় তাকে। এতক্ষণে হিমশীতল পানির কামড় অনুভব করতে পারছে ও।

মরিয়া হয়ে তীরের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক, মাঝ লেক থেকে তীরের কোন রেখাই দেখা যাচ্ছে না।

মনটাকে শক্ত করল রানা। আশা একেবারেই নেই, তবু বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। মৃত্যুর আগে মরে কাপুরুষরা। প্রথম কাজ রশিটাকে ফেলে দেয়া। ওর ধারণা, ওটা হাইড্রোফয়েল থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। দ্বিতীয় কাজ, ভারমুক্ত হবার পর, সাঁতার কেটে এগোনো। কোথায় যাচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, যাচ্ছে সেটাই আসল কথা। রশিটা কোমর থেকে খুলল ও, ছেড়ে দিতে যাবে এই সময় একটা টান টান ভাব অনুভব করল, যেন কিছুর সাথে আটকে আছে। হয়তো কাঠের কোন দরজার সাথে বাঁধা ছিল, দরজাটাও পানিতে পড়ে গেছে। তা যদি হয়, ভাগ্য বলতে হবে। দরজাটাকে ভেলার মত ব্যবহার করতে পারবে ও। নাইলন রশি টানতে শুরু করল।

শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে টানছে রানা। যখন আর পারছে না, চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে, তলিয়ে যেতে চাইছে শরীরটা, হঠাৎ হাতে চলে এল অক্সিজেন বটলগুলো। বুক ভরে শ্বাস টানল রানা, ঝাপসা লাগলেও চোখের সামনে চলে আসায় ব্যাগটা চিনতে পারল ও। লাইটওয়েট স্যুট খুলে ফেলল, নতুন আশায় উজ্জীবিত। খুলল টাই আর শার্ট। ওয়েট-স্যুট পরে পিঠে অক্সিজেন বটল বাঁধল। হাত দুটো কাঁপছে, প্রাণ ফিরে পাবার আনন্দে নাকি চরম ক্লান্তিতে বলা কঠিন। রশিটা তখনও রয়েছে, সেটা আরও খানিক টানার পর বুকের সামনে উঠে এল স্লেজটা। আনন্দে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করল রানার।

স্লেজে চড়ে রওনা হলো ও। ঠিক এভাবেই রওনা হতে চেয়েছিল চার্লি ফ্রানসি। তবে সে যেত বলিভিয়ার দিকে, রানা যাচ্ছে পুনো, পেরুর দিকে।

মাইল খানেক এগিয়েছে রানা, উড়ে এসে মাথার ওপর স্থির হলো

হেলিকপ্টারটা। রানার পায়ে জ্বালা করছে, সারা শরীরে অন্তত গোটা বিশেক কাটা-ছেঁড়ার দাগ, প্রায় সবগুলো থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাস্ক খুলে আকাশের দিকে মুখ তুলল ও।

রশির সিঁড়ি নামিয়ে রানাকে তুলে নিল ওরা। সিঁড়ির সাথে একটা ক্রেডল নিয়ে নেমে এল গগল, জিজ্ঞেস করল, 'লিফট লাগবে নাকি হে, কম্প্যানিয়ন শেভ্যালিয়্যার?' রানার রক্তমাখা চেহারা দেখে সহাস্যে একটা চোখ টিপল সে। 'কোথায় যেতে চাও তুমি? জুয়েলা মাদ্রে খুব সম্ভব দু'হাত বাড়িয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। নাকি তার কাছ থেকে দূরে কোথাও পালাতে চাও?'

'দূরে, দূরে!' জবাব দিল রানা। ঠাণ্ডায় হি হি করছে।

কুচক্র

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৯

এক

হাতঘড়ি দেখল অরবিন্দ সিংহে ওরফে মাসুদ রানা। ভারতীয় সময় বিকেল চারটে পনেরো। এবার রওনা হতে হয়। সাক্ষাৎ করার জায়গাটা চাণক্যপুরী অর্থাৎ অশোকা হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়, এক কিলোমিটারের মত হবে। চারতলার জানালা থেকে দেখা গেল ফুটপাথে ট্যুরিস্টদের ভিড়, বিকেলের ম্লান রোদ আর ফুরফুরে বাতাসের ভেতর হাঁটতে ভালই লাগবে। রেড ক্রস রোড চেনে রানা, তবে দিল্লী কাফেটা কোথায় জানা নেই–ওখানেই আসবে তাপস গাঙ্গুলী। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান বলে দিয়েছেন, 'সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।' পাঁচটার মধ্যে তাপস যদি না পৌঁছোয়, এক দণ্ডও আর অপেক্ষা করবে না রানা।

রুমমেটেরা সবাই বাইরে, লাল কার্পেট মোড়া করিডরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। মনটা অস্থির হয়ে আছে ওর, এ-ধরনের সাক্ষাতে গুরুতর অঘটন ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবু, মন যতই উদ্বিগ্ন থাক আর করিডর যতই ফাঁকা হোক, চেহারায় ট্যুরিস্টসুলভ হাসিখুশি ভাব নিয়ে এগোল ও। অ্যাশ কালার স্যুট, সাদা পপলিন শার্ট আর কালো জুতো পরে আছে; সিংহলী যুবক অরবিন্দ সিংহের পকেটে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই।

এলিভেটর আর ফাঁদ প্রায় সমতুল্য, এড়াবার সুযোগ থাকলে ছাড়ে না রানা। সিঁড়ির দিকে হাঁটছে, একটুর জন্যে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল। এঞ্জিনের শব্দটা আগে শুনতে পায়নি, কারণ স্টার্ট নিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। ড্রাইভারের বয়স পাঁচ কি ছয়, বাঁক ঘুরে রানার সামনে পড়েছে তিন চাকার সাইকেল, রানাকে দেখে মটরসাইকেল স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ হুবহু নকল করেছে। আঁতকে ওঠার ভান করে ছোট্ট এক লাফে সরে গেল রানা, পরমুহূর্তে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল। ভাবগম্ভীর চেহারা নিয়ে কপালে হাত তুলল ছেলেটাও। হোটেলে ওঠার পর গত তিনদিন ধরে দেখছে রানা, সারাক্ষণ করিডরেই থাকে সে। তার মা-বাবা কাছাকাছি একটা স্যুইটে উঠেছে, একবার আধখোলা দরজার ভেতর তার মাকে দেখেছে ও, শাড়ি পরা নেপালী এক যুবতী–ছোটখাট হলেও শক্ত-সমর্থ। এর আগে যতবার দেখা হয়েছে, ছেলেটাই প্রথম স্যালুট করেছে রানাকে।

তিন আর চারতলার মাঝখানে ল্যান্ডিংটা অস্বাভাবিক চওড়া, রিসেপশন রুমের কাজ তো চলেই, সেই সাথে অভ্যাগতদের জন্যে বসার সুন্দর আয়োজন। সোফায় যারা বসে রয়েছে তাদের মধ্যে নেপাল, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভারত ও বাংলাদেশ অর্থাৎ সার্কভুক্ত সব দেশের লোকজনই উপস্থিত। অতিথিদের সাথে নিচু স্বরে আলাপ করছেন ভারতীয় দু'জন রাজনীতিক। ডেস্কে চাবি রেখে সিঁড়ি বেয়ে

নিচে নামার সময় একটা কথা ভেবে মনে মনে হাসল রানা–ওদের যদি বলা হয়, এইমাত্র তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একজন বাংলাদেশী স্পাই, কে কি ভাববে ওরা?

গ্রাউন্ড ফ্লোরের হলরুমে অনেক লোকের ভিড়। রানাকে দেখে হাইহিলের খট খট শব্দ তুলে ছুটে এলেন জয়া মালহোত্রা, ওদের গ্রুপের জন্যে ভারতীয় ইন্টারপ্রেটর। 'আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি, মি. সিংহে।'

জয়া মালহোত্রার বয়স পঞ্চাশের কম নয়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর সব ক'টা রাষ্ট্রীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। শুধু ভাষা নয়, নৃত্যচর্চাতেও তিনি সমান পারদর্শী, তাঁর হাঁটা-চলার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের বহর দেখলে যে-কোন বঙ্গললনা লজ্জা পাবে। অন্তত পাওয়া উচিত।

'রওনা হচ্ছি কোথায়, মিসেস মালহোত্রা?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল রানা।

সাধারণ সুতী শাড়ি আর ব্লাউজ পরে আছেন জয়া মালহোত্রা, বাম কব্জিতে ছোট্ট হাতঘড়ি বাদে অন্য কোন অলঙ্কার পরেননি, তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে বাহুল্যবর্জিত সাদামাঠা পোশাক আর মার্জিত হাবভাবে। 'লালকেল্লা দেখব, শুধু ওটাই তো বাকি।'

মৃদু হেসে একটা হাত তুলল রানা। 'যাব আর আসব, দু'একটা জিনিস না কিনলেই নয়–যদি দেখেন ফিরতে দেরি হচ্ছে, আমাকে ছাড়াই বেরিয়ে পড়বেন, প্লীজ।'

রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর, হোটেলের গেটে সশস্ত্র পুলিস। তাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এল রানা, ফুটপাথ ধরে রেড ক্রস রোডের দিকে এগোল। মন জুড়ে আবার ফিরে এল তাপস গাঙ্গুলী। আসবে তো সে? অর্থাৎ, আসতে পারবে তো? প্রসঙ্গক্রমে বি. সি. আই. চীফ রাহাত খানের সাথে আলাপের প্রতিটি মুহূর্ত মনে পড়ে গেল ওর। এই তো, মাত্র কয়েক দিন আগের ঘটনা...

সব সেই আগের মত আছে, কিছুই বদলায়নি। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার সাততলা বিল্ডিংটা যেমন ভূমিকম্পে ধসে পড়েনি, তেমনি লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কুঁচকে থাকা ভুরুজোড়াও পেকে একেবারে সাদা হয়ে যায়নি। তাঁর ডাক পড়লে এখনও রানার বুক কাঁপে, হার্টবিট বেড়ে যায়, ঘামে ভেজা ভেজা হয়ে ওঠে হাতের তালু, ঢোক গিলতে ইচ্ছে করে। তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে 'শালা বুড়ো' বলে গাল দেয়, অনুভব করে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, সেই সাথে ওর প্রতি বুড়োর লুকিয়ে রাখা ভালবাসা আর স্নেহ উপলব্ধি করে ভিজে ওঠে চোখের কোণ। রাহাত খানের সাথে ওর সম্পর্ক নিজে যেমন অনুধাবন করে, আর কাউকে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। কখনও সন্দেহ জাগে, ওরা পরস্পরের বন্ধু, কিন্তু আর সবার কাছে ব্যাপারটা সুকৌশলে গোপন রাখা হয়েছে। আবার কখনও মনে হয় স্বাধীনচেতা পুত্র আর প্রতাপশালী পিতার সমতুল্য সম্পর্ক রয়েছে ওদের মধ্যে–পিতা সর্বক্ষণ শাসন করে চলেছেন আর

পুত্র প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কি লেনদেন ঘটছে সে খবর কারও জানা নেই–বিচক্ষণ গুরু নিষ্ঠার সাথে শিক্ষাদান করছেন, উপযুক্ত শিষ্য সাগ্রহে সব গেঁথে নিচ্ছে মনের দেয়ালে। কখনও কখনও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও বাধে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর আস্থার ভাবটুকু সব সময় অক্ষুণ্ন থাকে। লুকোচুরি খেলায় কেউ কারও চেয়ে কম যায় না–রানা ভাব দেখায়, বুড়োর প্রতি তার কোন স্পেশাল ভক্তি নেই; রাহাত খান বোঝাতে চান, রানার প্রতি তার বিশেষ কোন দরদ নেই। দু'জনেই যেন ঠিক উল্টোটা প্রমাণ করার জন্যে একটু বেশি মাত্রায় তৎপর।

না, কিছুই তেমন বদলায়নি। এখনও সেই আগের মত ছেলেমানুষি করে সোহেল আহমেদ, কান মলে দিলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রানার সিগারেট চুরি করে। অনেক দিন পর আবার ঢাকায় ফিরে আসছে রানা, খবরটা পাবার সাথে সাথে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে গোটা অফিস–বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নবাগত এজেন্টরা কিংবদন্তীর নায়ককে স্বচক্ষে দেখতে পাবার আশায় উত্তেজিত হয়ে থাকে, কিভাবে তার সামনে দাঁড়াবে, কি কথা বলবে, কি বলে সম্বোধন করবে, ইত্যাদি ভেবে রীতিমত নার্ভাস বোধ করে। ওর পুরানো বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে বৈঠকে বসে, আলোচনা হয় পুরানো পাপীটাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে–তাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বেমক্কা ধাক্কার মত সারপ্রাইজ দেয়ার উপকরণ দু'একটা না থেকেই পারে না। আর ওর পুরানো বান্ধবীরা রোমাঞ্চিত হয়, সেই সাথে বিষণ্ণও বোধ করে। ইলোরা, কান্তা, সোহানা, সালেহা, রূপা, রীতি, শাহানা, লিলি, রুমানা–এ-রকম কত মেয়ে, কে না বাঁধতে চেয়েছে রানাকে। ওদের মধ্যে একজনই মাত্র প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল, সোহানা চৌধুরী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীরব ব্যথা নিয়ে তাকেও মনটাকে কষে বাঁধতে হয়েছে। রানার সান্নিধ্য লাভ করার, রানাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসার সুযোগ এদের প্রায়-সবাই একবার না একবার অর্জন করেছে, কিন্তু কেউ তারা রানাকে জয় করতে পারেনি। আগুনে ঝাঁপ তারা নিজেদের ইচ্ছায় দিয়েছে, রানাকে কখনও পাবে না জেনেই। তাই ব্যর্থতার জ্বালা পুরোমাত্রায় থাকলেও, রানার প্রতি কারও কোন অভিযোগ নেই। রানা কখনও কাউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়নি, বরং প্রতিটি আগ্রহী মেয়েকে প্রথমেই সতর্ক করে দিতে দ্বিধা করেনি ও। কারও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা স্বভাব নয় ওর। পুরানো বান্ধবীদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে, স্বামীটি হয়তো রানারই কোন বন্ধু বা ভক্ত, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এখনও তারা রানার প্রতি আগের মতই আকর্ষণ বোধ করে।

একনাগাড়ে দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে দেশে ফেরার জন্যে ছটফট করছিল রানা, এই সময় রাহাত খান ওকে ডেকে পাঠান। ঢাকায় ফিরেছে সাতদিন আগে, উঠেছে সিদ্ধেশ্বরীর নতুন কেনা একটা অ্যাপার্টমেন্টে। কিন্তু প্রাণপ্রিয় ঢাকা শহরের সাথে পরিচয়টা নতুন করে ঝালিয়ে নেয়ার বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ এখনও ঘটেনি ওর। বসের অনুমতি না পাওয়ায় অফিসেও যাওয়া হয়নি। প্রায় বন্দী জীবন-যাপন করছে ও, দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা বই-পুস্তকে মুখ ডুবিয়ে

থাকতে হয়। একজন মেসেঞ্জারকে দিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন রাহাত খান, বেশিরভাগই সিংহলী ভাষায় লেখা, কিছু ইংরেজি বইও আছে। সিংহলী ভাষাটা অল্প কিছু জানে রানা, বসের নির্দেশে জানার পরিধি যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিতে হচ্ছে। এছাড়াও, গোটা একটা টপ সিক্রেট ফাইল মুখস্থ করতে হয়েছে রানাকে।

বইগুলো পড়া হয়ে গেছে, অন্যান্য কাজও প্রায় শেষ, সময় আর কাটতে চায় না। রানার প্রিয় খাবারগুলো রেঁধে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টায় রাঙার মা'র কোন ত্রুটি নেই, ব্যস্ত নয় বলে তার এই অত্যাচার এবার অন্তত উপভোগই করছে রানা। হঠাৎ হঠাৎ নিজেরই ভারি অবাক লাগে, রাঙার মা'র সাথে গল্প করার সময়ও সে পাচ্ছে! রাঙার মা মোখলেসের কথা ভোলেনি, প্রায়ই তার কথা তুলে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছে সে। রানার গায়ে টাকা ছুঁইয়ে আঁচলে বেঁধে রাখে, সময় করে মীরপুরের মাজারে দিয়ে আসবে বলে, তাতে নাকি আপদ-বিপদ ওর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। প্রৌঢ়া রাঙার মা আগের মতই ঘোমটা দিয়ে সামনে আসে, আবদারের সুরে ঘরে বউ আনার আবেদন জানায়। রানা হাসে।

হাসলেও, মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে ওর। বিয়ে করে ঘর-সংসার পাততে ইচ্ছে যে হয় না তা নয়। কিন্তু জানে, তা কোনদিন সম্ভব হবে না। দেশকে ভালবেসে এই বিপজ্জনক পেশা বেছে নিয়েছে ও, নিজের অনিশ্চিত আর ঝুঁকিবহুল জীবনের সাথে আরেকজনকে জড়াবার কোন অধিকার ওর নেই। কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেয়াটা তেমন কঠিন কিছু নয়, কিন্তু তাকে তার প্রাপ্য অধিকারটুকু দেয়ার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব নয়। না-মধুর দাম্পত্যজীবন, সুখের ঘর-সংসার ওর জন্যে নয়। সিদ্ধান্তটা পুরানো, অনেক আগেই এ-সব প্রশ্নের ফয়সালা হয়ে গেছে। তবু মাঝে-মধ্যে ছোট্ট একটা বাড়ি, সুন্দরী একটি বউ আর ফুটফুটে একটা শিশুর অভাবে হাহাকার করে ওঠে মনটা।

টেলিফোনে ডাক এল হঠাৎ করে, সাতদিনের দিন। 'কাল সকালে অফিসে এসো। আশা করি বইগুলো থেকে যা শেখার তুমি শিখে নিয়েছ।' বেশি কথা না বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন রাহাত খান।

নতুন অ্যাসাইনমেন্টের আভাস আগেই পেয়েছে রানা, ধারণাও করে নিয়েছে এবার বোধহয় শ্রীলংকায় পাঠানো হবে ওকে। দেশে ফিরতে না ফিরতে আবার বিদেশে যেতে হবে, ভাবতে খারাপ লাগলেও নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাবার আনন্দ আর উত্তেজনার কাছে সেটা ম্লান হয়ে গেল। ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে ও, বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালবাসে। রোমাঞ্চের হাতছানি আছে বলেই তো এই পেশা এত প্রিয় ওর।

চিরকালের অভ্যেস মত, কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টায় অফিসে পৌঁছুল রানা। মনে মনে উত্তেজনা বোধ করছে, সহকর্মী আর বন্ধুদের খুব একচোট চমকে দেয়া যাবে। রাহাত খানের কাছ থেকে আভাস পেয়েছে ও, ঢাকায় ওর ফিরে আসা বা উপস্থিতি সম্পর্কে অফিসের কেউ কিছু জানে না এখনও। এলিভেটরে চড়ে ছয়তলায় উঠল ও, করিডরে বেরিয়ে সাদা পোশাক পরা প্রহরীকে পরিচয়-পত্র দেখাল। লোকটা নতুন, তবে স্যালুট ঠুকল এমন ভঙ্গিতে যেন কতদিনের চেনা। রানার মনে হলো লোকটা অহেতুক গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। দরজা খুলে দেয়া হলো, আরেক

করিডরে চলে এল রানা।

দু'পাশে অনেকগুলো দরজা, পর্দা ঝুলছে। বসার আয়োজন যদি না বদলে থাকে, কোন্ রুমটা কার জানা আছে রানার। হাতের ডান দিকে প্রথম কামরাটা জাহিদের। পরেরটা সোহানার। বাঁ দিকের শেষ কামরাটা সলীলের, প্রথম দুটো রাশেদ আর আনিসের। বিল্ডিঙের আরেক দিকে বসে অন্যান্য এজেন্টরা। ব্রিগেডিয়ার সোহেল বসে সাততলায়।

প্রথম চমকটা জাহিদকেই দেয়া যাক। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল রানা, টাইয়ের নটটা ঠিক করে নিয়ে আস্তে করে হাত বাড়িয়ে পর্দা সরাল, 'কি রে, শালা!' বলার জন্যে তৈরি। ধ্যেৎ, কামরা খালি, ভেতরে কেউ নেই। চট করে করিডরের দু'দিক চোখ বুলিয়ে নিল রানা। এখনও কেউ ওকে দেখে ফেলেনি। ভাবল, রুম যখন খোলা দেখা যাচ্ছে, অফিসে পৌঁছে গেছে ব্যাটা। নিশ্চয়ই কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। করিডরে মাত্র দুটো দরজা বন্ধ, তারমানে এখনও পৌঁছোয়নি সোহানা, কিংবা সে হয়তো ঢাকাতেই নেই। আর রানা তো, জানেই, সলীল এখন স্পেনে। বাঁ দিকে সরে এল রানা, আবার পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাল—কি আশ্চর্য! রাশেদও তার কামরায় নেই। তাড়াতাড়ি পাশের কামরার সামনে চলে এল রানা। এটা আনিসের রুম। ঝট করে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল।

এরপর আবার ডান দিকে, সোহানার পাশের কামরার পর্দা সরাল ও। কেউ নেই। টেবিলে সব কিছু পরিপাটি করে গুছানো, কিন্তু সব জনশূন্য। ইতোমধ্যে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে রানা—ওর ঢাকায় ফেরা এবং আজ অফিসে আসার খবর সবাই ওরা জানে, যার যার নিজের কামরায় অনুপস্থিত থাকার মানে হলো, ওকে তারা কোনভাবে বোকা বানাতে চায়। সোজা এগিয়ে নিজের কামরার দরজা খুলল রানা, পকেটে চাবি ভরে আলো জেলে বসল টেবিলের কোণে, ব্রীফকেসটা রাখল চেয়ারের ওপর। সাজানো-গোছানো টেবিল, ফুলদানিতে তাজা ফুল। তারমানে ওর পার্সোনাল সেক্রেটারি শায়লা অন্তত জানে, ও আসছে। কিন্তু কোথায় সে?

সিগারেট ধরাল রানা, অনুভব করল টান টান হয়ে গেছে পেশীগুলো। জানে, ওকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে আশপাশেই কোথাও গভীর ষড়যন্ত্র চলছে; কিন্তু কোথায়, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এই সময়, ওকে প্রায় চমকে দিয়ে, পিক পিক করে উঠল ইন্টারকম। সুইচ অন করল রানা।

'রানা?' ইলোরার ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বলে চলল সে, 'বস্ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, এই মুহূর্তে চলে এসো!'

চমক, ষড়যন্ত্র, বন্ধু-বান্ধব, এ-সব কিছুই মনে থাকল না, কাঁচা-পাকা ভুরুসহ বাঘের চেহারাটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। ব্রীফকেস নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, জোরে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিল, হন হন করে হেঁটে বাঁক নিল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সাততলায়। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল একটা ওয়াকি-টকি-তে নিচুস্বরে কথা বলছে ইলোরা, ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারটায় পিঠ খাড়া করে বসে আছে সে। রানাকে দেখে ওয়াকি-টকি রেখে দিল দেরাজে, অন করল ইন্টারকম, কথা বলল রাহাত খানের সাথে, 'স্যার, এইমাত্র ঢুকল ও, পাঠিয়ে দেব?'

যান্ত্রিক আওয়াজ বেরিয়ে এল ইন্টারকম থেকে, গম্ভীর ও ভারী, 'হ্যাঁ।'

ইন্টারকম অফ না করেই রানার দিকে তাকাল ইলোরা। 'যাও। বসের সাথে আরও ক'জন আছেন। ওঁদের নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।'

ধাক্কা একটা বেশ বড় রকমেরই খেলো রানা। এতদিন পর অফিসে এসেছে ও, আর ইলোরা কিনা তার সাথে এমন নির্লিপ্ত ব্যবহার করল? রাগ হলেও, মুখে কিছু বলতে পারল না, বস্ শুনে ফেলবেন। ঠিক আছে, হিসাবটা পরে মেটানো যাবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে চেম্বারের দিকে এগোল ও। নক করল দরজায়।

'কাম ইন!' সেই বাজখাঁই কণ্ঠস্বর, অত্যন্ত পরিচিত অথচ আজও রানার পিলে চমকে উঠল। একটা ঢোক গিলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও।

নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে রয়েছেন বি. সি. আই. চীফ, সামনে খোলা একটা ফাইল, নাকের ডগায় নেমে এসেছে চশমাটা, নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছেন তিনি। ডেস্কের এ-ধারে বসা তিনজনের একজনকেও চিনতে পারল না রানা। একজন প্রৌঢ় একজন প্রৌঢ়া, তৃতীয়জন যুবক। প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্যুট পরে আছেন, ব্যাক ব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল। তিনি একটা পাইপ টানছেন। তাঁর পাশে বসেছেন ভদ্রমহিলা, শাড়ি পরিহিতা। ঠোঁটে লিপস্টিক, হাতকাটা ব্লাউজ, কোলের ওপর একটা হাতব্যাগ। তার পাশের চেয়ারটা খালি, হাতলহীন। খালি চেয়ারের আরেক পাশে বসা যুবকের বয়স খুবই কম, উনিশ কি বিশ হবে। সরল চেহারা, একটু যেন মেয়েলি, তবে সারা মুখে পাঁচ-সাত দিনের না কামানো দাড়ি। তিনজনের কেউই ওরা রানার দিকে তাকাল না, চেহারা আর দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধা আর সমীহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে রাহাত খানের দিকে।

রাহাত খান ফাইল থেকে মুখ না তুলেই জলদগম্ভীর সুরে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো!'

খালি চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বসল রানা, পায়ের সামনে কার্পেটে নামিয়ে রাখল ব্রীফকেস। পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণাই পাচ্ছে না ও। কি ঘটতে যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারছে না। সময় বয়ে চলল। চেম্বারের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা। মাঝে-মধ্যে নড়ার মধ্যে একা শুধু প্রৌঢ় ভদ্রলোক নড়ছেন, পাইপ টানার সময়। রাহাত খানের হাতেও একটা চুরুট রয়েছে, কিন্তু অনেক আগেই নিভে গেছে সেটা। গভীর মনোযোগের সাথে ফাইলটা পড়ছেন তিনি, খানিক পর পর পাতা ওল্টাচ্ছেন, মাঝে-মধ্যে হাত তুলে কপালের একটা পাশ টিপে ধরছেন দু'আঙুলে। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ফাইলের লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু অনেকটা দূর বলে কিছুই দেখতে পেল না। অবশ্য ফাইলের রঙ দেখে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, বি. সি. আই-এর কোন এজেন্টের ফাইল ওটা।

আমার নয় তো!

চেম্বারে ঢুকেছে রানা মাত্র তিন মিনিট হয়েছে, কিন্তু মনে হলো তিন ঘণ্টা ধরে বসে বসে ঘামছে ও। দু'দিকে তাকিয়ে তিনজনকে বারকয়েক দেখে নিল ও। তারা কেউ ওর দিকে ভুলেও একবার তাকায়নি, যেন ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়।

'এ আমি তোমার কাছ থেকে আশা করিনি!' হঠাৎ যেন বোমা ফাটল চেম্বারের

ভেতর। সশব্দে ফাইল বন্ধ করলেন রাহাত খান, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন, এক এক করে খুললেন নীল কোটের বোতামগুলো, চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে আছেন সরাসরি রানার বুকের দিকে। কুঁচকে আছে কাঁচা-পাকা ভ্রূ-জোড়া।

কি বলবে, কিছু বলবে কিনা, বুঝতে পারল না রানা। বোকার মত তাকিয়ে থাকল ও।

'এটা কি, দেখতে পাচ্ছ?' তর্জনী ঝাঁকিয়ে ফাইলটার দিকে দেখালেন বৃদ্ধ।

দেখেছে রানা, বন্ধ ফাইলের গায়ে ওর কোড-নেম লেখা রয়েছে। এম. আর. নাইন। 'জ্বী, স্যার!'

'আমি তোমার স্যার নই, রাস্কেল!' গর্জে উঠলেন রাহাত খান। 'তোমাকে স্যাক করা হয়েছে। আজ থেকে তুমি আর বি. সি. আই-এর এজেন্ট নও! ছি-ছি, শেষ পর্যন্ত তুমি কিনা আমার মুখে চুনকালি মাখালে!'

এতক্ষণে ওরা তিনজন, একযোগে, রানার দিকে তাকাল—সবার চোখে বিস্ময়ের সাথে মিশে আছে ঘৃণা আর অবিশ্বাস।

অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে রানা। স্পষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করল ও, 'কি ঘটেছে বলবেন আমাকে?' স্যার-টা বাদ দিল ইচ্ছে করেই।

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গোপনে তোমার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে,' গমগম করে উঠল রাহাত খানের ভারী গলা। 'তিন পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট, প্রমাণ ইত্যাদিসহ, তোমার ফাইলে চিরকালের জন্যে থেকে যাবে। ওরা অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পেরেছে, ভুল করে বা অবহেলাবশত কিংবা জেনেশুনে সি. আই. এ. আর কে. জি. বি-কে দেশের টপ সিক্রেট ইনফরমেশন দিয়েছ তুমি—মূল্যবান উপহারের বিনিময়ে, যেমন নিউ ইয়র্কে অ্যাপার্টমেন্ট, সুইস ব্যাংকে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, লন্ডনে বাড়ি...'

'আপনি বলছেন, ওরা প্রমাণও দাখিল করেছে, কি সে প্রমাণ?' রানা সম্পূর্ণ শান্ত, শুধু টান টান হয়ে আছে পিঠ, চোখে পলক পড়ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমে যুবক, পরে প্রৌঢ়া আর প্রৌঢ় ভদ্রলোককে আরেকবার দেখে নিল।

'প্রমাণ আছে, তা না হলে ওদের রিপোর্ট আমি বিশ্বাস করব কেন?' টেবিলে চাপড় মেরে বললেন রাহাত খান।

রানার হাতের চাবিটা খসে গেল, পড়ল কার্পেটে, পাশে বসা যুবক সেটা তোলার জন্যে ঝুঁকল। তার মাথা ডেস্কের কিনারা থেকে নিচে নামতেই রানার হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন।

এক মুহূর্তে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, কোন্‌টা আগে বা পরে ঘটল বলা মুশকিল। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইন্টারকম, অন করাই ছিল ওটা। ইলোরার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর আবছাভাবে শুনতে পেল রানা, 'স্যার, ফোর-ফোর-জিরো-জিরো! অসময়ে! রেড অ্যালার্ম!'

যুবকের দাড়ি রানার হাতে চলে এসেছে, অপর হাতে প্রৌঢ়ার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল ও।

'ক্যাচাল বেধে গেছে!' বলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন রাহাত খান।

দাড়ি-গোঁফ হারিয়ে যুবক এখন আর যুবক নয়, তরতাজা যুবতীতে পরিণত হয়েছে। রানা তাকে চেনে না। প্রৌঢ়া মহিলাও লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিলেন, চুলসহ মুখোশটা রয়ে গেল রানার হাতে। চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে দৌড় দিলেন রাহাত খান, তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে হোঁচট খেলেন প্রৌঢ়। প্রৌঢ়া মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আসছেন! উনি আসছেন!' রানার মনে হলো গলার অকৃত্রিম আওয়াজটা চিনতে পারছে ও–হারামজাদা সোহেলের। পিছন থেকে খপ্ করে রাহাত খানের কোট চেপে ধরল ও। কিন্তু ছদ্মবেশী রাহাত খান কোটটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে বুলেটের মত বেরিয়ে গেল। সব ক'জন পড়িমরি করে ছুটল, তাদের ধাক্কায় পড়ে যেতে গিয়ে একটা চেয়ার ধরে নিজেকে সামলে নিল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর যখন দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ও, দেখল ওয়েটিং রূমের দরজা দিয়ে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে ইলোরা, তারস্বরে চিৎকার করছে সে, 'পালাও! পালাও! ধরতে পারলে আস্ত রাখবে না!'

হাসল রানা। এক সেকেন্ড কি যেন ভাবল ও। পরমুহূর্তে ফিরে এল খালি চেম্বারে, কার্পেট থেকে নকল দাড়ি-গোঁফ, চুল আর রাবারের মুখোশটা তুলে পকেটে ভরল, ডেস্ক থেকে তুলে নিল ফাইলটা।

নেড়েচেড়ে দেখল ওটা, ভেতরে আজেবাজে কাগজ রয়েছে। ভাঁজ করে কোটের পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, শেষ পর্যন্ত গুঁজে রাখল কোমরের কাছে ট্রাউজারের তলায়। চট করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল আর কোথাও কিছু অসঙ্গতি আছে কিনা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ও, আশা করা যায় বসের ধমক থেকে বেয়াড়া সহকর্মীদের বাঁচানো গেছে। এবার নিজেকে বাঁচানোর পালা। ইলোরার 'ফোর-ফোর-জিরো-জিরো' যে স্বয়ং রাহাত খান আর 'রেড অ্যালার্ম' মানে যে তিনি আসছেন, তাতে আর সন্দেহ কি। কাজেই এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। ব্রীফকেস নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, পর্দা সরিয়ে আগমন ঘটল যমদূতের।

'ও তুমি!' রানাকে পাশ কাটিয়ে ডেস্কের দিকে এগোলেন রাহাত খান। 'ইলোরা বোধহয় তোমাকে পাহারায় রেখে কোথাও গেছে?' রিভলভিং চেয়ারে বসলেন তিনি। 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

বসতে গিয়ে একবার ইচ্ছে হলো রানার, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কাঁচা-পাকা ভুরু-জোড়া টেনে দেখে এটাও নকল মাল কিনা। কিন্তু চিন্তাটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। রানা চিরকাল যা দেখে অভ্যস্ত, খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এবার সব কিছু। এ-লোক যে সেই-লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'ভাষাটা আয়ত্তে এসেছে?'

'জ্বি, স্যার।'

'পড়ার জন্যে যে ফাইলটা পাঠিয়েছিলাম?'

কোলের ওপর রেখে ব্রীফকেস খুলে ফাইলটা বের করল রানা, ওপরে টপ সিক্রেট লেখা রয়েছে, ডেস্কের ওপর বসের সামনে আস্তে করে নামিয়ে রাখল।

'ফাইলে যে কুচক্রটির কথা বলা হয়েছে, তার সাথে তোমার এই

অ্যাসাইনমেন্টের কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। তোমাকে ওটা পড়তে দিয়েছিলাম, কারণ দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে একটা বিকট সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওরা।' থেমে চুরুট ধরালেন রাহাত খান। 'তুমি হিন্দীও তো ভালই বলতে পারো?'

'পারি, খুব ভাল না, স্যার।' মাথা নাড়ল রানা। ঝেড়ে কাশো না বাপ্, মনে মনে বলল ও। আমার যে দম আটকে মরার অবস্থা! কি অ্যাসাইনমেন্ট? কোথায় যেতে হবে? হিন্দী আর সিংহলীর সাথে কি সম্পর্ক?

'দিল্লী যাচ্ছ তুমি।' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রানার প্রতিক্রিয়া মাপার চেষ্টা করলেন রাহাত খান।

'তাহলে সিংহলী ভাষাটা...?'

'সিংহলী হিসেবে,' বললেন রাহাত খান, দেরাজ খুলে একটা ফোল্ডার বের করলেন, ভাঁজ খুলে কি যেন পড়ে নিলেন। 'সার্কের ছ'টা দেশ থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, সমাজসেবক ও সাংবাদিক ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লী আর বোম্বে সফর করবে। কিছু ব্যবসায়ীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে ওরা। বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী। যাত্রা শুরু হবে শ্রীলংকার জাফনা থেকে। নিমন্ত্রিতদের শ্রীলংকা থেকে বোম্বে নিয়ে যাওয়া আর বোম্বে থেকে শ্রীলংকায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে, তারমানে যে জাহাজটা তোমাদেরকে নিয়ে যাবে সেটা বাংলাদেশী–রাজহংস।'

'কত লোক যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাড়ে তিনশো। তোমার জন্যে একটা কেবিন বুক করা হয়েছে। তোমার পাসপোর্ট এই মুহূর্তে কলম্বোর ভারতীয় দূতাবাসে রয়েছে, ভিসা পাবার অপেক্ষায়। "অরবিদ সিংহে" নামে পাসপোর্ট। অরবিদ সিংহে শ্রীলংকার একজন তরুণ ব্যবসায়ী, অখ্যাত।' ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচিয়ে চুরুটে টান দিলেন তিনি।

'দিল্লীতে কি করতে হবে আমাকে?'

'এটাকে ঠিক অ্যাসাইনমেন্ট বলা চলে না।' এমন সুরে কথাটা বললেন রাহাত খান, যেন নিজের ওপরই অসন্তুষ্ট বোধ করছেন, যেন দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন মশা মারতে কামান দাগছেন তিনি। 'ছোট্ট একটা কাজ। তুমি জানো, সারা পৃথিবীতে আমাদের কিছু এজেন্ট ছড়িয়ে আছে, যাদের সাথে আমরা কোন যোগাযোগ রাখি না, কিছু জানাবার থাকলে তারাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তাদের মধ্যে একজন হলো তাপস গাঙ্গুলী। ভারতে পড়তে গিয়েছিল, রিসার্চ স্কলার হিসেবে একটা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কাজ পেয়েছে। আজ দশ বছর হলো সে কোন যোগাযোগ করেনি। ক'দিন আগে হঠাৎ একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। ঢাকার ছেলে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে চিনতাম। অত্যন্ত বিশ্বস্ত। মেসেজটা ইন্টারেস্টিং।'

অপেক্ষা করছে রানা।

'ওদের ল্যাবরেটরিতে কিছু সায়েন্টেফিক প্ল্যান পৌঁচেছে। প্ল্যানগুলো স্টাডি করার জন্যে যে টীমটা গঠন করা হয়েছে, সে-ও তার একজন সদস্য।' এক মুহূর্ত

বিরক্তি নিয়ে কথা শেষ করলেন রাহাত খান, 'প্ল্যানগুলো বাংলাদেশ থেকে চুরি করা।'

'কিসের প্ল্যান ওগুলো?' মনে মনে আঁতকে উঠল রানা, ঘরে চুরি হয়েছে শুনলে পাহারাদার যেমন ওঠে।

'আমরা তা জানি না। তবে কোন সন্দেহ নেই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছুই হবে, তা না হলে পি. বি. ই. টোয়েনটি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঝুঁকি নিত না। স্টাডি টীমের সদস্য বলে কড়া নজর রাখা হয়েছে তার ওপর, কোনরকমে ছোট্ট একটা মেসেজ পাঠাতে পেরেছে সে। কাজেই এখনও আমরা অন্ধকারে।'

'ব্যক্তিগতভাবে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে মনে করেন আপনি?'

উত্তর দেয়ার আগে নিভে যাওয়া চুরুটে আবার আগুন ধরালেন রাহাত খান। 'বলা কঠিন। সম্ভবত না। তুমি জানো, সায়েন্টেফিক রিসার্চের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে চোখে চোখে রাখা হয়। তাপস শুধু জানিয়েছে, প্ল্যানগুলো পাণ্ডুলিপি আকারে বা বলা যায় ওগুলোর সাথে হাতে লেখা নোট যোগ করা হয়েছে।'

'ওগুলোর একটা কপি পেতে হবে আমাদের, তাহলে জিনিসগুলো কি জানতে পারব, তারপর কোত্থেকে আর কিভাবে দেশ থেকে বেরিয়েছে খোঁজ নিতে হবে?'

'হ্যাঁ।' চোখে বিরক্তি নিয়ে তাকালেন রাহাত খান, যেন বলতে চাইছেন, সহজবোধ্য ব্যাপার প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার দরকারটা কি?

'তাপস এক কাজ করলেই তো পারে, দিল্লীতে আমাদের দূতাবাসে একটা ফটোকপি পাঠিয়ে দিক।'

এবার রেগে গেলেন রাহাত খান। 'পাঠিয়ে দেয়া কি এতই সহজ? তাপসের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে, দূতাবাসের প্রতিটি কর্মচারীকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ওদের কারও সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার জন্যে সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে।'

'সার্ক ট্যুরিস্টদের সাথে যাচ্ছি আমি, ভারতীয়রা কি আমাদের ওপর নজর রাখবে না?'

চেয়ারে হেলান দিলেন রাহাত খান। 'সাড়ে তিনশো লোক, ক'জনের ওপর নজর রাখা সম্ভব? তাছাড়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতটুকু বুঝছি, ভারত সরকার ঘুরে ফিরে বেড়ানোর যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবে ট্যুরিস্টদের। বাংলাদেশের সাথে অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে মন কষাকষি, নেপালের সাথে বাণিজ্য নিয়ে গোলমাল, মালদ্বীপে সৈন্য পাঠানো, শ্রীলংকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে না চাওয়া, পারমাণবিক বোমা তৈরি নিয়ে পাকিস্তানের সাথে বিতর্ক ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক কারণে সার্ক দেশগুলোর সাথে ওদের সম্পর্ক খুব নাজুক অবস্থায় পৌঁছে গেছে, সরকারীভাবে ট্যুরিস্টদের এই বিরাট একটা বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানাবার উদ্দেশ্যই হলো যথাসম্ভব উত্তেজনা কমিয়ে আনা। এমন কিছু করবে না ওরা, যাতে ট্যুরিস্টরা অস্বস্তিবোধ করে বা মনোক্ষুণ্ন হয়। আমার ধারণা, অন্তত পি. বি. ই. টোয়েনটির সাথে নিরাপদে যোগাযোগ করার সুযোগ অবশ্যই তুমি পাবে। কাজটা তো কিছুই না, ধরে নিতে পারো বেড়াতে যাচ্ছ।'

বেড়ানোর সাথে সম্পর্কিত অ্যাসাইনমেন্টগুলোকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় রানা। কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বলার সাহস হলো না ওর। 'কবে যেতে হবে আমাকে?'

'পরশু। ব্যবস্থা করা হয়েছে, বারো তারিখে তোমার সাথে দেখা করবে তাপস, সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। প্লেনে করে কলম্বো যাবে, ওখানে তোমার পরিচয়: সিংহলী ব্যবসায়ী অরবিদ সিংহে। সব ব্যবস্থা কমপ্লিট। কোন প্রশ্ন?'

সুযোগ দিয়েও সেটা কেড়ে নিলেন রাহাত খান, রানাকে চিন্তা করার অবসর না দিয়ে বললেন, 'এখন তুমি যেতে পারো। সোহেলের সাথে দেখা করো, বাকি সব সে-ই জানাবে তোমাকে। ও, হ্যাঁ, দিল্লী থেকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ো আমাকে। রেডিও বা অস্ত্র, এ-সব তোমার সাথে থাকছে না।'

হাঁফ ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

সাততলা থেকে নেমে এল রানা, করিডরেই সবার সাথে দেখা হলো। দলবেঁধে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, দেখেই হৈ-চৈ করে উঠল। হেসে উঠল রানা, হাত দুটো উঁচু করে জোড়া বুড়ো আঙুল নাড়ল। 'কাঁচকলা! আমাকে বোকা বানানো অত সহজ নয়, নিজেরাই ধরা পড়ে গেছিস!'

'বললেই হলো!' মারমুখো হয়ে তেড়ে এল জাহিদ। 'স্যার-স্যার করে কুল পাচ্ছিলি না! নিজের চোখে দেখলাম, দরদর করে ঘামছিলি! তাহলে বল্ শালা, যুবক সেজেছিল কে?'

ছুটন্ত পায়ের শব্দ পেল রানা, পিছন দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারল ওয়েটিং রুমে ফিরে যাচ্ছে ইলোরা, জানে যে-কোন মুহূর্তে তাকে খোঁজ করতে পারেন বস্। সবার ওপর একবার চোখ বুলাল রানা। নতুন রিক্রুট, ছেলে ও মেয়ে, সব মিলিয়ে পাঁচজন। একহারা, অল্প বয়স, লম্বা ও সুন্দরী এক মেয়ের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি, তার দিকে একটা আঙুল তাক করে মৃদু হাসল ও, বলল, 'ওই ছুঁড়িটা।'

'আর প্রৌঢ়া মহিলা?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল সোহেল, ভিড় ঠেলে রানার সামনে চলে এল সে।

পকেট থেকে চুলসহ মুখোশটা বের করল রানা। 'মাইরি বলছি, বি.টি.ভি-র নাটকে আধ-বুড়ি সমাজসেবিকার ভূমিকায় সাংঘাতিক উতরে যাবি তুই। তোর এই প্রতিভা সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কংগ্রাচুলেশন্স, দোস্ত!' দেখল, ধীরে ধীরে চুপসে গেল সোহেলের চেহারা। নতুন এজেন্টরা বিশেষ করে মেয়েগুলো, খিল খিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু জাহিদ পরাজয় স্বীকার করার বান্দা নয়। 'আর বস্? বল্ শালা, বস্ সেজেছিল কে?'

রানার চেহারায় তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। 'এ তো পানির মত সহজ। ঢুকেই লক্ষ করলাম, রাহাত খান আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছেন না, তাকাচ্ছেন বুকের দিকে। তখনই আমার খটকা লাগে। নিজেই তুই তোর পরিচয় ফাঁস করে দিলি।'

'কিভাবে?' জাহিদ হতবাক।

'চোখের দিকে তাকাচ্ছিলি না, কারণ তোর ভয় ছিল বসের চোখ আমি চিনে ফেলব। স্বীকার করছি, তোরও ছদ্মবেশ প্রায় নিখুঁতই হয়েছিল। কিন্তু যত নিখুঁতই হোক না কেন, রয়েলবেঙ্গল টাইগারের চোখ তুই পাবি কোথায় রে বেল্লিক।'

'লেকচার বাদ দে,' হুঙ্কার ছাড়ল জাহিদ। 'আমাকে চিনতে পারলি কিভাবে তাই বল।'

'লেকচার না দিলে ভবিষ্যতে তোদের এ-ধরনের কুকর্ম আবার কেঁচে যাবে। চেহারা বদলানোটাই বড় কথা নয়,' জ্ঞান দানের সুরে বলল রানা। 'সেই সাথে স্বভাব, মুদ্রাদোষ, শব্দচয়ন ইত্যাদি বিষয়েও সাবধান থাকতে হয়। তুই ধরা পড়েছিস মুদ্রাদোষে।'

রেগেমেগে সোহেলের দিকে তাকাল জাহিদ। 'রাস্কেলটা শুধু কথার প্যাঁচ কষছে!'

'ওই যে, আবার!' হেসে উঠে বলল রানা। 'কয়লার ময়লা যেমন, ধুলেও পরিষ্কার হয় না, তেমনি তোর এই মুদ্রাদোষ–কথায় কথায় "রাস্কেল" বলা।'

থ্ হয়ে গেল জাহিদ।

এবার দলের সম্মান রক্ষার্থে এগিয়ে এল নতুন মেয়েটা, যাকে রানা ছুঁড়ি বলেছে। এখনও লালচে হয়ে আছে তার চেহারা, তবে রানার সামনে সে বেশ টান টান হয়েই দাঁড়াল। 'আচ্ছা, মাসুদ ভাই, বলুন তো, প্রৌঢ় ভদ্রলোক কে সেজেছিল?'

মুহূর্তে গম্ভীর হলো রানা। 'খবরদার!' ঝাঁঝের সাথে ধমকে উঠল ও। 'মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই করবে না! ফের যদি শুনি, আস্ত রাখব না! এ এক মহা জ্বালা–নতুন যারাই আসে, ভাই-ভাই করতে শুরু করে। ক'দিন পর চাচা-চাচা করবে! এমন ভাব দেখাও, আমরা যেন বুড়ো হয়ে গেছি! যে ভাই বলবে, আজকের আড্ডা থেকে বাদ পড়বে সে।'

'সরি, দোস্ত!'

পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এল করিডরে, কারণ কণ্ঠস্বরটা মেয়েলি হলেও, হঠাৎ করে কেউ বুঝতে পারেনি কথাটা কে বলল। বোঝার পরও, অবিশ্বাসে আরও এক সেকেন্ড কারও মুখে কোন কথা যোগাল না। তারপর সবাই একযোগে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল। রানার সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে সেই মেয়েটা, সাহস করে সুযোগটা সেই নিয়েছে।

'ঠিক আছে,' উদার ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে মেয়েটাকে বলল রানা, 'তোমার ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো।'

'কিন্তু,' মেয়েটা নাছোড়বান্দা। 'আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। প্রৌঢ় সেজেছিল কে?'

আবার সবাই হৈ-চৈ শুরু করল।

জাহিদ বলল, 'এবার শালাকে কোণঠাসা করা গেছে! রাস্কেলটা বলে কিনা...'

সোহেল পরামর্শ দিল, 'রানা, তুই বরং হার মেনে যা।'

সবাই যখন হৈ-চৈ করছে, রানা তখন শায়লার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'একটু সাহায্য করো, প্লীজ। তুমি না আমার প্রাইভেট

সেক্রেটারি! এটুকু তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি না?'

'হবে না! জেনে নেয়ার চেষ্টা করছে!' তড়পে উঠল সোহেল। শায়লার হাত ধরে নিজের দিকে তাকে টেনে নিল সে।

হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল রানা, ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, 'মানলাম, ওই একজনকেই আমি চিনতে পারিনি। সবচেয়ে নিখুঁত ছদ্মবেশ–কে প্রৌঢ় সেজেছিল আমি ধরতে পারিনি।' সবার দিকে তাকাল একবার করে, তারপর সোহেলের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'কে রে?'

ধেই ধেই নাচ, কুকুর-বিড়ালের ডাক ইত্যাদি থামার পর সোহেল বলল, 'ছি-ছি, এত সহজ, অথচ ধরতে পারলি না! বলা যায় তাকে নিয়ে তুই ঘর করিস, মানে প্রায় বিয়ে করা বউয়ের মত সে, তাকেই তুই...'

শায়লা দপ্ করে জ্বলে উঠল, 'দেখো সোহেল ভাই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

'শায়লা!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সগর্বে হাসল ও। 'দেখতে হবে তো, কার কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়েছে!'

নতুন একটা মেয়ে পিছন থেকে মন্তব্য করল, 'শায়লা আপা প্রতিবাদ করলে কি হবে, মাসুদ ভাই কিন্তু সোহেল ভাইয়ের ইঙ্গিতটা নীরবে উপভোগ করছেন।'

'কে! কে!' ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটাকে খুঁজল রানা। 'আবার ভাই?' মেয়েটাকে দেখতে পেল ও। 'আজকের আড্ডা থেকে তোমাকে বাদ দেয়া হলো। না, শুধু তোমাকে নয়, তোমার অপরাধে শাস্তি ভোগ করবে নতুনরা সবাই। যে-যার কামরায় চলে যাও, আমরা বড়রা এখন আড্ডা দেব, সেখানে কিছু ল্যাংগুয়েজ ছাড়া হবে, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই...'

'এবারের মত মাফ করে দেয়া যায় না, দোস্ত?' আবার হাসির হররা ছুটল।

মেয়েটার চুলের বেণী ধরে মৃদু টান দিল রানা। 'মনে থাকে যেন, এই শেষ!'

'চল,' বলল জাহিদ, 'তোর কামরায় গিয়ে বসি সবাই। তার আগে, আয়, নতুন যারা তাদের সাথে তোর পরিচয় করিয়ে দেই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওদের সবাইকে আমি চিনি। পাঁচজন, তাই না?' এক এক করে পাঁচজনের দিকে তাকাল ও, একটা করে নাম বলে গেল। 'ওদের সবার ফাইল দেখেছি আমি, ফটোসহ।'

নতুন এজেন্টরা একটু অবাক হলো। এজেন্টদের ব্যক্তিগত ফাইল মানেই টপ-সিক্রেট ব্যাপার, সেগুলো দেখার অধিকারও তাহলে মাসুদ রানার আছে! কিন্তু পুরানো এজেন্টরা কেউ অবাক হলো না, কারণ তারা জানে সিনিয়রদের মধ্যেও বিশেষ একটা স্থান দখল করে রয়েছে রানা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধরতে গেলে ও-ই আবার গড়েছে বি. সি. আই-কে। অফিশিয়ালি কখনও বলা হয়নি, তবে জানা কথা, রাহাত খানের পর তার চেয়ারটায় একদিন রানাই বসবে। যোগ্যতা, মেধা, নিষ্ঠা আর কৃতিত্বের মর্যাদা দিতে জানে ওরা, তাই এই ধারণাটির প্রতি ওদের সবার অকুণ্ঠ সমর্থনও আছে। স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, রাহাত খানের পর মাসুদ রানা। কাজেই টপ-সিক্রেট ব্যাপারগুলো ওর তো জানারই কথা।

রানার কামরায় হৈ-হৈ করে ঢুকল ওরা সবাই, জমে উঠল আড্ডা। কফি বানিয়ে

সবাইকে খাওয়াল শায়লা। আড্ডার মধ্যমণি সোহেল। বি. সি. আই. অফিসে রাহাত খান যেমন এজেন্টদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, তেমনি সোহেল অর্জন করেছে সবার বন্ধুত্ব আর ভালবাসা। বিশেষ করে তরুণ এজেন্টরা সোহেল ভাই বলতে অজ্ঞান। ওদের সাথে তার অকৃত্রিম সম্পর্ক দেখে মনেই হয় না যে সে একজন ব্রিগেডিয়ার এবং তার স্থান রাহাত খানের ঠিক নিচেই। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জুনিয়ার ফিল্ড অফিসারদের সাথে বসে সিগারেট ফুঁকছে, চুটিয়ে আড্ডা মারছে, এটা শুধু বোধহয় বি. সি. আই. অফিসেই সম্ভব।

ছদ্মবেশ নেয়ার প্রসঙ্গ ধরেই সোহেল বলল, 'একবার হলো কি, ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ল, রাহাত খান মারা গেছেন। সাথে সাথে বি. সি. আই-এর ওপর চরম একটা আঘাত হানার জন্যে ব্যাপক একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ওরা। আমরা খবরটা পাই, মীটিঙে বসে ঠিক করি বস্ বেঁচে আছেন দেখাবার জন্যে তাঁকে লোকজনের সামনে বের করতে হবে। কিন্তু বস্ তো তখন হাসপাতালে আজরাইলের সাথে লড়ছেন। ঘটনাটা তোর মনে পড়ে, রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। আড্ডার সময়, চিরকালের অভ্যেস, টেবিলের ওপর পা তুলে দেয় ও–কিন্তু আজ পা না তুলে নতুন ছেলেমেয়েদেরকে বসার সুযোগ করে দিয়েছে। সোহেল আর জাহিদ বসেছে টেবিলের সামনের দুটো চেয়ারে, চেয়ার দুটোর হাতল দখল করেছে আনিস আর রাশেদ। বাকি সবাই টেবিলের কোণ আর কিনারা দখল করেছে। শায়লা বসেছে রানার চেয়ারের একটা হাতলে, অপর হাতলের দিকে কাত হয়ে আছে রানা। একের পর এক সিগারেট ফুঁকছে ও। 'ছ'বছর আগের ঘটনা। মোসাডের এক এজেন্ট গুলি করেছিল বসকে। গুরুতর আহত হয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহেল। 'তো, আর কোন উপায় না দেখে আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে রাহাত খান সাজিয়ে...'

'কাকে, সেটা বল্!' অধৈর্য জাহিদ চেঁচিয়ে উঠল।

'কাকে আবার!' বলল রানা। 'বসের মত দৈহিক গড়ন আমাদের মধ্যে তো একজনেরই আছে, বিশেষ করে ব্যাক সাইডটা...'

'দেখ রানা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি,' মারমুখো হলো জাহিদ।

'সবাই দেখো, নিজেই কেমন নিজের পরিচয় তুলে ধরছে,' বলে হো হো করে হেসে উঠল রানা।

ওর হাসি থামতেই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিল। তরুণরা সবাই একসাথে কৌতূহল আর বিস্ময় প্রকাশ করল, চারদিক থেকে ছুটে এল অসংখ্য প্রশ্ন। গুলি করা হয়েছিল বসকে? কোথায় লেগেছিল বুলেট? রাহাত খান মারা গেছেন, শুধু এই গুজবটা শুনেই মোসাডের সাহস রাতারাতি বেড়ে গেল? রাহাত খান তাহলে কি? কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হয় তাঁকে? শত্রুরা তাঁকে এতটা গুরুত্ব কেন দেয়?

'উনি আমাদের মাথার মুকুট,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আমাদের সমস্ত প্রেরণা আর সাহসের উৎস।'

একটু বিরতি নিল রানা, যেন কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘরের ভেতর কোন শব্দ নেই, কেউ নড়ছে না, অপলক তাকিয়ে আছে সবাই ওর দিকে। পুরানো এজেন্টদের চেহারায় শান্ত সমাহিত একটা ভাব, যেন যোগ্য মুখপাত্রের ওপর দলীয় মেনিফেস্টো ঘোষণার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তমনে বসে আছে তারা। আর নতুনরা ঠিক যেন একদল ক্ষুধার্ত সাংবাদিক, গোগ্রাসে গেলার জন্যে উন্মুখ।

রানা বলে গেল, কিন্তু গুণকীর্তন নয়, স্রেফ চরিত্রচিত্রণ। যা বাস্তব সত্য তারই নির্ভেজাল বর্ণনা। 'শুধু মোসাড কেন, কে.জি.বি. আর সি.আই.এ-ও তো সমীহ করে আমাদের চীফকে। তার কারণও আছে। বাংলাদেশ গরীব দেশ, অনেক দিক থেকে পিছিয়ে আছি আমরা, কিন্তু এসপিওনাজ জগতে আমাদের কৃতিত্ব তাক লাগানোর মত। বলতে পারো, এই সাফল্য কিভাবে আমরা অর্জন করলাম? সমস্ত কিছুর পিছনেই তো তাঁর একক অবদান রয়েছে।

'তিনি যে শুধু বি.সি.আই-এর প্রতিষ্ঠাতা তাই নয়, তাঁর অভিজ্ঞতা আর যোগাযোগগুলো স্মরণ করো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হয়ে লড়েছেন তিনি। সারা বিশ্বে আজ যারা সমরবিশারদ, এক কালে তাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, সে বন্ধুত্ব এখনও নষ্ট হয়নি। বহু দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তাঁরা তাঁর মেধা আর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও জানেন। অর্থ বল কম, দক্ষ এজেন্টের অভাব, ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি সীমিত, উপকরণ সামান্য, প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে সবাই শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী, তারপরও বি.সি.আই-এর সাফল্যের তালিকা সি.আই.এ. বা কে.জি.বি-র চেয়ে ছোট নয়। সমস্ত কৃতিত্বই তো তাঁর।'

'কোন সন্দেহ নেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রাশেদ। 'কিন্তু তারমানে কি দাঁড়াল? বস্ ছাড়া বি.সি.আই. ভেঙে যাবে? ব্যাপারটা যদি ওয়ান-ম্যান শো হয়, তাহলে তো...'

'সাফল্য বয়ে এনেছি আমরা, আমরা এজেন্টরা,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাদেরকে হাতে-কলমে শিখিয়েছেন কে? কে গাইড করেছেন, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন? বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজে একজন স্পাই ছিলেন এবং আজও আছেন, সমস্ত কলা-কৌশল তাঁর জানা, তাঁর সঞ্চয় তিনি মুক্তহস্তে দান করেছেন আমাদেরকে। কাজেই ব্যাপারটা ওয়ান-ম্যান শো নয়। তোমরা ভাবছ, বস্ যখন থাকবেন না তখন কি হবে। কেন,' মৃদু হাসল রানা, 'তিনি কি আমাদেরকে তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলেননি? একদিন না একদিন বসকে আমরা হারাব, কিন্তু বি.সি.আই. সগর্বে মাথা উঁচু করে থাকবে। রক্ত-মাংসের আকৃতিতে তাজা বোমা তিনি রেখে যাবেন, তারাই...'

প্রসঙ্গের শাখা-প্রশাখা গজাল। কে যেন রানার কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'বোমাগুলো তাঁর পোষা বিড়ালছানা।'

'বাঘের বাচ্চা!'

'সন্তান সন্তান!' ফস্ করে বলে ফেলল জাহিদ। 'উনি আমাদেরকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন!'

'একবার হয়েছে কি, অ্যাসাইনমেন্ট বুঝে নিতে গেছি, একটা জিনিস মাথায় ঠিকমত ঢুকছে না। চোখ রাঙিয়ে এমন বাঘের মূর্তি ধারণ করলেন কেঁদে তো ফেললামই, প্যান্ট ভিজে যাবার অবস্থা হলো।' সত্যি ঘটনা, বলতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল রাশেদের চেহারা। 'দু'দিন পর শত্রুপক্ষের গুলি খেয়ে সোজা হাসপাতালে আমি, জ্ঞান ফিরল আটচল্লিশ ঘণ্টা পর। চোখ মেলে দেখি কি, সেই বাঘ বসে আছে। আমার তো দফা সারা! ভাবলাম এই বুঝি মারবে! ওমা, বুড়ো আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় দেখছি!' গলা বুজে এল রাশেদের।

'সবার বেলা তাই হয়,' বলল রানা। 'আমরা সবাই মনে করি বস্ বোধহয় আমাকেই সবার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। আসলে কাউকেই তিনি কারও চেয়ে কম ভালবাসেন না। খুব যখন ধমক লাগান, মনে মনে খেপে উঠি, কিন্তু জানি একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে আমাদেরকে শাসন করার। আমরা যখন বিপজ্জনক কোন অ্যাসাইনমেন্টে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ি, সারারাত নিজের ঘরে পায়চারি করেন উনি, ছটফট করেন একটা খবর পাবার জন্যে…'

নিজেদের মধ্যে অনেক দিন পর রানাকে পেয়ে কাজে মন নেই কারও, তাছাড়া আলোচ্যসূচীতে ওদের প্রাণ-প্রিয় রাহাত খান চলে আসায় কারুরই সময়জ্ঞান থাকল না। অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে ইলোরার আগমন না ঘটলে আজকের এই আড্ডা কখন শেষ হত, কেউ তা বলতে পারে না। ঘরে ঢুকেই ঠোঁটে একটা আঙুল তুলল ইলোরা, ফিসফিস করে বলল, 'এই! চুপ-চুপ!'

'কেন, কি ব্যাপার?' তার দেখাদেখি সোহেলও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

'বস্!' সিঁড়ি বেয়ে সাততলা থেকে ছুটে এসে হাঁপিয়ে গেছে ইলোরা। 'ডেস্কে মাথা রেখে কাঁদছেন বস্! তোমাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছেন তো!'

বিদ্যুৎচমকের মত রানার মনে পড়ে গেল, ইলোরার ডাক শুনে বসের সাথে তাঁর চেম্বারে দেখা করতে যাবার সময় ইন্টারকমের সুইচটা অফ করতে ভুলে গিয়েছিল ও। ঝট্ করে তাকাল, দেখল সত্যি তাই—ইন্টারকমের সুইচ অন করা রয়েছে।

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। সবাই হতচকিত।

'স্যার!' ইন্টারকমে বলল রানা, প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায়, 'ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে দেবেন, স্যার!' এক ঝটকায় সুইচটা অফ করে দিল ও।

চাঁদা তুলে লাঞ্চ খেলো ওরা, আড্ডা ভাঙার পর বিকেল চারটের দিকে রানাকে নিয়ে নিজের কামরায় চলে এল সোহেল।

দুই বন্ধু ব্যক্তিগত কিছু আলাপ করল নিভৃতে। শ্রীলংকায় পৌঁছুনোর জন্যে ভুয়া বাংলাদেশী একটা পাসপোর্ট দিল ওকে সোহেল। অরবিদ সিংহের পরিচয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কলম্বোয় ওকে সাহায্য করবে ওদেরই এক এজেন্ট, তার বর্তমান নাম-ঠিকানা মুখস্থ করে নিল রানা।

সব কিছুই ঠিকঠাক মত ঘটল। নির্দিষ্ট দিনে কলম্বোয় পৌঁছুল রানা, সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে জাফনায় চলে এল রাজহংসে চড়ার জন্যে। সাড়ে তিনশো

ট্যুরিস্টকে নিয়ে বোম্বের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল জাহাজ।

আজ সেই বারো তারিখ, তাপস গাঙ্গুলীর সাথে দেখা করার দিন।

ফুটপাথ ধরে অলসভঙ্গিতে হাঁটছে রানা, পাঁচশো গজ পিছনে ফেলে এসেছে অশোকাকে। এদিকের ফুটপাথে যথেষ্ট ভিড়, বেশিরভাগটাই হকাররা দখল করে রেখেছে। মেশিন থেকে বেরিয়ে আসছে তাজা ফলের রস, লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়েই কিনে খাচ্ছে, তাদের মধ্যে রাজহংসের ট্যুরিস্টরাও রয়েছে অনেকে। সামনে হোটেল মিনার্ভা পড়ল, গেট থেকে একদল নর্তকীকে বেরুতে দেখল রানা। সর্বনাশ, মেয়েগুলো কি লম্বা! সবার পরনে ঢোলা ঘাগরা আর ব্লাউজ, বহুরঙা জরির কাজ করা, সারা গায়ে প্রচুর অলঙ্কার। রাস্তা পেরিয়ে রানাকে পাশ কাটাল তারা, কি কারণে কে জানে খিলখিল করে হাসছে। চার চাকার গাড়ি নিয়ে আইসক্রীম বিক্রেতা খদ্দের ধরার জন্যে গলা ফাটাচ্ছে। আর একটু সামনে মাথায় পাগড়ি বাঁধা একদল শিখ আর সশস্ত্র পুলিসকে দেখল রানা, শিখগুলোর কোমরে রশি বাঁধা, হাতে হাতকড়া। বাঁক ঘুরতেই রেড ক্রস রোডে পৌঁছুল রানা, পঞ্চাশ গজ এগিয়ে দেখল রাস্তার ওপারে একটা কাফে, হিন্দী আর ইংরেজিতে লেখা সাইন বোর্ড—দিল্লী কাফে। ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হবার অপেক্ষায় ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, তারপর রাস্তা পেরোল। ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে ওর সাথে রাস্তা পেরুল এক লোক, সাথে লোহার হালকা চেইনে বাঁধা একটা বানর, পিছনে বাচ্চাদের একটা বাহিনী।

দিল্লী কাফে ফুটপাথের অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে, কাফের বাইরে বেতের চেয়ারে অল্প দু'চারজন খদ্দের দেখল রানা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটে বাজে, এখনও সম্ভবত এসে পৌঁছোয়নি তাপস গাঙ্গুলী। ঢাকা ত্যাগ করার আগে সোহেল ওকে তাপসের একটা ফটোগ্রাফ দেখিয়েছে, কিন্তু ছবিটা দশ বছর আগের, দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে রানার। ফুটপাথেই, দেয়াল ঘেঁষে একটা বেতের চেয়ারে বসল ও, আশপাশের টেবিলগুলোর দিকে তাকাল। বেশিরভাগই খালি। সবচেয়ে কাছের খদ্দেররা একটা গ্রুপ, সবাই পুরুষ। দূরে, এককোণে, পাশাপাশি বসে আছে এক যুবতীকে নিয়ে এক যুবক, ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

প্রৌঢ় একজন ওয়েটার এগিয়ে এল। কফি চাইল রানা। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। রাস্তার ওপারে একদল ট্যুরিস্ট, তিনটে মেয়েকে নিয়ে দু'জন পুরুষ, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কি যেন কেনাকাটা করছে। মনে হলো রাজহংসের আরোহী, কিন্তু দূরে বলে চেনে কিনা বুঝতে পারল না। আজই ওদের দিল্লীতে শেষ দিন। বোম্বেতে ফেরার জন্যে সন্ধ্যায় ট্রেন ধরতে হবে।

কফি নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার, মানিব্যাগ বের করে একটা ডলার দেখাল রানা লোকটাকে, জিজ্ঞেস করল ভাঙানো যাবে কিনা। লোকটা ভাঙতি নিয়ে ফিরল, কফির দাম মিটিয়ে দিয়ে বাকি টাকা পকেটে ভরল ও। তাড়াহুড়ো করে চলে যাবার দরকার হলে বিল দেয়ার সময় পাওয়া যাবে না।

পাঁচটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। মোটাসোটা দুই বাচ্চাকে নিয়ে এক মহিলা একটা টেবিল দখল করল। আরেক টেবিলে বুড়ো এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বসতে সাহায্য করছেন, প্রায় অচলই বলা যায় বুড়িকে, সম্ভবত বাতে। তাপস গাঙ্গুলীর সাথে চেহারার মিল আছে এমন কাউকে চারপাশে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা। তবে, এখুনি অস্থির হবার কোন কারণ নেই।

পাঁচ মিনিট পর এক লোকের ওপর চোখ পড়ল রানার। বেশ লম্বা, বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি, শুধু জুলফি জোড়া পেকেছে, পরনে হালকা রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, রাস্তা পেরোনোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের কিনারায়, সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে কাফের দিকে।

কফির কাপে চুমুক দিল রানা, প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। চওড়া বুকের ভেতর হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে গেল ওর। সজাগ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানিয়ে দিল, তাপস গাঙ্গুলী আসছে।

রাস্তা পেরিয়ে সরাসরি কাফেতে ঢুকল লোকটা, কাছাকাছি একটা টেবিলে বসল, রানার দিকে প্রায় পিছন ফিরে। ওয়েটার এল, কফির অর্ডার দিল লোকটা। সিগারেট ধরাল সে, একটা ইংরেজি পত্রিকার ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে।

তার দিকে একবারও সরাসরি না তাকিয়ে আবার সিগারেট ধরাল রানা। লোকটা যদি পি.বি.ই. টোয়েনটি হয়, ওয়েটার তার অর্ডার ডেলিভারি না দেয়া পর্যন্ত কোন ইঙ্গিত দেবে না।

একটু পরই কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। রানার মত সে-ও আগেভাগে মিটিয়ে রাখল বিল।

ওয়েটার চলে যাবার পর ওরা দু'জন প্রায় একা হয়ে গেল, পাঁচ গজের মধ্যে আর কোন খদ্দের নেই। এই সময় তিনজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখল রানা, একবার চোখ বুলিয়েই আন্দাজ করল ওরা বোধহয় সাদা পোশাক পরা দিল্লী পুলিস। শক্ত-সমর্থ দীর্ঘ দেহ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, চেহারায় কাটখোট্টা ভাব। তবে রঙিন চাঁদোয়ার তলায় না বসে, সরাসরি কারও দিকে না তাকিয়ে মূল কাফের ভেতর ঢুকে গেল তারা। ভেতর আর বাইরের অংশের মাঝখানে নিচু একটা পাঁচিল রয়েছে, ভেতরে কেউ দাঁড়ালে বাইরে কি ঘটছে দেখতে পাবে সে। পাঁচিলের মাঝখানে একটা দরজা। কাফের পাশে একটা সরু গলি, সেদিকের একটা দরজা দিয়েও ভেতরের অংশে ঢোকা যায়।

লোকগুলো ভেতরে অদৃশ্য হবার সাথে সাথে রানার সামনে খুক করে কাশল লোকটা, মুখের সামনে খবরের কাগজ তুলল, সম্ভবত গলার আওয়াজ চাপা দেয়ার জন্যে। নিচু গলায় কথা বলল সে, কোন রকমে শুনতে পেল রানা।

'একসাথে হাঁটার একটু সময় হবে আপনার?' বিশুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করল তাপস গাঙ্গুলী।

সাঙ্কেতিক প্রশ্ন। 'দুঃখিত,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে খালি কাপের ভেতর, '...ব্যস্ত আছি।' ওর ওই কথায় লোকটা বুঝতে পারবে, ঢাকা থেকে ওকেই পাঠানো

হয়েছে। 'ওদের দেখলেন?'

'হ্যাঁ। খুব সাবধান, ওরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

'আমি চলে যাবার পর কি হবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা যদি আপনাকে...?'

'আমি নিষ্কলঙ্ক, রেকর্ডে কোন স্পট নেই। যাই ঘটুক না কেন, নিজেকে আমি নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব। আমার চিন্তা আপনাকে নিয়ে।'

'পিছনে বেরিয়ে যাব, চিন্তা করবেন না।'

'শুনুন। আমার টেবিলে নয়, বাঁ দিকের টেবিলটায় একটা সিগারেটের প্যাকেট রাখছি। ভেতরে মাইক্রোফিল্ম আছে। আমাকে পাশ কাটাবার সময় তুলে নেবেন ওটা, আমি আপনাকে খবরের কাগজ দিয়ে আড়াল করে রাখব।'

'ঠিক আছে।'

'বিল দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আরেকটা কথা। বসকে বলবেন, অনেক দেরিতে হলেও আমি জানতে পেরেছি, আমার ফার্মটা বিজনেস সিন্ডিকেটের একটা প্রতিষ্ঠান। এই চুরির পিছনে ওরাই রয়েছে...' কথা বলার ফাঁকে পকেট থেকে চারমিনারের একটা প্যাকেট বের করে বাঁ দিকের টেবিলের কিনারায় রাখল তাপস গাঙ্গুলী।

সাথে সাথে দাঁড়াল রানা। 'যদি মনে করেন আপনার বিপদ হবে, আমি তাহলে আজ ট্রেন ধরব না। যদি আপনার সাহায্য দরকার হয়...'

'বললাম না, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না! যান!'

পা বাড়াল রানা, তাপস গাঙ্গুলীকে পাশ কাটাবার সময় ডান হাত দিয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল চারমিনারের প্যাকেট, চট করে পকেটে ভরে ফেলল। 'গুড লাক,' বিড়বিড় করে বলল ও।

কোন উত্তর এল না।

এ পর্যন্ত সব ভাল। কিন্তু টেবিল চেয়ারগুলোকে পাশ কাটিয়ে রানা ফুটপাথের কিনারায় বেরিয়ে আসতেই পিছনে ভারী জুতোর আওয়াজ পেল। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা, পিছন ফিরে তাকাবে না। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পেরুতে শুরু করেছে, একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হলো পিছনে, কর্কশ গলায় কে যেন কাকে কি বলছে। হাঁটার গতি শ্লথ না করেই কাঁধের ওপর দিয়ে চট করে একবার তাকাল রানা। আগের সেই তিনজন দীর্ঘদেহীকে দেখতে পেল ও, তাপস গাঙ্গুলীকে ছেঁকে ধরেছে। হিন্দী ভাষায় কি যেন বলছে তারা। তিনজনের একজন দল থেকে বেরিয়ে ছুটে এল রাস্তার দিকে, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হিন্দীতে ডাকল লোকটা, 'ঠ্যারো!'

ভাষাটা হিন্দী, কাজেই বুঝতে না পারার ভান করার সুযোগ রয়েছে রানার। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ল ও, লোকটাও পিছু পিছু আসছে। একটা গাড়ির তলায় চাপা পড়তে যাচ্ছিল সে, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে। রানার সামনে আর দু'পাশে প্রচুর লোকের ভিড়, হকাররা চেঁচামেচি করছে, মানুষজনকে ধাক্কা দিয়ে হন

হন করে এগোল ও। বাঁক ঘুরে পিছনে ফেলে এল রেড ক্রস রোড। খানিক সামনে রাজহংসের একদল ট্যুরিস্ট আইসক্রীম খাচ্ছে, চার চাকার গাড়ি থামিয়ে বেচাকেনায় ব্যস্ত বিরাট বপু বিক্রেতা। ট্যুরিস্টদের কয়েকজনকে চিনতে পারল রানা, বেশিরভাগ ওরা নেপালী। সহাস্যে ওদের দলে ভিড়ে গেল রানা।

'হ্যালো! কেমন? খাওয়া যায়?' এদের অনেকের সাথে জাহাজে টেবিল টেনিস খেলেছে রানা, মেয়েগুলোর সাথে আড্ডা মেরেছে।

লম্বা ছিপছিপে একটা মেয়ে, রানার যেমন পছন্দ তারচেয়ে বয়স কিছুটা কম, উর্ধ্বে আঠারো কি উনিশ হবে, দেখতে অরি সুন্দরী আর চটপটে, রানার বাহু আঁকড়ে ধরল, ইংরেজিতে বলল, 'ওহ্, মি. সিংহে! আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল...'

প্রশ্নটা কি ছিল তা আর শোনা হলো না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে সাদা পোশাক পরা পুলিস লোকটা রাগে লাল চেহারা নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, রীতিমত হাঁপাচ্ছে। 'চলো মেরে সাথ্!' রানার কাঁধে ভারী একটা হাত রেখে হিন্দীতে হুঙ্কার ছাড়ল সে।

'কি বলছে ও?' বিহ্বল দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রানা, ভান করল কিছুই বুঝতে পারছে না।

এক নেপালী যুবক অনুবাদ করল কথাটা। 'উনি বলছেন, ওর সাথে আপনাকে যেতে হবে। কে উনি, মি. সিংহে?'

'যেতে বলছে!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'কোথায়? কেন? ও কে, তাই তো আমি জানি না!' ঝাপটা দিয়ে লোকটার হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল ও।

এবার পুলিস লোকটা ওর কব্জি চেপে ধরল। 'পুলিস!' প্রমাণ হলো, রানার সন্দেহ মিথ্যে নয়। 'চলো মেরে সাথ্!'

রাগে ফেটে পড়ার সময় হয়েছে। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পকেট থেকে সবুজ একটা কার্ড বের করল রানা। ভারত সরকারের দেয়া ট্র্যাভেল পারমিট ওটা, ট্যুরিস্টদের সবাইকে দেয়া হয়েছে। কার্ডটা লোকটার নাকের সামনে নাড়ল ও। 'আমি স্বাধীন সার্বভৌম শ্রীলংকার একজন সম্মানিত নাগরিক, আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার কারও নেই। ভারত সরকারের আতিথেয়তা সম্পর্কে রিপোর্ট করব আমি...' নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল ও।

'ঘাবড়ানেকা কোঈ বাত নেহি,' সুর একটু বদলেছে বটে, কিন্তু আবার রানার কাঁধে একটা হাত রাখল পুলিস লোকটা। 'থোড়ি সামায় কে লিয়ে পুলিস স্টেশন চলিয়ে, কুছ বাত পুছনা হ্যায়।'

অনুবাদ শোনার পর রানা বলল, 'ঘাবড়ানো উচিত তোমার, কারণ ভারত সরকারকে অপমান করছ তুমি।' আবার হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল ও। 'ভাল চাও তো কেটে পড়ো, তা না হলে তোমার কপালে খারাবি আছে।' ইতিমধ্যে লোকটাকে ঘিরে ফেলেছে নেপালী ট্যুরিস্টের দলটা, রানার পক্ষ নিয়ে সবাই চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। সবার হাতে এখনও আইসক্রীম রয়েছে, তবে খাওয়ার কথা মনে নেই কারও। দলের মধ্যে প্রৌঢ়া এক মহিলা, রাজহংসের এক আড্ডায়

রানাকে যিনি 'বাপ' বলে সম্বোধন করেছিলেন, ভিড় ঠেলে লোকটার একেবারে সামনে চলে এলেন, তাঁর হাবভাব দেখে মনে হলো হাতের আইসক্রীম যে-কোন মুহূর্তে লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবেন। যে-কোন কারণেই হোক, ভারতীয় পুলিসকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

'আমরা ট্যুরিস্ট, আমাদের দূতাবাসে অভিযোগ করব, তোমাদের সাংস্কৃতিক মন্ত্রীকে জানাব...'

সুবিধে করতে না পেরে খেপে গেল পুলিস লোকটা। 'শ্রীলংকান হো অওর আংরেজ হো, মেরে সাথ থানা পড়েগা তুমকো।'

নেপালী যুবক কোমরে হাত দিয়ে সামনে বাড়ল। 'আগে তোমার পরিচয়-পত্র দেখাও। তারপর ব্যাখ্যা করো, কেন তুমি মি. সিংহেকে থানায় নিয়ে যেতে চাইছ।'

খানিক ইতস্তত করে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল লোকটা। সেটা পরীক্ষা করল নেপালী যুবক, উঁকি দিয়ে রানাও চোখ বুলাল। লোকটা পুলিসই, দিল্লী মেট্রোপলিটন পুলিসের একজন সার্জেন্ট।

'এবার বলুন, মি. সিংহের অপরাধ কি? কেন তাঁকে আপনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে থানায় নিয়ে যেতে চাইছেন?' জানতে চাইল নেপালী যুবক।

'সবাই মিলে ধরো ওকে,' পরামর্শ দিলেন প্রৌঢ়া মহিলা। 'হোটেলে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে ডেকে বলি নিরীহ ট্যুরিস্টদের ওপর জুলুম করছিল...'

লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে লোকটা অন্য পথ ধরল। 'এই লোক,' রানার বুকের দিকে একটা আঙুল তাক করে হিন্দীতে বলল সে, 'এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসেছে। সে যদি প্যাকেটটা ফেরত দেয়, তাকে আর পুলিস স্টেশনে যেতে হবে না।'

নেপালী যুবকের দিকে ফিরল রানা। 'কি বলছে ও?'

অনুবাদ শোনার পর অবিশ্বাসে আঁতকে উঠল সবাই, গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। কে যেন বলল, 'ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

আঙুলের গাঁট দিয়ে লোকটার বুকে টোকা মারল রানা। 'মিথ্যে অভিযোগ তুলে ঘুষ খাওয়ার মতলব, তাই না? সিগারেট তো সবার পকেটেই থাকতে পারে, তাতে কারও নাম লেখা থাকে না—সেটা যে তোমার বা আমার, প্রমাণ হবে কি করে?'

'আমার প্যাকেট আমি চিনি,' শরীর বাঁকিয়ে রানার হাতটা সরিয়ে দিল পুলিস। 'বের করো, প্রমাণ করব।'

নেপালী যুবক রানার দিকে ফিরল। 'পকেটে প্যাকেট থাকলে ব্যাটাকে দিয়ে দিন, তাতে যদি ঝামেলা থেকে বাঁচা যায় মন্দ কি?'

'কি বলছেন!' রানা বিস্মিত। 'ভারতীয় সিগারেট খাওয়া যায়? দেশ থেকে দেশী সিগারেট এনেছি...' কথা শেষ না করে পকেট থেকে এক প্যাকেট স্টেট এক্সপ্রেস বের করে দেখাল রানা। 'এটা নিশ্চয়ই ওর নয়?'

পুলিস মাথা নাড়ল। 'দুসরা পাকিট নিকালো!'

'আমার পকেটে আর কোন সিগারেট বা প্যাকেট নেই,' ঘোষণা করল রানা। 'ইচ্ছে করলে সে আমাকে সার্চ করে দেখতে পারে।'

নেপালী যুবক অনুবাদ করল। দু'হাত মাথার ওপর তুলে দিল রানা। দক্ষতার সাথে প্রচুর সময় নিয়ে ওকে সার্চ করল পুলিস। ট্যুরিস্টরা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

প্রৌঢ়া মহিলা মন্তব্য করলেন, 'যদি কিছু পাওয়া না যায়, সবাই মিলে তোমাকে আমরা এই রাস্তার ওপর নাকে খত দেওয়াব!'

সার্চ শেষ করে পিছিয়ে গেল পুলিস সার্জেন্ট, হতভম্ব।

'দেখলে তো?' চেহারায় বিজয়ীর হাসি নিয়ে বলল রানা, হাঁ করা পুলিসের দিকে তাকিয়ে আছে। 'যদি বলো, কাপড়চোপড় খুলে দিগম্বরও সাজতে পারি, সেক্ষেত্রে মহিলাদের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে।'

রাগের সাথে নেপালী যুবক সার্জেন্টকে বলল, 'আপনি সন্তুষ্ট তো? এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কোথাও আপনার মারাত্মক ভুল হয়েছে? ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এখানে আমরা বেড়াতে এসেছি, আর একজন ভারতীয় অফিসার হয়ে আপনি আমাদের সাথে এই বিচ্ছিরি ব্যবহার করলেন! এই যদি ভারতীয় পুলিসের ভব্যতা জ্ঞান হয়, এখানে তাহলে গুণ্ডাপাণ্ডাদের আচরণ কি রকম হবে?'

'মাফি মাংতা হুঁ,' বিড়বিড় করল সার্জেন্ট, বিস্ময়ের ঘোর এখনও তার কাটেনি, 'ম্যায় শরমিন্দা হুঁ...'

'আর কখনও না জেনেশুনে এভাবে কোন ভদ্রলোককে চ্যালেঞ্জ কোরো না,' গম্ভীর সুরে উপদেশ খয়রাত করল রানা।

বিরক্তিসূচক শব্দ করে ভাঙতে শুরু করল ট্যুরিস্টদের ভিড়টা। রানাকে অপমান করে, সবাই একবাক্যে রায় দিল, আসলে অপমান করা হয়েছে সার্ক দেশগুলোর প্রত্যেক ট্যুরিস্টকে। ভারত সরকার আর ভারতীয় পুলিসের সমালোচনায় সবাই মুখর হয়ে উঠলেও, মনে মনে রানা জানে, ঘটনাটার সাথে সরকার বা পুলিস বিভাগের কোন সম্পর্ক নেই—কারণ, এই বিশেষ লোকটা কুখ্যাত এক কুচক্রের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে।

রানার হাত ধরে টান দিল কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটা। 'চলে আসুন, মি. সিংহে। দেখি কিভাবে বাধা দেয় আমাদের!' বাকি সবাইও ফুটপাথে আইসক্রীমের ভেজা চিহ্ন রেখে ঘুরে দাঁড়াল, হাঁটা ধরল হোটেলের দিকে। একই জায়গায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল পুলিস সার্জেন্ট, একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। তারপর হঠাৎ সে-ও ঘুরে দাঁড়াল, হন হন করে এগোল উল্টোদিকে।

'আরও লোক আনতে যাচ্ছে,' মন্তব্য করলেন প্রৌঢ়া মহিলা। রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি চিন্তা কোরো না, বাপ। হোটেলে ফিরে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট কোরো।'

রানাকে টেনে নিয়ে চলল মেয়েটা। রানার বিপদ হলো, তার নামটা স্মরণ করতে পারছে না। আগেও মেয়েটা ওর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বয়স কম বলে কৌশলে এড়িয়ে গেছে ও। পাখির মত কিচির মিচির করছে সে, তার মা আর বাবাকে অরবিন্দ সিংহের গল্প শুনিয়েছে, তাঁরা ওর সাথে আলাপ করার জন্যে

উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। দাবায় অরবিন্দ সিংহে হারিয়ে দিয়েছে তাকে, এটা নাকি তাঁরা বিশ্বাসই করতে চান না, কারণ স্বদেশে চলতি বছরই জাতীয় দাবা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সে।

হঠাৎ করে নামটা মনে পড়ল রানার। 'ধন্যবাদ, সুবর্ণা। তুমি যথেষ্ট সাহায্য করেছ।'

'ওমা! আমি আবার কি সাহায্য করলাম!' হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল সুবর্ণা পোখরেল।

একে একে নেপালী যুবক, প্রৌঢ়া মহিলা এবং অন্যান্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাল রানা। ইতোমধ্যে হোটেলে মিনার্ভার সামনে চলে এসেছে ওরা, দলটা এখান থেকে কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেল–অশোকা হোটেলে ফিরবে একা রানা, সুবর্ণা আর প্রৌঢ়া ঢুকবেন মিনার্ভায়, বাকি সবাই কাছাকাছি অন্যান্য হোটেলে। কারও হাতেই বেশি সময় নেই, ডিনার খাওয়ার পর সুটকেস গুছাতে হবে, গাড়ি ধরে পৌঁছুতে হবে রেল স্টেশনে।

'আমার সুটকেস গোছানো শেষ,' রানার কানে ফিস ফিস করল সুবর্ণা পোখরেল। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার পাঁচতারায় আসতে পারি? দিল্লীতে কি কেনাকাটা করলেন দেখব।'

হাসি চেপে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

প্রৌঢ়া মহিলাকে মিনার্ভার গেটে ছেড়ে দিয়ে অশোকার দিকে পা বাড়াল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। আপাতত নিরাপদ বোধ করল ও, তবে জানে এত সহজে হাল ছাড়বে না শত্রুরা। তাপস গাঙ্গুলীর কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করল ও। রেকর্ডে কোন দাগ না থাকলেও, বিজনেস সিন্ডিকেটের শয়তানগুলো দেখেছে রানাকে একটা সিগারেটের প্যাকেট দিয়েছে সে। প্যাকেটের ভেতর কি আছে তা যদি জানে তারা, কি বলার থাকবে তাপস গাঙ্গুলীর? কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে সে? বিজনেস সিন্ডিকেটের কাজের ধারা সম্পর্কে টপ সিক্রেট ফাইলটা পড়া আছে রানার, কথা আদায়ের জন্যে টরচার করে বহু লোককে মেরে ফেলেছে তারা।

তারপর রানা ভাবল, এমন হতে পারে যে কুচক্রটিকে নানাভাবে সাহায্য করে নিজের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাদের নিঃসন্দেহ করে রেখেছে তাপস গাঙ্গুলী। সেক্ষেত্রে অভিযোগটা খণ্ডন করতে বেগ পেতে হবে না তাকে। প্যাকেটের ভেতর কি আছে তা নিশ্চয় কাউকে জানতে দেয়নি সে। বা জানতে দেবেও না।

অশোকার হলরুমে দেশী-বিদেশী প্রচুর লোকজন, তাদের মাঝখান দিয়ে রানার হাত ধরে এলিভেটরের দিকে এগোল সুবর্ণা পোখরেল। কৌতুক বোধ করলেও, মনে মনে খানিকটা উদ্বিগ্নও বটে রানা, জানে একটা সময় আসবে যখন মেয়েটাকে হতাশ না করে উপায় থাকবে না ওর। মেয়েটা সরল, সেন্টিমেন্টাল এবং সম্ভবত আদর্শ প্রেমিকা হবার সমস্ত গুণের অধিকারী, কিন্তু অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা স্বভাব নয় রানার, আর এই বয়সের একটা মেয়ের সাথে প্রেম করারও কোন ইচ্ছে নেই ওর। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও, জড়িয়ে পড়ার আগেই কাঁধ থেকে নামিয়ে

দিতে হবে ভূতটাকে।

'সত্যি কি তুমি আমার কামরায় যেতে চাও?' এলিভেটরের সামনে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে, সেটা কি উচিত হবে?'

'উচিত হবে না মানে?' বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে তাকাল সুবর্ণা পোখরেল। 'আপনি আমার বন্ধু না? দাবায় আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েই তো সর্বনাশ করেছেন। কাসপারভকে বাদ দিয়ে আপনাকে বেছে নিয়েছি আমি—আমার হিরো হিসেবে।'

'কিন্তু তোমাকে তো আমি বলেছি, ওটা ছিল ঝড়ে বক।'

তিনতলার ডেস্ক থেকে চাবি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠল ওরা। সুবর্ণা জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা আপনার আস্তানা?'

'এই করিডর ধরে পাঁচমাইল সামনে।'

অর্ধেকটা করিডর পেরিয়ে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল সুবর্ণা, 'কেমন নির্জন, না? আলোও কম। আমার শীত করছে!'

'বলো, ভয় করছে।'

'মোটেই না!' সাথে সাথে প্রতিবাদ করল সুবর্ণা। 'আপনি সাথে থাকলে...'

'কেন, এমন হতে পারে না, আমিই তোমার জন্যে ভয়ের কারণ হয়ে উঠলাম?' রানা গম্ভীর। 'কাউকে উপদেশ দেয়া আমার স্বভাব নয়, তবু না বলে পারছি না—পা ফেলতে হয় একটু বুঝে-সুঝে। কার সাথে যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ, এ-সব আগেই ভাবতে হয়।'

ঠোঁট ফোলাল সুবর্ণা পোখরেল। 'ইঙ্গিতে কথা বললে খুব রাগ হয় আমার। তাছাড়া, আপনি বলতে চাইছেন, এখনও আমি ছোট। কিন্তু তা আমি নই। কি থেকে কি হয় সব আমি বুঝি, জানি নিজের জন্যে কোনটা ভাল।'

এই সময় পিপ পিপ শব্দ শোনা গেল, সাইকেল নিয়ে বাঁক ঘুরল বাচ্চাটা, রানাকে স্যালুট করে পাশ কাটাল। লাফ দিয়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল রানা, একটা হাত কপালে উঠে গেছে।

'বললে বিশ্বাস করবে, ওই বয়সের একটা ছেলে আছে আমার?'

খিলখিল করে হেসে উঠল সুবর্ণা পোখরেল। রানাকে বিস্মিত করে বলল, 'নেই বলেই জোকটা করতে পারছেন, মশাই!' প্রসঙ্গ বদলাল সে, 'ছেলেটা সুন্দর, তাই না?'

'দেখে যা মনে হয় ওর বয়স তারচেয়ে অনেক বেশি,' বলল রানা। 'অত্যন্ত প্রাচীন, জ্ঞানী পুরুষ সে—সত্যিকার আনন্দের গোপন উৎস আবিষ্কার করে ফেলেছে।'

দরজা খুলে আলো জ্বালল রানা, 'এসো!'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সুবর্ণা পোখরেল। তারপর তর্জনী তুলে সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল, 'ভুল বুঝবেন না, মিস্টার—ভয় নয়, আমার লজ্জা করছে।'

চোখ বুজে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখনও?'

'হুঁ,' বলে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ তুলল সুবর্ণা পোখরেল, রানাকে এক রকম

ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। 'ওমা, এ তো দেখছি রাজকীয় ব্যাপার-স্যাপার!'

কামরা নয়, গোটা একটা স্যুইট। বিশাল এন্ট্রান্স হল; পিয়ানো, কালার টিভি আর সোফা সেটসহ সিটিংরুম, এক কোণে রাইটিং টেবিল, আরেক কোণে ছোট্ট বার। বড় একটা কামরায় দুটো বিছানা, দু'জন শোয়। ছোট একটা কামরায় একটা বিছানা, রানার জন্যে। ভারত সরকার মাথাপিছু সবাইকে একটা নির্দিষ্ট টাকার হোটেল ভাড়া দিয়েছে, কেউ কেউ সেই টাকার সাথে পকেটের কিছু যোগ করে নিজেদের পছন্দমত হোটেলে উঠেছে। রানার কামরায় ঢুকে এটা সেটা দেখছে সুবর্ণা পোখরেল, দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল রানা।

'ভাল কথা, তোমার নামের শেষাংশটা আমার ঠিক মনে নেই...'

'পোখরেল।'

'কি জন্যে যেন বিখ্যাত তুমি?'

'ব্যঙ্গ করছেন, না? হারিয়েও তৃপ্তি হয়নি? আপনি সত্যি নিষ্ঠুর!' চোখ নামিয়ে নিল সুবর্ণা।

রানা ভেবেছিল রেগে উঠবে মেয়েটা, কিন্তু তার চোখ ছলছল করে উঠল দেখে অবাক হলো। অবশ্য মেয়েটার কাছাকাছি যাবার সুযোগ খুঁজছিল, সেটা পেয়েই খুশি ও। এগিয়ে এসে সুবর্ণার কাঁধে একটা হাত রাখল, বলল, 'ধ্যাত, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। অমনি মন খারাপ হয়ে গেল!'

হঠাৎ কি হলো, রানাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে থরথর করে কেঁপে উঠল মেয়েটা, রানার গায়ে হেলান দিয়ে নেতিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে মাথা রাখল বুকে। 'অরবিদ,' বিড়বিড় করল সে। 'অরবিদ সিংহে, আপনাকে আমার এত কেন ভাল লাগে!' রানার ঠোঁটের কাছে মুখ তুলল সে, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হচ্ছে।

কাজের কাজ কিছুই হলো না, নিজেকে প্রায় জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে দূরে সরে এল রানা। 'তুমি ছেলেমানুষ, সুবর্ণা। আমি ঠিকই বলেছিলাম কোথায় পা ফেলছ জানো না।'

সুবর্ণার চেহারায় ভয়, চোখে সন্ত্রস্ত ভাব। 'আপনি আমাকে... আপনি আমা...'

'না, সুবর্ণা, আমি কিছু মনে করিনি। কেন কিছু মনে করব, বুঝতেই তো পারছি তুমি অত্যন্ত সরল। কিন্তু ভেবে দেখো, এখনও তুমি ছেলেমানুষ, আমরা বড়জোর বন্ধু হতে পারি, তার বেশি কিছু না।'

মাথা নিচু করে ঝাড়া দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এখানে আমার আসা উচিত হয়নি।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

স্যুট পরে আছে সুবর্ণা পোখরেল, পকেটে হাত ভরে বলল, 'এটা বোধহয় ফেরত চাইবেন আপনি?' চারমিনারের প্যাকেটটা বের করে দেখাল সে।

হেসে উঠল রানা। ও ভেবেছিল, যেভাবে মেয়েটার পকেটে ওটা ফেলেছে সেভাবেই বের করে নেবে, মেয়েটাকে কিছু জানতে না দিয়ে–কিন্তু সে সুযোগ আর পেল কই। 'কখন বুঝতে পারলে ওটা তোমার কাছে রয়েছে?'

'এলিভেটরে চড়ার পর, পকেটে হাত ভরার সময়। ব্যাপারটা কি? পুলিসটা

তাহলে মিছেমিছি অভিযোগ করেনি!'

'ধন্যবাদ, সুবর্ণা।' তার হাত থেকে প্যাকেটটা তুলে নিল রানা।

চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল মেয়েটা। 'কোন ব্যাখ্যা দেবেন না? নাকি চান, আপনাকে আমি চোর বলেই জানি?'

রানা হাসল না। 'কেউ কিছু দিলেই আমি যে নিই না, তা সে যতই দুর্লভ বা লোভনীয় হোক, সে অভিজ্ঞতা কি ইতিমধ্যে হয়নি তোমার, সুবর্ণা?'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। 'তিক্ত, তবে হয়েছে।'

'তিক্ত বলে ভাবছ, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'কিন্তু যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর তুমি আমাকে চোর বলে ভাবতে পারো?'

আবার সময় নিয়ে ভাবল মেয়েটা। তারপর মাথা নাড়ল। 'তবু, গোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা না থেকে পারে না।'

'ব্যাখ্যা একটা আছে বৈকি, কিন্তু সেটা জানলে তোমার বিপদ হতে পারে। শুধু জেনো, আমি কোন অন্যায় করছি না। এর সাথে আমার দেশের ন্যায্য স্বার্থ জড়িত। তুমি যদি এ-ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন না করো, এবং কাউকে কিছু না বলো, আমি সত্যি কৃতজ্ঞবোধ করব।'

'কেন আপনি আমাকে ছেলেমানুষ আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, কেন আপনাকে আমার রহস্যময় বলে মনে হয়েছে, সব প্রশ্নেরই উত্তর পরিষ্কার হয়ে আসছে—হ্যালো, জেমস বণ্ড?' বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর।

অপ্রস্তুত বোধ করল রানা, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'এবার আমাকে যেতে হয়,' বলল সুবর্ণা। তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানা। 'আমি যদি আপনার প্রেমে না-ও পড়ে থাকি,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, 'আপনাকে আমি কোনদিন ভুলব না।' বলে আর দাঁড়াল না, হন হন করে করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল। কাঁধ আর ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে আছে। তার দীর্ঘ, একহারা শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, দূরে কোথাও করুণ সুরে বেহালা বাজছে, বিষণ্ন হয়ে উঠল মনটা।

নিজের কামরায় ফিরে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। গা থেকে কোট খুলে, পকেট থেকে বের করল চারমিনারের প্যাকেট, কোটটা ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। প্যাকেট খুলে ভেতর থেকে দশটা সিগারেট বের করল। একটা সিগারেটের ভেতর তামাক মাত্র অর্ধেক, বাকি অংশে পাওয়া গেল কালো রঙের একটা জিনিস, ষোলো মিলিমিটারের একটা ফিল্ম, রোল করা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা খুলল রানা, আবার সেটা শক্ত করে বাঁধল। নট-এর ভেতর ফিল্মের রোলটা ভরে নিয়েছে। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, নট শক্ত না হলে রোলটা খসে পড়বে। সাবধানের মার নেই ভেবে নটের নিচে খানিকটা সুতী উল ভরল ও, তারপর পরীক্ষা করল নটটা। আপাতত এতেই কাজ চালাতে হবে, অন্তত জাহাজে না ওঠা পর্যন্ত আরও নিরাপদ কিছু করা সম্ভব নয়। যতই ঝুঁকি থাক, নিজের সাথেই রাখতে হবে মাইক্রোফিল্মটা।

সুটকেস গোছগাছ করে নিল রানা, তালা লাগাল, ভারতীয় পর্যটন সংস্থার দেয়া লেবেল লাগাল গায়ে, কোটটা হাতের ভাঁজে নিয়ে নেমে এল ডাইনিংরুমে। ছ'টায় সময় ডিনার, নতুন দিল্লী রেল স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে আটটায়।

করিডরের শেষ মাথায় দৈত্যাকার লোকটাকে দেখে একটুও অবাক হলো না রানা, বরং না দেখলেই বিস্মিত হত। একটা জানালার সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে, রানাকে আসতে দেখেও ঘাড় ফেরাল না। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ঘাড়ের কাছে সড়সড় করল চুল, কিন্তু পিছন ফিরে তাকানোর ইচ্ছেটাকে দমন করল রানা। দরকার নেই, জানে লোকটা ভারতীয় এবং ওর ওপর নজর রাখার জন্যেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনে উঠতে পারলেই যে রেহাই পাওয়া যাবে তা নয়, জাহাজ পর্যন্ত পিছু নেবে ওরা, এমনকি শ্রীলংকা পর্যন্তও যেতে পারে। জিনিসটা রানার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবেই ওরা।

দুই

বাস আর মোটর কারের বিরাট একটা শোভাযাত্রা এসে পৌঁছুল রেল স্টেশনের সামনে। স্টেশনের একটা অংশ ট্যুরিস্টদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, প্ল্যাটফর্মে নতুন রঙ করা ট্রেনটা শুধু তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছে। মুখে সিগারেট, একটা হাত ট্রাউজারের পকেটে, কাঁধে ক্যামেরা, আনন্দমুখর মিছিলের সাথে এগিয়ে চলেছে মাসুদ রানাও। অশোকা হোটেলের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা দৈত্যটাকে দ্বিতীয়বার আর দেখেনি বটে, কিন্তু তার বদলে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হবার মুহূর্তে দু'জন ভারতীয় জুটে গেছে কপালে। নাম করা হিন্দী ও ইংরেজি দুটো দৈনিক পত্রিকার জার্নালিস্ট তারা, পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জয়া মালহোত্রা। এই মুহূর্তে রানার ঠিক পিছনে রয়েছে দু'জন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার দরকার নেই, রানার জানা আছে। পরিচয়ের মুহূর্তেই বুঝতে পারে, ও যেমন কবি নয় তেমনি লোক দুটোও জার্নালিস্ট নয়। তবে তাদের নিঃশব্দ, নির্বিঘ্ন উপস্থিতি একদিক থেকে স্বস্তিকর—এর মানে হলো, বিজনেস সিন্ডিকেট এখুনি জোর খাটাতে চাইছে না, অন্তত যতক্ষণ ভারতীয় এলাকায় থাকছে ও।

মনে মনে হাসল রানা। বিজনেস সিন্ডিকেট যতই না কেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আর শক্তিশালী অপরাধচক্র হোক, তাদেরও কিছু অসুবিধে আছে। কুচক্রটির বৈশিষ্ট্যই হলো, প্রশাসন, সামরিক বাহিনী আর পুলিস ফোর্স-এর সদস্যদের মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করা, কাজেই বুঝে শুনে ভেবে চিন্তে পা ফেলতে হয় তাদের। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আগত কোন ট্যুরিস্টের সাথে পুলিসের কোন সদস্য খারাপ ব্যবহার করলে রীতিমত হৈ-চৈ বেধে যাবে, সংশ্লিষ্ট পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তদন্তশেষে শাস্তি হয়ে যাবে, তদন্তের সময় কুচক্রটির অনেক গোপন তৎপরতা ফাঁস হয়ে যাবার ঝুঁকি তো আছেই।

সেজন্যেই রানা ভাবছে, বোম্বে থেকে রাজহংস রওনা হবার আগে পর্যন্ত ওর ভয় পাবার তেমন কোন কারণ নেই। বোম্বে থেকে জাফনায় যাবার পথেও ওকে হয়তো বিরক্ত করা হবে না। তবে জাহাজ থেকে জাফনায় নামার পর কি ঘটবে বলা মুশকিল। স্বভাবতই ইতোমধ্যে বেপরোয়া হয়ে উঠবে শত্রুপক্ষ, শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার আগেই একটা কিছু করতে চাইবে।

'হ্যালো, সিংহে!'

সিংহলী অধ্যাপক হরি শ্রেষ্ঠর সাথে করমর্দনের জন্যে থামতে হলো রানাকে। জাফনা থেকে আসার পথে জাহাজে একই কেবিনে ছিল ওরা, বোম্বেতে পৌঁছুনোর পর দু'জন দুই আলাদা গ্রুপে চলে যায়, তারপর ক'দিন আর দেখা হয়নি।

'হ্যালো, শ্রীবাস্তব?'

শিব শ্রীবাস্তব, নেপালী স্পোর্টসম্যান, ওদের কেবিনের তৃতীয় সঙ্গী। হরি শ্রেষ্ঠর সাথে এক মিনিট গল্প করল রানা, কাছাকাছি ভারতীয় এক যুবতীকে প্রায় কেঁদে ফেলতে দেখল, সুঠাম স্বাস্থ্য এক পাকিস্তানী যুবকের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে সে, বিদায়ের মুহূর্তে দু'জনেরই মন বিষণ্ণ। ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন পুলিস থমথমে চেহারা নিয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করছে।

রানা আর হরি শ্রেষ্ঠ পরস্পরের টিকেট মিলিয়ে দেখল, দু'জনকে দুটো আলাদা কমপার্টমেন্টে উঠতে হবে। বিদায় নিয়ে সাত নম্বরে উঠল রানা, আট নম্বর কাউচটা দখল করল, সংক্ষিপ্ত কুশলাদি বিনিময় করল ভ্রমণসঙ্গীদের সাথে—একজন পুরুষ, দুটো মেয়ে—তারপর নিজের সুটকেসের খোঁজ করল।

খুঁজে না পেয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল ও, 'আপনাদের লাগেজ পৌঁচেছে?'

'হ্যাঁ,' একযোগে বলল সবাই। পুরুষ সঙ্গী জানাল, 'এসে দেখি আগেই পৌঁছে গেছে।'

'কিন্তু আমারটা পৌঁছায়নি।'

করিডরে বেরিয়ে এসে অ্যাটেনড্যান্টের সাথে কথা বলল রানা। নীল জ্যাকেট পরা হাসিখুশি এক লোক, বোম্বে থেকে আসার পথেও তাকে দেখেছে ও। 'ওহে, বর্মণ, সব লাগেজ কি পৌঁচেছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে দিল মুকুল বর্মণ, জনান্তিকে বাংলায় বলল, 'আরে বাপু, ইংরেজি জানলে কি আর এই খোট্টাদের দেশে পড়ে থাকি!'

ইচ্ছা হলেও, মাতৃভাষায় কথা বলতে পারল না রানা। ইঙ্গিতে ডেকে তাকে নিয়ে কমপার্টমেন্টে ফিরে এল, সঙ্গীদের ব্যাগ আর সুটকেস দেখিয়ে নিজের বুকে আঙুল রাখল, তারপর হাত নেড়ে ভঙ্গি করল—নেই। গভীর আগ্রহ নিয়ে রানার মূকাভিনয় দেখল মুকুল বর্মণ, আবার বত্রিশ পাটি দাঁত বের করল সে, রানার ভঙ্গি অনুকরণ করে জানিয়ে দিল, এ-ব্যাপারে তারও কোন ধারণা নেই। অগত্যা প্ল্যাটফর্মে নেমে জয়া মালহোত্রাকে খুঁজে বের করল রানা। ছদ্মবেশী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন তিনি।

'এক্সকিউজ মি, মিসেস মালহোত্রা। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল, কিন্তু কমপার্টমেন্টে এখনও আমার লাগেজ পৌঁছায়নি। কি হতে পারে?'

'ওহ্হো!' হতাশায় মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজলেন জয়া মালহোত্রা। 'যতই সাবধান হও, এ-ধরনের ঘটনা ঘটবেই। তবে চিন্তা করবেন না, মি. সিংহে, নির্ভাবনায় থাকুন। নিশ্চয়ই অন্য কোন কমপার্টমেন্টে আছে ওগুলো, ভুল করেছে পোর্টার। এখানে দাঁড়ান আপনি, দেখি খুঁজে পাই কিনা।'

হরিণীর মত চঞ্চল পায়ে ভিড় ঠেলে চলে গেলেন মহিলা। নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায়, লোক দু'জনের দিকে তাকিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি বোম্বে, নাকি একেবারে জাফনা পর্যন্ত যাবেন?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল তারা, একজন মৃদু হাসল। হঠাৎ টাইটার নট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রানা, সচেতনতার মাত্রা রীতিমত শারীরিক পীড়নের সমতুল্য হয়ে উঠল। ব্যাপারটা হয়তো কল্পনা, কিন্তু ওর মনে হলো লোক দু'জন সরাসরি ওটার দিকেই তাকিয়ে আছে। 'এক্সকিউজ মি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ও, হেঁটে ফিরে এল নিজের কমপার্টমেন্টে। জয়া মালহোত্রা ফিরে এসে কি বলবেন আন্দাজ করতে পারছে ও। লাগেজ ফিরে পাবে বটে, কিন্তু আজ রাতে অবশ্যই নয়। একবার কিছু হারিয়ে গেলে, খুঁজে বের করতেও তো সময় লাগে।

যথাসময়ে রওনা হয়ে গেল ট্রেন, দিল্লী ছাড়বার আগেই ওর কমপার্টমেন্টে হাজির হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন জয়া মালহোত্রা, জানালেন, ওর লাগেজ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আবার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ট্রেন বোম্বে পৌঁছুলে খুঁজে পাওয়া যাবেই।'

সবই সত্যি, তবু নিয়মমাফিক যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করল রানা। আরেকবার আশ্বাস দিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন মহিলা। স্পীকার থেকে ভেসে এল লতা মঙ্গেশকারের একটা পুরানো দিনের গান। অপর দুই কাউচে হেলান দিয়ে উল বুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই মহিলা সহযাত্রী। চা আর বিস্কুট নিয়ে এল মুকুল বর্মণ। অনেকক্ষণ পরপর হলেও, রানার একটা হাত টাইয়ের নট ছুঁয়ে উঠে যাচ্ছে কপালে, যেন চুল সরাতে ব্যস্ত।

শাওয়ার ইত্যাদি সারার পর মুকুল বর্মণের পরিবেশিত ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসল রানা। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, কারণ ট্রেনের ড্রাইভার দু'মিনিট পরপর একবার করে দীর্ঘক্ষণ হুইসেল বাজিয়েছে—কোন সন্দেহ নেই আন-অফিশিয়াল হলেও, নির্ভেজাল ভারতীয় আতিথেয়তার আনন্দমুখর প্রকাশ ছিল ব্যাপারটা। সকাল আটটায় বোম্বে রেল স্টেশনে পৌঁছুল ওদের তুফান মেল।

ট্রেন থামতেই খালি হাতে নেমে পড়ল আরোহীরা, লাগেজগুলো একত্রিত করে রাজহংসে পৌঁছে দেয়া হবে। প্ল্যাটফর্মে প্রচণ্ড ভিড়। মিছিলে যোগ দেয়ার পর সরকারী ফটোগ্রাফারদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে দু'বার পিছন ফিরতে হলো রানাকে। চেহারা আদি ও অকৃত্রিম না হলেও, দেহ-কাঠামোয় কোন ভেজাল নেই, সামনে থেকে তোলা কোন ফটো এখানে রেখে যেতে চায় না ও।

স্টেশনের বাইরে টাটার অনেকগুলো বাস আর অ্যামব্যাসাডর কার কয়েকটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, সাথে একটা নিউজ-রীল ভ্যান, সেটার ছাদে ফিট করা হয়েছে

মুভি ক্যামেরা। ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিনস আর সাদা শার্ট পরা এক মহিলা। সঙ্গীরা কেউ পৌঁছুনোর আগেই গ্রুপের জন্যে নির্দিষ্ট বারো নম্বর কারে উঠে বসল রানা। তারপর একে একে এল তারা। সবার শেষে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে উদয় হলেন জয়া মালহোত্রা। বলাই বাহুল্য, তাঁর সাথে সাংবাদিক দু'জনও এল।

'সবাই তো পৌঁছে গেছি। তাহলে অপেক্ষা করছি কেন?' রোগা চেহারার একজন পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী জিজ্ঞেস করল, কানের পাশে তার জুলফি জোড়া কমপক্ষে আড়াই ইঞ্চি লম্বা, আর কণ্ঠার আকার টেনিস বলের মত।

'সব কার একসাথে রওনা হবে,' মৃদুকণ্ঠে জানালেন জয়া মালহোত্রা। 'সুশৃঙ্খলভাবে।'

বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি খাটিয়ে আবিষ্কার করল, তাঁর কথায় অসঙ্গতি রয়েছে। 'কোন কাজ এক সাথে করা আর শৃঙ্খলা, দুটোর সাথে আসলে কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হয়ে গেলে, আপনি বলতে পারেন, তাতে শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হবে? আমার তো মনে হয়, আগেভাগে রওনা হয়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটার বা হাঙ্গামা বাধার সম্ভাবনা কম, তাতেই বরং শৃঙ্খলা বজায় থাকার নিশ্চয়তা রয়েছে। আমরা সবাই এই ক্লান্তিকর জার্নি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই,-তাই নয় কি?' কথা শেষ করে সে তার গোটা শরীরটাকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত বাঁকা করে তুলল।

মৃদু হেসে জয়া মালহোত্রা বললেন, 'আমরা ব্যাপারটাকে উৎসব হিসেবে দেখছি, মি. মিরাট খান। কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকতেই হয়। দেখছেন না, আপনাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতে ফুলের ডালি নিয়ে?'

'শুধু ওদের নয়, অটোমেটিক অস্ত্রধারী প্রচুর পুলিসও আমি দেখতে পাচ্ছি, মিসেস মালহোত্রা-কোন সন্দেহ নেই, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে, তাই না? নাকি দিল্লীর মত বোম্বেতেও খালিস্থান মুক্তিযোদ্ধারা তৎপর?'

সকৌতুকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন জয়া মালহোত্রা, কিন্তু তার আর দরকার হলো না, কারণ সামনের কারগুলো এক লাইনে রওনা হয়ে গেল। পিছু নিল ওরাও, ক্যামেরাসহ ভ্যানটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ড্রাইভার। ছবি তোলা শেষ করে তীরবেগে ছুটে গেল ভ্যানটা, প্রতিটি সামনের বাঁকে সেটাকে অপেক্ষা করতে দেখল ওরা। জয়া মালহোত্রা জানালেন, 'ভারত জুড়ে প্রতিটি সিনেমা হলে আপনাদের এই শোভাযাত্রা দেখানো হবে।'

অবশেষে বন্দরে পৌঁছুল ওরা, জাহাজের পাশে থামানো হলো গাড়ির মিছিল। গভীর রাত পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করেছে রানা, নিরাপদে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় মাইক্রোফিল্মের রোলটা। জাহাজে প্যাসেঞ্জার'স শপ আর পারসার অফিসের পাশে একটা হল আছে, সেখান থেকে ফার্স্ট ক্লাস ডাইনিং রূমে নেমে গেছে একটা সিঁড়ি, ওখানে কাঠের চৌকো এক বেদীর ওপর বসানো আছে তামার তৈরি বেগম রোকেয়ার আবক্ষ মূর্তি। মাথাটা ফাঁপা, চোখের ভেতর দিয়ে একটা পেন্সিল ঢোকানো সম্ভব। টিউব আকৃতির মাইক্রোফিল্মটা দুই চোখের যে-কোন একটার ভেতর গলিয়ে দিলে আর কোন চিন্তা নেই। প্রকাশ্য জায়গায় থাকবে অথচ ওখানে

সার্চ করার কথা কেউ ভাববে না।

সবার আগে, তাড়াহুড়ো করে, গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। বহু লোক গ্যাংওয়ের দিকে হাঁটছে, ভিড় ঠেলে প্রায় ছুটতে শুরু করল ও, সারাক্ষণ জেটির কিনারায় থাকল। প্রায় বিশ গজের মত সামনে চলে এল ও, এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার পিছন দিকে। অনেকটা পিছনে, ভিড়ের ভেতর, জয়া মালহোত্রার সাথে সাংবাদিক দু'জনকে দেখতে পেল ও। হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, কাকে যেন খুঁজছে তারা। 'এই যে, আমি এখানে!' কৌতুক বোধ করে মুচকি হাসল ও।

সামান্য একটু ঝুঁকে, যাতে ওকে দেখতে না পায় বা দেখলেও চিনতে না পারে, হন হন করে হেঁটে গ্যাংওয়েতে পৌঁছে গেল রানা। অন্যান্য আরোহীদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে টানা রশির নিচ দিয়ে গলে কয়েক ফুট উঠে এল, পায়ের নিচে অ্যালুমিনিয়ামের মেঝে ভীতিকর শব্দ করছে, গ্যাংওয়ের মাথায় পৌঁছে দেখল ডেকগুলোয় জড়ো হয়ে আরোহীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে অফিসাররা। সরাসরি কারও চোখে না তাকিয়ে তাদেরকে পাশ কাটাল ও। এক প্রস্থ সিঁড়ি টপকাল, অসম্ভব লম্বা একটা করিডর পেরোবার সময় দুই কি তিনজনের সাথে দেখা হলো। ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জ হয়ে আরও ক'টা ধাপ বেয়ে নামল, নামার সময় ব্যস্ত হাতে ঢিলে করল টাইয়ের নট।

পানির মত সহজ। হলে কোন প্রাণী নেই। তবে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। এরইমধ্যে গলার আওয়াজ পাচ্ছে ও, সম্ভবত যাদেরকে পাশ কাটিয়ে এসেছে। তামার মাথাটা ভাল করে দেখল একবার, তারপর মাইক্রোফিল্মটা বাঁ চোখের ভেতর গলিয়ে দিল। চট করে আরেকবার দেখে নিল চারদিক।

সারা শরীরে স্বস্তির পরশ নিয়ে করিডরে ফিরে এল রানা, দুই প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে নিজের কেবিনের সামনে চলে এল। দরজায় তালা, চাবি পাবার জন্যে খুঁজে বের করতে হলো একজন স্টুয়ার্ডকে।

দিল্লীর উদ্দেশে রওনা হবার আগে ট্যুরিস্টদের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, তারা যেন একাধিক লাগেজ সাথে না রাখে। তাই দ্বিতীয় সুটকেসটা, একজোড়া জুতোসহ, কেবিনে রেখে গিয়েছিল রানা। সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, সার্চ করা হয়েছে। শত্রুপক্ষের ক্ষিপ্রগতি আর কাজকর্মে ত্রুটিহীনতার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা যা খুঁজছে সেটা সুটকেসে নেই জেনেও সার্চ করার মানেটা কি? একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, রানার পরিচয় জানার চেষ্টা করেছে তারা। তারমানে ইতোমধ্যে তাদের মনে সন্দেহ জেগেছে, অরবিন্দ সিংহে একটা কাভার।

দ্বিতীয় সুটকেসটায় রেজারসহ কিছু কাপড়চোপড় থাকায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা, দাড়ি কামিয়ে নতুন শার্ট আর স্যুট পরল, ভাবল ডাইনিং রূমে একবার ঢুঁ দিলে পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যেতে পারে। কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়েছে, দেখল লাগেজ নিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকজন পোর্টার। নিজের সুটকেস চিনতে পারল ও, চেয়ে নিয়ে ফিরে এল আবার কেবিনে, তালা লাগাল দরজায়।

সুটকেসটা ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। কাল রাতে গুছিয়েছে, কাজেই

কিভাবে সাজানো হয়েছিল জিনিসগুলো মনে আছে ওর। অবশ্য মনে না থাকলেও চলত, কারণ সুটকেসের ভেতরটা এলোমেলো করার পর গোছানোর কোন চেষ্টাই করেনি প্রতিপক্ষ। কাজটা যারই হোক, সে চেয়েছে রানা জানুক।

সে-যাই হোক, টুথব্রাশের অভাবটা ঘুচল রানার। দাঁত পরিষ্কার করে সুটকেস থেকে বের করল সব, যেখানে যেটা রাখার দরকার রাখল, তারপর সুটকেস তছনছ করার গুরুতর অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো পারসার-এর অফিসে। সেখান থেকে ডাইনিং রুমে চলে এল লাঞ্চ খেতে।

খেতে বসে কুচক্র অর্থাৎ বিজনেস সিন্ডিকেট সম্পর্কে কি জানে স্মরণ করল রানা।

বিজনেস সিন্ডিকেটের বর্তমান হেডকোয়ার্টার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। দু'বছর আগে ছিল নেপালের কাঠমণ্ডুতে। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ধারণা, দু'বছর পর হেডকোয়ার্টার উঠে যাবে বাংলাদেশের রাজধানীতে। বিজনেস সিন্ডিকেটের গঠনতন্ত্র অনুসারে, প্রতিটি দেশে দু'বছর মেয়াদে হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হবে। সার্ক দেশগুলোর অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ আর ভুটানের প্রায় সাতশো পুঁজিপতি তথা ব্যবসায়ী এই সংগঠনের সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের সংখ্যা দেড়শোর মত। এক হিসেবে জানা গেছে, সদস্যদের সম্মিলিত ধন-সম্পদ বা পুঁজির পরিমাণ বাংলাদেশী টাকায় পঞ্চাশ হাজার কোটির কম নয়। সদস্যরা অনেকেই যার যার দেশে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী মহলে তো বটেই, সামাজিকভাবেও বিপুল সুখ্যাতির অধিকারী। এদের মধ্যে শিল্প-মালিকদের সংখ্যা নগণ্য, বেশিরভাগই উঠতি পুঁজিপতি, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট-এর নাম করে চোরাচালানের জমজমাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। সবার পরিচয় জানা সম্ভব নয়, কারণ সংগঠনের ভেতর প্রচলিত অর্থে ব্যবসায়ী নয় এমন বহু লোকজন, যেমন–সরকার প্রধানদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থেকে শুরু করে সংসদ সদস্য, আমলা, মন্ত্রীসভার সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক, এনজিও কর্মকর্তা পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে ছদ্মপরিচয়ে।

সাতটা দেশের সাতজন ডিরেক্টরকে নিয়ে পরিচালকমণ্ডলী গঠিত। একাধিক সাব-কমিটি আছে, তাদের রিপোর্ট অনুসারে হেডকোয়ার্টারে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিচালকমণ্ডলীই নির্ধারণ করে দেয় ত্রৈমাসিক কোটা–কোন দেশে কোন সদস্য কি পরিমাণ সোনা, হেরোইন বা অন্য কোন বেআইনী মালামাল পাচার করবে। অবৈধ যে-কোন ব্যবসা বিজনেস সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা পাবার উপযুক্ত, সেটা লাভজনক হলেই হলো।

সাতটা দেশে প্রায় দশ হাজার লোককে বেতন দিয়ে পুষছে বিজনেস সিন্ডিকেট। তাদের বেতনভুক কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী, দূতাবাস কর্মী, পুলিস বাহিনীর সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী, শহর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তা ও নির্বাচিত সদস্য, বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা এবং শ্রমিক ও পরিবহন সংস্থাগুলোর কোন কোন নেতা। এক অর্থে, নিজেদের সংগঠন স্রেফ নামকাওয়াস্তে,

বিজনেস সিন্ডিকেট তাদের অবৈধ তৎপরতা চালায় সংশ্লিষ্ট সব ক'টা দেশের সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে। ফলে বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্য বলে এদেরকে আলাদাভাবে চেনা খুব কঠিন। সংগঠনের এই নিরাপদ অথচ বৈপ্লবিক ধারণাটি নাকি বাংলাদেশেরই কোন এক উঠতি পুঁজিপতির উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে।

বিজনেস সিন্ডিকেটের মূল শ্লোগান হলো-যেভাবে পারো টাকা কামাও। শিশুদের অপহরণ করার পর হত্যা করে রক্ত বেচা হয় স্থানীয় বাজারে, বিদেশে বেচা হয় মাথার খুলি। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার যুবতী মেয়েকে চাকরি দেয়ার নাম করে পাচার করা হয় মধ্যপ্রাচ্যে, ভোগ্যপণ্য হিসেবে। মোটা টাকার বিনিময়ে বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্যরা ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ ফেলে যাবার সুযোগ করে দেয় বিদেশী পরিবহন জাহাজগুলোকে। মাঝসমুদ্রে খাদ্য বোঝাই জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে চাল, গম, তেল, চিনি ইত্যাদির দাম বাড়িয়ে দেয়। একশো কোটি টাকার মেশিনারি পার্টস ইমপোর্ট করে, কিন্তু কাগজে-পত্রে দেখায় দশ কোটি টাকার আমদানী করা হয়েছে, এভাবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবার দেড়-দুশো কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি দেয়। প্রতি মাইল রাস্তা তৈরিতে বিল করা হয় এক কোটি টাকা, কিন্তু খরচ করা হয় দশ লাখেরও কম। গোপনে অ্যান্টিকস, গুইসাপ আর বাঘের চামড়া পাচার করে। বিদেশ থেকে চোরা পথে আনে সোনা আর হেরোইন। এমনকি বিজনেস সিন্ডিকেটের নির্দেশে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় কয়েকটা দেশে পপির চাষ পর্যন্ত শুরু হয়েছে। সামরিক তথ্য বেচাকেনায়ও পিছিয়ে নেই তারা, রাষ্ট্রীয় গোপন সিদ্ধান্ত ফাঁস করে দেয়ার বিনিময়ে সম্ভাব্য সব রকম সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করে।

দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করছে বিজনেস সিন্ডিকেট। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলো তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেও আজ পর্যন্ত শত্রুপক্ষকে ভালভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সনাক্ত করতে পারলেও, তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্যরা নিজেরা কোন কাজ সরাসরি করে না, সমস্ত অন্যায় অবৈধ কাজ তারা সরকারী আমলা, পুলিস আর সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সাহায্যে সমাধা করে। যদি কেউ হাতেনাতে ধরা পড়ে, তার কাছ থেকে রুই-কাতলাদের নাম জানা সম্ভব নয়, কারণ নিজেরাই তারা জানে না। তাছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলোয় টাকা ঢাললে সব মাফ হয়ে যায়, দু'দশটা খুন করেও চমৎকার রেহাই পেয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্ত সংখ্যায় খুব কম নয়।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই প্রথম এই কুচক্রটি সম্পর্কে একটা ফাইল তৈরি করেছে। ছয়টা দেশে গোপনে এজেন্ট পাঠিয়ে বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্যদের একটা তালিকাও সংগ্রহ করেছেন বি.সি.আই. চীফ। এই কাজে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে তাঁর এক এজেন্ট নিখোঁজ হয়ে গেছে, ধারণা করা হচ্ছে সে আর বেঁচে নেই। রাহাত খান জানেন, সদস্যদের পরিচয় উদ্ধার করাই শেষ কথা নয়, সেই সাথে যোগাড় করতে হবে অকাট্য প্রমাণ। প্রমাণ যোগাড় হলে, সমস্ত শক্তি এক করে দুর্জয় হতে হবে বি.সি.আই-কে, তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সেজন্যে আয়োজন দরকার, দরকার সময়।

বাংলাদেশ থেকে কি চুরি করা হয়েছে এখনও তা জানে না রানা, তবে চুরিটা যে বিজনেস সিন্ডিকেট করেছে সেটা জানা গেছে। বস্ তাহলে ঠিক সন্দেহই করেছেন, ভাবল ও।

বিকেলে গাড়িতে চড়ে গুহা-মন্দির দেখতে বেরুল ওরা, ফেরার পথে গোটা বোম্বে শহর চক্কর দিয়ে এল। নরিম্যান পয়েন্ট শহরের ব্যস্ততম এলাকা, গুলিস্তানের যানজটের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে—লোকজন আর যানবাহনের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি হলেও এখানে সে-ধরনের কোন সমস্যা নেই। দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানোর এক পর্যায়ে নিজেকে বন্দী বলে মনে হলো ওর, দু'তিনজন আরোহীকে দলে টেনে নিয়ে অভিজাত বান্দ্রা এলাকার কাছাকাছি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও, অজুহাত দেখাল কিছু কেনাকাটা করা দরকার। এতক্ষণ ওর পিছনের সীটে অলসভঙ্গিতে বসে থাকলেও, হঠাৎ করে সাংবাদিক দু'জনেরও কেনাকাটা করার শখ চাপল। রানার পিছু পিছু এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরে বেড়াল তারা, সব সময় ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রাখলেও নিজেদের উপস্থিতি গোপন করার কোন চেষ্টা করল না।

উদ্বেগ বোধ করার কোন কারণ দেখল না রানা। কেনাকাটা শেষ করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বন্দরে ফিরল ও, কাছাকাছি একটা স্টল থেকে শেষ ভারতীয় মুদ্রা খরচ করে কয়েকটা পত্রিকা কিনল। বসকে পোস্টকার্ড পাঠাবার কথাটা মনে পড়লেও, চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। প্রয়োজন নেই, কাজেই ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। নিজেদের চেষ্টায় ওর পরিচয় যদি ওরা জানতে পারে তো জানুক, সে কোনরকম সাহায্য করতে যাচ্ছে না।

চারটের সময় জাহাজে ফিরল রানা, সবাই ফিরে আসার এক ঘণ্টা আগে। জাহাজ প্রায় খালিই বলা যায়। ফার্স্ট ক্লাস বার-এ চলে এল ও, দেখল খালি, আলোও জ্বলছে না। তবে হাতে লেখা একটা নোটিশ রয়েছে—জানা গেল, ট্যুরিস্ট ক্লাস বার খোলা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে জাহাজের পুরোটা দৈর্ঘ্য ধরে হাঁটতে হবে। কি আর করা, আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। ভারি নিঃসঙ্গ বোধ করছে।

সিগারেট ধরিয়ে বিয়ারের গ্লাসে মাত্র চুমুক দিয়েছে, এই সময় আশীর্বাদের মত উদয় হলো সুনীতা।

ভারতে পৌঁছুনোর পরদিন বোম্বের শিল্পকলা একাডেমীতে ট্যুরিস্টদের সম্মানে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে নৃত্য পরিবেশন করে সুনীতা খান্না। অনুষ্ঠানে ট্যুরিস্টদের অনেকেও অংশগ্রহণ করে। সুনীতা সুন্দরী, বয়স হবে একুশ কি বাইশ। অনুষ্ঠান শেষে যেচে-পড়ে রানাই তার সাথে আলাপ করে। নাচে ভাল হলেও পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিতে চায় মেয়েটা, বিদেশী ভাষার মধ্যে সিংহলী আর তামিল শিখছে, ভাল ইংরেজি জানে। শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তাকে কল্পনা করতে কষ্ট হবারই কথা, কারণ বেশিরভাগ সময় এমন পোশাক পরে থাকে সে যেন এখুনি কোথাও নাচতে যাবে। এই যেমন এখন, শাড়ি পরার ধরন, অলঙ্কারের বাহুল্য আর মেকআপের বহর দেখে মনে করা স্বাভাবিক যে কোথাও

থেকে নেচে এল বা নাচতে যাচ্ছে। কম কথা বলে, মার্জিত চলাফেরা, কিভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে হয় ভালই জানা আছে।

বারের পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছিল, রানাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। টেবিল ছেড়ে উঠে এল রানা।

'হ্যালো,' বলল ও। 'চিনতে পারো? আবার দেখা হবে ভাবিনি।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলেই ফেলল, 'বসবে নাকি?'

রানাকে ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকল সুনীতার দৃষ্টি, বারে আর কোন লোক নেই দেখে আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল, তবু ইতস্তত করে বলল, 'বসব?'

'যদি আপত্তি না থাকে,' ভুবনভোলানো হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা।

পাতলা ঠোঁট মুহূর্তের জন্যে দাঁত দিয়ে সামান্য একটু কামড়ে আবার ছেড়ে দিল সুনিতা। 'ঠিক আছে।' রানার সাথে টেবিলে চলে এল সে। মৃদুকণ্ঠে ব্যাখ্যা করল, নেপালী এক মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে তার, তাকেই খুঁজতে এসেছিল, কিন্তু না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। মেয়েটার নাম বলল, কিন্তু রানা তাকে চেনে না।

'তোমার জন্যে কি বলব?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'হালকা কিছু, নাকি...?'

প্রায় আঁতকে উঠল সুনীতা। 'না-না! আমি ড্রিঙ্ক করি না! কখনও খাইনি!'

বাংলাদেশী জাহাজ, বার-এর ব্যবস্থা শুধু বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে, স্টকে প্রচুর ঠাণ্ডা ও হালকা পানীয় রয়েছে। সুনীতা কোকাকোলা চাইল, কখনও খায়নি।

গ্লাসে ঢেলে সাবধানে চুমুক দিল সে, হাসি হাসি মুখ করে মাথা ঝাঁকাল। 'ভালই তো।' এরপর সে জানতে চাইল, দিল্লী কেমন লাগল রানার। রানা বলছে, মাঝখানে বাধা দিয়ে সুনীতা জানাল, 'মেয়েটার সাথে কেন দেখা করতে এসেছিলাম, জানেন?' শব্দ করে হেসে উঠল সে।

'কেন?'

'আগে কখনও বড় কোন জাহাজে চড়িনি তো, ওর কাছ থেকে কথা আদায় করেছিলাম, ঘুরে ঘুরে সব দেখাবে আমাকে। রাজহংসে নাকি সুইমিং-বাথ-এর ব্যবস্থা আছে...' এবার খিলখিল করে হেসে উঠল সুনীতা। '...আমার খুব ইচ্ছে সাঁতার কাটব!'

মেয়েটার সারল্য আর কৌতূহল স্পর্শ করল রানাকে। কৌতুক করে বলল, 'আগে কখনও করা হয়নি, এর তালিকাটা দেখছি বেশ লম্বা তোমার। কোন সমস্যা নেই, অল্প সময়ের জন্যে হলেও ইচ্ছে করলে আমাকে গাইড হিসেবে পেতে পারো তুমি। জাহাজ দেখতে চাও, বান্দা হাজির। সুইমিং-বাথ? কেন নয়! ওটা কোথায় জানো তুমি? জাহাজের তলায়, ওয়াটার লাইনের নিচে।'

বিস্ময় আর রোমাঞ্চে হাতের গ্লাস এত জোরে চেপে ধরল সুনীতা, রানার মনে হলো ওটা ভেঙে যাবে। বিল মিটিয়ে সুনীতাকে নিয়ে বেরুল ও। দুই প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলল, 'আমার কেবিনটা এই ডেকে।'

'চলুন, একবার ঢুঁ মেরে আসি,' বলল সুনীতা। 'এর মধ্যে যদি আমার বান্ধবী ফিরে আসে, তাহলে আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

ইতস্তত করল রানা। 'এখনই তুমি আমার কেবিনে যেতে চাও? তার আগে জাহাজটা ঘুরে দেখলে হত না?'

হেসে উঠল সুনীতা। 'আপনার কেবিন দেখা আর জাহাজ দেখার মধ্যে পার্থক্যটা কি?'

সুনীতার চেহারায় চট করে কি যেন খুঁজল রানা, কিন্তু সরল কৌতুক আর নিষ্পাপ কৌতূহল ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তার এই কৌতূহলের সুযোগ নেয়ার কোন ইচ্ছাই ওর নেই, তবে মেয়েটার স্বতঃস্ফূর্ত ভাব একটু যেন অপ্রত্যাশিত লাগল ওর। সেজন্যেই, কেবিনে ঢোকার পর, সুনীতা কিছু বলে কিনা দেখার জন্যে দরজা বন্ধ করে দিল ও। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

বিছানার ওপর থেকে একটা বই তুলে নিল সুনীতা। 'হেমিংওয়ে। কেমন লাগে আপনার?'

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রানা। কেন যেন মনে হলো, এটা ঠিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনার সময় নয়।

'হেমিংওয়েকে আমি ভোগবাদী বললে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না,' বলল সুনীতা। 'প্রচুর খাবার, প্রচুর মদ আর মেয়েমানুষ, এ-সবই আপনি পাবেন তাঁর লেখায়। ব্যক্তিগত জীবনেও ভদ্রলোক মেয়েদের সাংঘাতিক ভক্ত ছিলেন।'

হেসে উঠল রানা। 'যদি বলি, তুমি আসলে আমারই নিন্দা করছ?'

'ধ্যেত, আপনি কেন সেরকম হতে যাবেন।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, সেরকম আমি হতে চাইছি না। এই হলো আমার কেবিন, এখন আমরা কি করব?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে সুনীতা খান্না বলল, 'ভেবেছিলাম গল্প করব, কিন্তু এখানে খুব গরম। আচ্ছা, সাঁতার কাটা সম্ভব? মানে, নিয়মের বাইরে কিছু হয়ে যাবে না তো?'

'সুইমিং-বাথে, বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ,' আগ্রহের সাথে বলল সুনীতা। 'কেউ আপত্তি করবে না তো?'

'কেন কেউ আপত্তি করবে, তুমি আমার অতিথি না? যদি চাও, তোমার সাথে আমিও সাঁতরাতে পারি।'

'কি মজা!' প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল সুনীতা। পরমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল তার চেহারা। 'কিন্তু আমার যে সুইমিং কস্টিউম নেই!'

তাকে রানা জানাল, সুইমিং-বাথের ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া যাবে একটা। তারপর বলল, 'দয়া করে একটু যদি বাইরে অপেক্ষা করো, বেদিং শর্টস পরে নিতে পারতাম।'

হঠাৎ লজ্জা পাওয়া চেহারা নিয়ে এক রকম ছুটেই কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সুনীতা, দরজার কাছ থেকে বলল, 'বেশি দেরি করবেন না, মশাই!'

খানিক পর বেদিং শর্টস, স্যান্ডেল আর বাথ-রোব পরে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। আরও দুই ডেক নিচে সুইমিং-বাথ। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় সাঁতারে নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানাল সুনীতা। ইদানীং ডাইভিঙের ভক্ত হয়ে উঠেছে সে। প্রথম

দিকে অবশ্য স্রেফ লাফ দিত, নাক চেপে ধরে। 'আরে!' সবিস্ময়ে বলল সে, দাঁড়িয়ে আছে সুইমিং হলের দোরগোড়ায়। 'কেউ কোথাও নেই, সব যে একেবারে খাঁ খাঁ করছে!'

ঠিক তাই। কেউ কোথাও নেই।

'ভালই হয়েছে, ইচ্ছেমত যা খুশি করা যাবে!' ছোট্ট খুকীর মত খুশি হয়ে উঠল সে। তার কৌতূহলের কোন পরিসীমা নেই–কোত্থেকে পানি আসে, বেরোয় কোন পথে, হিটিং অ্যাপারেটাস কিভাবে কাজ করে, এক এক করে সব তাকে দেখাতে হলো। আবদার ধরায়, জিমনাস্টিক ইকুইপমেন্টগুলোর ব্যবহার পদ্ধতিও শেখাতে হলো রানাকে। স্প্রিঙ বোর্ডের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওটার নমনীয়তা পরীক্ষা করল সুনীতা। তারপর শাওয়ারগুলো দেখতে চাইল।

সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ সুনীতার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। এদিকে শীত শীত করছে রানার। অবশেষে ওকে বলতে হলো, 'তুমি যদি কিছু মনে না করো, আমি বরং গায়ে কিছু চড়িয়ে আসি।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল সুনীতা, পরমুহূর্তে অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল, তাকিয়ে আছে রানার পিছনে দরজার দিকে। ঘুরল রানা।

সাংবাদিক দু'জন দাঁড়িয়ে রয়েছে, বড় একটা পিস্তল হাতে রানাকে কাভার দিচ্ছে একজন। দেখে মনে হলো, নাইন এম এম। বোধহয় বেরেটা। অপরজন হাত তুলে ইশারা দিল, একটাও কথা না বলে বা রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সুনীতা খান্না–সাহায্য আনতে নয়, এটা পরিষ্কার। চেহারায় রাজ্যের সরলতা নিয়ে সুন্দরী মেয়েটা ওদেরই এক সঙ্গিনী, চমৎকার অভিনেত্রীও বটে।

'এটা তোমরা কি খেলা খেলছ?' কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চোর-পুলিস,' দু'জনের একজন চোস্ত সিংহলী ভাষায় জবাব দিল।

'তোমরা চোর আর আমি পুলিস?' সাথে সাথে মন্তব্য করল রানা, বলার মত আর কিছু ভেবে পেল না। ঘটনার আকস্মিকতায় এখনও বিস্মিত।

সাবধানে শাওয়ার রুমে ঢুকল ওরা, পিস্তলধারী লোকটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা, তারপর হেলান দিল কপাটের গায়ে। ভাব দেখে মনে হলো, দু'জনই জানত ঠিক এই অবস্থাতেই পাওয়া যাবে রানাকে।

'আমার যতদূর মনে পড়ে, পরিচয়ের সময় বলা হয়েছিল তোমরা সাংবাদিক,' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে শান্ত গলায় বলল রানা। 'কলমের বদলে হাতে পিস্তল কেন? শুনেছি তোমাদের হিন্দী ছবিতে এ-ধরনের আজগুবি ব্যাপার ভূরি ভূরি আছে।' হঠাৎ রানার চোখের দৃষ্টি কঠিন হলো। 'পথ ছাড়ো। শীত করছে, কাপড় পরা দরকার, আমাকে কেবিনে ফিরতে হবে।'

'কাপড় যে কেবিনে ছেড়ে এসেছ, আমরা জানি। এইমাত্র সার্চ করে এলাম।'

তারমানে ফাঁদে ভালভাবেই পা দিয়েছে রানা। ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত টোপ ছিল, সুনীতা গোসল করতে চাইলে রানাও তার সাথে পানিতে নামতে চাইবে। কিন্তু মেয়েটা আগে থেকে জানবে কিভাবে যে কেবিনেই কাপড় পাল্টাবে রানা? স্যুট পরে সুইমিং-বাথে ঢুকলে কি ঘটত? উত্তরটা সহজ, সেক্ষেত্রে এরা দু'জন এখানে সার্চ

করত ওকে।

'তাপস গাঙ্গুলী মুখ খুলেছে,' বলল একজন, যার হাত খালি।

'কে?' রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল।

'তাপস গাঙ্গুলী।'

'নামটা আগে কখনও শুনিনি।' সত্যি না-ও হতে পারে, ভাবল রানা। সম্ভবত ওকে দুর্বল করার জন্যে বানিয়ে বলছে।

অলসভঙ্গিতে হাসল লোকটা, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'কাজেই দিল্লী কাফের টেবিল থেকে যে জিনিসটা তুলে এনেছ সেটা তুমি আমাদেরকে ফেরত দেবে। শুধু ওটাই চাই আমরা। তারপর তুমি যেতে পারো।'

'তোমাদের ঔদার্য আর মহত্ত্বকে নমস্কার। কিন্তু মুশকিল হলো, কোন কাফে টেবিল বা কোন জিনিস সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। তোমরা কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'তারমানে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না—বেশ,' হিসহিস করে বলল লোকটা, বস্তাপচা হিন্দী ছায়াছবির ভিলেনের মতই চুটকি বাজিয়ে নির্দেশ দিল, 'তোমার ড্রেসিং গাউন আর শর্টস, দুটোই খোলো।'

জানে তর্ক করা বৃথা, তবু তিক্ত হাসি নিয়ে রানা বলল, 'আমাকে দেখার এত শখ? সুনীতা দেখতে চাইলে না হয় কথা ছিল। একজন আমাকে সার্চ করলেই তো পারো।'

'মালুম হোতা হ্যায়...'

পিস্তলধারীকে থামিয়ে দিয়ে রানার উদ্দেশে গর্জে উঠল অপর লোকটা, 'কথা না শুনলে মেরে তক্তা বানাব। খোলো সব!'

ওর সাথে মাইক্রোফিল্মটা নেই দেখলে লোকগুলো হয়তো অন্য কোথাও খোঁজার জন্যে চলে যাবে। উপায় নেই, সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

'স্যান্ডেল দুটো!'

তাও খুলল রানা। প্রথম লোকটা এখনও পিস্তল হাতে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে, দ্বিতীয় লোকটা রানার প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। হতভম্ব দেখাল, তারপর রাগে লাল হলো সে, হিংস্র চোখে তাকাল রানার দিকে, হিসহিস করে বলল, 'কোমর বাঁকা করে সামনে ঝোঁকো।'

রাগে জ্বলে গেল গা, কিন্তু পিস্তলের মুখে ব্যবসায়ীর আচরণ করল ও—ঝুঁকল, ডেক থেকে তুলে নিল কাপড়গুলো, পরতে শুরু করল। শর্টসের ভেতর মাত্র একটা পা গলিয়েছে, হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ভারতীয় একজনের পায়ে, হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর বুটের আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা দেয়ালের গায়ে, অন্ধকার দেখল চোখে। উল্টো করা পিস্তলের বাড়িটা মাথায় লাগল, তারপর আর কিছু মনে থাকল না ওর।

জ্ঞান ফিরল শাওয়ারের নিচে। রানার পাশে, পানির নাগাল থেকে সামান্য দূরে অপেক্ষা করছে দু'জন।

'তোমাকে দয়া করছি আমরা,' পিস্তলধারী বলল। 'বুঝতেই পারছ, ইচ্ছে

করলে এখানেই তোমাকে আমরা মেরে রেখে যেতে পারি। তাই মারব, তবে এখুনি নয়। তুমিও জানো, আপাতত তোমার বড় ধরনের কোন ক্ষতি আমরা করব না। কিন্তু মনে রেখো, জাহাজ থেকে জাফনায় নামার পর তোমার প্রাণের মূল্য এক রুপীও থাকবে না। সাবধান, মাঝখানের সময়টা তোমার ওপর আমাদের নজর থাকবে।'

কথাগুলো বলেই তাড়াহুড়ো করে চলে গেল লোকগুলো। শাওয়ারের নিচ থেকে সরে এসে দাঁড়াল রানা। গা মুছে শর্টস পরল, পায়ে স্যান্ডেল গলাল, কাঁধে বাথ-রোবটা ফেলে বেরিয়ে এল শাওয়ার রুম থেকে। কেবিনে ফেরার পথে কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করল ও। কর্কশ হুমকি দিয়ে গেল লোকগুলো, হালকা ভাবে দেখার উপায় নেই। আপাতত বলতে আগামী চারদিন, ওর বড় কোন ক্ষতি করা হবে না। কথাটা কতটুকু সত্যি হবার সম্ভবনা?

ভারতীয় জলসীমায় রয়েছে বা আরও ক'টা দিন থাকবে রাজহংস, জাহাজটা বাংলাদেশের, আরোহীরা সবাই সরকারী আমন্ত্রণে ভারত সফর করে ফিরছে—এই পরিস্থিতিতে রানা যদি ভারতীয় হত, কি করত ও? জাহাজ জাফনায় না পৌঁছুনো পর্যন্ত নজর রাখা আর অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার থাকত ওর?

চার চারটে দিন, কাটায় কিভাবে? বিতর্ক ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে বটে, কিন্তু ও-সব রানার ভাল লাগে না। বয়স, মন-মানসিকতা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি মেলে এমন যুবতী পাওয়া গেলে সময় কাটানো কোন সমস্যা নয়। কিন্তু তেমন মেয়ে চাইলেই পাচ্ছে কোথায় সে? ঠিক করল, চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, খুলে যেতে পারে ভাগ্য। সে-ও অন্য এক ধরনের তল্লাশি চালাবে। ফাঁদ পাতবে মেয়ে ধরার।

তিন

শুকনো মাটিতে পা ফেলার আগে কিছু ঘটবে না, এটা ধরে নিয়ে ভুল করেছে রানা।

বাম দিকে ভারতকে রেখে আরব সাগর ধরে এগোল রাজহংস। যাত্রা শুরুর পর প্রথম ভোরে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে অল্প সময়ের জন্যে ভিড়ল জাহাজ, গভীর রাতে ভিড়ল কর্ণাটকের কামটায়। আরোহীদের নামার অনুমতি দেয়া হয়নি, তবে দুই রাজ্য থেকেই শিল্পী আর পণ্ডিতদের একটা করে দল উঠল জাহাজে, গায়ে এসে ঠেকল হকারদের কিছু নৌকো। শেষবার কেরালার কোচিনে নোঙর ফেলেছে জাহাজ, রসদ আর জ্বালানি সংগ্রহ করা হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে কাল দুপুর নাগাদ জাফনায় পৌঁছে যাবে ওরা।

ফিরতি পথে দিল্লী আর বোম্বে সহ অন্যান্য শহর থেকেও বেশ কিছু ভারতীয় স্টাডি গ্রুপ ওদের সাথে চলেছে, জাফনা পর্যন্ত যাবে। ডাক্তার আর সার্জেনদের গ্রুপটা ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জ প্রায় দখল করে রেখেছে, ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও হাসপাতাল

সম্পর্কে ট্যুরিস্টদের মূল্যবান মতামত সংগ্রহে ব্যস্ত। শিক্ষকদের আলোচ্য বিষয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। সব মিলিয়ে প্রায় গোটা বারো গ্রুপ, কোন হল বা লাউঞ্জ কখনোই খালি থাকে না। গুরুগম্ভীর আলোচনা সভার মাঝে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে গান, নাচ বা কৌতুকাভিনয়ের আসর। যারা সিরিয়াস টাইপের, অক্লান্তভাবে তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করছে—বার, করিডর, খোলা ডেক, এমনকি সুইমিং-বাথেও দেখা যাবে এদেরকে। পক্ষ, বিপক্ষ আর নিরপেক্ষ, এই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ট্যুরিস্টরা। একদল, সংখ্যায় তারাই ভারী, ভারতের বড়ভাইসুলভ আচরণে ক্ষুব্ধ, তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দ্বিধা করছে না। আরেক দল ভারতের প্রতিটি আচরণ সমর্থন করে যাচ্ছে। শেষ অর্থাৎ নিরপেক্ষ দলের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে কম, অপর দুই দলের তীব্র সমালোচনার শিকার হলো তারা। শেষদলে ঠাঁই পেয়ে গর্ববোধ করল রানা। একজন পাকিস্তানী ওকে জিজ্ঞেস করল, 'ভারতীয় নারীদের পজিশন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' উত্তরে রানা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আরে, আপনি জানলেন কিভাবে আমি ভারতীয় নারী সম্পর্কে উৎসাহী, পাকিস্তানী নারী সম্পর্কে নই? আপনারা তো ওদেরকে বোরখা আর চার দেয়ালের ভেতর আটকে রাখার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন, তাই না?' মাথায় জিন্না টুপি আর শেরওয়ানি পরা পাকিস্তানী যুবক লাল চেহারা নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ল।

ওর জবাবটা শুনতে পেয়ে সহাস্যে এগিয়ে এল একজন ভারতীয় কংগ্রেস কর্মী। 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে এ-ব্যাপারে একমত হবেন যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ভারতে নেই। আমরা ধর্ম-নিরপেক্ষ, নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী...'

'আচ্ছা,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'হিসেবটা ঠিক কিনা বলতে পারেন? স্বাধীনতার পর ভারতে পাঁচ, নাকি ছ'হাজার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে?'

পাকিস্তানীর মত, গান্ধীটুপি পরা ভারতীয় যুবকও পালাতে দিশে পেল না।

সামনে যে রাত আসছে, আরব সাগরে ওটাই শেষ রাত ওদের, ট্যুরিস্টরা সবাই যে যার রুচি আর পছন্দ অনুসারে বিচিত্র পোশাক পরে বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দেবে, তবে এ-ব্যাপারে কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই।

সমুদ্রভ্রমণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলে রানা খুশি। বোম্বে ছাড়ার পর থেকে সময়টা বড় একঘেয়ে কাটছে। টেবিল-টেনিস বা দাবা কত আর খেলা যায়।

সুন্দরীদের অভাব নেই জাহাজে। ফাঁদ পাততে হয়নি, তাদের অনেকে উপযাচক হয়ে ওর সাথে ভাব জমাতেও চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবচেতন মন অতিমাত্রায় সতর্ক থাকায় তাদের সাথে ঠিক ব্যবহারটি করতে ব্যর্থ হয়েছে রানা, ফলে লাভ নেই জেনে ফিরে গেছে ওরা। একটু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে রানা, ফাঁদে ফেলার জন্যে আবার কোন সুন্দরী মেয়েকে পাঠাতে পারে বিজনেস সিন্ডিকেট, এই ভয়টা গেঁথে গেছে ওর মনে।

একসময় ওর মনে হয়েছে, নিরাপদ মেয়ে বলতে একজনই আছে জাহাজে, সে হলো সুবর্ণা পোখরেল। বোম্বে থেকে রওনা হবার পর, কিংবা দিল্লী থেকে বোম্বে আসার পথে ট্রেনে, মেয়েটার সাথে বহুবার দেখা হয়েছে ওর। কখনও একা, কখনও

সাথে এক যুবক ছিল। ওর ওপর ভীষণ খেপে আছে মেয়েটা। দেখা হলেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, প্রায় সবেগে। সরল মেয়েটা মনে দুঃখ পেয়েছে বুঝতে পেরে খারাপ লেগেছে রানার। আবার এ-ও লক্ষ করেছে, ও যখন সরাসরি তাকিয়ে নেই, ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সুবর্ণা, চোখাচাখি হলেই ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লক্ষণ অত্যন্ত খারাপ, কাজেই তাকেও রানা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। একেবারেই ছেলেমানুষ মেয়েটা, আরও আঘাত তার সইবে না।

৩ তবে এ-যাত্রায় ওর কপাল যে একেবারেই মন্দ তা-ও নয়। আশ্চর্য এক সপ্রতিভ, প্রাণ চঞ্চলা হরিণীর সন্ধান পেয়েছে ও, প্রথম দর্শনেই যাকে রহস্যময়ী বলে মনে হয়েছে ওর। প্রতি মুহূর্তে আট থেকে দশজন প্রৌঢ় তাকে ঘিরে থাকে। প্রথমে রানা মেয়েটার চুলের প্রশংসা শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল–দুই পাকিস্তানী তর্ক করছিল, একজনের ধারণা ওগুলো পরচুলা। বাজিতে হেরে যায় সে, জানা গেল হাঁটুর পিছন পর্যন্ত লম্বা ওগুলো নকল নয়, আসল জিনিস। তখনও রানা মেয়েটার মুখ দেখেনি, প্রৌঢ়দের সাথে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল সে, ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জে। সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা, ভরাট দেহসৌষ্ঠব, অথচ মেদ নেই। তারপর আয়নায় তার চোখ আর নাক, ভুরু আর চিবুক, দাঁত আর ঠোঁট দেখতে পেল রানা, একদৃষ্টে ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। চোখাচোখি হতেও দৃষ্টি সরাল না, বরং কয়েক সেকেন্ড পর ঘাড় ফেরাল ওর দিকে, সরাসরি তাকাল। মুখের ত্বক পাকা ডালিমের মত রাঙা, এত মসৃণ আর নিভাঁজ যে চোখ ফেরাতে পারল না রানা। নিজের অজান্তেই ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে তার অস্তিত্ব আর উপস্থিতির প্রতি সম্মান জানাল। মিষ্টি করে ক্ষীণ একটু হাসল মেয়েটা, যেন কতকালের পরিচয়। রানার মাথা নোয়ানোর উত্তরে মাখনরঙা লম্বা হাতটা সামান্য একটু দোলাল সে, ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, 'হাই!'

প্রথম পরিচয়ের পর আরও পাঁচ-সাতবার দেখা হয়েছে ওদের। কখনও পরস্পরের চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে হেসেছে ওরা। কখনও হাঁটার গতি এক সেকেন্ডের জন্যে শ্লথ করে হাত নেড়েছে। কখনও, 'ভালো?' জিজ্ঞেস করে চলে গেছে যে যার পথে। ইতোমধ্যে মেয়েটা সম্পর্কে রানার গবেষণা অনেকদূর এগিয়েছে। অদ্ভুত এক ব্যাপার, দিনে পাঁচ-সাতবার পোশাক পাল্টায় সে, কিন্তু প্রতিটি পোশাক তার কালো। শাড়ি, ট্রাউজার, ম্যাক্সি, সালোয়ার-কামিজ, সবই সে পরে, কিন্তু কালো ছাড়া অন্য কিছু নয়। হরিণীর মতই চঞ্চল, প্রৌঢ়দের দলটাকে নিয়ে গোটা জাহাজ সারাক্ষণ চষে বেড়াচ্ছে, তার পিছনে থাকার জন্যে লোকগুলোকে রীতিমত হাঁপাতে দেখেছে রানা। মেয়েটার চেহারায় ঠিক সারল্য বা বোকা বোকা কোন ভাব নেই, আছে আন্তরিকতার ছোঁয়া। সরাসরি তাকায়, স্পষ্ট করে কথা বলে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঋজু–এ সব দেখে রানার মনে হয়েছে মনে পাপ বা কলুষ না থাকলেই শুধু কোন মেয়ে এত সৌন্দর্য নিয়ে এমন মুক্তবিহঙ্গের মত চলাফেরা করতে পারে।

মুশকিল হলো, তাকে কখনও একা পাবার উপায় নেই। ভাব দেখে মনে হয়, প্রৌঢ় লোকগুলো তার ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দিতে চায় না। তাদের মধ্যে

ভূতের মত কালো এক লোক আছে, মুখ আর দাঁত যথাক্রমে হনুমান আর ড্রাকুলার মত। দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায় রানার।

ডিনারের পর বিচিত্রানুষ্ঠানে না ফিরে খোলা ডেকে বেরিয়ে এল ও, পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা বসেছে, বাতাসে সমুদ্রের লোনা গন্ধ। যে-জন্যে নির্জনতার খোঁজ করা, সেটা নাগালের বাইরেই থেকে গেল, আগের মতই টান টান হয়ে থাকল রানার স্নায়ু। কারণ আর কিছুই নয়, ইন্দ্রিয়গুলো বিপদের আশঙ্কা করছে। জাহাজ বোম্বে ছাড়ার সময় থেকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। কথাটা ওকে বলার পর আন্দাজ করে নিয়েছে তা নয়, শত্রুপক্ষের অস্তিত্ব আর দৃষ্টি অনুভব করতে পারছে ও।

তামার মাথা থেকে রাতেই মাইক্রোফিল্মটা বের করা দরকার; তারমানে আজই, কারণ এটাই জাহাজে ওদের শেষ রাত। ট্যুরিস্টদের জাফনায় নামিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে চলে যাবে রাজহংস। বিচিত্রানুষ্ঠান শেষে সবাই যখন যার যার কেবিনে ঘুমিয়ে পড়বে, জিনিসটা বের করার জন্যে সেটাই আদর্শ সময়। কিন্তু তার আগে ওকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে কারা ওর ওপর নজর রাখছে।

নিজেকে হালকা টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবল রানা। ডেকের পুরোটা দৈর্ঘ্য হেঁটে এল ধীর পায়ে, স্টার্নের শেষ মাথা পর্যন্ত। এদিকে এঞ্জিনের আওয়াজ বেশি, লোকজন কম। গায়ে কোট বা চাদর জড়িয়ে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে দু'একজন। রানাও বসল, সাবধানে তাকাল চারদিকে। ওর ডান দিকে ট্যুরিস্টদের জন্যে বার, প্রায় খালিই বলা যায়। ওর পিছনে আরোহীরা জাহাজের একদিক থেকে আরেক দিকে আসা-যাওয়া করছে। বাম দিকে, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে কয়েকটা ছায়ামূর্তি, তারা ও অন্যান্য জাহাজের আলোর খেলা দেখছে পিছনে ফেলে আসা পানিতে। কিন্তু সবাই নয়, অন্তত একজন তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে।

রানা অনুভব করল, লোকটা একা নয়, তার সাথে আরও কেউ আছে। শেষ কয়েক ঘণ্টা ওর ওপর নজর রাখার জন্যে একাধিক চর থাকার কথা, ওর প্রতিটি নড়াচড়া খুঁটিয়ে লক্ষ করতে চাইবে তারা–কখন চেয়ারের হাতল স্পর্শ করে ও, কখন একটা দিয়াশলাই তুলে নেয়, কারও সাথে করমর্দন করে কিনা। তারা জানে, এ-ধরনের কোন মুহূর্তেই রানার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে মাইক্রোফিল্মটা।

কয়েকজনের মধ্যে একজন তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কে সে বুঝতে পারছে না রানা, ওদিকটা বড় বেশি অন্ধকার।

সাড়ে ন'টার দিকে উঠল রানা, পোর্ট সাইডের পুরোটা দৈর্ঘ্য হেঁটে এল। ফার্স্ট ক্লাস বার-এর পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে, স্বপ্নকন্যার ওপর চোখ পড়ে গেল। সুবেশী প্রৌঢ়দের দলটা এখনও তাকে ঘেরাও করে রেখেছে। তাদের একজনকে বলতে শুনল রানা, 'যখন স্বীকার করেছি অভ্যেস আছে, খেতে আমার কোন আপত্তি নেই–আমার ধারণা পুরুষদের কারুরই কোন আপত্তি নেই, কিন্তু একজনকে বাদ দিয়ে অসম্ভব। যা করব সবাই একসাথে করব, তা না হলে করব না।'

'আপনার একতা বোধ প্রশংসার যোগ্য,' বলল মক্ষীরানী। 'কিন্তু মদ্যপানে

আমি অনভ্যস্ত না হলেও, সবার সাথে খেতে অভ্যস্ত নই। কাজেই আমাকে মাফ করতে হবে।'

লোকটার ওজন হবে কম করেও আড়াই মন, মাথায় চকচকে টাক, সেই টাকের ওপর দিয়ে তাকিয়ে মেয়েটার উদ্দেশে হাসল রানা। 'কি, বিচিত্র কিছু পরেননি যে?'

মুখভঙ্গিতে ক্লান্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে মেয়েটা বলল, 'শক্তি ফুরিয়ে গেছে।'

'দু'এক ঢোক হুইস্কি আবার আপনাকে চাঙা করে তুলতে পারে।'

মাথা নাড়তে শুরু করেও কি মনে করে নাড়ল না মেয়েটা। এই প্রথম তার মধ্যে ইতস্তত একটা ভাব দেখল রানা।

'কিংবা তাজা মুক্ত বাতাসেও কাজ হতে পারে,' পরামর্শ দিল ও।

মেঘ কেটে গিয়ে হঠাৎ যেন হেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ, মুহূর্তের মধ্যে সেটা ধরা পড়ে গেল হনুমান বা ড্রাকুলার চোখে। কটমট করে রানার দিকে তাকাল সে।

তাকে অগ্রাহ্য করে প্রৌঢ়দের তৈরি পাঁচিলের বাইরে, কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। 'আমাকে যদি দরকার হয়, আমি আছি।' একটা বিয়ার নিয়ে খেলো ও, সিগারেট ফুঁকল, তারপর কেবিনে ফিরে এল জ্যাকেট পরার জন্যে। আধঘণ্টা পর একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা খেলো সুবর্ণা পোখরেলের সাথে।

দিল্লীর সেই ঘটনার পর পরস্পরের সাথে কথা বলেনি ওরা, এত কাছাকাছিও আসেনি। চশমা পরা এক অল্পবয়েসী যুবকের সাথে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে রানা, অনর্গল বাক্য উদ্‌গীরণ করা ছেলেটার অত্যন্ত প্রিয় একটা স্বভাব।

'ওহ্! আপনি, মি. সিংহে!'

'কেমন আছ তুমি, সুবর্ণা?' সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আ-আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম!' ফিসফিস করে বলল সুবর্ণা পোখরেল। চট করে সিঁড়ির ওপর আর নিচেটা একবার দেখে নিল।

'কেন? কি ব্যাপার বলো তো?'

'আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো না।'

'অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটেছে।'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল রানা। দিল্লীতে ওর কামরা থেকে সুবর্ণাকে বেরুতে দেখেছে কেউ? মাইক্রোফিল্মের সাথে তাকে জড়িত বলে ভাবছে শত্রুপক্ষ?

'আমার কেবিন সার্চ করা হয়েছে।'

যতটুকু অবাক হলো তারচেয়ে বেশি ভান করল রানা। 'কি? কিন্তু কারা? চুরি গেছে কিছু?'

'না, সেটাই তো অদ্ভুত লাগছে।'

'কি করে বুঝলে তোমার কেবিন সার্চ করা হয়েছে?'

'বাহ্! সুটকেসের সমস্ত জিনিস-পত্র ঘেঁটে এলোমেলো করে রেখে গেছে, বুঝব না! বোম্বে ছাড়ার পর সন্ধ্যার দিকে প্রথমবার ধরতে পারি আমি। দুপুরে আমি যখন ডেকে ছিলাম তখনই কেউ...'

'তারমানে একবার নয়?'

'না। দ্বিতীয়বার পরদিন সকালে, সুইমিং-বাথে সাঁতার কাটতে যাবার পর। শ্যাম্পু নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা নিতে এসে দেখি কেবিনে একজন স্টুয়ার্ড রয়েছে। আগের রাতে যে কাপড়গুলো পরে ছিলাম, সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে বিছানার ওপর।'

'তাকে তুমি চেনো?'

'না। আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'সে কি সাদা জ্যাকেট পরে ছিল?'

'হ্যাঁ, আর সবার মত।'

'কিছু বলোনি তুমি?'

'আমি কিছু বলার আগে সে-ই বলল, মাফ করবেন, ম্যাডাম। বলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম, কিছু করার কথা ভাবিনি। আমাকে যেটা অবাক করেছে, লোকটা সিংহলী ভাষায় কথা বলল। জানল কিভাবে ভাষাটা আমিও জানি?'

'তুমি জানো?'

'একটু একটু—মানে, শিখছি।' চোখ নামাল সুবর্ণা পোখরেল। 'আমার নতুন বন্ধুটিকে দেখেননি? শ্রীলংকার নামকরা ক্রিকেটার, জাতীয় দলে খেলে—ও-ই তো আমাকে শেখাচ্ছে।'

'বাংলাদেশী জাহাজে সিংহলী ভাষা জানা স্টুয়ার্ড, আশ্চর্যই বটে। তবে, এ হতেই পারে, তাই না?' সুবর্ণাকে শান্ত করার চেষ্টা করল রানা। 'লোকটা দেখতে কেমন? চেহারাটা মনে করতে পারো?'

'বিপদে ফেললেন। আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কিনা, তাছাড়া এক নিমিষে চলে গেল, চেহারা ভুলে গেছি। তবে, খুব একটা লম্বা নয়। শ্যামলাই হবে। চুলগুলো...ভুলও হতে পারে আমার...একটু কি খাড়া খাড়া...!'

'ঘটনাটা কাউকে জানিয়েছ? পারসার বা তোমার মা-বাবাকে?'

'না, এখনও কাউকে বলিনি। বলা উচিত, তাই না?'

'তুমি যা ভাল মনে করো। কিছু যখন চুরি হয়নি...লোকটাকে পরে আর দেখোনি?'

'না।'

'আমার কি ধারণা, শুনবে? আর কিছু না, লোকটাকে স্রেফ কৌতূহল পেয়ে বসেছিল। সে বোধহয় এই প্রথম ভয়েজে বেরিয়েছে, হয়তো বিদেশী মেয়েরা কি পরে জানার খুব শখ...'

অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে উঠল সুবর্ণা পোখরেলের চোখ দুটো, পরমুহূর্তে লালচে আভা ফুটল তার মুখে। 'ছি! কি জঘন্য লোক রে বাবা!'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' একমত হলো রানা। 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। নিশ্চয়ই গুরুজনদের লুকিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান থেকে পালিয়ে এসেছ?'

সুবর্ণাকে পৌঁছে দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস বার-এ ফিরে এল রানা, কিন্তু সেখানে

স্বপ্নকন্যাকে না দেখে চলে এল পারসার অফিসের সামনে লম্বা হলের উল্টোদিকে, ঢুকল রেস্তোরাঁয়। 'কফি, প্লীজ!'

এক কি দু'বার চুমুক দিয়েছে কাপে, এই সময় এক মেয়ে এসে ঢুকল ভেতরে, পরনে স্টুয়ার্ডেস-এর ইউনিফর্ম, তবে কালো ভেলভেটের একটা মুখোশে মুখ আড়াল করা। কোন সন্দেহ নেই, রাজহংসের কোন মহিলা স্টাফের কাছ থেকে ইউনিফর্মটা ধার করা হয়েছে। ভ্রমণের আজকের এই শেষ রাতে অনেকেই অনেক অদ্ভুত পোশাক পরেছে। রানার সামনের চেয়ারটায় বসল সে, কফির অর্ডার দিল।

'চৌকিদাররা ঘুমোয় বলে তো শুনিনি!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা।

'আই বেগ ইওর পার্ডন!' পুরুষালি কণ্ঠস্বর নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

'তারা বোধহয় এখনও আপনাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু আমি আপনাকে ঠিকই চিনে ফেলেছি–মাথা উঁচু করে হাঁটার ভঙ্গি দেখে আর সেন্টের গন্ধ পেয়ে।'

হেসে উঠল স্বপ্নকন্যা। 'হতাশ হলাম! এত খাটাখাটনি সব জলে গেল।'

'একা এসেছেন সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'আর আপনি আমাকে একা পাবার প্রত্যাশা করেছেন, সেজন্যে আপনাকেও ধন্যবাদ। আমিও চাইছিলাম...'

'কেন বলুন তো?' আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'কেন চাইছিলেন? আগে আপনারটা শুনি, দেখা যাক একই কারণে দু'জনকে আমরা একা পেতে চাইছি কিনা।'

'জানি স্পষ্ট করে বললে আপনি অন্য কোন অর্থ করবেন না, তাই বলছি–আপনাকে আমার এত ভাল লেগে গেছে যে নিরিবিলিতে গল্প করার সুযোগ পেলে সত্যি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

মনের আনন্দ আর বিস্ময় চেপে রেখে মৃদু হাসল রানা। 'নিরিবিলি জায়গা পাওয়া খুব কি সহজ? যদি বা পাওয়া যায়, কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।'

'কেন, আপনি যদি আমার কেবিনে যান? কিংবা আমি যদি আপনার কেবিনে?'

'নিন্দা বা কলঙ্কের ভয় নেই আপনার?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা। 'সমাজকে ভয় পান না?'

'কে কি বলল, ও-সব আমি গায়ে মাখি না। যার সাথে চারদেয়ালের ভেতর বা নির্জন কোথাও সময়টা কাটাব সে যদি রুচিবান ভদ্রলোক হয়, কিছু হারাবার নেই আমার। আমিও তো সমাজের একটা অংশ, অভূতপূর্ব কিছু একটা করে আমি যদি কোন নির্মল দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারি, সমাজ সেটাকে অনুমোদন দিয়ে রীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না?' অধীর আগ্রহে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটা। 'অন্তত পারা উচিত নয়?'

'উচিত,' সমর্থন করল রানা। 'বলবেন কি, কি দেখলেন আমার মধ্যে যে এত ভাল লেগে গেল? আমার সম্পর্কে আপনি তো প্রায় কিছুই জানেন না।'

'সত্যি জানি না, এমনকি আপনার নামটা পর্যন্ত না। আর, ভাল লাগল কেন?' একটু হাসল মেয়েটা। 'কোন জিনিস বা কাউকে কেন মানুষের ভাল লাগে? এর কি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে? আপনি সুন্দর, সেটা একটা কারণ হতে

পারে। সুন্দর অর্থে আমি আপনার শারীরিক সৌন্দর্যের কথা বলছি না–বলছি আপনার পোজ, হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গি, কথা বলার আর তাকানোর ধরন, শব্দ নির্বাচন, সমস্ত কিছুর কথা। এ-সবের সাথে ছোটখাট আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন, আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে। কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে আছেন। তাছাড়া, পাঁচ-সাত বছরে এক আধবার হঠাৎ কাউকে দেখলে মনে হয় না, এই লোকের সাথে আমার মিল আছে? অথচ মিলটা খুঁজতে যাওয়া বোকামি। মনে হয়, এই লোক আমাকে বুঝবে। আপনাকে দেখে ঠিক তাই মনে হয়েছে আমার।'

'তারমানে আপনি শ্রোতা হিসেবে পেতে চান আমাকে।'

'বলতে চাই, শুনতেও চাই–আমি আসলে আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। হোক না মাত্র একদিনের জন্যে, শুধু একরাতের জন্যে, পরস্পরের মুখোমুখি বসে রাতটা কোথাও আমরা কাটিয়ে দিতে পারি না, শুধু গল্প করে? আর হয়তো জীবনে কখনও আপনার সাথে আমার দেখা হবে না, কিন্তু স্মৃতিটুকু তো থাকবে? মাঝে মধ্যে আপনার কথা মনে পড়ে যাবে আমার, জানব, দুনিয়ায় একজন অন্তত আছে যাকে আমি আমার সব কথা বলতে পেরেছিলাম, যে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছিল···হয় না, এমন হতে পারে না?' উত্তেজনায় রানার কব্জি চেপে ধরল মেয়েটা।

'তাহলে বলি, ঠিক এই কথাগুলোই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছি, কিন্তু সুযোগের অভাবে বলা হয়নি। ভাল কথা, আমি অরবিদ সিংহে–সিংহলী ব্যবসায়ী।'

'আমি কাহার।'

'শুধু কাহার?'

'জেসমিন কাহার।'

এক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'জেসমিন নামে আমার কোন বন্ধু নেই।'

'এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ!'

হেসে উঠল রানা। 'দুঃখিত।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আপনার কেবিনে,' বলল জেসমিন। 'কিংবা আমারটায়। যেখানে খুশি।'

করিডরে অনেক না হলেও, মাঝে মধ্যেই দু'চারজন লোককে দেখা গেল। এদের মধ্যে কারা ওর ওপর নজর রাখছে?

বাঁক নিয়ে একটা নির্জন করিডরে চলে এল ওরা, একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জেসমিন বলল, 'এটা আমার।'

হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলল সে। চারদিকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে জেসমিনের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রানা। আশা করা যায়, কেউ ওদেরকে ঢুকতে দেখেনি।

'আরাম করে বসুন–কারণ ধরে যখন আনতে পেরেছি, সহজে আপনাকে আমি ছাড়ছি না।' ভেলভেটের মুখোশ খুলে একটা চেয়ারের দিকে ছুঁড়ে দিল জেসমিন। 'বুকে বালিশ দিয়ে ইচ্ছে করলে বিছানাতেও কাত হতে পারেন, তবে আমার দিকে মুখ করে।' স্টুয়ার্ডেস-এর ইউনিফর্মটা খুলে ফেলল, ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল কালো সালোয়ার কামিজ। 'গুছিয়ে বসার আগে বলুন দেখি, কি খাবেন?'

'কি আর খাব!' কৃত্রিম অভিযোগের সুর রানার কণ্ঠে। 'বলেই তো দিয়েছেন, অনভ্যাস না থাকলেও, সবার সাথে খেতে আপনি অভ্যস্ত নন।'

'কথাটা সত্যি। আপনি ছাড়া, আরও একজন বন্ধু আছে আমার, আজ পর্যন্ত শুধু তার সাথেই দু'এক চুমুক খেয়েছি। আপনার সাথে খাব কিনা...দুঃখিত, ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তাই বলে এ-কথা ভাববেন না, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না বা অন্য কিছু। একজন মানুষের যত রকম অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, এমনকি মানুষ খুন পর্যন্ত, তা-ও আমার আছে।'

'কি বললেন!' বিছানায় বসতে গিয়েও বসল না রানা।

'দূরদর্শনের নিয়মিত দর্শকরা ব্যাপারটা জানে। দিল্লীতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্যে লোকটাকে খুন না করে আমার কিছু করার ছিল না।'

'রেপ, তাই না?' বিছানার কিনারায় বসল রানা।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জেসমিন। তারপর বলল, 'জানেন, দেখে হয়তো মনে হয়নি, কিন্তু কথাটা সত্যি–প্রতিটি কাজের মুহূর্তেও চারপাশে শুধু আপনাকে খুঁজেছি আমি।'

'তারমানে আপনি একটা স্পাই।'

হেসে উঠল জেসমিন। 'প্রায় ঠিক ধরেছেন। জাতীয় একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিভা খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। রাজহংসে আমারদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, সার্ক দেশগুলোর কোন প্রতিভা যদি খুঁজে পাই, বৃত্তি নিয়ে ভারতে দু'বছর কাটানোর প্রস্তাব দেয়া।'

'পেয়েছেন দু'একটা?'

'তিনজনকে বাছাই করেছি আমরা, পেয়েছি অনেক,' বলল জেসমিন। 'শুনে আশ্চর্য হবেন, তিনজনই তারা বাংলাদেশী। নাচ, অভিনয় আর উচ্চাঙ্গ সংগীত–তিনটে প্রতিভা।' ফ্রিজ থেকে কোকাকোলা আর স্ট্র বের করল সে।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখতে হলো রানাকে। ছোট্ট করে বলল, 'আচ্ছা।'

'বলুন তো, ওদের সাথে আমাকে দেখে কি মনে হয়েছে আপনার?' রানার হাতে একটা কোকাকোলা ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল জেসমিন, বিছানার দিকে মুখ করে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসল।

'মনে হয়েছে, আপনি স্বামী শিকারে বেরিয়েছেন,' কৌতুক করল রানা। 'স্বাধীনচেতা মেয়েরা নাকি বয়স্ক স্বামী পছন্দ করে।'

খিল খিল করে হেসে উঠল জেসমিন। তারপর বলল, 'এক সময় ওঁরা সবাই আমার স্যার ছিলেন ভার্সিটিতে। এখন ওঁদের সাথে আমিও পড়াই। কাউকে স্যার বলি না, সবাইকে সহকর্মী বলে মনে করি। না, অরবিন্দ, আমি স্বামী খুঁজছি না।'

'কেন, বিয়ে করার ইচ্ছে নেই নাকি?'

একটু চিন্তা করে জবাব দিল জেসমিন, 'কিছু কিছু ব্যাপার থাকে, বন্ধুত্বের খাতিরে উহ্য রাখতে হয়। বিয়ে প্রসঙ্গে কোন কথা যদি না বলতে চাই, আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লীজ।'

একটা অপরাধবোধ রানাকেও পীড়ন করছে। 'আমারও কিছু ব্যাপার আছে, যা কাউকে বলা যায় না। সে-ও ওই বন্ধুত্বের খাতিরে। গোপন করার কিছু আছে, কথাটা বলে হালকা হতে চাইছি, বুঝতে পারছেন তো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জেসমিন।

'বললেন, আরেকজন বন্ধু আছে। যদি জিজ্ঞেস করি...'

হঠাৎ ঝুঁকে রানার মুখে হাতচাপা দিল জেসমিন। 'তার কথাও থাক।'

জেসমিনের হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'আমি কিছু মনে করছি না।'

'আগে আমি শুরু করি, কেমন? বিশ্বাস করবেন, আমি এতিমখানায় মানুষ হয়েছি...?'

না, নীরস বিবৃতি বা করুণ জীবনকাহিনী নয়। নিজের জীবনের টুকরো টুকরো কিছু ঘটনার বর্ণনা দিল জেসমিন, সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল জ্ঞানতাপসী ও কোমলহৃদয়া এক মানব হিতৈষিণী, কৈশোরেই যার বোধোদয় ঘটে যে প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরতুল্য, তার সেবা করার মধ্যেই জীবনের পরম সার্থকতা নিহিত, সেই সাথে এই উপলব্ধিও হয় যে অবহেলিত বা নির্যাতিত মানুষকে সুখী করতে হলে প্রথমে তার নিজেকে সুখী হতে হবে। অল্পে সন্তুষ্ট হলেও, জীবনের কাছ থেকে পেয়েছে সে অঢেল, সেটাই নাকি তার ঠোঁটে লেগে থাকা সার্বক্ষণিক হাসিটির গোপন রহস্য।

এক সময় রানা মন্তব্য করল,'জ্ঞান আর মানবসেবা, এই দুটো জিনিসের সাথে সুখ বা হাসি আগে কখনও এক হতে দেখিনি। আপনি একটা ব্যতিক্রম।'

এরপর রানার পালা। ইতোমধ্যে একবার কফি বানিয়েছে জেসমিন, রানাকে সিগারেট ধরাবার অনুমতি দিয়েছে। বিছানাতেই বসেছে রানা, কাত হয়ে আছে বগলের নিচে বালিশ দিয়ে। ওর কথা হলো, জীবনকে প্রচণ্ড ভালবাসে ও। সাধ্য সীমিত হলেও দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য দেখার সাধ থাকায়, বাস্তবতা আর কল্পনার সাথে গুরুতর অমিল লক্ষ করে মাঝে মধ্যে ভয়ানক খেপে যায়। স্বীকার করল, ভোগী পুরুষ সে, তবে সামান্য একটা ফুলকে বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করার দৃষ্টান্তও তার দ্বারা স্থাপিত হয়েছে।

কথাগুলো এমনভাবে বলা হলো, আত্মগরিমার কোন গন্ধ তাতে থাকল না। দেখা গেল দু'জনেই ওরা কয়েকটা বিষয়ে একমত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের আবির্ভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মানুষ অমৃতের সন্তান, তার কোন পাপ নেই; সুখী হতে চাওয়ার মধ্যে নেই কোন স্বার্থপরতা, নারী দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলে পুরুষশাসিত সমাজ তাতে উপকৃত হবে, অনন্ত সম্ভাবনাময় মানবসভ্যতার কল্যাণে প্রতিটি ব্যক্তিরই অবদান রাখার দায়িত্ব রয়েছে।

জেসমিন দ্বিতীয়বার কফি বানিয়ে আনার পর কাপে চুমুক দিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল রানা।

'কি হলো? কফিতে বিষ মিশিয়ে দিইনি তো?'

'সেরকম ইচ্ছে কি জেগেছে মনে?'

'অনেক দামী দামী কথা বললাম, কিন্তু তারপরও অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত

হতে পারি কই!' খেদ প্রকাশ পেল জেসমিনের বলার সুরে। 'অত্যন্ত ভাল লেগে যায় এমন কোন জিনিস, জানি পাব না, তবু পেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে জোর করে পাই, ছিনিয়ে নিই; তাও যদি না পারি, তখন সেটাকে ধ্বংস করে দেয়ার একটা তাড়না অনুভব করি। এই প্রবণতাটা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করি বলে নিজেকে নিয়ে আমার ভারি ভয়।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। তারপর অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেল রানা, 'আঁতকে উঠলাম; কারণ ভোর হয়ে এসেছে।' আবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও। 'এবার তো যেতে হয়।'

কেউ ওরা অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলল না, ঠাণ্ডা হয়ে গেল কফি। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল জেসমিন। বিছানার ওপর সিধে হয়ে বসল রানা, দু'জন একসাথে উঠে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, যেতে তো তোমাকে দিতেই হবে। আরেকটু থাকা যায় না?' অপলক চোখে তাকাল জেসমিন।

'আমি চাই না কেউ দেখুক তোমার কেবিন থেকে বেরুচ্ছি। এরপর সবার ঘুম ভাঙবে, এখনই সময়।'

রানার একটা হাত ধরল জেসমিন। 'আর কি আমাদের দেখা হতে পারে না?'

'হতে হয়তো পারে, কিন্তু দেখা হওয়াটা কি উচিত হবে?'

'ভাবছ, আমি দুর্বল হয়ে পড়ব?' নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জেসমিন। 'যদি হইও, নিজেকে আমি সামলে রাখতে জানি, অরবিদ। ভয় নেই, আমি তোমাকে গ্রাস করতে চাইব না। কারণ, তোমাকে তো বলেইছি, আরও একজন বন্ধু আছে আমার–তার কাছ থেকে আমি অঢেল পাই।'

'তুমি না বলেছিলে, স্বামী আর সেই বন্ধুর কথা আলোচনা করতে চাও না?'

'বলেছিলাম। তখন এতটা চেনা হয়নি তোমাকে। এখন বুঝতে পারছি, তোমাকে চিনতে ভুল করিনি আমি। সব কথা তোমাকে বলা যায়, তুমি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়বে সে ভয় না করেই।'

আবার হাতঘড়ি দেখল রানা।

অস্থির হয়ে উঠে জেসমিন বলল, 'আরেকটু থাকো, প্লীজ। আবার কবে দেখা হয়, কিংবা হয় কিনা। অরবিদ, তুমি জানো, তোমার চোখ দুটোয় অসম্ভব মায়া? ওই চোখে কি যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি।' ফিসফিস করে কথা বলছে সে, 'দেখো, আমি কত শক্ত মেয়ে–তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, কত রকম লোভ জাগছে অপরাধ করার, কিন্তু জানি নিজেকে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সামলে রাখতে পারব।'

'নিজের সম্পর্কে অতটা জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলে খুশি হতাম,' ক্ষীণ হেসে বলল রানা। 'আমাকে ভুল বুঝো না, জেসমিন–আমি দেবতা নই।'

'এমন অকপটে স্বীকার করায় আমার কাছে আরও লোভনীয় হয়ে উঠছ তুমি,' বিড়বিড় করে বলল জেসমিন, হঠাৎ হাত তুলে রানার চিবুক স্পর্শ করল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে পিছন ফিরে। 'যাও, বন্ধু। বিদায়। শেষ একটা কথা–আমি বিবাহিতা। আমার স্বামীই আমার সেই বন্ধু। বঞ্চনার কোন অনুভূতি যদি তোমার

ভেতর থেকে থাকে, আশা করি এ-কথা জানার পর আমাকে তুমি ক্ষমা করবে।'

'কোথায় সে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমাকে একা ছেড়ে দিয়ে হতভাগাটা গেছে কোথায়?'

হেসে ফেলল জেসমিন, রানার দিকে ফিরল। 'সে আমার ছাত্র, বয়েসে বছর তিনেকের ছোট, পরীক্ষা চলছে বলে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। দু'জনে আমরা অত্যন্ত সুখী, অরবিদ।'

'আমার একটা মেসেজ আছে, পৌছে দেবে তাকে?'

সকৌতুকে জানতে চাইল জেসমিন। 'কি মেসেজ?'

'তুমি যাকে ভালবাস, তার কোন ক্ষতি করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, কাজেই আমার তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে। আসি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, দীর্ঘ পায়ে দরজার সামনে চলে এল, কবাট খুলে উঁকি দিল করিডরে।

করিডর ফাঁকা দেখে কেবিন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা, আস্তে করে বন্ধ করে দিল পিছনের দরজা। পা বাড়াতে যাবে, চাপা কান্নার অস্পষ্ট আওয়াজ পেল ও। ইচ্ছে হলো আবার ফিরে যায়, কিছু একটা বলে সান্ত্বনা দেয়, পরমুহূর্তে ভাবল জেসমিনের এটা ব্যক্তিগত কান্না, ওর নাক গলানো উচিত হবে না। সব জিনিসেরই দাম দিতে হয় মানুষকে—ওকে জেসমিনের অতিরিক্ত ভাল লেগে গেছে, এই মুহূর্তে তারই মাসুল দিতে হচ্ছে তাকে। এখানে ওর কিছু করার নেই।

চারটে বেজে দশ মিনিট, করিডর থেকে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। আকাশে কোন তারা নেই, সব ঢাকা পড়েছে মেঘে। জাহাজের বেশিরভাগ আলো নিভে গেছে, পথ চিনে সাবধানে এগোতে হলো ওকে। ইস্পাতের বেঢপ আকার আকৃতিতে বাধা পেয়ে সামুদ্রিক বাতাস করুণ বিলাপের সুরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে স্টার্নের দিকে হাঁটছে রানা। শীত শীত করছে, মনটা বিষণ্ণ।

করিডর ধরে নিজের কেবিনে ফিরতে পারত ও, তামার আবক্ষ মূর্তি সহ হলটা ওর পথেই পড়ত, কিন্তু মাথায় একটা প্ল্যান থাকায় খোলা ডেকে বেরিয়ে এসেছে ও। তামার মাথাটা থেকে মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করার আগে অদৃশ্য প্রহরীদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

ধীর পায়ে হাঁটছে ও, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ। একটু পরই, বাতাস আর জাহাজের নানা ধরনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ছাপিয়ে, অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল ও—যেন ইস্পাতের সাথে কারও জুতো ঘষা খেলো। ওই একটা শব্দই যথেষ্ট, রানা টের পেয়ে গেল ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। রাত সাড়ে দশটা থেকে ওর অপেক্ষায় করিডরে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল লোকগুলো, ভাবতে ভালই লাগল ওর।

বার কয়েক ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, ফেউদের বুঝতে দিল গোপন কিছু করার মতলব আছে ওর। সেটা কি হতে পারে, বুঝে নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিল তাদের কল্পনাশক্তির ওপর।

ফার্স্ট ক্লাস কেবিনগুলোর সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আরোহীদের হাঁটা-চলা করার জন্যে। জায়গাটার শেষ মাথায় পৌছে অকস্মাৎ ডান দিকে বাঁক নিল রানা,

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সানডেকে। জোরাল বাতাস বইছে, এঞ্জিনের আওয়াজও এদিকে খুব বেশি। কেউ কোথাও নেই, কাউকে দেখতে পাবে বলে আশাও করেনি ও। প্রথম চিমনিটার ডান দিক দিয়ে এগোল, সামনে শাফল-বোর্ড খেলার দাঁড় আকৃতির একটা সরঞ্জাম দেখল, ডেকের ওপর পড়ে আছে। ইচ্ছে করেই সেটার গায়ে কষে লাথি মারল রানা, সশব্দে ঘষা খেয়ে ছুটল জিনিসটা, ধাক্কা খেলো ইমার্জেন্সী ভেলার গায়ে। পথ ভুলে ওকে যদি হারিয়ে ফেলে থাকে শত্রু, শব্দটা তাদেরকে এদিকে টেনে আনবে।

দ্বিতীয় চিমনির গোড়ায় পৌঁছুল রানা। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বাতিল তার, ভাঙা ভেন্টিলেটর, কাঠের পরিত্যক্ত বাক্স ইত্যাদি। কিছু তার লোহার আঙটার সাথে সংযুক্ত, আঙটাগুলো অগভীর গর্ত থেকে বেরিয়ে আছে। একটা গর্তের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে ভান করল, কি যেন খুঁজছে।

খানিক পর সিধে হলো রানা, ফিরতি পথ ধরে হাঁটা ধরল। চিমনি ছাড়িয়ে আসার পর সামনে একটা ছোট্ট র‍্যাম্প রয়েছে, সেটা বেয়ে অর্ধেকটা উঠেছে ও, এই সময় কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল পিছন থেকে।

'হ্যান্ডস আপ! খবরদার, এক চুল নড়বে না!'

ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলে নির্দেশ পালন করল রানা। প্ল্যানটা দারুণ কাজ দিয়েছে। শত্রুপক্ষের ধারণা, 'জিনিস'টা এই মুহূর্তে ওর সাথেই আছে।

'ঘোরো। সাবধানে, ধীরে ধীরে।'

ঘুরল রানা। প্রায় অন্ধকারে প্রথম মনে হলো, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। তারপর ভুল ভাঙল রানার—একজনই সে, তবে অস্বাভাবিক চওড়া। লোকটার মাথায় হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত নামানো, ফলে মুখটা দেখা গেল না। ইংরেজি বলছে সে, তবে উচ্চারণে হিন্দী টান স্পষ্ট।

'কই হে, এদিকে চলে এসো!' সঙ্গীকে ডাকল লোকটা।

রানার মনে হলো, অপর লোকটা ওর পিছন দিক থেকে আসছে। সন্দেহ নেই, চিমনির আরেক পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে সে, পিছন দিক থেকে এসে ওর মাথায় বাড়ি মারার ইচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ, আরও এক কি দেড় সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর দ্রুত পাশে সরল এক পা, বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ঘুরতে শুরু করল। ওপরে তোলা একটা হাত দেখতে পেল, হাতের নিচে শরীরটা লক্ষ্য করে সবেগে চালাল ডান পা, জুতোর ডগায় পেয়ে গেল লোকটার হাঁটুর হাড়। 'মর গিয়া!' বলে ককিয়ে উঠল সে, কোমরের কাছ থেকে দু'ভাঁজ হয়ে গেল শরীরটা। তার পেতে দেয়া ঘাড়ের পিছনে রানার একটা কনুই হাতুড়ির বাড়ি মারল। দু'নম্বর ঝামেলা আপাতত শেষ।

কিন্তু এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি নিয়ে ছুটে এল প্রথম লোকটা। উল্টো করে ধরা পিস্তলের বাঁটটা ওর মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল সে, একপাশে সরে গিয়ে কোন রকমে এড়াতে পারল রানা। সরার সময় লোহার একটা আঙটায় পা বেধে গেল। হোঁচট খেলো ও, ভারসাম্য ফিরে পাবার আগে মূল্যবান একটা সেকেন্ড নষ্ট হলো। তারপর রানা শুধু অনুভব করল, ওর খুলিটা যেন দু'ভাগ হয়ে গেল।

বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। এক সেকেন্ড পর পেটে একটা লাথি অনুভব করল ও। জ্ঞান হারাল।

বন্ধ, গরম একটা জায়গায় জ্ঞান ফিরল রানার, সিগারেটের ধোঁয়া আর ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সদ্যজাত শিশুর মত বিবস্ত্র। শুনতে পেল ওর ওপর দিক থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। বমির উদ্রেক হলো, মোচড় খেলো পেটের ভেতরটা। খানিক পর, ধীরে ধীরে বসল ও।

চওড়া একটা জায়গা, ক্রুদের বিশ্রামাগার বলে মনে হলো। বাংলায় লেখা কিছু নোটিশ টাঙানো রয়েছে দেয়ালে। দুটো বড় টেবিলের মাঝখানে রয়েছে রানা, টেবিলগুলো মেঝে বা ডেকের সাথে আটকানো। একটা টেবিলের ওপর নিজের কাপড়-চোপড় দেখতে পেল, এলোমেলো করা, বোঝাই যায় নিষ্ফল তল্লাশি চালাবার পর ফেলে রাখা হয়েছে ওখানে। হ্যাট পরা চওড়া লোকটা দ্বিতীয় টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে দীর্ঘদেহী সঙ্গীটি, দু'জনেই তারা হিংস্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। যেন তাদের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই কুঁকড়ে গেল রানার শরীর, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও।

'বল্ হারামজাদা, কোথায় রেখেছিস জিনিসটা?' দীর্ঘদেহী ঘুসি পাকাল, ঠাস করে মারল অপর হাতের তালুতে।

'কি-কি-কো-কোথায় রেখেছি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তো-তো-তোমরা শুধু শু-ধু কেন আমা-মা-কে...'

'সান-ডেকে যেটা আনতে গিয়েছিলি। কোথায় সেটা, তাড়াতাড়ি বল্।'

'ফে-লে দিয়েছি।' কাঁপা গলায় বলল রানা, বুদ্ধিটা হঠাৎ গজিয়েছে। 'ছুঁ-ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তো-তো-তোমরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়লে আম-আমা-মার ওপর। তখন ওটা আ-আ-মার হাতেই ছি-ছিল।'

সঙ্গীর দিকে তাকাল দীর্ঘদেহী। 'শালা অমন করছে কেন?'

'জন্মগত নয়,' ফিক করে হেসে চওড়া লোকটা মন্তব্য করল। 'আতঙ্কজাত।'

দাঁতে দাঁত চাপল দীর্ঘদেহী। 'কোথায় ফেলেছিস?'

'জা-জানি না। অন্ধকারে কোথায় পড়েছে কি-কি করে ব-বলব!'

'তারমানে ওপরের ডেকেই কোথাও আছে?'

'পা-পারে, থাকতে পা-পারে।'

'জিনিসটা কেমন দেখতে?'

'তোমরা জা-জানো না?' রানা বিস্মিত।

'জানি, জানি। কিন্তু কিসের ভেতরে আছে? কি ধরনের মোড়ক?'

'মোড়ক? ও...বুঝেছি...' তথ্যটা পাবার জন্যে এতই যখন আগ্রহ লোকটার, তাকে বিশ্বাস্য একটা মিথ্যে কথা বলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। 'ওটা একটা প্রজাপতির ভেতর আছে।'

'কিসের ভেতর?'

'প্রজাপতির ভেতর।'

'প্রজাপতি!'

'ওটা একটা অলঙ্কার,' বলল রানা, এখনও মাঝে মধ্যে ব্যথায় গোঙাচ্ছে ও. তবে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে তোতলানো বন্ধ করেছে। 'মেয়েরা পরে। চুলে পরা যায়, ড্রেসেও লাগানো যায়। বোতাম আছে, ভেতরটা ফাঁপা।'

'আচ্ছা!' সবিস্ময়ে বলল দীর্ঘদেহী। 'তাহলে এভাবে লুকিয়ে রেখেছ!' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হলো তার কণ্ঠ ও দৃষ্টি, রানার দিকে ঝুঁকল। 'বোকা বানাবার চেষ্টা করছ না তো? জানো নিশ্চয়, ওটা খুঁজে না পেলে আমরা বুঝব তুমি মিথ্যে কথা বলেছ?'

'মিথ্যে না বলে আমার উপায় কি?' লোকটাকে হতাশ করল রানা। 'সত্যি কথা বললে তোমরা বিশ্বাস করবে? যদি বলি, সান-ডেকে আমি কিছু খুঁজছিলাম না, তোমরা কি খুঁজছ সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, করবে বিশ্বাস? আমি শুধু বলতে পারি, এই যে বোকার মত আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছ, এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাদের।'

ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করল লোক দু'জন।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে রানার। প্রচুর সময় নিয়ে, ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে দাঁড়াল ও. টলমল করছে পা–সবটাই ভান।

ওকে দাঁড়াতে দেখে মারমুখো হয়ে তেড়ে এল দীর্ঘদেহী, হ্যাট পরা সঙ্গী বাধা দিল তাকে। 'ঠিক আছে। এক মিনিট। প্রথমে যে কথাটা বলেছে, সেটাই সত্যি হতে পারে। টর্চ নিয়ে ওপরের ডেকটা দেখে আসি আমি। ইতিমধ্যে ওকে কাপড় পরিয়ে স্টার্নের দিকে নিয়ে এসো তুমি। ওখানে যত খুশি চিৎকার করুক, কেউ শুনতে পাবে না।'

একটা কাবার্ড খুলে ভেতরটা হাতড়াল সে, হাতে টর্চ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'তুমি একা থাকায়,' সঙ্গীকে বলল সে, 'ওর মাথায় কুবুদ্ধি গজাতে পারে। কোন রকম সুযোগ দেবে না।' বেরিয়ে গেল সে, বাইরে থেকে ঠেলে দিল দরজা।

'কাপড় পরো,' নির্দেশ দিল লম্বা লোকটা। 'ইচ্ছে করলে হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, পেটে যদি গুলি খাবার সাধ জাগে।'

কাঁপা কাঁপা হাতে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে পরতে শুরু করল রানা। মাথা আর পেট দুটোই এখনও ব্যথা করছে, তবে শরীরের আর সব পেশীতে কোন রকম জড়তা নেই। ওর কাপড় পরা শেষ হতে দরজা খুলল লোকটা।

'বেরোও। বেরিয়ে ডান দিকে ঘোরো, তাড়াহুড়ো করবে না। তোমার পেছনে থাকব আমি, নিরাপদ দূরত্বে, আবার এত দূরে নয় যে মাথায় লাগাতে চাইলে ঘাড়ে লাগবে গুলি।'

'তাড়াহুড়ো, হুহ!' প্রায় অভিমানের সুরে অভিযোগ করল রানা, আরেকবার গোঙাল। 'আমি বলে নড়তেই পারছি না।'

করিডরটা জাহাজের এমন একটা অংশে যেটা শুধু ক্রুরা ব্যবহার করে। ঘষে-মেজে সব কিছু ঝকঝকে করে রাখার প্রয়োজন হয়নি, এখানে সেখানে রঙ চটে গেছে। বেকারি আর প্রিন্টিং-প্রেস ছাড়িয়ে এল ওরা, ভোর রাতে দুটোই খালি। কাছাকাছি থেকে শুধু এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে। করিডরের শেষ মাথায়

একটা ওয়াটারটাইট দরজা। লোকটার নির্দেশে সেটা খুলতে হলো রানাকে, ভেতরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে থামতে হলো। ওর পিছনে ভারী ইস্পাতের দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল প্রতিপক্ষ।

জাহাজের পিছন দিকে, নিচু আর অর্ধবৃত্ত আকারের একটা ঘেরা জায়গার ভেতর রয়েছে ওরা। হুক লাগানো চেইন, রশি আর তারের কুণ্ডলী, বিচিত্র আকৃতির মেশিন আর কপিকল, প্রায় ঢেকে ফেলেছে ডেক্কের ওপরটা। স্টার্ন প্যারাপেটের ওপর রশি আর লোহার চেইন ঢোকানোর জন্যে অসংখ্য গর্ত দেখল রানা, পুলি রয়েছে অনেকগুলো, অ্যাংকর চেইন টানার জন্যে—সেগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে জাহাজের পিছনে আলোড়িত পানির গায়ে চাঁদের আলো দেখতে পেল ও, পারদের মত ঝলমল করছে। বিরতিহীন আওয়াজে কান পাতা দায়। 'ওখানে যত খুশি চিৎকার করুক, কেউ শুনতে পাবে না,' কথাটা মনে পড়ে গেল রানার।

এবার একটা সুযোগ খুঁজে নিতে হবে ওকে, শুধু পালানোর জন্যে নয়, সম্ভবত খুন হওয়া এড়াবার জন্যে। এ-ব্যাপারে লোকগুলোর ওপর অবশ্যই নির্দিষ্ট নির্দেশ আছে, সেটা খুন না করার কঠিন নির্দেশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, অন্তত যতক্ষণ না তারা মাইক্রোফিল্মটা উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু নির্দেশ যাই থাক, সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে লোকগুলোকে আরও অনেক কিছু প্রভাবিত করতে পারে। জাফনার কাছাকাছি ফিরে এসেছে রাজহংস, একজন আরোহী নিখোঁজ হলে কারও চোখে সেটা না-ও ধরা পড়তে পারে। লোকগুলো প্রচণ্ড রেগে আছে ওর ওপর, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেও জিনিসটা উদ্ধার করতে পারেনি তারা। তাছাড়া, রানারও সময় কম, মাইক্রোফিল্মটা তাড়াতাড়ি হাতে আনা দরকার।

রানাকে আরও দু'পা সামনে ঠেলে দিল লোকটা, একটা ইলেকট্রিক উইঞ্চের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হলো ওকে। ধীর পায়ে, ব্যথায় উহ্-আহ্ করতে করতে এগোল রানা, লোকটার পেশী সামান্য হলেও যাতে শিথিল হয়। তারপর উইঞ্চের খাঁচায় হেলান দিল ও, বুকে চিবুক ঠেকে আছে, হাত দুটো দু'পাশে নড়বড় করছে। রানার মাথায় একটাই চিন্তা—আর বেশি সময় নেই, যে-কোন মুহূর্তে অপর লোকটা ফিরে আসবে।

ঠিক করল, যা করার এখুনি। টলমল করছে পা, হঠাৎ মাথাটা উইঞ্চের খাঁচার সাথে ঠুকল। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল খুলিটা। তারপর চিৎকার করে যা বলল তার সারমর্ম হলো, মারা যাচ্ছে সে, কারণ ওরা তার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে।

'কি?' এক পা সামনে বাড়ল দীর্ঘদেহী। পিস্তলের বাড়িটা সে মারেনি, কাজেই রানার আঘাত কতটা গুরুতর জানা নেই। পরমুহূর্তে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার, নেতিয়ে পড়ল ডেকের ওপর, যেন হঠাৎ করে জ্ঞান হারিয়েছে।

আরও এক পা সামনে বাড়ল লোকটা। এক সেকেন্ড থেমে ঝুঁকল, তারপর আরও এক পা এগোল। রানার দিকে চোখ, পিস্তলটাও ওর দিকে তাক করা। ইতস্তত করছে সে, সন্দেহে জর্জরিত। 'বুঝেছি, অভিনয় করছে!' চিৎকার করল সে। কিন্তু রানা নড়ল না দেখে, আরও খানিক ইতস্তত করে সামনে বাড়ল।

লোকটা যেন সাপের ছোবল খেলো পায়ে। আঙুলগুলো ইস্পাতের মত শক্ত, পা ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল রানা। ভারী বস্তার মত সশব্দে আছাড় খেলো লোকটা, পড়ার সময় ফাঁকা আওয়াজ করল পিস্তলটা। পরমুহূর্তে তার ক্যারটিড আরটারিতে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল রানা। একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল রানা, সিধে হবার সময় উফ্ করে উঠল। উইঞ্চের খাঁচায় হেলান দিয়ে কয়েক সেকেন্ড হাঁপাল, মাথাটাকে সময় দিল পরিষ্কার হবার। পিস্তলের আওয়াজ নিয়ে উদ্বিগ্ন হলো না, প্রপেলারের শব্দের সাথে মিশে চাপা পড়ে গেছে। মাথাটা পরিষ্কার হবার পর ওয়াটারটাইট দরজার আড়ালে এসে লুকাল ও। দরজা বন্ধ, তবে তালা দেয়া নয়। ইচ্ছে করলে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারে ও। তবে অপর লোকটা স্বাধীনভাবে জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে যখন, তার সাথে ধাক্কা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা কম নয়, কাজেই আগে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

অপেক্ষার সময়টায় মন খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার। লোকটাকে কি খুব জোরে মেরেছে সে? মারা যায়নি তো? তার সঙ্গীর ব্যবস্থা না করে, এখন আর তাকে পরীক্ষা করারও সুযোগ নেই। লোকটার আসার সময় হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে ওদেরকে নিয়ে কি করবে ঠিক করে ফেলেছে ও। দুই অজ্ঞান শত্রুর মুখে কাপড় গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যাবে এখানে। তারপর ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। কপাল যদি রানার মন্দ হয়, এখান থেকে ওর সরে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ক্রুরা এসে দেখতে পাবে ওদেরকে, ইতোমধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে ওদের, মুক্ত হয়ে রানাকে পাকড়াও করার জন্যে ছুটবে। জোঁকের মত লেগে থাকবে পিছনে। আর যদি ওদের কপাল মন্দ হয়, জাফনায় পৌঁছে জাহাজ খালি হয়ে যাবার আগে ক্রুরা ওদেরকে দেখতে পাবে না।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ধীরে ধীরে খুলে গেল ভারী দরজা। দোরগোড়া পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকটা। দু'পা এগিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে থমকে দাঁড়াল। 'কি হলো, কোথায় তোমরা?'

'এখানে,' বলল রানা, সেই সাথে লোকটার মাথার পিছনে সজোরে আঘাত করল উল্টো করা পিস্তল দিয়ে।

এক চুল নড়ল না লোকটা। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। গা ছম ছম করে উঠল রানার। ব্যাপার কি? তারপর লোকটা সটান পড়ে যাচ্ছে দেখে ধড়ে জান ফিরে এল ওর। ডেকে পড়ল সে, ঘ্যাচ করে বিশ্রী একটা আওয়াজ শুনে গা গুলিয়ে উঠল রানার।

আলো খুব কম, লোকটার হাত থেকে গড়িয়ে পড়া টর্চটা খুঁজল রানা। সেটা পেয়ে জ্বালল, পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাংলাদেশী জাহাজ, ভারতীয় কোন নাগরিক এখানে খুন হলে শিপিং করপোরেশনকে ঝামেলায় পড়তে হবে। নানা প্রশ্ন তো উঠবেই, ক্ষতিপূরণও দিতে হতে পারে। তারপর রানা ভাবল, কিন্তু লোকটার হাতে ছোরা কেন? ছোরা সাথে থাকা সম্ভব, বিজনেস সিন্ডিকেটের লোক যখন, কিন্তু সেটা বের করে হাতে নেয়ার মানে কি?

তারমানে ওপরের ডেক থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরার সময় ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত

নের সে। এক হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেলেও, অপর হাত থেকে ছোরাটা পড়তে একটু বেশি সময় নেয়। যেভাবেই হোক, ছোরাটা উল্টে গিয়েছিল, লোকটা সটান আছাড় খেয়েছে ওই খাড়া ছোরার ওপর। পালস্ দেখল রানা, জানে নেই। নিতান্তই দুর্ঘটনা, তবে একেবারে নিখুঁত—সরাসরি হার্টে, হাতলের কিনারা পর্যন্ত ঢুকে গেছে।

লাশটা জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়া কোন সমস্যা নয়, ভাবল রানা। কিন্তু সমস্যাটা অন্য দিক থেকে জটিল হয়ে উঠেছে। জ্ঞান ফেরার পর দীর্ঘদেহী দেখবে জাহাজে সে একা, সঙ্গীটি গায়েব হয়ে গেছে। জাহাজ জাফনায় নোঙর ফেলার আগেই যদি তার জ্ঞান ফেরে, মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে সে, চেষ্টা করবে রানাকে যাতে খুনের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। খানিক চিন্তা করে সম্ভাব্য ঝামেলা এড়াবার একটা বুদ্ধি বের করল রানা। অজ্ঞান লোকটাকে এখান থেকে সরিয়ে এমন কোথাও রাখতে হবে যেখানে সহজে কেউ আসা-যাওয়া করে না। তাকেও জাহাজ থেকে ফেলে দেয়ার কথা মনে উঁকি দিল, কিন্তু বিবেকের তরফ থেকে সায় পাওয়া গেল না। তা করলে অকারণ হত্যা করা হবে। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেয়া উচিত নয়।

কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান হয়ে আছে, রানা জানতে পারল একটু দেরিতে। দীর্ঘদেহীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাজ্জব ও বোকা বনে গেল ও। দেখল, সে-ও জ্বালা জুড়িয়েছে। থমথমে চেহারা নিয়ে সিধে হলো রানা, নিজেকে তিরস্কারের সুরে বলল, ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হওয়া উচিত তোমার।

দুটো লাশ, এক এক করে জাহাজের কিনারা থেকে পিছনের আলোড়িত পানিতে ফেলে দিয়ে এল রানা। ফেলে দিল পিস্তলটাও। ডেক থেকে রক্ত মোছার কাজ শেষ করে টর্চটা আগের জায়গায় রেখে দিল, ওয়াটারটাইট দরজাটা বন্ধ করল, ফিরে এল করিডরে। কারও সাথে দেখা হলো না, পারসার অফিসের পাশের হলে চলে এল ও। উঁচু বেদী থেকে তামার মূর্তিটা, শুধু মাথা, দু'হাতে ধরে তুলল ও, নিঃশব্দ পায়ে ঢুকল কাছাকাছি একটা টয়লেটে। দরজায় তালা লাগিয়ে কাজে হাত দিল রানা। ঢোকানোর সময় কোন সমস্যা হয়নি, বাঁ চোখ দিয়ে সহজেই গলে গিয়েছিল মাইক্রোফিল্মটা। মূর্তিটা নিচের দিকে নিরেট, উল্টো করে ধরে ঝাঁকাতে গিয়ে হাত দুটো ব্যথা হয়ে গেল রানার। মাইক্রোফিল্ম বেরুবে শুধু চোখ থেকে, ওগুলো ছাড়া আর কোন পথ নেই। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পরও লাভ হলো না, অগত্যা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল রানা, একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে খুঁচিয়ে চোখের কিনারায় নিয়ে এল জিনিসটাকে। তারপর আর কোন সমস্যা হলো না।

মূর্তিটা জায়গামত বসিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এল রানা। হরি শ্রেষ্ঠ আর শিব শ্রীবাস্তব, দু'জনেই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভোরের প্রথম আলো একটু একটু করে ঢুকতে শুরু করেছে পোর্টহোল দিয়ে। দ্রুত ও নিঃশব্দে কাপড় পাল্টাল ও, মাইক্রোফিল্মটা একটা মোজার ভেতর ভরে ঢুকিয়ে রাখল পা'জামার পকেটে। ঘুমন্ত সঙ্গীদের দিকে তাকাল আরেক বার। রাজহংসে সিঙ্গেল কেবিনের সংখ্যা কম, কিন্তু পুরুষ প্রার্থী বেশি হওয়ায় তাদেরকে বঞ্চিত করে শুধু মেয়েদেরকে বরাদ্দ করা

হয়েছে ওগুলো। অফিস থেকেও ওকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, সুযোগ পেলেও সে যেন একটা কেবিনে একা না থাকে। পরামর্শ বা আয়োজন, কোনটাই পছন্দ হয়নি রানার, শুরু থেকেই অস্বস্তিবোধ করছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে নিরাপত্তার দিকটা চিন্তা করে খুশি হলো ও। কেবিনে দু'জন লোক থাকায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারা যাবে। দু'জন নিপাত হলেও, শত্রুপক্ষকে ছোট করে দেখছে না রানা।

একজোড়া সিটামল আর এক গ্লাস পানি খেয়ে নিজের বার্থে উঠল ও, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

চার

জাফনায় যথাসময়ে পৌঁছুল রাজহংস। রানা যদি মনোক্ষুণ্ণ আর হতাশ হয়ে থাকে, ওকে দোষ দেয়া যায় না। স্বীকার করতে হবে, অভিযানটা তেমন ঝুঁকিবহুল তো নয়ই, এমনকি ঘটনাবহুলও ছিল না। রানা মনোক্ষুণ্ণ এই জন্যে যে প্রায় তুচ্ছ একটা কাজে পাঠানো হয়েছে ওকে। আর হতাশ বোধ করছে বিজনেস সিন্ডিকেটের ক্ষমতার বহর উপলব্ধি করে। কথাতেই আছে, যত গর্জে তত বর্ষে না। শত্রুপক্ষ যদি ভয়ঙ্কর না হয়, প্রতিবার তারা যদি নতুন নতুন চমক নিয়ে উদয় না হয়, তাদের সাথে পাঞ্জা কষে মজা কোথায়।

তবে একটা কথা জানে রানা, এই অ্যাসাইনমেন্টের বৈশিষ্ট্য অন্যখানে। দেশের ভেতর থেকে টপ সিক্রেট কোন জিনিস যখন চুরি যায়, ধরে নিতে হয় চোরের সাথে সহযোগিতা করা হয়েছে। তারমানে এক বা একাধিক বেঈমানকে খুঁজে বের করতে হবে। চোরের পরিচয় জানা গেছে, মাইক্রোফিল্মটা স্টাডি করার পর জানা যাবে কি জিনিস চুরি গিয়েছিল, তারপরই শুরু হবে রানার আসল কাজ।

সুটকেস গুছিয়ে রেখে সাড়ে এগারোটাতেই লাঞ্চ সেরে ফেলেছে রানা, স্টারবোর্ডের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখল নোঙর ফেলার পর দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা হচ্ছে রাজহংসকে, পক্ষকাল আগে এই একই জেটি থেকে রওনা হয়েছিল জাহাজ।

সামনের বড় লাউঞ্জে হাজির হয়েছে পুলিস আর কাস্টমস অফিসাররা, আরোহীরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছে। রানার প্রকৃতি ছিল, আরোহীদের প্রথম দলটার সাথে আনুষ্ঠানিকতার ঝামেলা সেরে ফেলতে পারল। ওর দিকে ভাল করে না তাকিয়ে ওর জাল পাসপোর্টে সীল মারল একজন ইন্সপেক্টর, হাতে গুঁজে দিল ডিজএমবারকেশন টিকেট। ডিক্লারেশন ফর্মে সীল মেরে সই করল কাস্টমস অফিসার। আমদানী নিষিদ্ধ বা ডিউটি দিতে হতে পারে এমন কোন জিনিস ওর সাথে নেই। কিন্তু কয়েকজন যুবকের আচরণ লক্ষ করে লজ্জায় অধোবদন হলো রানা। কইতেও পারে না, সইতেও পারে না, এই অবস্থা। এদেরকে দিল্লী আর বোম্বেতেও হ্যাংলামি করতে দেখেছে রানা। সস্তা মেয়েদের পিছু নিয়েছে, মদ খেয়ে রাস্তা-ঘাটে মাতলামি করেছে, হোটেলে জুয়ার আসর বসিয়েছে, আর এখন আমদানী

নিষিদ্ধ গাদা গাদা জিনিস-পত্র সাথে থাকা সত্ত্বেও দাবি করছে, তাদের সাথে কিছু নেই। চেকিং হবে আরেকটু সামনে, জানা কথা তখন ওরা চেকারদের ঘুষ দিয়ে পার পাবার চেষ্টা করবে। রানার খারাপ লাগার কারণ আর কিছুই নয়, যুবকরা সবাই বাংলাদেশী।

একজন পোর্টারকে দিয়ে কেবিন থেকে সুটকেস দুটো আনল রানা। কয়েক মিনিট পর গ্যাংওয়ের নিচে দাঁড়ানো পুলিসকে ডিজএমবারকেশন টিকেট ধরিয়ে দিয়ে নেমে এল জেটিতে। জেটির শেষ মাথায় কাস্টমস শেড, এরইমধ্যে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে লোকজন। দু'জন পোর্টারকে দেখল রানা, কাস্টমস শেডে না ঢুকে পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, তাদের পিছনে অলসভঙ্গিতে দু'জন লোক হাঁটছে। পিছন থেকে ঠিক চেনা গেল না, তবে চেনা চেনা লাগল। জাহাজে এরকম কত লোককেই তো দেখেছে, আলাপ না হলেও মুখচেনা। কোন সন্দেহ নেই, বাংলাদেশী।

কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এল রানা, পোর্টার আগেই ওর জন্যে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছে। স্যালুট ঠুকে দরজা খুলে ধরল ড্রাইভার, ভেতরে ঢুকতে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। রাস্তার উল্টোদিকে চোখ পড়েছে ওর। কালো একটা প্রাইভেট কার, পুরানো মডেলের মাজদা। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন লোক। হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। র, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স! ওরা এখানে কি করছে?

গাড়ির ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা। ইতোমধ্যে দেখে নিয়েছে দু'জনের একজনের হাতের তালুতে কি যেন লুকানো রয়েছে, রানা আর লুকানো জিনিসটার দিকে বারবার তাকাল লোকটা। সন্দেহ নেই রানার ফটো ওটা। রানার দেখাদেখি তারাও মাজদায় উঠে বসল।

'স্টেশনের কাছে,' ড্রাইভারকে বলল রানা, 'টয়োটা গ্যারেজে।' গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। সীটের ওপর নড়েচড়ে বসল রানা, রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ, দেখল পিছু নিয়েছে মাজদা।

চিন্তার বিষয়। তারমানে রাজহংস থেকে দু'জনকে পানিতে ফেলে দিয়ে কোনই লাভ হয়নি। বিজনেস সিন্ডিকেটকে ছোট করে দেখাটাও ভুল হয়েছে। এ-ধরনের কিছু যে ঘটতে পারে, বিজনেস সিন্ডিকেট আগেই তা আন্দাজ করে নিয়েছিল, তাই অরবিদ সিংহের ফটো সহ দু'জন ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে জাফনায়। ভারতীয় ভিসার জন্যে জমা দেয়া হয়েছিল ওর ভুয়া পাসপোর্ট, ফটো পেতে অসুবিধে হয়নি ওদের। ওরা দু'জন যে র, ভাল করেই জানে রানা। বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টারে ওদের ফাইল দেখেছে ও, ছবি সহ। সেটাই চিন্তার বিষয়—প্রেমদাস চোপড়া আর জগজিৎ পাণ্ডে, দু'জনেই কিলার।

কখন আর কিভাবে লোকগুলো অ্যাকশনে যাবে? ওদের রেকর্ড আর প্রকৃতিই বলে দেয়, ওরা সময় নষ্ট করবে না। জাফনা আর কলম্বোর মাঝখানে রাস্তায় কোথাও একটা ফয়সালা করতে চাইবে। রাজহংসের বেশিরভাগ আরোহী কলম্বোয় যাচ্ছে বিশেষ একটা ট্রেনে চড়ে, ওর-ও কি তাই যাওয়া উচিত, নিরাপত্তার স্বার্থে? ট্রেন ভ্রমণে ঝুঁকি কম, সন্দেহ নেই। কিন্তু ধারণাটা বাতিল করে দিল দুটো কারণে। প্রথম

কারণ, তাতে কিছু অর্জিত হবে না। ওকে ট্রেনে চড়তে দেখলে লোকগুলো তাদের কলম্বো প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করবে, লাইনের অপরপ্রান্তে দ্বিতীয় আরেকটা রিসেপশন কমিটির সাথে দেখা হবে রানার। আরেকটা কারণ, একটা মাজদা গাড়িকে ভয় পাবার দরকার নেই ওর। কলম্বো ত্যাগ করার আগে ওকে একটা পুজো ফোর-জিরো-থ্রী দেয়া হয়েছিল, বাইরে থেকে কিছু বোঝা না গেলেও, ওটার শক্তি বাড়ানো হয়েছে—চল্লিশ সেকেন্ডে স্পীড ওঠে ঘন্টায় পঁচাত্তর মাইল, গতিবেগ তোলা যায় ঘন্টায় একশো বিশ মাইল।

সামনে যানবাহনের লম্বা লাইন অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল। 'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'ব্রিজটা সরু, ওদিক থেকে গাড়ি আসছে,' বলল ড্রাইভার। 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ, অপেক্ষা না করে একদিনও ব্রিজটা পেরুতে পারলাম না।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'কপাল ফাটা হলে এক ঘন্টার কম নয়। তবে, তার আগে বোমাও ফাটতে পারে।'

'মানে?'

ড্রাইভার লোকটা তামিল, ভাল ইংরেজি জানে। 'মানে জিজ্ঞেস করছেন, স্যার? কেন, শ্রীলংকায় কি ঘটছে জানেন না? ভারতীয় সৈন্য যত দিন না আমাদের দেশ থেকে...'

তাড়াতাড়ি রানা বলল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি!' রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে যেতে চায় ও।

মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু করার কিছু নেই। ব্রিজের ওদিক থেকে লাইন দিয়ে আসছে যানবাহন, শেষ হতে চায় না। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা মাজদা আর ট্যাক্সির মাঝখানে আরেকটা গাড়িকে ঢুকতে দিয়েছে। ওরা বোধহয় এখনও বোঝেনি যে রানা জানে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

মাত্র পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, তারপর আবার সচল হলো যানবাহনের দীর্ঘ মিছিল। ব্রিজ থেকে নেমে আসার খানিক পর সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখা গেল—যে-কোন মুহূর্তে সবুজ আলো নিভে লালটা জ্বলে উঠবে। স্পীড বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সিগন্যাল পেরিয়ে এল ওরা, পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল লাল আলো। দেখা যাক মাজদা কি করে।

সিগন্যাল অগ্রাহ্য করে ট্যাক্সির পিছনে থাকল লোকগুলো। রানা আশা করল, পুলিসের গাড়ি ধাওয়া করবে ওদেরকে। হতাশ হতে হলো ওকে।

গ্যারেজে পৌঁছুনোর পথে আর কিছু ঘটল না। গ্যারেজের সামনে থামল ট্যাক্সি, সুটকেসগুলো নামাতে রানাকে সাহায্য করল ড্রাইভার। পঞ্চাশ গজ পিছনে মাজদাও দাঁড়িয়েছে।

গ্যারেজের পিছন দিকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই রয়েছে পুজো। সুটকেস দুটো বুটে রাখল রানা। ফুয়েল, পানি আর ব্রেক চেক করল, তারপর উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। সুইচ অন করে স্টার্টারে টান দিল। এঞ্জিন গরম করছে, এই

সময় রাজহংসের কয়েকজন আরোহী এসে পৌঁছুল, তারাও এই একই গ্যারেজে গাড়ি রেখে গিয়েছিল। স্মিত হেসে হাত নাড়ল রানা, গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল। ফুয়েল নিতে হবে, উইন্ডস্ক্রীন পরিষ্কার করানো দরকার, চেক করাবে টায়ারগুলো। গ্যারেজ কর্মীদের হাতে গাড়ি তুলে দিয়ে টয়লেটে ঢুকল ও। বেরিয়ে এসে দেখল সব কাজ শেষ হয়েছে। বিল মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় উঠে এল রানা। মাজদা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সীটের ওপর নড়েচড়ে বসে মনে মনে হাসল ও। ওদের জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

জাফনা খুব একটা বড় শহর নয়, কিন্তু বেরুতে দীর্ঘ সময় লাগল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড আর চেকপোস্ট; সামরিক ইউনিফর্ম, ট্যাংক, সৈন্যবাহী জীপ আর ভ্যান শহরটাকে ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে রেখেছে। শ্রীলংকার সেনাবাহিনীর সাথে তামিল গেরিলাদের যুদ্ধ চলছে, এমন কোন দিন নেই যেদিন শহরের কোথাও না কোথাও খণ্ডযুদ্ধ বাধছে না। গাড়ি থেকে তিনবার নেমে দাঁড়াতে হলো রানাকে, ভারতীয় সৈনিকরা অস্ত্রের সন্ধানে তল্লাশি চালাল। অবশেষে শহরের বাইরে বেরিয়ে এল পুজো, এরপর চওড়া আর সমতল রাস্তাটা ছোট ছোট অনেকগুলো শহর ছুঁয়ে সেই একেবারে কলম্বো পর্যন্ত চলে গেছে। স্পীড বাড়াবার একটা ঝোঁক চাপলেও, নিজেকে দমন করল রানা। তাড়াহুড়োর দরকার কি, অপেক্ষা করায় কোন ক্ষতি নেই। কম হলেও, যানবাহন আছে রাস্তায়, শত্রুরা প্রকাশ্যে কিছু করতে চাইবে বলে মনে হয় না। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডই ধরে রাখল রানা, একশো গজ পিছনে আঠার মত সেঁটে থাকল মাজদা।

মানকুলাম পর্যন্ত কিছুই ঘটল না, তারপর রাস্তা প্রায় ফাঁকা হয়ে যাবার পরও কিছু ঘটল না। অনুরাধাপুর-এ পৌঁছুবার আগে বহুবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দূরত্ব কমানোর কোন চেষ্টা করল না মাজদার আরোহীরা। রানা ভাবল, তবে কি ওরা শুধু পিছু নিয়ে দেখতে চায় কলম্বোয় পৌঁছে কি করে সে, কার সাথে যোগাযোগ করে বা কোথায় যায়, তাকে নিয়ে অন্য কোন প্ল্যান নেই ওদের? উঁহু, তা হতে পারে না। দু'জন কিলারকে শুধু অনুসরণ করার জন্যে পাঠাবে না বিজনেস সিন্ডিকেট। তাছাড়া, এভাবে পিছনে লেগে থাকা, ওদের জন্যে ঝুঁকির ব্যাপার। ওর কাছে ছোট একটা মাইক্রোফিল্ম রয়েছে, সেটা কোথায় কাকে দেয় বা পাঠায় দেখার জন্যে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিতে হবে ওদেরকে–সেটা সম্ভব নয়, তা করার কোন চেষ্টাও ওরা করছে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা জানে, ওদের সামনের চার চাকার ভেতর কোথাও আছে জিনিসটা। ফাঁকা রাস্তা, ইচ্ছে করলেই বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। দিচ্ছে না, কিন্তু তারমানে এই নয় যে দেবে না। অন্য কোন যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হলো না, রানার দৃঢ় বিশ্বাস জিনিসটা কেড়ে নিয়ে ওকে খুন করার জন্যেই পাঠানো হয়েছে ওদেরকে।

অনুরাধাপুর ছাড়িয়ে আসার পর রাস্তার দু'ধারে খাদ আর বনভূমি শুরু হলো। ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি মাইল গতিতে ছুটছে পুজো। হঠাৎ রানা দেখল, মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্যে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে মাজদা। ওরা কি চাইছে বুঝতে অসুবিধে

হলো না। পুজোকে পাশ কাটিয়ে যাবে, তারপর অকস্মাৎ ব্রেক করে খাদে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে পিছনের গাড়িটাকে। পুজো বিধ্বস্ত হোক, অরবিন্দ সিংহে মারা যাক, কিছু আসে যায় না, খাদে পড়া গাড়ি থেকে নিজেদের জিনিসটা খুঁজে নিতে পারবে ওরা। মাইক্রোফিল্মটা পেলে রানার পালস পরীক্ষা করবে। তখনও যদি মারা গিয়ে না থাকে, গলায় পায়ের চাপ দিয়ে পাঠিয়ে দেবে পরপারে। ওকে আহত অবস্থায় রেখে যাবে, সে আশা নেই। ও যদি ফিল্মটা দেখে থাকে, স্মৃতিতে গেঁথে নিয়ে থাকে ডকুমেন্টটা।

মাজদা পাশ কাটাতে শুরু করল। ভিউ মিররে তাকিয়ে রানা দেখল, দু'জনেই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ওদের মুখের ওপর হাসল ও, চাপ দিল অ্যাকসিলেরাটরে, সাথে সাথে সুপারচার্জড এঞ্জিন গর্জে উঠল, সামনের দিকে লাফ দিল গাড়ি। মুহূর্তে পুজোর স্পীড উঠে গেছে আশি মাইলে। পঁচাশি, নব্বুই, তিরানব্বুই– দ্রুত পিছিয়ে পড়ল মাজদা। পরবর্তী বাঁকের সামনে স্পীড উঠল পঁচানব্বুইয়ে। মাজদা তিনশো গজ পিছিয়ে পড়েছে। সামনে এরপর কাছাকাছি অনেকগুলো বাঁক, স্পীড কমাতে হলো। মাজদাকে আবার কাছে আসতে দিল রানা, তারপর পরবর্তী সরল বিস্তৃতিতে পৌঁছে বাড়িয়ে দিল গতি। ডামবুলা পেরিয়ে এল যখন, পিছনে কোথাও দেখা গেল না মাজদাকে। রানা জানে, ওদের নাগালের বাইরে চলে এসেছে পুজো। কলম্বোয় অবশ্য ওরাও পৌঁছুবে, দেরি করে হলেও, কিন্তু অত বড় শহরে ছোট্ট একটা মাইক্রোফিল্ম কোথায় খুঁজবে ওরা?

কলম্বোয় পৌঁছে স্টেশনের কাছাকাছি, সরু একটা গলির অনেকটা ভেতরে গাড়ি থামাল রানা। ড্যাশবোর্ডের তলায় টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল মাইক্রোফিল্মটা, সেটা খুলে পকেটে ভরল। হেডকোয়ার্টার থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া আছে, কেউ যদি ওকে অনুসরণ করে, কিংবা কোন ভাবে শত্রুপক্ষ যদি ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখে, প্রথম সুযোগেই ডকুমেন্টটা হস্তান্তর করতে হবে কলম্বোয় বি.সি.আই-এর স্থায়ী এজেন্টের কাছে। শ্রীলংকায় সে-ই রানার কন্ট্যাক্ট, জিনিসটা তারপর নিরাপদে ঢাকায় পাঠানো তার দায়িত্ব।

এজেন্টের নাম আশরাফ চৌধুরী। বাইশ নম্বর রত্নাগালায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সে। ফাইন আর্টসের ছাত্র আশরাফ, নিয়মিত ক্লাস করে। অরবিন্দ সিংহের চেহারা এবং পরিচয় নিতে সে-ই সাহায্য করেছে রানাকে। প্রতি মাসের শেষে ঢাকা থেকে মোশাররফ চৌধুরী নামে একলোক মোটা টাকা পাঠায় তাকে। রাহাত খান ছাড়া আর মাত্র অল্প দু'একজন জানে মোশাররফ চৌধুরীর কোন অস্তিত্ব নেই।

এক মাইলটাক হেঁটে এল রানা। বড় রাস্তার ধারেই আশরাফের অ্যাপার্টমেন্ট, নিচ থেকে ওর ফ্ল্যাটের জানালা দেখা যায়। রাস্তা পেরোবার সময় মুখ তুলে তাকাল ও। জানালায় পর্দা ঝুলছে। জানালা যখন বন্ধ নয়, আশরাফ নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও বেরোয়নি।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ঢোকার আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা, আশপাশে কেউ ঘুরঘুর করছে কিনা। সন্দেহজনক কাউকে দেখল না। ফ্ল্যাটটা

তিনতলায়, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। কারও সাথে দেখা হলো না। ল্যান্ডিঙে পৌঁছে অপেক্ষা করল খানিক। না, ওর পিছু পিছু অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে কেউ ঢোকেনি। মাইক্রোফিল্মটা আশরাফকে দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্টটা চেয়ে নেবে ও, ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে যাবে কান্ডিতে, ওখানে ব্যক্তিগত একটা কাজ আছে—রাতেই ফিরবে কলম্বোয়, প্লেনের টিকেট পাওয়া গেলে সকালের ফ্লাইট ধরে ফিরে যাবে হেডকোয়ার্টারে।

তিনতলায় উঠে আশরাফের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল রানা, হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে সাড়ে পাঁচটা বাজে। আশরাফের জানার কথা, আজ দুপুরে জাফনায় পৌঁচেছে রাজহংস, কাজেই ওর জন্যে অপেক্ষা করার কথা তার। কলিংবেলে আঙুল রেখে চাপ দিল ও—দু'বার, একবার, দু'বার। কে এসেছে বুঝতে পারবে আশরাফ।

সাথে সাথে নয়, আবার খুব বেশি দেরি করেও নয়, খুলতে শুরু করল দরজা। একই সময়ে পিছনে পায়ের শব্দ পেল রানা। ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই দেখল, করিডরের বাঁক ঘুরে মাজদার একজন আরোহী ওর দিকে এগিয়ে আসছে, তার হাতে ধরা পিস্তলের মাজল্ হাঁ করে চেয়ে আছে ওর দিকে।

ঝুঁকি নেয়ার ঝোঁক চাপল রানার, জানে প্রায় আত্মহত্যা করা হবে। করিডর ধরে, লোকটার উল্টোদিকে, ছুটতে শুরু করতে পারে ও। কিন্তু লোকটা যদি গুলি করে, লাগবে। এত কাছ থেকে ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

খোলা দরজার দিকে ফিরল রানা। আরেকজন শত্রু, আরেকটা পিস্তল। ঢিল পড়ল ওর পেশীতে, পরাজয় মেনে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ, বোকার মত বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে নেয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই।

'ভেতরে ঢোকো!' খুনী জগজিৎ পাণ্ডে ঠাণ্ডা গলায় বলল রানার পিছন থেকে। ঝানু প্রফেশনাল সে। দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, রানার পিঠের কাছে সরে আসেনি।

দরজার ভেতর থেকে প্রেমদাস চোপড়া মৃদু হাসল। 'চালে আও, দোস্ত, আন্দার চালে আও। খুশ্ খবরি শুনাওগে না?'

'তোমরা কে?' বিস্মিত হবার ভান করল রানা। 'ও কোথায়?' করিডরে দেরি করতে চাইছে রানা, আশা করছে হঠাৎ কারও চোখে পড়ে যাবে।

শিরদাঁড়ার ওপর পিস্তলের মাজল্ চেপে ধরল জগজিৎ পাণ্ডে। 'ঢোকো!'

'ওকে আমার বিশ্বাস নেই,' রানার কাঁধের ওপর দিয়ে জগজিৎ পাণ্ডের দিকে একবার তাকাল প্রেমদাস, রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ধৈর্য কম, তোমার শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দিলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না।'

এরপর দেরি করলে ওর অজ্ঞান দেহটাকে ওরাই ধরাধরি করে ভেতরে ঢোকাবে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রানা, চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। সিটিংরূমে আশরাফ নেই, বেডরূমও খালি। কিচেনে নিয়ে আসা হলো ওকে। কাঠের একটা শক্ত চেয়ার আগেই এনে রাখা হয়েছে, সেটায় রানাকে বসিয়ে নাইলনের রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রানাকে কাভার দিল জগজিৎ পাণ্ডে, পিস্তলের মাজল্ লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

এখনও সন্ধ্যা হয়নি, তবু কিচেনের বালবটা জ্বলছে।

পিস্তলটা এতক্ষণে পকেটে ভরল জগজিৎ পাণ্ডে। সে-ই রানাকে সার্চ করল। মাইক্রোফিল্মটা বের করে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল সে।

'এ-সবের মানে কি?' চেহারায় অসন্তোষ আর রাগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কারা তোমরা?'

জগজিৎ পাণ্ডে প্রেমদাস চোপড়ার দিকে একবার তাকাল। 'তোমাকে না জানানোর কোন কারণ নেই। আমি জগজিৎ পাণ্ডে, আর আমার সঙ্গী প্রেমদাস চোপড়া।' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল লোকটার ঠোঁটে, গা শিরশির করে উঠল রানার। লোকটা নিজেদের আসল পরিচয় দিল কেন? একটাই উত্তর হতে পারে—ওদের দৃষ্টিতে রানা এরইমধ্যে মারা গেছে।

'পরিচয় জেনে খুশি হলাম,' বলল রানা, অনুভব করল পিঠ বেয়ে ঘামের ধারা নামছে। 'বোধহয় আমার পরিচয়টাও তোমরা জানতে চাও। আমি অরবিন্দ সিংহে।'

হাসি মুখে মাথা ঝাঁকাল প্রেমদাস চোপড়া, একটা ভুরু কপালে তুলল। জগজিৎ পাণ্ডে ঘড়ঘড় শব্দে হেসে উঠল। দু'জনেই খুব হালকা মেজাজে রয়েছে।

'অরবিন্দ সিংহে—ঘোড়ার আণ্ডা!' জগজিৎ পাণ্ডে খস খস করে শার্টের ওপর দিয়ে পেট চুলকাল। 'ওটা তোমার নাম নয়। তোমার নাম আবদুস সামাদ। তুমি বাংলাদেশের একজন স্পাই।'

আবদুস সামাদ অবশ্যই পরিচিত একটা নাম। ঢাকা থেকে শ্রীলংকায় আসার সময় নামটা নিয়েছিল রানা। আশরাফ চৌধুরীর কাছ থেকে অন্যান্য ডকুমেন্টের সাথে পাসপোর্টটাও তাহলে ওরা হাতিয়ে নিয়েছে। তার মানে, ধরে নিতে হয়, আশরাফকে ওরা পাকড়াও করেছে, এবং তা আজ নয়, দিন কয়েক আগেই। সেক্ষেত্রে, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। 'তোমরা দেখছি ভারি কাজের লোক। সবই জেনে ফেলেছ। আশ্চর্য! কিভাবে জানলে?'

প্রেমদাস চোপড়া কথা বলল, সঙ্গীর চেয়ে একটু মোটা আর লম্বা সে। তার মধ্যেও কোন আড়ষ্ট ভাব বা টেনশন নেই, যেন রানাকে নিয়ে কি করবে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে গেছে। 'কিভাবে জানলাম?' হেসে উঠল সে। 'কোন সমস্যাই হয়নি। জাহাজে আমাদের লোক ছিল, তোমার সুটকেস পরীক্ষা করতে গিয়ে ছোট্ট একটা কাগজ পায় তারা—জাফনার একটা গ্যারেজের টিকেট, যেখানে তুমি তোমার গাড়িটা রেখেছিলে। বললাম তোমার গাড়ি, কিন্তু আসলে তা নয়। জাহাজ থেকে আমাদের বন্ধু টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে খবরটা জানায় আমাদেরকে, আমরা গাড়িটা সার্চ করি। সার্চ করে রেজিস্ট্রেশন বুকটা পাই—আশরাফ চৌধুরীর নামে।'

'গাড়িটা যদি আরও ভালভাবে পরীক্ষা করতে তাহলে জানতে পারতে পুরোর পুরানো খোলসের নিচে নতুন, সুপারচার্জড এঞ্জিন ফিট করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাকে ধাওয়া করতে গিয়ে ঠকতে হত না।'

মুচকি হাসল প্রেমদাস। 'ঠকেছি, এ-কথা বলা যায় কি? কে কার হাতে বন্দী, বলো? যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি আমরা।'

সবই সত্যি কথা। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো রানার। বোকার মত কেন সে

গ্যারেজের টিকেটটা নিজের সুটকেসে রাখতে গেল? পারসারকে রাখতে দেয়নি কেন? আশরাফের ওপরও রাগ হলো ওর। বিদেশে স্থায়ী এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হলে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। ছোট্ট একটা ভুল থেকে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। রানাকে তার এমন একটা গাড়ি দেয়া উচিত হয়নি যেটা তার নিজের নামে রেজিস্ট্রি করা।

'বলো দেখি, বঙ্গবীর,' দরাজ গলায় জিজ্ঞেস করল জগজিৎ পাণ্ডে, 'তুমি জানতে জাফনায় আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব?'

'হ্যাঁ, জানতাম,' মিথ্যে কথা বলল রানা।

'তারমানে জাহাজে আমাদের বন্ধুরা মুখ খুলেছে? শুধু তাদের কাছ থেকেই আমাদের কথা জানতে পারো তুমি। যোগাযোগ করার কথা ছিল, কিন্তু করেনি–তারমানে দু'জনকেই পানিতে ফেলে দিয়েছ?'

হেসে উঠল রানা। 'ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ডেকে লোকজন আসা-যাওয়া করছে দেখে স্টোররুমে বেঁধে রাখতে বাধ্য হলাম। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে, চিৎকার করতে পারবে না। ভাগ্য ভাল হলে ইতিমধ্যে তাদেরকে মুক্ত করেছে ক্রুরা।'

'তোমার প্রশংসা করি,' রানার মতই হেসে উঠে বলল প্রেমদাস চোপড়া। 'বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যে কথা বলার আর্টটা ভালই রপ্ত করেছ।' সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

'ভারি ইন্টারেস্টিং,' সায় দিল জগজিৎ পাণ্ডে।

রানার দিকে ফিরল প্রেমদাস। 'তাই যদি হয়, যদি জানতে আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, তাহলে কোন্ বুদ্ধিতে এখানে এলে তুমি? বিশেষ করে রাস্তায় আমাদেরকে খসিয়ে দেয়ার পর? মনে হয়নি, বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ফেলছ?'

'তোমরা ধরে নিচ্ছ, আশরাফের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে আমাকে। তোমরা আমাকে অনুসরণ করায় আমি ধরে নিই, আশরাফের ব্যাপারে কিছু জানো না–জানলে আমার পিছু নিতে না, এখানে অপেক্ষা করার কথা।'

'সাবধানতার বিকল্প নেই,' সহাস্যে বলল প্রেমদাস। 'তোমার মনে মিথ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব এনে দেয়ার জন্যেই জাফনা থেকে পিছু নিই আমরা। তুমি যদি নিজ গুণে আমাদেরকে না খসাতে, আমরা নিজেরাই খসে যাওয়ার ভান করতাম।'

মনে মনে স্বীকার করল রানা, সম্ভাব্য সমস্ত দিক বিবেচনার মধ্যে রেখে কাজ করেছে ওরা। তাই জিতেছে। 'অতীত বাদ দিয়ে আমরা কি বর্তমান নিয়ে আলাপ করতে পারি না?' জিজ্ঞেস করল ও। 'এখন কি ঘটবে?' আশরাফের ভাগ্যে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে ও।

প্রায় সদয় দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল জগজিৎ পাণ্ডে। 'সেটা নির্ভর করে তোমার ওপর। বি.সি.আই-এর এজেন্ট বড়ই দুর্লভ চিড়িয়া, একটা যখন হাতে পেয়েছি, নিঙড়ে রস বের করার এই সুযোগ আমরা ছাড়ব না। আমাদেরকে বলার মত অনেক কথা হয়তো জমা হয়ে আছে তোমার পেটে।'

'কেন, আশরাফ চৌধুরীর সাথে কথা হয়নি?' ধৈর্য হারানোর সুরে বলল রানা।

নাইলনের রশি মাংস কেটে ভেতরে দেবে যাচ্ছে. ব্যথা করছে কব্জি। 'তোমাদের ভাষায় চিড়িয়া হলেও, নিতান্তই খুদে আমি। আশরাফ আমার বস্, যা জানার তার কাছ থেকেই তো জেনে নিতে পারো।'

ঘড়ঘড় করে হাসল জগজিৎ পাণ্ডে, রানার হাতের রোম খাড়া হয়ে গেল। 'খুদে? আশরাফ তোমার বস্? কভি নেহি! সরাসরি ঢাকা থেকে এসেছ তুমি। আশরাফের কাজ ছিল তোমাকে সাহায্য করা।'

'যা খুশি ভাবতে পারো,' বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'তবে আমার কাছ থেকে কিছুই তোমরা জানতে পারবে না।'

'মুখ কিভাবে খোলাতে হয় আমাদের জানা আছে,' নিশ্চয়তা দানের সুরে বলল জগজিৎ। 'আশরাফ তার প্রমাণ পেয়েছে। তুমিও পাবে। বেচারা আশরাফের ওপর অত্যাচারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, স্বীকার করছি। অল্প বয়স, আরামে মানুষ, সহ্য করতে পারেনি।'

চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে গেল রানা। 'ওকে তোমরা মেরে ফেলেছ?'

'তোমাকেও ফেলব, মুখ না খুললে।'

নীল হয়ে গেল রানা। কিছুই বলল না ও। শুধু সারা শরীরে জ্বলে উঠল প্রতিশোধের অদৃশ্য আগুন। 'বেশ,' কয়েক সেকেন্ড পর শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কি জানতে চাও তোমরা?' যেন সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

'বলো কি জানতে চাই না। বি.সি.আই. সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু বলবে তুমি। শুনেছি, তোমরা নাকি আমাদের সম্পর্কে একটা ফাইল তৈরি করেছ। তারমানে, আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে চাইছে বি.সি.আই, তাই না?'

প্রেমদাস বলল, 'মান্ধাতা আমলের সেই বুড়োটাই কি এখনও তোমার বস্? সব মিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তোমাদের ক'জন এজেন্ট কাজ করছে? তাদের কাভার, ঠিকানা, কন্ট্যাক্ট...'

'তোমরা মানে? র, নাকি বিজনেস সিন্ডিকেট?'

এই প্রথম ধাক্কা খেলো ওরা। প্রেমদাস স্থির পাথর হয়ে গেল। জগজিৎ হাঁ।

প্রথম কথা বলল প্রেমদাস, 'তুমি জানো!'

'কাজেই বুঝতে পারছ, তোমাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেব না।'

'কিভাবে জানলে তুমি?' চাপা স্বরে গর্জে উঠল জগজিৎ।

'তোমরাই না বললে, জানো বি.সি.আই. একটা ফাইল তৈরি করেছে? তাছাড়া, র সম্পর্কে বা র-র এজেন্টদের সম্পর্কে বি.সি.আই. জানবে না?'

প্রেমদাস আর জগজিৎ দৃষ্টি বিনিময় করল।

'বেশি জানার তাৎপর্য বোঝো তো?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল জগজিৎ।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি তোমাদের আগের সিদ্ধান্তই বহাল থাকছে। তোমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, কথা আদায় করার পর আমাকে মেরে ফেলা হবে। সেটা বদলানো হবে না। এই তো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জগজিৎও। 'যোগ্য প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলেও আরাম। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। কোন সন্দেহ নেই তুমি ঝানু প্রফেশনাল। তবে, একটু

ভুল হচ্ছে তোমার। তোমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ-কথা ঠিক। কিন্তু বিকল্প একটা প্রস্তাবও আছে বৈ কি। অবশ্য তুমি দলবদল করতে চাইবে বলে মনে হয় না। দেশপ্রেমিক টাইপদের দেখলেই আমরা চিনতে পারি। যেমন আশরাফকে দেখেও চিনতে পেরেছিলাম।' প্রেমদাসের দিকে তাকাল সে। 'বাংলাদেশীদের একটা প্রশংসা না করে পারা যায় না, অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। প্রস্তাবটা হলো...'

'ভুলে যাও।'

'শুনতেও চাও না?' অবাক হলো প্রেমদাস।

'না।'

'তারমানে মুখও খুলবে না,' জনান্তিকে বলল জগজিৎ। 'আমরাও ধারণা করেছিলাম, গোয়ার্তুমি করবে তুমি। ঠিক আছে, আরেকটু অন্ধকার হোক।'

'হলো, তারপর?'

জগজিৎ হাসল। 'তারপর তোমাকে কথা বলাবার ব্যবস্থা করব। তবে এখানে নয়। আমাদের আস্তানায়। সেখানে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না। অন্তত চেঁচাবার স্বাধীনতা পাবে তুমি। মাঝখানের অল্প সময়টুকু চিন্তাভাবনা করে দেখো। প্রস্তাব ছিল, তুমি যদি বিজনেস সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করো...'

'বৃথা সময় নষ্ট করছ।'

'আমারও তাই ধারণা,' জগজিৎকে বলল প্রেমদাস। 'আস্তানায় পৌঁছে যা করার করা যাবে।' দু'জনেই ওরা কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল, যাবার আগে নিভিয়ে দিয়ে গেল আলোটা। ইতোমধ্যে বাইরে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

কিচেনের খোলা জানালা দিয়ে যানবাহনের বিরতিহীন আওয়াজ ভেসে আসছে। শহরের অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকায় অ্যাপার্টমেন্টটা। যথেষ্ট রাত না হলে রাস্তা খানিকটা ফাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রানা ধারণা করল, আরও অন্তত তিন-চার ঘণ্টা এই চেয়ারে বসে থাকতে হবে ওকে। এই মুহূর্তে মিছিলের মত ভিড় ফুটপাথে, ওকে নিয়ে বেরুতে সাহস করবে না ওরা।

ক্লাসিকাল একটা সমস্যা—ঘরের দরজা বন্ধ, চেয়ারের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা বুক, হাত দুটো বাঁধা পিছমোড়া করে, খুন হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে বন্দী। ঘরের দরজা বন্ধ বা দরজার বাইরে পাহারা রয়েছে, এ-সব তেমন কোন সমস্যা নয়। জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে ও। সমস্যা হলো, নিজেকে মুক্ত করা।

কি, পারবে? চ্যালেঞ্জ করল রানা নিজেকে।

কিন্তু মাত্র তিন মিনিটের চেষ্টাতেই কব্জির চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল, ঢিলে হওয়া তো দূরের কথা, আরও শক্তভাবে দেবে গেল রশি। ক্ষতগুলো জ্বালা করছে, পানি বেরিয়ে পড়ল চোখে।

হতাশ? হাল ছেড়ে দেবে?

পাশের ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে না। লোকগুলো ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে? না, তা যাবে না। ওরা হয়তো সিটিংরুমে বসে টিভি বা ভিসিআর-এ ছবি দেখছে। কিংবা হয়তো মাইক্রোফিল্মের রোলটা পরীক্ষা করছে। খুব বেশি সময় নেই, ওর হিসেব ভুলও হতে পারে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। বাঁচতে চাইলে যা করার

তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ঘাড় যতটা সম্ভব বাঁকা করে গোটা কিচেনের ওপর চোখ বুলাল ও। এখানে আগেও একবার এসেছে, কিন্তু এভাবে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন হয়নি। গ্যাসের চুলোটা মেঝের কাছাকাছি, এক প্রান্তে। দুটো চুলো, তবে একটাও জ্বলছে না।

একদিকের দেয়ালে একটা কাঠের মিটসেফ রয়েছে। মিটসেফের মাথায় বাসন-পেয়ালা, আলু-পেঁয়াজ ভর্তি একটা ঝুড়ি, দুধের টিন, চায়ের প্যাকেট ইত্যাদির সাথে একটা দিয়াশলাই রয়েছে।

রানা ভাবল, একটা ছুরি পেলে হত। কিন্তু পিছমোড়া করে বাঁধা হত, ছুরি পেলেই বা কি লাভ? এরপর দিয়াশলাইটার কথা ভাবল ও। আগুন ধরাতে পারা যায়? মিটসেফের দেরাজে কাগজ-টাগজ কিছু কি পাওয়া যাবে না? নিদেনপক্ষে দু'একটা ঠোঙা?

সামনের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকতে শুরু করল রানা। চেয়ারটা আগের মতই সেঁটে থাকল পিঠের সাথে, মুখ থুবড়ে মেঝেতে আছাড় খাবার অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে ও। অবশেষে পায়ের আঙুলগুলোয় ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারল, পিঠে চেয়ার নিয়ে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল রানা, প্রতি মুহূর্তে ভয় হতে লাগল এই বুঝি পড়ে গেল।

এক সময় মিটসেফের সামনে পৌঁছুল ও। কিনারা থেকে ছ'ইঞ্চি দূরে রয়েছে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা। নাক দিয়ে টেনে সেটাকে কাছে আনল, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে গেল, ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল, নিয়ে এল মুঠোর ভেতর। দেহ ভঙ্গি না বদলে মিটসেফের দেরাজ খোলার চেষ্টা করল চেয়ারের একটা পায়া নবে বাধিয়ে। ভাগ্যগুণে নবটা বেশ বড়। বার কয়েক চেষ্টা করার পর খানিকটা বেরিয়ে এল দেরাজ। এরপর আবার ওকে ঘুরতে হলো, কারণ চেয়ারের আড়াল থাকায় দেরাজের ভেতর কি আছে দেখতে পাচ্ছে না।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শুধু দেরাজ খোলেনি, খোলা দেরাজ থেকে ভাঁজ করা অনেকগুলো খবরের কাগজও মেঝেতে পড়ে গেছে। আবার ঘুরল রানা, চেয়ারের পায়ার সাহায্যে কাগজগুলোকে টেনে আনল সরাসরি ওর হাতের নিচে। কয়েকটা কাগজ এমনভাবে সাজাল যাতে দেরাজের ভেতরও আগুন ঢুকতে পারে।

কপালে ঘাম জমেছে। হাঁপিয়েও গেছে রানা। পরিশ্রমে নয়, উদ্বেগে। যে-কোন মুহূর্তে কিচেনে চলে আসতে পারে খুনী দু'জন।

এবার দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা খুলতে হবে। কাজটা সামান্য, কিন্তু সাংঘাতিক ভোগাল রানাকে। দুই হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের এত কাছে যে নাড়াচাড়া করার জায়গা নেই। প্রতি মুহূর্তে হাত থেকে খসে মেঝেতে পড়তে চাইছে বাক্সটা, পেশীতে টান পড়ায় গোটা হাত ব্যথায় টন টন করছে। অনেক কসরৎ করার পর বাম হাতে বাক্স, ডান হাতে একটা কাঠি ধরতে পারল রানা। বাক্সের গায়ে কাঠিটা ঘষা কঠিন হলো না। বারুদের জ্বলে ওঠার আওয়াজ পেল রানা। জ্বলন্ত কাঠিটা কাগজের ওপর ছেড়ে দিল। ধোঁয়ার গন্ধ আর শিখার শব্দ পাবার অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কাজেই গোটা ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি শুরু হলো–বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে বাক্সের গোড়ায় ঠেলা দাও, ডান হাতের আঙুল দিয়ে বের করো একটা কাঠি–ধেত্তেরি, পাঁচ-ছ'টা কাঠি আঙুলের ফাঁক গলে খসে পড়ল নিচে–বন্ধ করো বাক্স, বাঁ হাতে নিয়ে এসো ওটাকে, কাঠিটা ডান হাতের দু'আঙুলে ধরে বাক্সের গায়ে ঘষো, জ্বলন্ত কাঠিটা ছেড়ে দাও, মেঝেতে পড়ুক ওটা। কিন্তু এবারও কিছু ঘটল না।

তৃতীয়বার চেষ্টা না করে আরেকটু মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করল রানা। চেয়ার নিয়ে পিছন দিকে মেঝেতে পড়তে পারে ও? যাতে কাগজগুলোকে স্পর্শ করা যায়?

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল রানার। পিছন দিকে আছাড় খাওয়া সম্ভব, কিন্তু তারমানে দাঁড়াতে পারে জ্যান্ত পুড়ে মরার ব্যবস্থা পাকা করা। কাজেই আবার কাঠি বের করারই চেষ্টা করল।

সব সেই আগের মত ঘটল। জ্বলন্ত কাঠিটা দু'আঙুল থেকে ছেড়ে দিল রানা। এবারও কাগজে আগুন ধরল না।

সাতবারের বার সফল হলো রানা। ইতোমধ্যে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, চেহারা হয়েছে উন্মাদের মত। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে ঢিল পড়ল পেশীতে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ঘুরল ও, দেখতে চায় কি ঘটছে।

আগুন ধরেছে, তবে এখনও সেটা ছোট্ট। মেঝের অন্যান্য কাগজের দিকে ছড়াতে শুরু করার সাথে সাথে ওপর দিকেও উঠে যাবে সেটা। সামনের দিকে ঝুঁকে ফুঁ দিল রানা। গোটা একটা খবরের কাগজে আগুন ধরে গেল। তৃপ্তির সাথে লক্ষ করল, লকলকিয়ে দেরাজের দিকে উঠছে একটা শিখা।

আগের জায়গায় ফেরার জন্যে আবার ঘুরতে হলো রানাকে। ঠিক আগের পজিশনে স্থির হবার পর আগুনটার দিকে আবার তাকাল। বাহ্, রীতিমত দাউ দাউ করে জ্বলছে। গোটা দেরাজে আগুন ধরে গেছে, পুড়তে শুরু করেছে মিটসেফের শরীর, এরইমধ্যে কালচে হয়ে গেছে কাঠ।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা। খুনী দু'জন এসে যেন দেখে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে আগুন। মিটসেফের মাথা থেকে লাফ দিয়ে শিখাগুলো কাঠের মাচা স্পর্শ করল। মাচায় আগুন সিলিং ছুঁলো। এবার চিৎকার করা যায়।

প্রথমে এল জগজিৎ পাণ্ডে, উঁকি দিয়েই বিস্ফারিত চোখ নিয়ে পিছিয়ে গেল সে, আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা থেকে, 'আগ! আগ!' তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিল প্রেমদাস চোপড়া।

'হায় ভগবান! আগ লাগা ক্যায়সে!'

প্রেমদাসকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল জগজিৎ, আগুনের দিকে একটা চোখ রেখে কিচেন ট্যাপ-এর প্যাঁচ ঘোরাল।

'কোঈ ফায়দা নেহি!' চিৎকার করে বলল প্রেমদাস। 'ট্যাপের পানি দিয়ে নিভবে না! দেখছ না চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে!'

ঘটনাচক্রে, কিচেনে কোন বালতি নেই। জগজিৎও বুঝল, এ আগুন তাদের

ধারা নেভানো সম্ভব না। ঝট করে রানার দিকে ঘুরল সে, হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে। 'তুমি লাগিয়েছ, তাই না?' কিন্তু কোন জবাব পেল না। ধোঁয়া গিলে কাশছে রানা।

আটকা পড়া ইঁদুরের মত ঘরময় ছুটোছুটি করল জগজিৎ, তারপর প্রেমদাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শালাকে এখানে ফেলে পালাই চলো।' চোখ রগড়াল সে।

'না,' বলল প্রেমদাস। 'কোনমতেই না। ওকে আমাদের দরকার। ওকে নিয়ে...'

'বুঝতে পারছ না!' উন্মাদের মত মাথা দোলাল জগজিৎ। 'ওকে নিয়ে নিচে নামলেই পালাতে চেষ্টা করবে, চিৎকার করে লোক জড়ো...'

'চেষ্টা করে দেখুক।' খক খক করে কাশতে কাশতে ছুটে রানার কাছে চলে এল প্রেমদাস, ব্যস্ত হাতে ওর বাঁধন খুলছে। আগুনের আঁচ এরইমধ্যে অসহ্য হয়ে উঠছে। 'কি করতে চেয়েছিলে জানি,' রানাকে বলল সে। 'ভেবেছিলে আগুনে পোড়াতে পারবে রশিটা, তাই না?' তার চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। রাগে দাঁত কিড়মিড় করল। 'কিন্তু তোমাকে তো আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান থেকে যে ইনফরমেশন পাচ্ছি, তোমাকে পালাতে দিলে তা কি আর পাব আমরা? অথচ আরও ইনফরমেশন আমাদের পেতে হবে...'

বাঁধন মুক্ত হবার পর নিজের পায়ে দাঁড়ালই শুধু রানা, হাঁটতে পারল না। চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করল, তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল প্রেমদাস। ওরা দু'জন ওর দুটো হাত ধরে বের করে আনল কিচেন থেকে। সিটিংরুমে একবার দাঁড়াল ওরা, প্রেমদাস টেলিফোন করল ফায়ার ব্রিগেডে। সময় পেয়ে হাত আর পা নাড়াচাড়া করে রক্ত প্রবাহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল রানা। নিকট ভবিষ্যতে কি করণীয় ভাবছে। জগজিৎ পান্ডের হাতে পিস্তল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সিধে হলো প্রেমদাস। 'চলো!' মারমুখো ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল সে। 'তার আগে শুনে রাখো—দু'জনেই আমরা সশস্ত্র। আমার পিস্তলটা ট্রাউজারের পকেটে থাকবে, কিন্তু আঙুল থাকবে ট্রিগারে। যদি দেখি তুমি পালাতে চেষ্টা করছ বা চিৎকার দিতে যাচ্ছ, পকেট থেকেই গুলি করব। আর গুলি করব খুন করার জন্যে।'

তার কথা বিশ্বাস করল রানা। ওকে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল দু'জন। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ওর দু'পাশে থাকল তারা। ইতোমধ্যে জগজিতের পিস্তলটাও ট্রাউজারের পকেটে গিয়ে ঢুকেছে।

নিচের হলে নেমে এল তিনজন, কারও সাথে দেখা হলো না। হল পেরিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ফুটপাথে, জনতার সচল মিছিলের মাঝখানে। রানার একটা হাত ধরে ওর পিছনে রয়েছে প্রেমদাস, ওদের সামনে রয়েছে জগজিৎ। বিশ গজ দূরে বহু লোকের একটা জটলা দেখা গেল, কিচেন থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। ভিড়টাকে এড়াবার জন্যেই ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে এল জগজিৎ, রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠতে চায়। কে জানে, ভাবল রানা, ওদের গাড়িটা হয়তো ওদিকেই কোথাও লুকানো আছে।

কিন্তু রাস্তায় নামলেও, সামনে যানবাহনের বিরতিহীন ছুটোছুটি, অগত্যা নিরাপদ

একটা ফাঁক পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ওদেরকে। রানার কানে কানে ফিস ফিস করল প্রেমদাস, 'সাবধান! বোকার মত কিছু করতে গিয়ে নিজের অকাল মৃত্যু ডেকে এনো না।'

তার কথা শুনতেই পেল না রানা। একজোড়া ভ্যান দেখতে পাচ্ছে ও। ভাবছে আশরাফের কথা। ছেলেটার জন্যে গর্ব অনুভব করল। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের ট্রেনিং সম্পর্কে জানা আছে ওর, জানা আছে বিজনেস সিন্ডিকেটের ইন্টারোগেশনের পদ্ধতি সম্পর্কে। সব সহ্য করেছে আশরাফ, তবু মুখ খোলেনি। দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে সে, লোভনীয় প্রস্তাব পায়ে দলে। তার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ যদি নিতে না পারে, নিজেকে রানা কোন দিন ক্ষমা করতে পারবে?

ভ্যান দুটো থেকে উপচে পড়ছে ভারতীয় সৈন্য। ভ্যানের মাথার কাছে মেশিনগান ফিট করা রয়েছে। মেশিনগানের পিছনে গানার, শ্যেনদৃষ্টিতে চোখ বুলাচ্ছে ফুটপাথে সচল লোকারণ্যের ওপর। কারণটা পরিষ্কার। তামিল গেরিলারা প্রতিদিনই কলম্বো শহরের আনাচেকানাচে অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করে, ভারতীয় সৈন্য দেখলেই শুরু করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ। ভ্যান দুটোর গতি দেখেই বোঝা যায়, সদলবলে টহলে বেরিয়েছে সৈন্যরা। অন্যান্য যানবাহন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

রানার পিঠে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল প্রেমদাস। জগজিৎ রাস্তা পেরুতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল রানা। প্রথম ভ্যানটার সামনে দিয়ে রাস্তাটা পেরিয়ে যাবে ওরা, ডান দিকে সেটা এখনও পনেরো গজ দূরে। রাস্তার মাঝখানে এসে আত্মহননের পথটাই বেছে নিল রানা। জানে, মৃত্যুর ঝুঁকি না নিলে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না।

ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে প্রেমদাস, তার সন্দেহ রানা হঠাৎ করে সামনের দিকে ছুট দিতে পারে। ছুট দিল রানা, কিন্তু পিছন দিকে। তার আগে প্রেমদাসের পাঁজর লক্ষ্য করে কনুই চালাতে ভুল হয়নি ওর।

রাস্তার মাঝখানে অদ্ভুত এক দৃশ্য। সদ্য আছাড় খেয়ে পড়া প্রেমদাসকে লাফ দিয়ে টপকাল রানা, তিন গজ এগিয়ে থামল, চিৎকার জুড়ে দিল, 'টেরোরিস্ট!' লম্বা করা হাত প্রেমদাস আর জগজিতের দিকে তাক করা। জগজিৎ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরেই! 'টেরোরিস্ট! টেরোরিস্ট! টেরোরিস্ট!' চিৎকার করছে রানা, দ্রুত পিছিয়ে আসছে। চট করে একবার সামনের ভ্যানটার দিকে তাকাল! তারপর মুখ ফেরাতেই দেখল, বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করছে প্রেমদাস।

কিন্তু তার ভুলটা বুঝতে পেরে চিৎকার করে উঠল জগজিৎ। 'না! প্রেমদাস, না!' সঙ্গীকে বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে এল সে।

আর ঠিক তখুনি গুলি হলো। মেশিনগানের প্রথম দফার বর্ষণে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল প্রেমদাস, তার হাতের পিস্তল থেকে বেরিয়ে বুলেটটা উঠে গেল আকাশের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জগজিৎ, ঘাড় ফেরাতে শুরু করল ভ্যানের দিকে, খালি হাত দুটো উঠে যাচ্ছে মাথার ওপর। এই সময় আবার গুলি হলো।

ঝাঁকি খেতে খেতে পিছুতে শুরু করল জগজিৎ পাণ্ডে। হাজার হাজার দর্শক দেখল, লোকটা যেন নৃত্যচর্চা করছে। তার শার্ট আর ট্রাউজারে অসংখ্য ফুটো তৈরি হলো, প্রতিটি ফুটো ভরে উঠল লাল রক্তে। পড়ে গেল সে। সেই সাথে মেশিনগানও থামল। মুহূর্তের জন্যেও পিছু হটা বন্ধ করেনি রানা, ফুটপাথে ওঠার পর উপলব্ধি করল ওর দু'পাশ দিয়ে বুলেটের মত ছুটে যাচ্ছে মানুষজন। নিমেষে তাদের একজন হয়ে যেতে কোন সমস্যাই হলো না ওর।

পাঁচ

চোখ থেকে হালকা ফ্রেমের চশমাটা খুললেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, খোলা একটা ডোশিয়েরের ওপর রাখলেন সেটা, হেলান দিলেন রিভলভিং চেয়ারে, ঢুলুঢুলু চোখে হিমশীতল দৃষ্টি, রানার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'প্রেমদাস আর জগজিৎ প্রসঙ্গ শেষ হলো। ঠিকই আছে। অস্বাভাবিক ঝুঁকি নিয়েছ তুমি, অন্য কোন পরিস্থিতি হলে একে অমানবিক বলতাম–কিন্তু বি.সি.আই-এর একজন এজেন্টকে খুন করে কেউ পার পেয়ে যাবে, এ হতে পারে না। তবে কি জানো, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তাতে বেশ খানিকটা চিড় ধরল। এজেন্টরা একটা ক্রাইম সিন্ডিকেটের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে, প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করছে, অথচ কর্মকর্তারা নির্বিকার, স্রেফ অবিশ্বাস্য।'

'লাগেজসহ গাড়িটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে, আমি আর ওটার কাছে ফিরে যাইনি,' বলল রানা।

'ভালই করেছ। তোমার হয়তো জানার কৌতূহল রয়েছে–সেই রাতেই তোমার লাগেজ চুরি যায়, আর গাড়িটা থানায় নিয়ে গেছে পুলিস। একটা খাল থেকে আশরাফের লাশও উদ্ধার করা হয়েছে।' ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটুকরো ভেলভেট বের করলেন রাহাত খান, চশমার কাঁচ পরিষ্কার করছেন। 'সব মিলিয়ে, বলতে হয়, ফলাফল খুব একটা ভাল হয়নি–কি বলো?'

'জ্বী।' মৃদুকণ্ঠে স্বীকার করল রানা। 'ডকুমেন্টের ফটো-কপিটা হাতছাড়া হয়েছে। তবে...'

'আর ভুলটা?' হঠাৎ তলোয়ারের মত খাড়া হলো রাহাত খানের শিরদাঁড়া, চোখে চশমা পরে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন রানার দিকে। 'গ্যারেজের স্লিপ কোন আক্কেলে সাথে রাখলে তুমি, বিশেষ করে যখন জানতে ওটা আশরাফের গাড়ি? নো, নেভার–এ-ধরনের ভুল তোমার কাছ থেকে আশা করি না আমি। কি মাসুল দিতে হলো? সামান্য ভুল, কিন্তু কি ক্ষতি হয়ে গেল!'

চেম্বারের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এল। রানা অধোবদন, এক চুল নড়ছে না, অপরাধবোধে জর্জরিত।

'ভবিষ্যতে এ-ধরনের ত্রুটি যেন আর না হয়,' গম গম করে উঠল রাহাত

খানের ভারী কণ্ঠস্বর। 'প্রতিশোধ নিতে পেরেছ, তাই আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। আবার যদি স্লিপ করো, গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমাকে আর আমাদের দরকার হবে না। মনে থাকবে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। ভুলটা অপরাধের সমতুল্য, জানে ও। ভুল আশরাফও করেছে, নিজের নামে রেজিস্ট্রি করা গাড়ি রানাকে ব্যবহার করতে দেয়া উচিত হয়নি তার। ছোট্ট একটা ভুল, কিন্তু প্রাণ দিয়ে তার মাসুল দিতে হলো তাকে। প্রায় একই ধরনের ভুল করেছে রানাও।

'তবে...কি?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান, রানার শেষ কথাটার সূত্র ধরে।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকটা হালকা করে নিল রানা, কথা বলার সময় বসের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। 'আমি একটা তথ্য জানি। ডকুমেন্টটা বাংলাদেশের কোন প্রজেক্ট থেকে চুরি করা হয়েছে। প্রজেক্টের নামটা আমি জানি—জিরো-জিরো-ওয়ান।'

চোখ দুটো যেন অকস্মাৎ দপ করে জ্বলে উঠল, পরমুহূর্তে কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে ধমকের সুরে বললেন রাহাত খান, 'কি করে বুঝলে সূত্রটা তোমাকে ইচ্ছে করে দেয়া হয়নি?'

'আমার তা মনে হয় না,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'একটা ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ওরা আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। ওরা ধরে নিয়েছিল ডকুমেন্টটা আমি পরীক্ষা করেছি—সুযোগ পেলে করতামও। তাছাড়া, কিচেনে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, মিথ্যে তথ্য দেয়ার পরিবেশ ছিল না সেটা।'

'আচ্ছা, বেশ,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান, মনে মনে রানার ওপর সন্তুষ্ট, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিলেন না। 'তুমি যখন নিঃসন্দেহ, তথ্যটা মিথ্যে নয় বলেই ধরে নিচ্ছি।' রানার অবনত মস্তকের দিকে চোখ রেখেই ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিল ইলোরা।

'সোহেলকে দরকার,' বললেন তিনি। 'প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান-এর ফাইলটা নিয়ে এখুনি আসতে বলো।'

রানার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান কি জিনিস। কিন্তু বসের মেজাজ ঠিকমত ঠাহর করতে না পেরে প্রশ্নটা করল না। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কলম্বো থেকে প্রেমদাস আর জগজিতের রিপোর্ট না পেয়ে বিজনেস সিন্ডিকেট ধরে নেবে তারা বেঁচে নেই। বাংলাদেশে তাদের স্পাইকে সাবধান করে দেবে ওরা।'

'তুমি ভাবছ লোকটাকে ধরা কঠিন হবে? সেটা নির্ভর করবে তার নার্ভ আর ব্যক্তিত্বের ওপর। ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে শুনলেই হয়তো নার্ভাস হয়ে পড়বে সে।'

চেম্বারের দরজায় টোকা পড়ল।

'কাম ইন!' অনুমতি দিলেন রাহাত খান।

পরনে স্যুট, হাতে একটা ফাইল, স্মার্ট ভঙ্গিতে চেম্বারে ঢুকল সোহেল আহমেদ।

'বসো,' বললেন রাহাত খান। 'প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান সম্পর্কে যা জানো সব বলো রানাকে—প্রজেক্টের জন্ম, ইতিহাস, কি নিয়ে ব্যাপারটা, তাৎপর্য, এবং নিরাপত্তার দিকগুলো।' কথা শেষ করে বাক্স খুলে একটা চুরুট বেছে নিলেন তিনি, আগুন ধরিয়ে হেলান দিলেন চেয়ারে।

হাতলহীন একটা চেয়ারে রানার পাশে বসল সোহেল, ডেস্কের ওপর ফাইলটা রেখে খুলল। 'অ্যাটমিক সাবমেরিন নটিলাসের কথা তো জানিস?' রানার দিকে ফিরে শুরু করল সে, কথার মাঝখানে বারবার খোলা ফাইলে চোখ বুলাল। 'নটিলাস তৈরি করেছিল ইলেকট্রিক বোট কোম্পানী—ওরা জাহাজ ছাড়া আর কিছু তৈরি করে না। আরেকটা প্রতিষ্ঠান, জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশন, এয়ারক্রাফট তৈরি করে। ইলেকট্রিক বোট কোম্পানী অ্যাটমিক সাবমেরিন তৈরি করার পর সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যায়, সেই সাথে জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশন অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। এই কোম্পানী দুটো এমন এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন এঞ্জিন চালাবার জন্যে অ্যাটমিক এনার্জি ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু অ্যাটমিক সাবমেরিন তৈরিতে সাফল্য এলেও, অ্যাটমিক এ্যারোপ্লেন তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সমস্যার প্রকৃতিটা কি বোঝাবার জন্যে এত কথা বলা।

'এরপর আরও বহু প্রতিষ্ঠান গজিয়েছে, অত্যাধুনিক বহু ধরনের প্লেন দেখেছি আমরা, কিন্তু অ্যাটমিক প্লেন তৈরির স্বপ্ন আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে। সমস্যাটা কি? কেন অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করা সম্ভব হয়নি?'

'উন্নত বিশ্বে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী কয়েক যুগ ধরে গবেষণা চালিয়েও কোন সমাধান দিতে পারেনি। সমস্যাটা হলো—ওজন। র‍্যাডিয়েশন থেকে ক্রু আর মেশিন বাঁচাবার জন্যে সীসা বা পানির একটা শীল্ড দরকার। কিন্তু প্রতি পাউন্ড শীল্ড মানে প্লেনের জন্যে অতিরিক্ত এক পাউন্ড বোঝা। ইদানীং গোটা ব্যাপারটার ন্যূনতম ওজন দাঁড়ায়, এয়ারক্রাফট আর অ্যাটমিক এঞ্জিনসহ, প্রায় তিনশো টন। বুঝতেই পারছিস, অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'গোড়াতেই একটু খটকা লাগছে আমার,' বলল রানা। 'আমরা যেখানে প্লেনই তৈরি করতে পারি না, সেখানে অ্যাটমিক প্লেন তৈরির সাথে বাংলাদেশের কি সম্পর্ক? নাকি কোন সম্পর্ক নেই?'

'আছে,' চট করে একবার রাহাত খানের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল সোহেল। 'সে ব্যাখ্যাই তো দেয়া হচ্ছে তোকে, তুই শা-, মানে, শান্ত হয়ে একটু ধৈর্য ধর। তার আগে জানা দরকার, আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে, কিন্তু পৃথিবীর কোথাও এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, এ-ধরনের অন্তত বারোটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা চলছে বাংলাদেশে। এগুলোর যে-কোন একটা আবিষ্কার করা সম্ভব হলে গোটা বিশ্ব উপকৃত হবে, আর বাংলাদেশ পাবে সম্মান ও অর্থ। আমরা পিছিয়ে আছি, কিন্তু তারমানে তো এই নয় যে চিরকাল পিছিয়ে থাকতে হবে, অন্তত চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, বিশেষ করে আমাদের বিজ্ঞানীরা যখন উন্নত বিশ্বের মানদণ্ডেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালভাবে উতরে যেতে পারছেন। বারোটা বিষয়ের মধ্যে এটাও

একটা—অ্যাটমিক প্লেন তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কার।'

রানা কিছু বলার আগে রাহাত খান প্রশ্ন করলেন, সোহেলের দিকে গভীর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি, 'আমি কি ধরে নেব, ওজনের প্রশ্নটাই অ্যাটমিক প্লেন তৈরির ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা?'

'জ্বী, স্যার, আমার তাই বিশ্বাস।'

'বাংলাদেশে এ-ধরনের গবেষণা চলছে অথচ···!' মৃদু হলেও, রানার গলায় খেদ প্রকাশ পেল।

ওকে বাধা দিয়ে সোহেল বলল, 'দুঃখ করার কিছু নেই তোর। কারণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অল্প দু'চারজন ব্যক্তি ছাড়া কি কি বিষয়ে কোথায় গবেষণা চলছে কেউ তা জানে না। বি.সি.আই. কেন জানে, সেটা তুই-ও বুঝিস। মাঝখানে কথা না বলে পটভূমিটা ব্যাখ্যা করতে দে আমাকে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বছর দুই আগে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স এই অ্যাটমিক প্লেন তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কারের জন্যে একটা ল্যাবরেটরি গড়ে তোলে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, এয়ারফোর্সের যে-কোন বিজ্ঞানী, তার যদি সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স থাকে, এই ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু মাস কয়েক পর সিদ্ধান্ত হয়, তিনজন বাংলাদেশী বিজ্ঞানীকে গবেষণা চালানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এয়ারফোর্সের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবাই তাঁরা দেশে ফিরে আসেন, রাজি হন গবেষণা চালাতে। এখানে বলে রাখা দরকার, তিনজনই তাঁরা এই একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন দেশে কাজ করছিলেন।

'বাধাটা কি, তা তো শুনলিই—ওজন। সেই বাধা বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের দ্বারা টপকানো সম্ভব হয়েছে,' বলে চলল সোহেল, আরেকবার চোখ বুলাল ফাইলে। 'এ-বছরের এপ্রিলে তৈরি একটা মেমোর‍্যানডাম রয়েছে এখানে, বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমাদের বিজ্ঞানীরা কিভাবে একটা শীল্ড তৈরিতে সফল হলো···' পাতা ওল্টাবার জন্যে থামল সে। 'এক মিনিট। এখানে বলা হয়েছে, জিনিসটা কি দিয়ে তৈরি, তৈরির পদ্ধতি। সবটুকু জানতে চাস?'

'কি দরকার!' রাহাত খান মন্তব্য করলেন, 'প্রথমবার যখন শুনি, মনে হয়েছিল গ্রীক। দ্বিতীয়বার হিব্রু।'

'মোটকথা,' বলল সোহেল, 'ওরা এমন একটা হালকা শীল্ড তৈরি করতে পেরেছে, যার ফলে ভবিষ্যতে অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করতে চাইলে সর্বসাকুল্যে ওজন নেমে আসবে আশি টনে। আশি টন—বলা হয়েছে, এটা গ্রহণযোগ্য একটা ওজন।'

'এই শীল্ড সম্পর্কে কার কি রকম আগ্রহ বলে তোমার ধারণা, সোহেল?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'আমি আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, এমনকি ভারত ও পাকিস্তানেরও কথা বলছি।'

'মার্কিন প্রেস আমাদের গবেষণা সম্পর্কে প্রথম আঁচ করতে পারে,' বলল সোহেল। 'তারপরই গবেষণা কত দূর এগিয়েছে জানার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে

সি.আই.এ.। ওদের দেখাদেখি কে.জি.বি-ও চর পাঠায়। তারপর একে একে আসতে থাকে আর সবাই। ভারত আর পাকিস্তান কূটনীতিক পর্যায়ে খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করে। ভারত প্লেন তৈরি করে, তাই না? তারাও অ্যাটম ভাঙতে পারে। পাকিস্তান প্লেন হয়তো তৈরি করে না, কিন্তু করতে কতক্ষণ? তারাও অ্যাটম ভাঙতে পারে বলে জোর গুজব রয়েছে বাজারে। ফর্মুলাটা পেয়ে, ওরা যদি অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করে, ফলাফলটা সহজেই অনুমেয়। ভারত বা পাকিস্তানের এয়ারফোর্স, এক কথায়, রাতারাতি অজেয় হয়ে উঠবে। সেই সাথে রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স আর ব্রিটেনের এয়ারফোর্স, বলা যায়, তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে। কিংবা, যদি আমেরিকা পেয়ে যায় ফর্মুলাটা...'

'কে পেলে কি ঘটতে পারে, সেটা বরং রানাকে কল্পনা করে নিতে দাও,' সোহেলকে পরামর্শ দিলেন রাহাত খান। 'ওকে জিজ্ঞেস করো, ওর কোন প্রশ্ন আছে কিনা।'

'প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান তাহলে ওই একটা বিষয়েই গবেষণা চালাচ্ছে?'

'না-না,' মাথা নাড়ল সোহেল। 'ওটা মূল সমস্যা, কিন্তু একমাত্র বলা যায় না। সমস্যা আরও অনেক আছে, এক এক করে সেগুলোরও সমাধান করা হচ্ছে।' ফাইলের গায়ে টোকা দিল সে। 'কি রকম ঢাউস দেখছিস না? প্রতিটি বিষয়ে বিশদ তথ্য দেয়া আছে...'

মুখ তুলে রাহাত খানের দিকে তাকাল রানা। 'স্যার, আমি বোধহয় কাজ শুরু করে দিতে পারি।'

'আমারও তাই ধারণা। দেরি করা উচিত হবে না।' সোহেলের দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'সোহেল, ভারত থেকে ফিরে রানা যা বলছে, তা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে—প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ানে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে একজন বেঈমান আছে। বিজনেস সিন্ডিকেট প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান থেকে কিছু একটা চুরি করে নিয়ে গেছে। সেটা কি হতে পারে, রানা জানতে পারেনি। ধরে নিতে হয়, ফর্মুলাটাই।'

সোহেলের দিকে ফিরল রানা। 'শীল্ড তৈরিতে যারা কাজ করছে, তাদের সম্পর্কে তোর ফাইলে কিছু আছে?'

ফাইল ঘেঁটে সবুজ একটা কাগজ বের করল সোহেল। 'এই নে। হেডিংটা দেখ—রিসার্চ প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান। তিনজন বিজ্ঞানী কাজ করছে, সবার সম্পর্কে যা কিছু জানার সব এতে লেখা আছে।'

'আচ্ছা, মাত্র তিনজন লোক...?'

সোহেল বলল, 'এই তিনজন হলো মাস্টার মাইন্ডস। হেড অভ প্রজেক্ট—রিয়াজুল হাসান, বয়স পঁয়তাল্লিশ। সুব্রত বড়ুয়া, বত্রিশ। আর, শারমিন চৌধুরী, আটাশ। রিয়াজুল হাসান অ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, বাকি দু'জন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।'

'বেশ,' বলল রানা। 'কোথায় গেলে পাব ওদের?'

'চট্টগ্রামে,' মৃদু হেসে বলল সোহেল। 'এয়ারফোর্সের ল্যাবটা ওখানেই। ওটা এয়ারফোর্সের হলেও, ওরা কেউ এয়ারফোর্সের লোক নয়—বলতে পারিস, আমন্ত্রিত

গবেষক। এয়ারফোর্সের বহু টেকনিশিয়ান ওদেরকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু সরাসরি গবেষণা বা ল্যাবের সাথে ওরা তিনজনই শুধু জড়িত।'

'তুমি তাহলে, রানা,' রাহাত খান বললেন, 'আজকালকের মধ্যেই চট্টগ্রামে চলে যাও। সোহেল, ওদের তিনজন সম্পর্কে তৈরি করা ডোশিয়ে থাকলে একটা করে কপি দাও ওকে।'

'জ্বী, স্যার। আরেকটা কথা…ভাবছিলাম. এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্সকে ব্যাপারটা জানাব কিনা। ওরা হয়তো রানাকে সাহায্য করতে পারত।'

'উহুঁ,' সাথে সাথে আপত্তি তুলল রানা। 'ওদের আমি চিনি। যদি জানতে পারে ওদের একটা আউট-ফিটে বেঈমান আছে, গোটা এলাকা সীল করে দেবে–ধারে কাছে আমি ঘেঁষতেই পারব না। উহুঁ, ওদেরকে না জানানোই ভাল।'

মুচকি একটু হেসে রাহাত খান সমর্থন করলেন রানাকে। 'ও ঠিকই বলেছে। বেঈমান একজন আছে, এটা আমরা যখন আবিষ্কার করেছি, তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব ও কৃতিত্ব আমরাই নেব, আর কাউকে নাক গলাতে দেই কেন?'

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কনফিডেনশিয়াল
ডিভিশন ফাইভ
রিয়াজুল হাসান
জন্ম তারিখ: আটাশে ডিসেম্বর, ১৯৪৩, ইংরেজি।
জন্মস্থান: খুলনা।
দৈহিক বর্ণনা: উচ্চতা–পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চি। চোখ–কালো। চুল–কালো। বিশেষ চিহ্ন–বাঁ হাতের দ্বিতীয় আঙুল কাটা।
সাধারণ বিবরণ: নামকরা ডাক্তারের বড় ছেলে। খুলনায় দু'জন বিবাহিতা বোন আছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড আর ম্যাসাচুসেটস-এর ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজিতে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশনে তিন বছর চাকরি করেছে। নিজের কাজের প্রতি নিবেদিত সুদক্ষ টেকনিশিয়ান। রাজনীতিতে সক্রিয় নয়। উনিশশো ছেষট্টি সালে সুফিয়া খাতুনকে বিয়ে করে, সাত বছর পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়. কোন সন্তান নেই। চারিত্রিক কোন দুর্বলতার কথা জানা যায়নি। ড্রাগস, মদ বা আফিম, কিছুই খায় না। ধূমপান করে, খুব বেশি নয়। আর্থিক অবস্থা ভাল। গাড়ি আছে, টয়োটা। পৈত্রিক সম্পত্তি ও বাড়ি আছে খুলনায়। মাসিক আয়, সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজার টাকার মত।
বর্তমান ঠিকানা: টাইগার পাস, ২৭ নং কদমতলী, চট্টগ্রাম।

রানার মনে হলো, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী রিয়াজুল হাসান একটু বোধহয় বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করে। বাংলাদেশ বিমানের প্রথম শ্রেণীর টিকেটে ভ্রমণ করছে ও. চট্টগ্রামের উদ্দেশে মাঝপথে রয়েছে। দ্বিতীয় ডোশিয়েটা তুলে নিল ও।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কনফিডেনশিয়াল

ডিভিশন ফাইভ
সুব্রত বড়ুয়া
জন্ম তারিখ: তেসরা এপ্রিল, ১৯৫৬, ইংরেজি।
জন্মস্থান: ঢাকা।
দৈহিক বর্ণনা: পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি। চোখ—কালো। চুল—একটু লালচে। বিশেষ চিহ্ন—ডান কপালে সামান্য কাটা দাগ। চশমা পরে। সাধারণ বিবরণ: বাবা এঞ্জিনিয়ার। এক বোন কলেজে পড়ে। ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর আমেরিকায় পড়তে যায়। ফিলাডেলফিয়ার স্কুল অভ অ্যারোনটিকস থেকে ডিগ্রী নিয়ে নিউক্লিয়ার প্রপালশন সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। একাধিক মার্কিন বিমান তৈরি কারখানায় চাকরি করে। পরে রাশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে মস্কোয় একটা গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করে। তার রাজনীতি সচেতনতা সম্পর্কে জানা গেছে, সর্বহারা পার্টির সাথে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ ছিল, পরে কাজের ব্যস্ততায় ও দেশে অনুপস্থিত থাকার দরুন যোগাযোগ একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোন ধর্মের প্রতিই দুর্বলতা নেই। অবিবাহিত, মেয়েদের সঙ্গ ভারি পছন্দ করে। জুয়া খেলে না, সামান্য মদ খায়, সিগারেট খায় প্রচুর। বেশ সচ্ছল। পুরানো একটা গাড়ি আছে—ফোক্সওয়াগেন। মাসিক আয় বিশ হাজার টাকার নিচে নয়। সব খরচ হয়ে যায়। বর্তমান ঠিকানা: ৯/৮ নং স্ট্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম।

ডোশিয়েটা নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল রানা, তারপর শেষ কাগজটা তুলে নিল।

বাংলাদেশে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কনফিডেনশিয়াল
ডিভিশন ফাইভ
শারমিন চৌধুরী
জন্ম তারিখ: পয়লা জানুয়ারি, ১৯৬০, ইংরেজি।
জন্মস্থান: দিনাজপুর।
দৈহিক বর্ণনা: পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। চোখ—কালো। চুল—কালো। বিশেষ চিহ্ন—নেই। সাধারণ বিবরণ: বাবা উকিল ছিলেন, '৭৮ সালে মারা গেছেন। মা এখনও বেঁচে আছেন, কর্মচারীদের সাহায্যে দিনাজপুরে গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরি চালান। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিল। ঢাকায় পড়াশোনা শেষ করার পর ভারত ও রাশিয়ায় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ওপর পি.এইচ.ডি. করেছে। ফ্রান্সের একটা বিমান তৈরির কারখানায় দু'বছর গবেষণা চালিয়েছে। তার আগে জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশনেও চাকরি করেছে এক বছর। রাজনীতি সম্পর্কে কোন উৎসাহ নেই। '৮০ সালে বিয়ে, '৮২ সালে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় স্বামীর সাথে। সন্তান নেই। ছেলে-বন্ধু অনেক, তবে কারও সাথেই এখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। মদ সিগারেট খায় না, অন্য কোন নেশাও নেই। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল। গাড়ি আছে, ডাটসান, নিজেই ড্রাইভ করে। ব্যক্তিগত মাসিক আয় পনেরো হাজার টাকা। খরচ করে আরও বেশি।

বর্তমান ঠিকানা: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, পাঁচতলা ৪৭/বি, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

পড়া শেষ করে সীটে হেলান দিল রানা, চোখ বুজল। খুব বেশি কিছু জানা গেল না। সর্বহারা পার্টির সাথে সুব্রত বড়ুয়ার সম্পর্ক, চট্টগ্রামে তার আর শারমিন চৌধুরীর কাছাকাছি এলাকায় বাস করা, এবং শারমিন চৌধুরী আর রিয়াজুল হাসানের প্রায় একই সময়ে জেনারেল ডায়ন্যামিক করপোরেশনে চাকরি করা, এগুলোর বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে।

তাহলে চট্টগ্রামে পৌঁছে প্রথম করণীয় কি? বিজনেস সিন্ডিকেট যে তার ইনফরমারকে সতর্ক করে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে যদি বুদ্ধিমান হয়, ভুল-ভ্রান্তি যা কিছু করেছে সব মুছে ফেলে ওর অপেক্ষায় তৈরি হয়ে থাকবে। রানার মনে হলো, সূক্ষ্ম কোন কৌশল এক্ষেত্রে তেমন কাজ দেবে না। বরং খোলাখুলি আলোচনা করাই ভাল, আচরণে আক্রমণাত্মক একটা ভাব নিয়ে–সব মিলিয়ে যেন মনে হয়, চীনামাটির দোকানে একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় ঢুকে পড়েছে।

রণকৌশল স্থির করার পর বাকি সব পানির মত সহজ হয়ে গেল। সরাসরি রিয়াজুল হাসানের সাথে তার বাড়িতে দেখা করবে ও, সমস্যা আর তদন্তের বিষয়টা তাকে জানাবে, তারপর তার মতামত চাইবে। রিয়াজুল হাসান বেঈমান হোক বা না হোক, তার বক্তব্য থেকে দরকারী অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

ছয়

টাইগার পাস, কদমতলী রোড। শহরের এই অংশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে, রাস্তা থেকে লাইনটা বেশ উঁচু, দু'পাশের বাড়িগুলোর দোতলার সাথে একই লেভেলে। শুক্রবার, ছুটির দিন, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। সাতাশ নম্বর কদমতলী খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। খানিকটা দূরে গাড়ি পার্ক করে নিচে নামল রানা। বাড়ির চেহারা পছন্দ হওয়ার মত নয়, অনেকদিনের পুরানো। বাড়ির সামনে রাস্তা, তারপর উঁচু রেললাইন। রিয়াজুল হাসানের মত একজন বিজ্ঞানী এখানে থাকে কেন? বিশেষ করে আরও ভাল কোন এলাকায়, নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ি ভাড়া করার সামর্থ্য যখন রয়েছে? রেলগাড়ির শব্দ শুনতে পছন্দ করে নাকি? ট্রেন আসাযাওয়া করার সময় বাড়িটা যে কাঁপে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্রেফ অভ্যেসবশত একতলা বাড়িটার সামনে দিয়ে একবার হেঁটে গেল রানা। সামনে একটা বস্তি শুরু হতে যাচ্ছে দেখে ফিরে এল ও। ফিরছে, শব্দ শুনে বুঝল একটা ট্রেন আসছে। জুতোর তলায় কংক্রিটের রাস্তা কাঁপতে শুরু করল। আশ্চর্য, একজন বিজ্ঞানী এখানে বাস করে: একটা লন্ড্রি পেরিয়ে এসে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, হাতে থলে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে কয়েকজন লোক। রাস্তার এক ধারে গোল্লাছুট খেলছে চার-পাঁচটা ছেলে। মাথায় ঝাঁকা ভর্তি ডাব নিয়ে এগিয়ে

আসছে একজন ফেরিওয়ালা। একটা বাড়ি থেকে এক মহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'লাটসাহেবরা এক একজন এক এক সময় নাস্তা করবে, আমি আর পারি না, বাপু! বিয়ে করে ঘরে বউ আন্, আমি আর এই বয়সে বাঁদী-দাসীর মত খাটতে পারব না!'

উপায় ছিল না, ও যে আসছে সেটা জানাতে হয়েছে রিয়াজুল হাসানকে। প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ানের সিকিউরিটি রুলস, অফিশিয়াল অনুমোদন ছাড়া কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না টেকনিশিয়ানরা। রিয়াজুল হাসানকে তাই জানানো হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একজন প্রতিনিধি, মেজর শফিকুর রহমান, সকাল দশটার দিকে তার সাথে দেখা করতে আসবে। উদ্দেশ্য এটা-সেটা নিয়ে আলাপ করা।

সদর দরজার সামনে দাঁড়াল রানা, চাপ দিল কলিংবেলের বোতামে।

কয়েক সেকেন্ড পর একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে?'

'শফিকুর রহমান।'

সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। একহারা গড়নের, প্রাণ চঞ্চল এক লোক ঝট করে বাড়িয়ে দিল একটা হাত, বলল, 'ঢুকে পড়ুন, আমি রিয়াজুল হাসান।' সামনের কামরাটা অন্ধকার মত, কোন ফার্নিচার নেই। বিজ্ঞানীর পিছু পিছু পাশের কামরায় চলে এল রানা। এটাই ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সোফা, কালার টিভি, ডেক সেট, মেঝেতে কার্পেট, সবই আছে। ঢুকেই লক্ষ করল রানা, দুটো মাত্র জানালা, দুটো থেকেই রেললাইন দেখা যায়।

'বসুন, মেজর রহমান। চা খাবেন তো?'

'না, ধন্যবাদ,' সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে বলল রানা।

'তাহলে কফি?'

'প্লীজ, না।'

'তাহলে একটা সিগারেট,' বলে নিচু টেবিল থেকে স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেটটা তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল রিয়াজুল হাসান, তার এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানাকে।

প্রথমদর্শনে বিরূপ কোন অনুভূতি জাগল না, রিয়াজুল হাসানকে বরং ভালই লাগল রানার। মুখটা বড়সড় বা থমথমে কোন ব্যাপার নয়, দৃষ্টি কাড়ার মত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সরু লম্বাটে খুলি। ঘরতে শুরু করা চুলের নিচে চওড়া কপাল, লম্বা নাক, নাকের নিচে মুখের অংশটা প্রাণবন্ত, কোণগুলোয় অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে আছে। তবে গোটা চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব রানার দৃষ্টি এড়াল না, যেমন সাধারণত বুদ্ধিজীবীদের চেহারায় দেখা যায়। চেহারাই বলে দেয়, যে-কোন সমস্যাই সামনে আসুক, সে তার ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে সেটার প্রকৃতি অনুধাবনে সমর্থ, তার জানা আছে চিন্তাধারাকে কোন্ পথে পরিচালিত করলে সমাধান আয়ত্তে আসবে।

হাঁটাচলায় ক্ষিপ্র একটা ভঙ্গি লক্ষ করল রানা। সামান্য নার্ভাস বলেও মনে হলো। কাঠের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে, নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে। ঠোঁট থেকে আগের চেয়ে একটু বিস্তৃত হয়েছে হাসিটা।

'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি।'

'ছুটির দিন, এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনি হয়তো বাইরে কোথাও যেতেন...'

'না-না, বাইরে যাব কি, কত কাজ পড়ে রয়েছে,' দক্ষ টেনিস খেলোয়াড়ের মত নেটের ওপর দিয়ে রানার দিকে বলটা পাঠিয়ে দিল রিয়াজুল হাসান, পরবর্তী আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঠিক তখুনি আবার ট্রেন আসার শব্দ হলো। ঝন ঝন করে উঠল জানালার শার্সি, টেবিলের ওপর নাচতে শুরু করল ছাইদানি। ট্রেন চলে যাবার পর হেসে উঠে রানা বলল, 'কি বলব, স্নায়ুবিদারক? আপনি সহ্য করেন কিভাবে?'

'কি, আওয়াজটা? না, কেন! আমি তো টেরই পাই না!'

'ভূমিকম্প, কামানের গর্জন, এ-সবের মধ্যেও আপনি কাজ করতে পারেন?'

'পারছি তো,' হালকা সুরে বলল রিয়াজুল হাসান, একটু যেন গর্বের সুরেই। 'যে-কোন পরিবেশে কাজ করতে পারি আমি।'

'ভাগ্যবান।'

'ঠিক তা নয়। গুরুত্ব দিলে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে এমন হাজার হাজার জিনিস আছে। নিজের কাজে এত ব্যস্ত থাকি, আমার কাছে আর কিছুর কোন গুরুত্ব নেই।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ কাটল। রানা ঠিক করল, প্রসঙ্গটা সরাসরি পাড়বে। রিয়াজুল হাসানের ওপর চোখ রেখে নিরপেক্ষ সুরে বলল, 'আমার আসার কারণটা বলা দরকার'। ব্যাপারটা জিরো-জিরো-ওয়ান প্রজেক্টকে নিয়ে। আমাদের বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে ওখান থেকে ইনফরমেশন পাচার হচ্ছে।'

আকস্মিক উদ্বেগ বা অপরাধবোধ, চেহারায় কোনটাই ফুটল না, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রিয়াজুল হাসান, কুঁচকে উঠল ভুরু। 'তাই? কি ইনফরমেশন?'

'অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট সম্পর্কে—নতুন লাইট-ওয়েট যে শীল্ডটা আপনারা তৈরি করছেন, র‍্যাডিয়েশন ঠেকানোর জন্যে।'

ঝট করে কপালে উঠে গেল রিয়াজুল হাসানের ভুরু জোড়া, কয়েক সেকেন্ড চিন্তিত দেখাল তাকে, তারপর শান্তভাবে বলল, 'সব কথা বলুন আমাকে।'

'বলার তেমন কিছু নেই। আমরা শুধু জানি, একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট ফর্মুলাটার বিশদ বিবরণ পেয়ে গেছে।'

'ক্রাইম সিন্ডিকেট? বিশদ বিবরণ?'

'সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টার পাকিস্তানে,' বলল রানা। 'তবে ভারত বাংলাদেশসহ সব ক'টা সার্ক দেশেই তৎপর তারা। জিরো-জিরো-ওয়ানের ফর্মুলাটা পাচার হয়েছে ভারতে।'

রানার মুখে কি যেন খুঁজল রিয়াজুল হাসান। কয়েক সেকেন্ড কিছু বলল না। গভীর চিন্তামগ্ন দেখাল তাকে। অবশেষে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক জানেন? অ্যাবসলিউটলি পজিটিভ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কাছে প্রমাণ আছে?'

আছে।'

মাথা নাড়ল রিয়াজুল হাসান, কিন্তু কারণটা বোঝা গেল না, যেন রানার সাথে একমত হতে পারছে না। সব মিলিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন মনে হলো রানার কাছে। চেয়ারে হেলান দিল সে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সিলিঙের দিকে, চেহারায় ফুটে উঠল হতভম্ব একটা ভাব। 'ওহ্ গড! দ্যাট'স টেরিবল!' কিন্তু সবটাই তার অভিনয় হতে পারে, অন্তত সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। অবশ্য তার পরবর্তী কথাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নির্দোষ একজন লোকের কাছ থেকে আশা করা যায়। 'আমার কাছে এসে আপনি ভাল করেছেন,' বলল সে। 'বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না। দেখুন, আমরা মাত্র তিনজন কাজ করছি প্রজেক্টটায়। তাছাড়া, অত্যন্ত কড়া গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। এ-ধরনের একটা ব্যাপার কিভাবে ঘটতে পারে...'

'কিন্তু ঘটেছে। প্রথমে এটা ভালভাবে গেঁথে নিন মগজে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে না। কিন্তু কিভাবে? আমার দুই সহকর্মী এবং নিজের ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, তাহলে...' মুখটা অস্বাভাবিক হাঁ হয়ে গেল রিয়াজুল হাসানের, তাড়াতাড়ি ফাঁকটা বন্ধ করার চেষ্টা করল সে, রীতিমত নার্ভাস। '...না, হ্যাঁ—তারমানে, আমরা তিনজনও সন্দেহের বাইরে নই!'

রানা কিছু বলল না।

'তাহলে তো ব্যাপারটা জটিল হয়ে যাচ্ছে,' বলল রিয়াজুল হাসান। 'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, অন্তত আমি তো চাই-ই, কিন্তু আপনি যদি আমাদেরকে সন্দেহ করেন, বলছি না সেটা অন্যায়, কিন্তু তাহলে আমরা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করব?'

এবারও কিছু বলল না রানা।

রেগে গেল রিয়াজুল হাসান। 'আপনি কি ভাবছেন সেটা আমাকে জানতে হবে না? বেশ তো, কি জানতে এসেছেন জিজ্ঞেস করুন। উত্তর দেয়ার সুযোগ পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমি প্রজেক্ট চীফ, আমাকে দিয়েই শুরু করতে চান, গো অ্যাহেড!'

লোকটার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক বলে মনে হলো রানার। 'আপনাকে আমি উদ্বেগ থেকে এখুনি মুক্ত করতে পারি, হাসান সাহেব। না, আপনাকে আমরা সন্দেহ করি না। করলে আপনার কাছে আসতাম না। আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে।'

'রাইট। গুড। কৃতজ্ঞ বোধ করছি। বলুন, কি সাহায্য চান।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আসুন তাহলে, প্রথমে আমরা চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলি। আপনারা তিনজন ছাড়া টেকনিশিয়ানদের আর কেউ কি ঢুকতে পারে ল্যাবে?'

'না, ভুলেও আর কারও ঢোকার উপায় নেই।'

'ঠিক জানেন?'

'ঠিক জানি। সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট অত্যন্ত কড়া। দরজার চাবি মাত্র একটা,

সেটা একা শুধু আমার কাছে থাকে। কোন কারণেই কাউকে সেটা আমি দিই না। ল্যাবের ভেতর ঝাড়ুদার, মেথর, টেকনিশিয়ান, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমনকি প্রজেক্ট ডিরেক্টরেরও ঢোকার অনুমতি নেই।'

'তাহলে ঝাড়া-মোছার কাজটা কে করে?'

'আমরাই করি–অবশ্য আমাদের হাতে ঝাড়ু দেখলে সেটা কেড়ে নেয় শারমিন,' হেসে ফেলে বলল রিয়াজুল হাসান।

'আচ্ছা।'

'আমার মনে হয়,' পরামর্শ দিল রিয়াজুল হাসান, 'আপনি বরং একবার ল্যাবে আসুন, নিজের চোখে দেখুন সব। আমি নিশ্চিতভাবে জানি চুরি হবার কোন উপায় নেই, তবে এ-ও বুঝি যে আরও নানা প্রশ্ন আছ–ডুপ্লিকেট চাবি, চোরা পথ, ইত্যাদি। বিশ্বাস করুন, সিকিউরিটি সিস্টেমে আপনি যদি কোন ত্রুটি বের করতে পারেন, আমি খুশিই হব।'

'কারণ তাহলে আপনার সহকর্মীরা সন্দেহমুক্ত হতে পারেন?'

'বাহ! প্রজেক্টের হেড হিসেবে আমি আমার সহকর্মীদের সন্দেহের ঊর্ধ্বে দেখতে চাইব না?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। যাবার ইচ্ছে আমারও ছিল, তাহলে কাল সকালে আসি?'

'আসুন।'

'আপনার সহকর্মীদের সম্পর্কে দু'একটা কথা। সুব্রত বড়ুয়া–তিনি কি মনে করেন, রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রথম জীবনের বিশ্বাস ভুল ছিল?'

ঠোঁট কামড়ে মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করল রিয়াজুল হাসান, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'খুব সতর্কতার সাথে মন্তব্য করা দরকার, তাই না? সত্যি কথা বলতে কি, রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথাই তাকে আমি কখনও বলতে শুনিনি। কাজের প্রতি সাংঘাতিক নিবেদিত সে। তাকে আমি পছন্দ করি, কারণ, অত্যন্ত খোলামেলা স্বভাবের লোক সে, উদার। ফর গডস সেক, সুব্রত যদি বেঈমান হয় তাহলে নিজেকেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না! কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, রাজনীতি সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টেছে কিনা, পাল্টালে কেন পাল্টেছে–দুঃখিত, এ-ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

'ফেয়ার এনাফ।' সোফা ছাড়ল রানা, বাড়িয়ে দিল হাতটা। 'আপনাকে আর বিরক্ত করব না, হাসান সাহেব। কাল সকালে দেখা হবে। পরস্পর সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছে আমাদের, আমি আশা করব তদন্তে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'সম্ভাব্য সব রকম,' আশ্বাস দিয়ে বলল রিয়াজুল হাসান, দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানাকে।

'আরেকটা কথা,' বলল রানা, দরজার নবে হাত। 'ল্যাবরেটরিটা আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে দিন, কেমন? আমি যাব বলে গোছগাছ করার দরকার নেই, কোন দরজা বন্ধ করার দরকার নেই সাধারণ অবস্থায় যেটা খোলাই রাখা হয়...'

মৃদু হেসে রিয়াজুল হাসান মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। গুড

বাই।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটছে রানা, সাক্ষাৎকারটা কেমন হলো চিন্তা করছে। কয়েকটা প্রশ্ন করল নিজেকে। ফ্ল্যাটটায় কি অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে ও? না। রিয়াজুল হাসানকে সন্দেহ করার মত কিছু ঘটেছে? না। তার কথা, সুর, শব্দচয়ন, মুখভঙ্গি, দৃষ্টি, এ-সব কি ওর মনে কোন খটকা সৃষ্টি করেছে? গভীরভাবে চিন্তা করল রানা, সিদ্ধান্তে পৌছুল—না। কিন্তু তারপরই মজার একটা প্রশ্ন উদয় হলো মনে। রিয়াজুল হাসানের জায়গায় যদি সে হত, আর সে যদি অপরাধী হত, রিয়াজুল হাসান যে আচরণ করেছে সে-ও কি ঠিক সেই একই আচরণ করত না? উত্তরটা পেতে দেরি হলো না—হ্যাঁ।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা। খানিকদূর এগিয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলিতে। পাশের সীটের সামনে, ড্যাশবোর্ডের তলায় ছোট্ট একটা ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, হাত বাড়িয়ে সেটার সুইচ অন করল। 'ওয়ান-ওয়ান-সেভেন কলিং টার্কি···ওয়ান-ওয়ান-সেভেন কলিং টার্কি···'

যান্ত্রিক শব্দকোলাহল শোনা গেল, তারপর একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'টার্কি শুনতে পাচ্ছে। খুব মজা লাগচে, স্যার। বলে দিন কি করতে হবে।'

'এইমাত্র রিয়াজুল হাসানের সাথে কথা হলো। তার বাড়ির সামনে পাহারা বসাতে হবে। যদি বাইরে বেরোয়, পিছু নিতে হবে। যা যা দরকার, ভ্যানে সব নিয়েছ তো? কেউ যদি নিচের গেট দিয়ে বাড়িটায় ঢোকে, তার ফটো তুলতে হবে। টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থা করেছ?'

'সব কুচ ঠিক হ্যায়, স্যার। ট্রেনিং লিয়েচি এমনি নাকি! আমাকে হুব্বা ভাবার কোন কারণ নেই। টেলিফোন লাইনে কারিগরি ফলাতে পাঠিয়েচি মাসুমকে। আর কিছু, স্যার?'

'কাল সকাল ন'টায় রিপোর্ট কোরো আমাকে। আউট।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল রানা, স্টার্ট দিল গাড়ি, গলি থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের পথ ধরল। ফাঁদ পাতা হয়েছে, এখন দেখা যাক কে তাতে পা দেয়।

শফিকুর রহমান ওরফে মাসুদ রানা হোটেল সেভেন স্টারে দিলীপ সরকার নামে উঠেছে—পেশা, লবণ ব্যবসা। হোটেলটা আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়ায়। সকাল ঠিক ন'টার সময় ওর সাথে দেখা করতে এল টার্কি ওরফে গিলটি মিয়া।

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স গিলটি মিয়ার। খর্বকায়, ফড়িঙের মত ছটফটে। ভাঙাচোরা, তোবড়ানো মুখে তার চোখ জোড়া এত বেশি সরল যে বেমানান লাগে। ওস্তাদ লোক ছিল, রানার কাছে প্রতিজ্ঞা করে চুরির মহৎ পেশা ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে স্বীকার করে যে এখনও তার হাত নিশপিশ করে। রানার প্রতি তার ভক্তির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। গিলটি মিয়ার প্রতি রানার দরদ কতটুকু তা-ও মাপজোক করা সম্ভব নয়। অবশ্য এখন আর গিলটি মিয়া আগের মত নেই, রানা তাকে নিজের সাথে রেখে যতটা সম্ভব শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে। বেশ ক'বার রানার সাথে বিদেশে গেছে সে। পাঁচ-সাতটা ভাষার সংমিশ্রণে নিজেই অদ্ভুত এক

জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরি করে নিয়েছে, মজার কথা হলো তার সেই ভাষা বিদেশীরা বেশ বুঝতেও পারে।

'এসে গেচি, স্যার, বান্দা হাজির, রিপোর্ট লিয়ে আসতে বলেছিলেন না!' চারদিক তাকাল গিলটি মিয়া। 'বাহ্, কামরাগুলো দেকচি ভারী সুন্দর!'

হাতের দৈনিক পত্রিকাটা, পূর্বকোণ, বিছানার ওপর রেখে মুখ তুলল রানা। 'রাতে কিছু ঘটেছে?'

ঢোলা ট্রাউজারটা এক হাতে কোমরের কাছে ধরে আছে গিলটি মিয়া, অপর হাতটা পকেটে ভরে কয়েকটা কাগজ বের করল। ছেড়ে দিতেই কোমর থেকে খানিকটা নেমে গেল ট্রাউজার, খালি হাতটা দিয়ে মাথা চুলকাল সে। তারপর মেশিনগানের মত চালু হলো তার মুখ, 'বেলা সাড়ে বারোটার দিকে, বুঝলেন স্যার, মানে কালকের কতা বলচি, রিয়াজ সাহেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে এলেন একটা হোটেলে, হোটেল সাফিনায়। ওকানে বসে একা একা লাঞ্চ খেলেন। কি কি খেয়েচেন, বলব?'

'না।'

'একানে সব লেকা আচে, স্যার।'

'বেশ তো। ফাইলে রেখে দিয়ো।'

'দেড়টার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে, বাড়ি ফিরলেন একটা বিয়াল্লিশ মিনিটে। পৌনে তিনটে পর্যন্ত সব চুপচাপ। তারপর এক মেয়েমানুষ তাকে ফোন করল। কি কি কতা হলো বলচি।'

কাগজ-পত্র নেড়েচেড়ে খুক করে কেশে তৈরি হলো গিলটি মিয়া।

রিয়াজ: "হ্যাঁ।"

মেয়েমানুষ: "কেমন আচো তুমি, হাসান ভাই? সময়টা কেমন কাটচে তোমার আজ?"

রিয়াজ: "কোনো রকম। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম। এক কাপ চা হলে মন্দ হত না, কি বলো?"

মেয়েমানুষ: "কি, আমার একানে?"

রিয়াজ: "হ্যাঁ।"

মেয়েমানুষ: "বেশ। খুশি হলাম। ককোন আসচো তাহলে?"

রিয়াজ: "সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মদ্যে। ঠিক আচে?"

মেয়েমানুষ: "হ্যাঁ, ঠিক আচে। আমি তাহলে অপেক্কা করচি। ওহ্ হো, ভাল কতা, হাসান ভাই...না, মানে, থাক—তারচেয়ে বরং দেকা হলেই বলব, কেমন?"

রিয়াজ: "হ্যাঁ, সেই ভাল—আমি হলেও তাই করতাম, দেকা না হওয়া পোজ্জন্ত অপেক্কা করতাম।"

মেয়েমানুষ: "তাহলে তাই কতা হলো। তুমি আসচো। তকনই কতা হবে।"

রিয়াজ: "খোদা হাফেজ।"

কাগজগুলো গুছিয়ে পকেটে ভরল গিলটি মিয়া, ট্রাউজারটা কোমর থেকে নেমে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলল। 'আর কিছু জানা যায়নি, স্যার। মেয়েমানুষটা

নাম বলেনি। আমরা অপেক্ষা করছিনু, পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে রিয়াজ সাহেব বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে, গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা দিলেন। পিছু নিলাম আমরা। জুবিলী রোডে এলেন তিনি, থামলেন পাঁচতলা মেসের সামনে। সাতচল্লিশের বি, সেঁদিয়ে গেলেন ভেতরে।'

মেস নয়, ভাবল রানা, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল।

'মেয়েলোকটা কে, তকোনো আমরা জানি না,' বলে চলল গিলটি মিয়া। 'তারপর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। মেয়েলোকটাকে নিয়ে, থুড়ি–মেয়েলোক নয়, ছুঁড়ি···তাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন রিয়াজ সাহেব। তকোন সাড়ে ছ'টার মতন বাজে। রাস্তায় হাওয়া খেলেন দু'জন। মেসের সামনে ফিরে এসে রিয়াজ সাহেব গাড়ি নিয়ে একাই চলে গেলেন, ছুঁড়িটা মেসে না ফিরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। আমি আর আমার এক সাকরেদ, দু'জন পিছু নিলুম। রিয়াজ সাহেবের পিছু পিছু তার বাড়ি অবদি এলুম, রাতে আর তিনি বেরুননি, কোতাও ফোনও করেননি।'

'খেতে বেরুননি, ঠিক জানো?'

'না, স্যার। মনে হয় উপোস গেচেন।'

'আর মেয়েটা?'

'ছুঁড়িটাকে ফলো করে আমার এক সাকরেদ, বলেচিই তো। হেঁটে একা গ্যারেজে গেল, গাড়িটা বোধায় মেরামত করতে দিসলো, একটা লাল ডাটসান। গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যায় ইস্ট্যান্ড রোডে।' কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল গিলটি মিয়া। '৯/৮নং ইস্ট্যান্ড রোড, স্যার।'

'ইন্টারেস্টিং,' জনান্তিকে বলল রানা, মনে পড়ল ঠিকানাটা সুব্রত বড়ুয়ার। 'বলে যাও।'

'আদঘণ্টা পর ছুঁড়িটা এক ছোকরাকে নিয়ে বেরিয়ে এল। মাখখন চেহারা ছোকরার। এবার গাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরুলেন তেনারা। একটা চাইনীজ হোটেলে ঢুকে খাওয়াদাওয়া সারল। বাড়িতে ফিরলেন তেনারা রাত তকোন প্রায় বারোটার কাচাকাচি।'

'তোমার সাগরেদ ওদেরকে খেতে দেখেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেকেনি মানে!'

'না, আমি জিজ্ঞেস করছি, সে কি ওদের আচরণ কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে? ধরো, সেকি বলতে পারবে মেয়েটা সম্পূর্ণ ফ্রী ছিল কিনা? কথার মাঝখানে পরস্পরের হাত ধরেছে ওরা?'

'কার সাকরেদ দেকতে হবে তো! তাছাড়া, এত যন্তোর দিয়েচেন, ভেবেচেন সেগুলো ব্যবহার করব না? এই নিন, স্যার। দেকুন!' বলে পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে রানাকে দিল গিলটি মিয়া।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা শারমিন চৌধুরীর। পানপাতা আকৃতির অবয়ব, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। যুবকের একটা বাহু আঁকড়ে ধরে হাসছে সে–হালকা বা মৃদু নয়, রীতিমত খিলখিল করে হাসছে, মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে। 'কোথায় তোলা হয় ফটোটা?'

'চাইনীজ রেস্তোরাঁ থেকে যকোন বেরুচ্ছিল...'

রানা ভাবল, শারমিন চৌধুরীর সাথে সুব্রত বড়ুয়ার সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ—ওরা কি পরস্পরকে ভালবাসে? 'তারপর, স্ট্যান্ড রোডে ফেরার পর কি ঘটল?'

'ছোকরা বাড়ির সামনে নেমে পড়ল, গাড়ি নিয়ে চলে এল ছুঁড়ি।'

'ব্যস?'

'আমার সাকরেদ তো তাই বলচে।'

'আর রিয়াজ সাহেব? রাতে তিনি বাড়ি ফিরলেন, তারপর কিছুই ঘটেনি?'

'আমার দুই সাকরেদকে বসিয়ে রেকে আমি একটু চোক বুজেচিলুম, স্যার। তারা বলচে, কেউ আসেনি বা যায়নি। রিয়াজ সাহেব কোতাউ ফোন করেননি বা কোন ফোন আসেনি।'

রানা চিন্তিত।

গিলটি মিয়া বলল, 'ঘাবড়াবার কিচু নেইকো, স্যার। আপনার রিয়াজ সাহেব ঠিকই পা দেবে ফাঁদে।'

দেবে কি?—ভাবল রানা। কে জানে, সম্ভবত রিয়াজুল হাসান সম্পূর্ণ নির্দোষ। ওরা তিনজনই হয়তো নিরপরাধ। দেখেশুনে এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে বটে। তবে কোন প্রমাণ নেই, না এদিকে না ওদিকে। 'তোমার লোকজনের তো অভাব নেই, তাই না? আরও দু'জনকে কাজে লাগিয়ে দাও, তারা সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরীর ওপর নজর রাখবে।'

'আচ্চা! আপনি তাহলে তেনাদেরও চেনেন! ঠিক আচে, স্যার, ঠিক আচে, আপনার কতা মতনই কাজ হবে।' দু'সেকেন্ডের মধ্যে কামরা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল গিলটি মিয়া।

ধীরে-সুস্থে কাপড় পরল রানা, হোটেলের গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা হলো বাংলাদেশ এয়ারফোর্স-এর ল্যাবরেটরি ভবনের উদ্দেশে। ঠিকানা দরকার নেই, কর্ণফুলী নদীর কিনারায় বিল্ডিংটা কোথায় জানা আছে ওর। অলসভঙ্গিতে গাড়ি চালাল ও, কেসটা নিয়ে ভাবছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, মানুষের মনের ভেতর কি ঘটছে তার সূত্র হিসেবে বাইরের আচরণ অত্যন্ত দুর্বল। সব মানুষকেই দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু গোপন রাখতে হয়, এভাবে বেশিরভাগ মানুষই মনের ভাব গোপন রাখার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। প্রশ্নটা হয়ে ওঠে মাত্রার, কে কতটা স্বাভাবিক আচরণ করতে পারল। তবে এই কেসে মনে রাখতে হবে বেঈমান লোকটা জানে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। আগেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে তাকে। সে পুরুষ হোক বা নারী, তার প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়ার কথা? স্বভাবতই সে ভান করবে উদ্বেগের কোন কারণ ঘটেনি, এমনকি তারা শুক্রবার ছুটির সন্ধ্যায় চাইনীজ খেতেও যেতে পারে, হাসি না পেলেও হাসতে পারে খিলখিল করে।

এয়ারফোর্স-এর ল্যাবরেটরি ভবনে সাড়ে দশটায় পৌঁছুল রানা। গোটা বিল্ডিং উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। খানিক পর পর পাঁচিলের মাথায় তৈরি করা হয়েছে সেন্ট্রি বক্স, সেন্ট্রি বক্সের মাথায় সার্চলাইট বসানো

হয়েছে। কড়া পাহারা, তবে বাইরে থেকে কোন প্রহরীকে দেখতে পাওয়া গেল না। রানার পরিচয়-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলো গেটে, দু'জন সিকিউরিটি অফিসার ওকে পৌছে দিল প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান-এর অফিসে। অফিসারদের একজন পকেট থেকে চাবি বের করে ইস্পাতের ভারী একটা দরজা খুলে দিল। খালি একটা ওয়েটিং রুমে ঢুকল রানা। প্রায় গোল আকৃতির ছোট আকারের কয়েকটা চেয়ার আর নিচু একটা টেবিল ছাড়া কামরায় কোন ফার্নিচার নেই। টেবিলটার ওপরে ফুলদানিতে তাজা গোলাপ রয়েছে। উল্টোদিকের দেয়ালে আরেকটা ভারী দরজা, সেটাও ইস্পাতের তৈরি। কয়েক সেকেন্ড পর ভেতর থেকে খুলে গেল দরজাটা। ওয়েটিং রুমে বেরিয়ে এল রিয়াজুল হাসান। সন্দেহ নেই, মেইন গেট থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছে সে।

'গ্ল্যাড টু সি ইউ, মেজর। আসুন, প্লীজ, এদিক দিয়ে।'

দরজার পর প্যাসেজ, প্যাসেজের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা, ভেতরে রিয়াজুল হাসানের ল্যাবরেটরি। বেশ বড়সড় কামরা উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে, চারদিকে হরেক রকম সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট, কামরার দু'দিকে জানালা।

'আসুন, আমার সহকর্মীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। মিসেস শারমিন চৌধুরী, ইনি মেজর শফিকুর রহমান।'

শারমিন চৌধুরীই প্রথম হাত বাড়াল, হ্যান্ডশেক করার সময় রানার বুকের কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। ফটোতে আসল রূপ ধরা পড়েনি, রক্ত-মাংসের শারমিন চৌধুরী আরও অনেক সুন্দর। ছোট ছোট নিখুঁত দাঁত, পটলচেরা চোখ, ফর্সা চামড়ায় লাবণ্যের প্রলেপ। ধবধবে সাদা ব্লাউজটা তাকে নিষ্কলুষ দেবীর মহিমা দান করেছে। রানা লক্ষ করল, মেয়েটা তার চুলের রঙ পাল্টেছে। ঘন কালোর বদলে লালচে-কালো।

'হাউ ডু ইউ ডু? আপনি আসায় আমরা খুশি হয়েছি,' বলল শারমিন চৌধুরী, আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। তার হাসি আর শরীরের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে এখানে আসার উদ্দেশ্য বেমালুম ভুলে গেল রানা।

'আর ইনি সুব্রত বড়ুয়া।'

সাদা কোট পরা দীর্ঘদেহী যুবক জোরাল ঝাঁকির সাথে করমর্দন করল, কিন্তু কোন কথা বলল না। চওড়া, শক্তিশালী চোয়াল রানার দৃষ্টি এড়াল না। সুব্রত বড়ুয়ার মুখটা ছোট, তবে বয়সের তুলনায় রেখা আর ভাঁজের সংখ্যা একটু বেশি। সোনালি ফ্রেমের চশমা তার চেহারায় অ্যাকাডেমিক একটা ভাব এনে দিয়েছে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তার গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব।

রিয়াজুল হাসানের দিকে ফিরল রানা। 'আমার আসার কারণটা কি ব্যাখ্যা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'প্রথমে আমি তাহলে কামরার চারদিকটা একবার দেখে নিই?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

বড় আকারের তিনটে টেবিল, ওপরে ড্রইং আর কাগজ-পত্র রয়েছে। ফাইলিং কেবিনেট রয়েছে দুটো, একটা বুককেস। পিছনের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট–রিটর্ট, পিপেট, ফিউমকাবার্ড, গ্লাস কাবার্ডের ভেতর সূক্ষ্ম স্কেল, টিউব আর কনডেনসার নিয়ে কন্টেইনার, বানসনবার্নার, আরও কত কি। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে রানার কোন আগ্রহ নেই। সরাসরি জানালার দিকে এগোল ও। ভেতর দিক থেকে তারের জাল দিয়ে ঘেরা ওগুলো।

'জাল কি ইস্পাতের তৈরি?'

'হ্যাঁ,' বলল রিয়াজুল হাসান।

'জানালা কি কখনও খোলা হয়?'

'না। কামরাটা এয়ার-কন্ডিশনড। জানালাগুলো শুধু দিনের আলো পাবার জন্যে।'

'বাথরুমে যাবার দরকার হলে কি করেন?'

একটা হাত তুলল রিয়াজুল হাসান। 'পিছনের দরজা খুললে পাশাপাশি দুটো বাথরুম পাবেন।'

'ওদিক দিয়ে আর কোথাও যাওয়া যায়?'

'না।'

'আর কোন পথ নেই, বেরুবার?'

'না। ঢোকার বা বেরুবার পথ একটাই, যেটা দিয়ে ঢুকলেন আপনি।'

'দরজাটার চাবি শুধু আপনার কাছে থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'সিকিউরিটি অফিসার, যে আমাকে ওয়েটিং রূমে দিয়ে গেল, তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি নেই?'

'না।'

'তাহলে বাইরে থেকে কেউ এসে চুরি করবে, সে-সম্ভাবনা নেই বলতে হয়, কি বলেন?'

'নেই,' গম্ভীর সুরে বলল রিয়াজুল হাসান। 'এককথায়, অসম্ভব।'

'আপনি কি বলেন?' ঝট্ করে ঘুরে প্রশ্নটা সুব্রত বড়ুয়াকে করল রানা, একটা টেবিলের পাশে অনড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'আমি একমত,' ছোট্ট করে জবাব দিল সুব্রত বড়ুয়া।

'আপনি?'

'না···মানে, আমি একমত নই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল শারমিন চৌধুরী, সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে। 'তিক্ত হলেও আপনার কথাটাকেই সত্যি বলে মানছি আমরা–ডকুমেন্টটা হয় সরানো হয়েছে, নয়তো কপি করে পাচার করা হয়েছে। আমরা কেউ বেঈমান নই, তারমানে বাইরের কেউ নিয়ে গেছে জিনিসটা। যদি বলা হয় তা অসম্ভব, আমি একমত হতে বাধ্য এই জন্যে যে উল্টোটা প্রমাণ করতে পারছি না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলব, সম্ভব। কাজেই আমাদের কাজ হবে, বাইরের কেউ কিভাবে জিনিসটা নিয়ে যেতে পারল সেটা খুঁজে

বের করা। একমাত্র প্রশ্ন: কোত্থেকে শুরু করব আমরা।'

'সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি, সন্দেহ নেই,' উৎসাহ দিয়ে হাসল রানা। 'আমি হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারব, তবে আমাকেও আপনাদের সাহায্য করতে হবে। সমস্যাটার সমাধান হবেই, তবে সহজে হবে কিনা নির্ভর করছে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতার ওপর। এখানে কি ঘটে না ঘটে সব আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি না। এমন দু'একবার হয়তো ঘটেছে যে দরজা খোলা ছিল, আর আপনারা কেউই ঘরে ছিলেন না...'

বাধা দিল রিয়াজুল হাসান, 'না, আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি...'

'শুনুন, হাসান সাহেব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা, 'শুরু থেকেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। আমি খোলা মন নিয়ে এখানে এসেছি, প্রমাণ আর পরিস্থিতি ছাড়া আর কিছুই আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতা আপনাদেরকেও মেনে নিতে হবে। যা ঘটেছে, তার খানিকটা দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে নিতেই হবে। কিন্তু আপনি যদি আঙুল তুলে দেখাতে পারেন কিভাবে ঘটেছে তাহলে হয়তো বেশ অনেকটা দায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কাজেই আমার সাথে সহযোগিতা করলে নিজেরই উপকার করা হবে, কেমন?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম, আপনি যদি এভাবেই দেখেন ব্যাপারটাকে...'

'দরজাটা দু'একসময় খোলা থাকতে পারে। এমনও ঘটতে পারে যে খোলা দরজা দিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকল বা বেরিয়ে গেল, কারও চোখে ধরা না পড়ে। আমি এখন চাই, এখানকার নিয়ম আর নিরাপত্তার দিকগুলো মনে রেখে, নিজেদেরকে প্রত্যেকে আপনারা বহিরাগত একজন চোর বলে ভাবতে চেষ্টা করুন—আপনাদের উদ্দেশ্য ডকুমেন্টগুলো চুরি করা। সিরিয়াসলি ভাবুন। এভাবে হয়তো একটা সূত্র আমরা পেয়েও যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়—চিন্তা করে দেখা যাক,' হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল সুব্রত বড়ুয়া।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। যদিও সে নিস্তব্ধতা স্বর্ণডিম্ব প্রসব করল না। অনড় দাঁড়িয়ে থাকল তিনজন বিজ্ঞানী, গভীর ধ্যানমগ্ন।

হঠাৎ করে সুব্রত বলল, 'আমাদের ইকুইপমেন্ট যেবার বিস্ফোরিত হলো, মনে আছে?'

ভুরু কুঁচকে উঠল শারমিন চৌধুরীর, তবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'উঁহু, না। জঞ্জাল সাফ করার জন্যে একজন ঢুকেছিল বটে, কিন্তু সব নিয়ে আমাদের সামনেই বেরিয়ে যায় সে। পুরোটা সময় তিনজনই আমরা এখানে ছিলাম।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো।'

'আমি কি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?' অবশেষে প্রস্তাব দিল রানা। 'দু'একটা প্রশ্ন করে? যেমন, ধরুন—বাতিল কাগজগুলো আপনারা কি করেন?'

'সব আমরা এই চপার-এ ফেলি,' বলল রিয়াজুল হাসান, ওয়াশিংআপ মেশিনের মত দেখতে একটা বাক্সের দিকে হাত তুলে দেখাল সে। 'ওটার ভেতর কাগজগুলো

ছোট ছোট টুকরো হয়ে যায়–ফুলপ্রুফ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মেশিনটা সম্পর্কে জানে ও, বি.সি.আই. অফিসে আছে। 'তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন। আপনারা তিনজন বাদে আর কেউ কখনও এই ল্যাবে পা ফেলেছে?'

'না, আপনাকে তো আগেই বলেছি,' জানাল রিয়াজুল হাসান, 'এটাই সবেচেয়ে কড়া নিয়ম, কখনও ভাঙা হয়নি।'

'অথচ আজ ভাঙা হয়েছে, তাই না?' হাসল রানা।

'মানে?'

'আমি কি আপনাদের তিনজনের একজন?'

রিয়াজুল হাসানের মুখ ঝুলে পড়ল, তারপর অপ্রতিভ একটু হাসল সে। 'আপনার ব্যাপারটা আলাদা!'

'আলাদা কেন?'

'তা কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে?'

'প্লীজ!'

'আপনি একটা তদন্তের কাজে এসেছেন, আপনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসার।'

'কিভাবে জানলেন?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রিয়াজুল হাসান, তারপর আবার হাসল। 'জানলাম, কারণ প্রজেক্ট ডিরেক্টর বৃহস্পতিবার রাতে আমাকে বলেছেন যে কাল সকাল দশটায় আপনি আমার সাথে দেখা করতে আসবেন।'

'আমার সম্পর্কে কি বলেছেন তিনি আপনাকে?'

'বলেছেন আপনি একজন মেজর, আপনার নাম শফিকুর রহমান।'

'তিনি কি আমার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন? কিংবা আমার কোন ফটো দেখিয়েছেন আপনাকে?'

'না।'

'অথচ আপনার ফ্ল্যাটের দরজায় আমাকে দেখে আপনি আমার পরিচয় সম্পর্কে কোন প্রমাণ চাননি। কি করে জানলেন আমি মেজর শফিকুর রহমান?'

'হতে আপনি বাধ্য! তা না হলে তথ্য পাচার সম্পর্কে জানবেন কিভাবে!'

'কেন, সহজেই জানা যায়। হতে পারে আমি সি.আই.এ-র লোক, জেনেছি আসল শফিকুর রহমানের কাছ থেকে, আপনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম তার পরিচয় নিয়ে, আমার হয়তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ আছে...'

কাঁপা কাঁপা হাসি নিয়ে রিয়াজুল হাসান বলল, 'এ-ধরনের ঘটনা শুধু স্পাই থ্রিলারে ঘটে।'

'এখানটাতেই পুরোপুরি ভুল হচ্ছে আপনার,' ভারী গলায় বলল রানা। 'আপনি খবরের কাগজ পড়েন না? এমন দু'একটা কেসের বিশদ বিবরণ মনে নেই, যা স্পাই থ্রিলারের চেয়েও ফ্যানটাসটিক?'

নিচের ঠোঁট একবার চুষে চুপ করে থাকল রিয়াজুল হাসান।

মৃদুকণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভাঙল শারমিন চৌধুরী, 'উনি ঠিকই বলেছেন, হাসান ভাই।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, এই দেখুন,' বলে মেজর শফিকুর রহমান লেখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচয়-পত্রটা পকেট থেকে বের করে ওদের তিনজনকে দেখাল রানা। 'আশা করি আপনারা কিছু মনে করেননি, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ভুল একটা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন,' সবিনয়ে বলল রিয়াজুল হাসান। 'সিকিউরিটির ব্যাপারে নিখুঁত হতে চাইলে আরও সাবধান হতে হবে। ঘ্যাপারটা অনেকটা এইরকম: নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে অপরাধী।'

'ঠিক তাই। কাজেই কথাটা মনে রেখে আবার আপনারা চিন্তা করুন। যখন থেকে এই ল্যাবে আপনারা কাজ করছেন, আপনারা বাদে কেউ কি এখানে ঢোকেনি, এক আধ মিনিটের জন্যে হলেও?'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। রিয়াজুল হাসান, সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরী গভীর চিন্তায় মগ্ন।

হঠাৎ, 'মনে পড়েছে!' বলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'এসেছিল! এসেছিল!'

ঝট করে তার দিকে ফিরল রিয়াজুল হাসান, চেহারায় উৎকণ্ঠা। 'উঁ?'

'আপনার মনে নেই, হাসান ভাই? রিপোর্টাররা!'

'ইয়েস!' সায় দিল সুব্রত বড়ুয়া, সবেগে মাথা দোলাল। পাঁজরের ভেতর লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ড।

দুর্বল ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল রিয়াজুল হাসান। 'ওহ্ গড! ইয়েস! বেমালুম ভুলে গেছি! মেজরকে বলো, শারমিন।'

'দু'জন রিপোর্টার আমাদের ল্যাব দেখতে এসেছিলেন,' বলল শারমিন চৌধুরী, তার পটলচেরা চোখ রানার মুখের ওপর স্থির। 'চার কি পাঁচ মাস আগের কথা।'

মাথা নাড়ল সুব্রত বড়ুয়া। 'তবে আমি যতদূর শুনেছি, ওরা ঠিক রিপোর্টার ছিল না!'

'আপনি তখন এখানে ছিলেন না?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ক'দিনের ছুটিতে ছিলাম আমি।'

মেয়েটার দিকে ফিরল রানা। 'দুঃখিত। আপনি বলে যান।'

'হ্যাঁ, সুব্রত ঠিক বলেছে,' বলল শারমিন চৌধুরী। 'ওঁদের ঠিক রিপোর্টার বলা চলে না। একজন ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন, আরেকজন মার্সফিল্ড-এর স্কুল অভ অ্যারোনটিকস-এ পড়াতেন। পড়ানোর চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় দু'জনই সে-সময় দেশে ফিরে এসেছিলেন, "লাইফ" পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ওঁদের সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ রাখে, অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট সংক্রান্ত ফর্মুলা আবিষ্কারের জন্যে বাংলাদেশে যে গবেষণা চলছে তার ওপর তারা একটা অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি করলে পত্রিকার পাঠকমহল খুব খুশি হবে। লাইফ সম্পাদক পেশাদার সাংবাদিকদের বদলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বেছে নিয়েছিলেন।'

'এবং তাঁরা এই কামরায় এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রিয়াজুল হাসান। 'ভুলে গিয়েছিলাম সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।

তবে কারণটা হলো, ওঁদের দুজনকে আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চিনি, আর দু'জনেই ওঁরা সন্দেহের উর্ধ্বে। ভদ্রলোকদের একজন রফিকুল বারী। নিউক্লিয়ার ফিশন-এ বিশেষজ্ঞ, দীর্ঘদিন ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেন। আর একরামুল হক একজন এঞ্জিনিয়ার।'

'এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স-এর অনুমতি ছিল?'

'ছিল। এয়ারফোর্সের চীফ স্বয়ং ওদের আবেদন মঞ্জুর করেন।'

'আপনাদের ওপর কোন নির্দেশ ছিল, কতটুকু ওদেরকে জানানো যাবে, কি কি বলা যাবে না?'

'হ্যাঁ, ছিল বৈ কি,' শারমিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল রিয়াজুল হাসান। 'তিন পৃষ্ঠা জুড়ে প্রায় পঞ্চাশটা নির্দেশ। তবে, তার কোন দরকার ছিল না। আমরা খুব ভালভাবেই জানি কোনটা টপ সিক্রেট কোনটা নয়।'

'ওঁরা যখন এলেন, গোপন ব্যাপারগুলো নিজেদের মাথায় আর কাবার্ডে তালা দিয়ে রাখলেন আপনারা?'

'বলাই বাহুল্য। অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট নির্মাণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা, বললাম গবেষণা এগিয়ে চলেছে, আশা করা যায় অচিরেই সাফল্যের মুখ দেখব আমরা। তারপর ওঁরা জানতে চাইলেন, ফর্মুলাটা কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে।'

'কি বললেন আপনারা?'

'বললাম, ব্যাপারটা নির্ভর করে অ্যান্টি-রেডিয়েশন স্ক্রীন, ওজন ইত্যাদির ওপর।' রিয়াজুল হাসান ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে, তার হাবভাবে আত্মবিশ্বাসের আর কোন অভাব দেখা গেল না।

'ওঁরা কি কোন ফটো নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান। 'প্রথমে তাঁরা ল্যাবের একটা ছবি তুললেন। তারপর আমার আর শারমিনের একটা—জানালার দিকে মুখ করে, ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই আমরা, ফটোতে যাতে চেনা না যায়। আরেকটা ছবি তোলা হলো শারমিনের।'

'সেটাতেও আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি, নিচে ক্যাপশন ছাপা হলো—"প্রত্যাশা নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে বিজ্ঞান"।' শারমিন চৌধুরীর সাথে বাকি সবাইও হেসে উঠল।

'লাইফের ওই সংখ্যাটা আমাকে দেখতে দিতে পারেন, যেটায় ওদের রিপোর্ট আর ফটো ছাপা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রিয়াজুল হাসান। 'আর্কাইভে একটা কপি আছে। এখুনি চান?'

'যদি সম্ভব হয়।'

রিয়াজুল হাসান বেরিয়ে যেতে কামরার ভেতর অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল। ধীর পায়ে এগিয়ে ল্যাবরেটরি বেঞ্চের সামনে দাঁড়াল সুব্রত বড়ুয়া, ইকুইপমেন্ট নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল। খুক করে কাশল একবার শারমিন চৌধুরী, ক্ষীণ একটু হাসল,

কিন্তু তারপরও কেউ স্বাভাবিক হতে পারল না দেখে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনাকে এক কাপ কফি দিই?'

'না, ধন্যবাদ। ভাল কথা, দুপুরে আপনারা খাওয়াদাওয়া করেন কোথায়? আর রাতে যেদিন কাজ করেন?'

'ক্যানটিনে।'

'ল্যাব থেকে বেরুবার আগে সব কিছু তালা দিয়ে যান? আপনাদের গোপন কাগজ-পত্র ইত্যাদি?'

'হ্যাঁ, সব সময়। কখনও ভুল হয় না। সব আমরা সেফে তুলে রেখে তারপর বেরুই।' দেয়ালে লাগানো ভারী ইস্পাতের একটা দরজা দেখাল শারমিন। শুধু লাঞ্চের এক ঘন্টা সময় কেন, ওটা ভাঙতে আট-দশ ঘন্টাও যথেষ্ট নয়।

'সেফটার কমবিনেশন কে কে জানে?'

'শুধু আমরা তিনজন।'

'আর কেউ না?'

'না।'

'সুব্রত বাবু,' বলল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। 'রফিকুল বারী বা একরামুল হকের সাথে আপনার কখনও পরিচয় হয়েছে?'

'একরামুল হকের সাথে একবার দেখা হয়েছিল,' ল্যাবরেটরি বেঞ্চ থেকে জবাব এল। 'একটা সায়েন্টিফিক সেমিনারে দু'একটা কথা হয়।'

'এখানে আসার আগে ওঁদের কাউকে আমি আগে কখনও দেখিনি,' নিজে থেকেই জানাল শারমিন চৌধুরী।

'এমন হতে পারে, ওঁরা আপনাদের কোন ডকুমেন্টের ফটো তুলে নিয়ে গেছেন?'

'না, প্রশ্নই ওঠে না,' জোর দিয়ে বলল শারমিন চৌধুরী।

'হুম।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। সমস্যাটা আগের মতই জটিল থেকে যাচ্ছে। শারমিন চৌধুরী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করলেও, তার জবাবগুলো বড় বেশি সহজ-সরল, কথার পিছনে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা নেই, আর উদ্দেশ্য একটাই মাত্র—সহকর্মীদের সহ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা। কিন্তু সুব্রত বড়ুয়া ঠিক উল্টো আচরণ করছে, যেন গোটা ব্যাপারটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সে। 'সুব্রত বাবু,' ডাকল রানা। 'এদিকে একটু আসবেন, প্লীজ?'

বিড়বিড় করতে করতে সামনে এগিয়ে এল সুব্রত বড়ুয়া, 'মাফ করবেন।'

'একটা কথা—নিশ্চয়ই আপনারা তা বুঝতে পারছেন,' বলল রানা। 'তথ্য পাচারের ঘটনাটা যদি বাইরে থেকে ঘটে থাকে, তাহলে নিখুঁত সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে আপনারা আমাকে যা বলছেন তা সত্যি হতে পারে না। আপনারা হয়তো ভাবছেন নিখুঁত, কিন্তু আসলে তা নয়। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে, আর সেই ভুলের দায়-দায়িত্ব এই কামরায় যারা কাজ করে তাদের ঘাড়েই বর্তাবে। এবার আমাকে স্পষ্ট করে কথা বলতে হবে। কি করবেন সেটা বেছে নিন আপনারা। হয় ভুলটা খুঁজে বের করার কাজে আমাকে সাহায্য করুন, আমরা যদি সফল হই তাহলে

শুধু অবহেলার অভিযোগ তোলা হবে আপনাদের বিরুদ্ধে। নয়তো এখন যা করছেন তাই করুন, বারবার বলতে থাকুন—এ কখনও ঘটতে পারে না। সেক্ষেত্রে আপনাদের সাহায্য ছাড়াই তদন্ত চালাতে হবে আমাকে, রেজাল্ট পেতে তাতে সময় লাগবে, কিন্তু মনে রাখবেন, এই পরিস্থিতিতে আপনাদের তিনজনকেই আমি সন্দেহ করব। কাজেই নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে কি করা দরকার বুঝে দেখুন।'

এত কথা বলার পরও হতাশ হতে হলো রানাকে, কারণ অত্যন্ত শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা দু'জন, তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ব্যাপারটা অদ্ভুত। সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করছে তারা, প্রতিবাদের সুরে এ-ধরনের কিছু বলাটা স্বাভাবিক ছিল না? ওরা নির্দোষ হলে কথাগুলো শোনার পর চেহারায় বিরক্তি বা অসহিষ্ণু ভাব ফুটত না?

রানার প্রশ্নবোধক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সুব্রত বড়ুয়া নির্লিপ্ত থাকল, বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

বড়বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল শারমিন চৌধুরী, কোন কথাই বলল না। এই সময় লাইফের একটা কপি আর কাগজের দুটো শীট নিয়ে ল্যাবে ফিরে এল রিয়াজুল হাসান। 'রফিকুল বারী আর একরামুল হক এখানে আসার আগে এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়েছিল। আমাদের প্রজেক্ট ডিরেক্টর রিপোর্টের একটা করে কপি পাঠিয়েছিলেন। আপনি দেখতে চাইবেন মনে করে নিয়ে এসেছি।' পত্রিকা আর কাগজ দুটো রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কাজে আসবে।' কাগজ দুটো পকেটে ভরল ও, পত্রিকাটা বগলের তলায় রাখল।

সরে গিয়ে সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরীর সাথে জোট বাঁধল রিয়াজুল হাসান, তিনজনের চেহারা দেখে রানার মনে হলো, ওরা আশা করছে এবার ওদেরকে রেহাই দেবে সে। আপাতত তা দেয়া যেতে পারে, ভাবল রানা। 'পরে আবার আপনাদের সবাইকে দরকার হবে আমার,' বলল ও। 'তার আগে আমাকে যদি আপনাদের দরকার হয়, হোটেল সেভেন স্টারে ফোন করে দিলীপ সরকারকে চাইবেন।'

'ঠিক আছে,' হাসিমুখে বলল রিয়াজুল হাসান। 'আপনি যদি ওয়েটিং রুমে একটু অপেক্ষা করেন, সিকিউরিটি অফিসারকে ফোন করে ডাকতে পারি আমি...'

দশ মিনিট পর নিজের গাড়িতে ফিরে এল রানা। ড্যাশ বোর্ডের নিচে আটকানো রেডিও অন করে গিলটি মিয়ার সাথে যোগাযোগ করল। নির্দেশ দিল, কাজ শেষ করে ল্যাবরেটরি ভবন থেকে বেরুলে তিনজন বিজ্ঞানীকেই অনুসরণ করতে হবে। তারপর জিজ্ঞেস করল, শারমিন চৌধুরীর টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা।

গিলটি মিয়ার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মেকানিকরা কাজ করে যাচ্ছে, স্যার। একটু সময় লাগচে, কারণ হলো গে টেলিফোন শুদু ওই ছুঁড়ির ঘরেই রয়েচে, লাইনটা রাস্তা থেকে পাঁচিল টপকে সরাসরি উটে গেচে পাঁচতালায়। এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্যার, আজ রাতেই হয়ে যাবে।'

'রাতে নয়, সন্ধ্যায়। ছ'টার মধ্যে। খুব জরুরী, বুঝতে পারছ? কি বলেছি মনে আছে, আমাদের নিজস্ব লোক ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কাজ করাবে না?'

'জ্বী, স্যার, মনে আছে।'

সেট অফ করে হোটেলে ফিরে এল রানা। এবার রফিকুল বারী আর একরামুল হককে নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। এই দুটো নাম ছাড়া বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আর তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তার নিয়ম রক্ষায় কোথাও ভুল হয়েছে, এটা স্বীকার করতে তিনজনের একজনও রাজি নয়। ভুল হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, এটাই তারা মেনে নিতে পারছে না। ফলে প্রত্যেকের চিন্তাস্রোত বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছাকৃত অসহযোগিতা নয়, এ এক ধরনের জেদ বা অসহিষ্ণুতার ফল। তারাও, দুনিয়ার আর সব বিজ্ঞানীর মত, নিজেদের কাজ নিয়েই শুধু মগ্ন, অন্য কোন সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহী বা অভ্যস্ত নয়। পেশাগত সমস্যার সমাধান নিজেদের স্বার্থে করতে চায় তারা, প্রেরণার উৎস হিসেবে দেশপ্রেম তেমন বড় কোন ভূমিকা রাখে না। আর তাই, নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে-কোন নিয়ম তাদের জন্যে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নিয়মগুলো এড়িয়ে চলে তারা, মনে করে এ-সবের কোন দরকার নেই। শুধু এই মানসিকতার কারণে অতীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে।

সাত

টিকেট করা ছিল, সেদিনই বাংলাদেশ বিমানের বিকেলের ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে এল রানা। একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, সরাসরি মণিপুরীপাড়ায় পৌঁছে গেল ও, সি ব্লকের তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটবাড়িটা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না। এটাই রফিকুল বারীর ঠিকানা। লাইফ ম্যাগাজিনে যে দুই ভদ্রলোক ফিচার লিখেছেন তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পড়ার পর রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রথমে রফিকুল বারীর সাথেই দেখা করবে ও।

দু'জনের মধ্যে রফিকুল বারীকে বেশি সন্দেহ করছে রানা, ব্যাপারটা তা নয়। বরং একরামুল হক সম্পর্কেই প্রচণ্ড কৌতূহল বোধ করছে ও। ভদ্রলোকের অতীত শুধু ঘটনাবহুলই নয়, ধোঁয়াটে ও জটিলও বটে। তাঁর বর্তমান জীবনযাপনও স্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক, সুদর্শন, মাঝারি গড়ন, কাঁচাপাকা চুল। স্বাধীনতার আগে যুক্তরাষ্ট্রে একটা এয়ারক্রাফট কোম্পানীতে চাকরি করেছেন, তারপর পাকিস্তান এয়ারফোর্সে যোগ দেন, পদোন্নতি পেয়ে স্কোয়াড্রন লীডার হয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে করাচীতে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে, পরবর্তী ছ'মাস তাঁর অবস্থান বা ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ছবি পাওয়া যায়নি। করাচীতে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল, নাকি স্বেচ্ছায় তিনি থেকে গিয়েছিলেন, এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। ছ'মাস পর, সেপ্টেম্বর মাসে, হঠাৎ করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে উদয় হন তিনি,

সাংবাদিকদের জানান লাহোর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন। সেখানে তাঁকে নাকি দেশদ্রোহিতার অভিযোগে দশ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করে। পরবর্তী তিন মাস কোথায় তাঁকে রাখা হয়েছিল কেউ জানে না। দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তি পান তিনি, কিন্তু দেশে না ফিরে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে, মাসফিল্ড-এর স্কুল অভ অ্যারোনটিকস-এ চাকরি নিয়ে। বছর কয়েক আগে দেশে ফিরে এসেছেন। সম্ভবত দেশের কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ানোর কোন প্রস্তাব তিনি পাননি কিংবা পেলেও তা গ্রহণ করেননি। জানা গেছে, রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর তেমন কোন আগ্রহ নেই। ভদ্রলোক চিরকুমার, জীবনযাপনে সংযম বা রুটিনের কোন বালাই নেই। নিয়মিত মদ্যপান করেন, ড্রাগসেও অরুচি নেই, ভোগী পুরুষ, অনেক নারীতে আসক্ত। তার কোন পিছু টান বা বাঁধন নেই।

ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ রফিকুল বারী। এক মওলানার ছেলে, কঠোর পরিশ্রমী, ধর্ম-কর্মে সাংঘাতিক ভক্তি। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন, কিছুদিন সৌদি আরবে ছিলেন, অধ্যাপনা করেছেন ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটিতে। বিবাহিত, তিন সন্তানের জনক। বর্তমানে দেশেরই একটা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন।

মণিপুরীপাড়ায় পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল, ইতোমধ্যে লাইটপোস্টের মাথায় টিউব লাইট জ্বলে উঠেছে। শুধু যারা প্রাচুর্যের অধিকারী তাদেরই বসবাস এদিকে, আভিজাত্যের একটা ছাপ ফুটে আছে গোটা এলাকায়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রানা আবিষ্কার করল অন্তত সি ব্লকে বিদেশ ফেরত কোন ডাক্তার চক্ষুপীড়াদায়ক সাইনবোর্ডবহুল ক্লিনিক খুলে বসেনি। এবার ঢাকায় এসে আরও হাজারটা রুচিবিকৃতির ঘটনার মত এটাও লক্ষ করেছে ও, ঢাকার সদর রাস্তাগুলোয় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ক্লিনিকগুলো যেন একেকটা বসন্তের রোগী। মীরপুর রোডে এ-ধরনের তিনটে ক্লিনিক দেখেছে ও, গড়পড়তায় প্রতিটির গায়ে রঙিন সাইনবোর্ডের সংখ্যা বিশ, রঙগুলো গায়ে যেন চাবুক মারে। অভিজাত এলাকা হলেও, ফুটপাথের অন্তত একটা ম্যানহোলে ঢাকনি দেখল না রানা। তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটবাড়ির উল্টোদিকের লাইটপোস্টে টিউবটা জ্বলছে না। টুলে বসা দারোয়ানের কাছ থেকে জানা গেল, বারী সাহেব পাঁচতলায় থাকেন। সে জানে না তিনি বাড়িতে আছেন কিনা। সাততলা বাড়ি, চোদ্দটা ফ্ল্যাট, এলিভেটর আছে। রফিকুল বারীর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাল রানা।

কয়েক সেকেন্ড পর মোটাসোটা এক ভদ্রলোক দরজা খুলে রানার সামনে দাঁড়ালেন। মাথায় চকচকে টাক, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, ফুলহাতা শার্ট আর লুঙ্গি পরে আছেন। 'আপনি কি রফিকুল বারী?' স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। বলুন?'

পকেট থেকে কার্ডটা বের করে দেখাল রানা। 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আসছি, মেজর শফিকুর রহমান। যদি সময় হয়, আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।'

কার্ডটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন রফিকুল বারী, তবে বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে

হলো না। শুধু বললেন, 'আসুন।'

সরু হলরুমে ঢুকে হাসি পেল রানার। ফ্ল্যাটটা নতুন, কিন্তু এরইমধ্যে সেটার বারোটা বাজতে শুরু করেছে। কয়েক জায়গায় প্লাস্টার খসে পড়ার পর মেরামত করা হয়নি। দেয়ালগুলো রীতিমত ভীতিকর সব ছবি আর পোস্টারে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। এক কোণে তিনচাকার একজোড়া সাইকেল, দুটোরই একটা করে চাকা ভেঙে গেছে। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে খেলনা আর হাত ভাঙা পুতুল।

ড্রইংরুমেও খুদে দানবদের কীর্তির ছাপ স্পষ্ট। মেহগনি কাঠের আসবাব-পত্র, অসম্ভব ভারী। চাপ দাড়ি, মাথায় টুপি পরা বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের ফটো দেয়ালে; রানা আন্দাজ করল, ইনিই বোধহয় রফিকুল বারীর মরহুম পিতা। মেঝেতে কার্পেট, মাঝখানে খয়েরি দাগ। ইঙ্গিতে একটা বড়সড় কাঠের চেয়ার দেখিয়ে রানাকে বসতে অনুরোধ করলেন রফিকুল বারী, তার আগে চেয়ার থেকে তুলোর একটা সিংহ সরালেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, শুরু করুন। আমি শুনছি।' উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ারে বসে হাত দুটো বুকের নিচে ভাঁজ করলেন।

'ফ্ল্যাটে আপনি একা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই মুহূর্তে, হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আত্মীয়তা রক্ষা করতে গেছেন গিন্নী। ছাত্রদের খাতা দেখতে হবে, আমার যাওয়া হয়নি।'

'ব্যাপারটা হলো,' শুরু করল রানা, 'মাস কয়েক আগে, লাইফ ম্যাগাজিনের তরফ থেকে একটা রিপোর্ট করার জন্যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন আপনি—এয়ারফোর্সের ল্যাবরেটরি ভবনে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন রফিকুল বারী। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমার সাথে একরামুল হক ছিল।'

'হ্যাঁ। আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য হলো, ইদানীং জানা গেছে, ল্যাবরেটরি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডকুমেন্ট চুরি গেছে, এই চুরির সাথে আপনাদের দু'জনের ওখানে যাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তদন্ত করে দেখা।'

অবিশ্বাস আর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন রফিকুল বারী। 'কি! চুরির সাথে আমাদের যাওয়ার সম্পর্ক? আপনি সিরিয়াস?'

'সিরিয়াস।'

'ইয়া আল্লাহ! কি ডকুমেন্ট?'

'সেটা এই মুহূর্তে খুলে বলা যাচ্ছে না।'

'আর আপনি আমার কাছে এসেছেন, ধরে নিতে পারি, আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে?'

'না, বারী সাহেব, না। আপনাকে নয়। সন্দেহ করছি আমি একরামুল হককে। আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনি তাঁকে চেনেন। আশা করছি তাঁর সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারবেন।'

এই প্রথম উদ্বিগ্ন দেখাল রফিকুল বারীকে। ব্যস্ত হাতে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন, রানাকে অফার না করেই ধরালেন একটা। 'একরামুল হক…তার সম্পর্কে তথ্য…কি তথ্য?'

'গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত তথ্য,' বলল রানা। 'যা যা জানেন। ভদ্রলোককে আপনি পছন্দ

করেন?'

'পছন্দ করা না করার সাথে কি সম্পর্ক?' একটু যেন বিরক্ত হলেন রফিকুল বারী।

'হয়তো বিরাট।'

বিড়বিড় করে, শোনা যায় কি যায় না, রফিকুল বারী বললেন, 'আমি চাই না একরাম কোন বিপদে পড়ুক।'

'বন্ধুকে রক্ষা করতে চাওয়া ভাল, কিন্তু একজন বেঈমানকে বাঁচানোর চেষ্টা করা? ভেবে দেখুন, রফিক সাহেব। গুরুতর একটা অপরাধ ঘটানো হয়েছে, কাজটা দেশের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। একরাম সাহেব যদি দেশের নিরাপত্তার জন্যে একটা হুমকি হন, আপনার দায়িত্ব বোধ কি বলে? আপনি চাইবেন না তার শাস্তি হোক?'

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। চট করে উল্টোদিকের দেয়ালে লটকানো বৃদ্ধ বাবার ফটোর দিকে একবার তাকালেন রফিকুল বারী। 'চাইব, অবশ্যই চাইব,' তাড়াতাড়ি বললেন তিনি। 'কিন্তু ব্যাপারটা খুব জটিল, মেজর···দুঃখিত, আপনার নামটা আমি ভুলে গেছি।'

'শফিকুর রহমান।'

'রহমান সাহেব, সত্যি কথা বলতে কি, একরাম আমার বন্ধু নয়—তাকে আমি একেবারেই পছন্দ করি না।'

'কেন?'

'তার নৈতিক চরিত্রের জন্যে।' রফিকুল বারীর চেহারা কঠিন হয়ে উঠল, হঠাৎ জ্বলে ওঠা চোখ দেখে তাঁকে ফ্যানাটিক বলে মনে হলো রানার। 'শুধু যে মদ খায় তাই নয়, ধর্ম নিয়ে বিচ্ছিরি সব ব্যঙ্গ করে সে। পেশাগত কারণে মাঝে-মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তা না হলে তার ছায়া মাড়াতেও ঘৃণাবোধ করি আমি। মেজর রহমান, আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু না বলেও পারছি না—এই লোক যে নির্ঘাত দোজখে যাবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। নামাজ তো পড়েই না, ধর্ম সম্পর্কে এমন সব কথা বলে যে শুনলেও পাপ হবে!'

কিন্তু মারা যাবার পর একরামুল হকের কি হবে সেটা রানার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়, ওকে লোকটার রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পর্কে জানতে হবে। 'লাহোরের সেন্ট্রাল জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি, এ-সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছেন কখনও?'

'দূর!' তাচ্ছিল্যের সাথে হাত নাড়লেন রফিকুল বারী। 'যত সব গালগল্প!'

'তাই?'

'ওর কথা কি আর বলব। একবার এক সেমিনারে গেছে, তা-ও মদ খেয়ে। তখনই, সম্ভবত মুখ ফস্কে, বলে ফেলে কথাটা।'

'কি কথা?' আগ্রহের সাথে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা।

'বলল, "সবাই আমাকে হিরো বানিয়ে ছাড়ল! আসলে কি ঘটেছে তা যদি কেউ জানত রে!" বলেই বুঝতে পারে, ভুল হয়ে গেছে। টলতে টলতে চলে গেল।'

'ঠিক জানেন, জেলভাঙার প্রসঙ্গেই কথাটা বলেছেন?'

'কেন জানব না! সেই থেকে আমি বুঝে নিয়েছি, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেনি, ওকে পাঠানো হয়েছে। তার প্রমাণ ভারত সরকার ওকে গ্রেফতার করেছিল।' চেহারায় বিজয়ীর ভাব নিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন রফিকুল বারী, একরামুল হককে 'বিপদে' ফেলার সমস্ত ভয় মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। তার মত মানুষের কাছে নৈতিক চরিত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি জীবনের সারবস্তু। কবরে ঢোকার আগে পর্যন্ত আফসোস করেন, কী এক জঘন্য দুনিয়ায় তাঁদের জন্ম হয়েছে! তবু বলতে হয়, রানা ভাবল, খবরটা গুরুত্বপূর্ণ।

'আপনার সাথে রাজনীতি নিয়ে কখনও তিনি আলাপ করেছেন?'

মাথা নাড়লেন রফিকুল বারী। 'তবে, দেখা হলেই প্রচুর অভিযোগ শুনতে হয়। দুনিয়াটা ভাল জায়গা নয়, মৌলবাদীরা দেশটাকে ধ্বংস করছে, অযোগ্য লোকেরা বড় বড় পদ আঁকড়ে আছে, সম্পদের সুষম বণ্টন হওয়া দরকার ইত্যাদি। আসলে নিজে ভাল না হলে যা হয় আর কি, সবার বিরুদ্ধে আক্রোশ পুষে রাখে।'

রানা উপলব্ধি করল, সুযোগ পেলে ভদ্রলোক তাঁর পরিচিত সবার বিরুদ্ধে সারারাত ধরে নিন্দা করবেন। সাক্ষাৎকারটা সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিল ও। 'আর একটা প্রশ্ন, রফিক সাহেব। আপনি নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন যে তথ্য পাচারের ঘটনার সাথে অবশ্যই একরামুল হক জড়িত। আপনি কি তার বিরুদ্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ বা নিরেট তথ্য দিতে পারেন, যা আমার তদন্তে সাহায্য করবে?'

'অকাট্য প্রমাণ...' মাথা চুলকালেন রফিকুল বারী। '...নিরেট তথ্য ...' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'তার সম্পর্কে আমি কি ভাবি তা তো আপনাকে আমি বলেইছি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু নিরেট তথ্য বা প্রমাণ যদি চান...মানে, না।' এই 'না' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলা হলো।

প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, অদ্ভুত হলেও সত্যি যে পরম স্বস্তিবোধ করছে ও। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, রফিক সাহেব। যথেষ্ট সাহায্য করলেন আপনি। প্রয়োজনে আবার আমাদের দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা তো আমার দায়িত্ব...'

সাড়ে সাতটার দিকে গাড়িতে ফিরে এল রানা। গায়ে হিমেল হাওয়া নিয়ে ভাবল, কোথাও সম্ভবত বৃষ্টি হচ্ছে। এবার কড়ুয়া, ৭০নং দীপক ব্যানার্জি রোডে যেতে হয়। ধীরে ধীরে একটা বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে ওর মনে—একরামুল হককেই খুঁজছে সে। ভদ্রলোক পাকিস্তানে ছ'মাস ছিলেন, মুক্ত হোন বা বন্দী, তারপর ভারত সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে, এ-সব ঘটনা বিরাট তাৎপর্য বহন করে। ফর্মুলাটা চুরি করেছে ভারত সরকারের কোন এজেন্সি নয়, বিজনেস সিন্ডিকেট, আর বিজনেস সিন্ডিকেট ছোট আকারে হলেও বিশ-বাইশ বছর আগে থেকেই উপমহাদেশে তৎপর রয়েছে, যদিও

তখন এই নামে কুচক্রটি পরিচিত হয়ে ওঠেনি। সে-সময় পাকিস্তানে আরও যারা বন্দী ছিল এবং পরে মুক্ত হয়ে ভারতে বা দেশে ফিরেছে, তাদের জবানবন্দী থেকে জানা গেছে, কুচক্রটির তখনকার প্রতিনিধিরা তাদেরকে দলে টানার কম চেষ্টা করেনি। ধরে নিতে হয়, এ-ধরনের প্রস্তাব একরামুল হককেও দেয়া হয়েছিল।

যানজট থেকে মুক্ত হয়ে ফতুল্লায় পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লাগল রানার। দীপক ব্যানার্জি রোডের সত্তর নম্বর বাড়িটা মান্ধাতা আমলের, বাড়ির উল্টোদিকে একটা কলেজের সদ্য তৈরি ছাত্রাবাস। দু'জন ছাত্র গেটের সামনে দাঁড়িয়ে 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' নিয়ে তুমুল আলোচনা করছে, রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বাড়ির নম্বর মিলিয়ে দেখছে রানা, রাস্তা পেরিয়ে ছাত্র দু'জন এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

'একরামুল হক সাহেব তো এ বাড়িতেই থাকেন, তাই না?'

'প্রফেসর একরামুল হক তো?' প্রথম ছাত্র জানতে চাইল।

দ্বিতীয় ছাত্র বলল, 'বল্, মিসগাইডেড প্রফেসর।'

'আহ্, তুই চুপ কর!' রানার দিকে ফিরল প্রথম ছাত্র। 'হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকেন উনি, দোতলায়। কিন্তু আপনাকে উঠতে হবে পিছনদিকের সিঁড়ি বেয়ে।'

'প্রফেসর বাড়ি নেই,' অপর ছাত্র বলল। 'তবে অপেক্ষা করলে, প্রফেসরের দেখা যদি না-ও পান, অদ্ভুত সব চিড়িয়ার সাথে মোলাকাত ঘটবে আপনার।'

'আহ্, তুই না···!'

কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা। 'কি রকম?'

দ্বিতীয় ছাত্র বলল, 'দোতলায় উঠে যান, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।' রানার আপাদমস্তক চোখ বুলাল সে। 'আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, কি দরকার ওনার সাথে?'

সঙ্গীর হাত ধরে টান দিল প্রথম ছাত্র। 'সব কিছুতে বাড়াবাড়ি তোর!' বলে তাকে নিয়ে রাস্তা পেরোতে শুরু করল সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা, বাড়ির পিছন দিকে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল দোতলায়। বারান্দাটা প্রায় অন্ধকার, খাঁ খাঁ করছে। বেশ লম্বা বারান্দা, খানিক পর পর একটা করে পিলার, প্রতি দুই পিলারের মাঝখানে রেলিং, উল্টোদিকের দেয়ালে একটাই মাত্র দরজা। ছোট একটা তালা ঝুলছে কড়ার সাথে।

বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বার দুয়েক হাঁটল রানা। কি করবে ভাবছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কে জানে। রেলিঙের ওপর বসে পিলারে হেলান দিল ও, একটা সিগারেট ধরাল। ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মধ্যে সিঁড়ির দিকে তাকাল। কেউ আসছে না। রাত বাড়ছে, সেই সাথে মেঘ জমছে আকাশে।

বিশ মিনিট পর ধৈর্য হারাল রানা। রেলিং থেকে নামতে যাবে, খস খস শব্দ পেয়ে স্থির হয়ে গেল শরীরটা। পিলারের আড়ালে রয়েছে ও, ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ধাপ বেয়ে উঠে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। অন্ধকারে কাঠামোটাও ভাল করে ঠাহর করা গেল না।

নড়ল না রানা। ছায়ামূর্তির উঠে আসার মধ্যে অস্বাভাবিক কি যেন একটা

আছে। ধীরে ধীরে উঠল সে, প্রচুর সময় নিয়ে, ভয়ে ভয়ে বা সতর্কতার সাথে। বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত রাখল দুই কোমরে, তবে এদিক ওদিক বিশেষ তাকাল না। আবার পা বাড়াল, নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়াল বন্ধ দরজাটার সামনে। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। ছায়ামূর্তি পুরুষ নয়।

তার নিঃশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিছন ফিরে হেলান দিল দরজার গায়ে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবল রানা। রাস্তাটা প্রায় নির্জন, এলাকায় একটা ছাত্রাবাস রয়েছে, বাড়িটার এই অংশে চিরকুমার একরামুল হক ছাড়া আর কেউ বাস করে না, তার ওপর দোতলার বারান্দায় কোন আলো নেই—এই পরিবেশ আর পরিস্থিতিতে একা একটা মেয়ে কেন আসবে? আর যদি কোন প্রয়োজনে আসতেই হয়, একরামুল হক নেই দেখেও কেন দাঁড়িয়ে থাকবে?

মেয়ে, না মহিলা? বোঝা যাচ্ছে বেশ লম্বা, তবে একটু যেন কুঁজো। শাড়ি পরে আছে, তবে হাতে চুড়ি থাকলে শব্দ পেত ও। একটা হাত অপরটার তুলনায় কম নড়াচড়া করছে, সেটা বুকের কাছাকাছি উঁচু হয়ে থাকায় রানা আন্দাজ করল, হাতটায় হ্যান্ডব্যাগ থাকতে পারে। আশ্চর্য, এত হাঁপাচ্ছে কেন?

একটা অপরাধবোধ জাগল রানার মনে। বারান্দায় ওর উপস্থিতি সম্পর্কে আগেই মেয়েটাকে সচেতন করা উচিত ছিল। এখন যদি শব্দ করে ও, মেয়েটা নির্ঘাত চমকে উঠবে, ভয় পেয়ে চেঁচিয়েও উঠতে পারে। ছাত্রদের একজনের কথা মনে পড়ে গেল ওর, অদ্ভুত সব চিড়িয়ার সাথে মোলাকাত ঘটবে। চিড়িয়া?

'ভয় পাবেন না,' মৃদুকণ্ঠে কথাটা বলে খস করে দিয়াশলাই জ্বালল রানা। 'আমিও হক সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করছি।' সিগারেট ধরাল ও। ধরাবার পরও কাঠিটা নেভাল না।

অদ্ভুত ব্যাপার, মেয়েটা ভয় পায়নি। রানার মনে হলো ভয়, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে এই মেয়ে। বয়স...বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে সুন্দরী না হলেও সুশ্রী, কিন্তু চেহারা থেকে অকালে ঝরে পড়েছে সমস্ত লাবণ্য। পরনের শাড়িটা ছাপা চায়না সিল্ক, আজকাল খুব কম মেয়েই পরে। হাতকাটা ব্লাউজ। রানার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটো বড় বড় হলেও দৃষ্টিতে রাজ্যের ক্লান্তি, প্রায় ঢুলুঢুলু। মুহূর্তে বুঝে নিল রানা, মরণনেশা ড্রাগসে আসক্ত সে। প্যাথেড্রিন? নাকি হেরোইন? সম্ভবত প্যাথেড্রিন।

'কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন?' শুদ্ধ বাংলা, আঞ্চলিকতার কোন টান নেই, প্রশ্ন করলেও এক চুল নড়ল না সে।

হাতের কাঠিটা নিভে গেল, রেলিং থেকে নেমে দাঁড়াল রানা। 'আধ ঘণ্টা হবে। আপনি কি...?' প্রশ্নটা শেষ না করে আরেকটা কাঠি জ্বালল ও।

'এসে যখন পাননি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা, 'আজ আর তাহলে পাবেন না। একরাম ভাই যেখানে গেছেন, এখুনি ফিরবেন বলে মনে হয় না।'

'কোথায় গেছেন?'

দম নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলল না মেয়েটা, রানার দিকে পিছন ফিরল,

একটা হাত তুলে দরজার মাথার ওপর কংক্রিটের সরু কার্নিসে কি যেন খুঁজল। এই সময় রানার হাতে নিভে গেল কাঠিটা।

অন্ধকারে ভাল ঠাহর করতে পারল না রানা কি ঘটছে। তালা খোলার আওয়াজ পেল ও। কয়েক সেকেন্ড পর খোলা দরজার ভেতর আলোকিত হয়ে উঠল কামরাটা। রানার দিকে পিছন ফিরে ঘরের আরও ভেতরে হেঁটে গেল মেয়েটা. তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিক মুখ করে একটা চেয়ারে বসল। ঠিক বসল না. বলা যায় নেতিয়ে পড়ল। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে. কোন কৌতূহল বা সংকোচ নেই। ভেতরে ঢোকার জন্যে ডাকল না রানাকে।

দরজার কাছে এসে রানা বলল, 'ভদ্রলোক কে হন আপনার?'

'একরাম ভাই? এমনি পরিচয়, বন্ধু...কেন, আপনার কি দরকার?'

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের অনেকদিনের পরিচয়?'

চোখ বুজল মেয়েটা। 'আমি ক্লান্ত, আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন, প্লীজ?'

দরজার চৌকাঠে হেলান দিল রানা। 'দুঃখিত। কিন্তু হক সাহেবকে আমার খুব জরুরী দরকার। যদি বলেন কোথায় তাকে পাওয়া যাবে...'

'সুজি ওয়াং চেনেন?' চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'চাইনীজ রেস্তোরাঁ? গেণ্ডারিয়ায়, রেল স্টেশন রোডে?'

'হ্যাঁ, ভেতরের একটা কামরায় বার-ও আছে।' চোখ খুলল মেয়েটা। 'ওখানেই পাবেন তাঁকে। জানতে পারি, কি দরকার? উনি কারও সাথে কথা বলার অবস্থায় আছেন বলে মনে হয় না।'

'ধন্যবাদ,' জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

পিছন থেকে ডাকল মেয়েটা। 'শুনুন।'

ফিরল রানা।

'আপনি কি এখুনি একরাম ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

কি যেন চিন্তা করল মেয়েটা। 'কি এমন দরকার যে...'

'উনি খুব বিপদে আছেন,' সত্যি কথাই বলল রানা।

'বিপদে আছেন!' মেয়েটার নেতিয়ে পড়া শরীর হঠাৎ নড়ে উঠল। 'অদ্ভুত তো!'

'কি অদ্ভুত?'

'খানিক আগে তার সাথে যখন কথা হলো আমার, টেলিফোনে, উনি চেঁচামেচি করে বললেন, কারা যেন তাঁর পিছু নিয়েছে; বললেন শালারা বাইরে ঘুরঘুর করছে, কাজেই রাত বারোটার আগে আমি বেরুচ্ছি না...তুমি বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করো, তোমার জন্যে প্যাথেডিন নিয়েই ফিরব...' নিজেকে সামলে নিল সে, কিন্তু তার আগেই যা বলার বলে ফেলেছে।

দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়। উচ্চশিক্ষিত এক ভদ্রলোক, তার এই অধঃপতনের কারণ কি? গুরুতর কিছু একটা করার পর অপরাধবোধে ভুগছেন? কারা

যেন পিছু নিয়েছে–মানে? তাড়াতাড়ি সুজি ওয়াঙে পৌঁছুনোর জোরাল একটা তাগাদা অনুভব করল রানা। 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'মিস্টার,' আবার পিছু ডাকল মেয়েটা। 'বাড়ির সামনে দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনার?'

'হ্যাঁ।'

কি যেন ভাবল মেয়েটা। 'কিছু যদি মনে না করেন, আমার একটা উপকার করবেন?'

'বলুন।'

'হয় আমাকে একরাম ভাইয়ের কাছে নিয়ে চলুন,' চোখ নামিয়ে, মৃদুকণ্ঠে বলল মেয়েটা, 'নয়তো...' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল সে, '...নয়তো গোটা পঞ্চাশ টাকা দিন আমাকে।'

হায় নেশা! রানা ভাবল, মেয়েটা বেশিদিন বাঁচবে না। কে জানে কি দুঃখে এই সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছে! ওর ভেতর থেকে কোমল একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, মেয়েটার জন্যে কিছু করা যায় না? উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে হয়তো সেরে উঠবে। 'ঠিক আছে, চলুন।' এখুনি কোন প্রস্তাব দেয়া ঠিক হবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা, আজ শুধু বাড়ির ঠিকানাটা চেয়ে নেবে।

চেয়ার ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল মেয়েটা। তালা বন্ধ করল দরজার। চাবিটা রাখল দরজার মাথায়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানার সাথে।

বাড়িটার সামনে এসে রানা দেখল, বৃষ্টির ভয়ে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে। জড়োসড়ো হয়ে, নিশ্চল ওর পাশে বসে থাকল মেয়েটা। গাড়ি চালাতে চালাতে রানা তার নাম জানতে চাইল। আকাশের পুব কোণে বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

চুপ করে থাকল মেয়েটা। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি ফুটল না।

নরম সুরে আবার প্রশ্ন করল রানা, 'আপনি থাকেন কোথায়? বাড়িতে কে কে আছেন?'

'প্লীজ!' মিনতির সুরে বলল মেয়েটা, আর তাতেই হাঁপিয়ে গেল।

'কি ভাবছেন জানি না,' খানিক পর বলল রানা। 'কথা দিতে পারি, আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আজকাল তো ভাল চিকিৎসাও বেরিয়েছে। আপনি শুধু আমাকে আপনার ঠিকানাটা দিন।'

রানার দিকে ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা। 'আপনি বরং গাড়ি থামান, আমি নাহয় একরাম ভাইয়ের বাড়িতেই অপেক্ষা করি।'

'ঠিক আছে, কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

পথে আর কোন কথা হলো না। সম্ভব হলে নাম-ঠিকানা হক সাহেবের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, ভাবল রানা। গেণ্ডারিয়ায় পৌঁছে গেল গাড়ি। সুজি ওয়াং খানিকটা দূরে থাকতেই মেয়েটা অনুরোধ করল, 'রেস্তোরাঁটার সামনে যেতে চাই না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, গাড়িতে বসে থাকি আমি। আপনি একরাম ভাইকে ডেকে আনুন?'

'ঠিক আছে।' সুজি ওয়াঙের সামনে দিয়ে এগোল গাড়ি, দেড়শো গজের মত

আসার পর হাতের ডান দিকে একটা নির্জন গলি দেখল রানা, গলিটা ছাড়া গাড়ি রাখার আর কোন সুবিধেমত জায়গা পেল না।

গলি থেকে স্টেশন রোডে বেরিয়ে এল ও, সাথে সাথে ওকে প্রায় ছেঁকে ধরল রিকশা ড্রাইভাররা। সবারই জিজ্ঞাস্য—সাব কৈ যাইবেন? রানার চোখের সামনে আফ্রিকার একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—কালোদের ঘাড়ে চড়ে শ্বেতাঙ্গরা অগভীর জলাশয় পেরুচ্ছে। শুধু শ্বেতাঙ্গ নয়, দুঃস্থদের ঘাড়ে চড়তে ইচ্ছুক কালো মহাজনদের সংখ্যাও কম নয়। কে বলল, ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে? বলা যায়, ধরনটাই শুধু বদলেছে। হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে তিরস্কার করল নিজেকে রানা—তুমিও তো কম যাও না হে, দরদী সাজার ভান করছ! অমানবিক বলে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু রিকশায় না উঠে হেঁটে যাওয়া কঠিন। তুমি নিজে তার একটা দৃষ্টান্ত নও?

স্টেশন রোড দখল করে রেখেছে রিকশাগুলো। রাস্তায় পথচারী আর আলোর অভাব, শুধু সুজি ওয়াঙের রঙিন নিওন সাইন জ্বলছে সামনে। হালকা নীল ইউনিফর্ম পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন দারোয়ান। রানাকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়াল সে। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা।

রেস্তোরাঁটা ছোট, কামরাটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে মখমলের ভারী একটা লাল পর্দা। চার কি পাঁচটা টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করছে লোকজন, বয়সে সবাই তরুণ। এদের মধ্যে একরামুল হক নেই। একজন বেয়ারা এগিয়ে এল। পর্দার ওদিক থেকে বহু লোকের গুঞ্জন ভেসে আসছে।

'একরামুল হক নামে এক ভদ্রলোককে খুঁজছি।'

রানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল বেয়ারা, কথা না বলে ইঙ্গিতে লাল পর্দাটা দেখিয়ে দিল। 'ধন্যবাদ,' বলে সেদিকে এগোল রানা। পর্দা সরাতেই দেখল, দশ-বারোটা টেবিল, প্রতিটি টেবিলে চারটে করে চেয়ার, কোনটাই খালি নেই। নিষ্প্রভ নীলচে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া ভাসছে, একেবারে কাছে না গেলে কাউকে চেনা যাবে না। বোঝা গেল, নামে মাত্র চাইনীজ রেস্তোরাঁ, এখানে আসলে মদ বিক্রি হয়। মনে পড়ল, বাংলাদেশে সুস্থ কোন মুসলমানকে মদ কেনার পারমিট দেয়া হয় না। সকৌতুকে ভাবল রানা, এখানে ক'জন লোক পাওয়া যাবে যাদের মুসলমানী হয়নি বা মদ খওয়ার পারমিট আছে? টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে ধীর পায়ে এগোল ও। সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল একবার, এই সুযোগে কাছাকাছি টেবিলে বসা লোকগুলোকে দেখে নিল ভাল করে। কামরার একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে, জানালার ধারে একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখল একরামুল হককে। চেহারার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। টেবিলে আরও তিনজন রয়েছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা। একরামুল হকের হাতে সিগারেট, হাঁ করে তাকিয়ে আছেন সিলিঙের দিকে।

'হক সাহেব।'

চোখ নামিয়ে তাকালেন ভদ্রলোক। তাঁর দৃষ্টি দেখে সাথে সাথে বুঝল রানা, নেশা করেছেন। মাথাটাও এদিক-ওদিক দুলছে। 'কে, বাওয়া? হ্যাঁ, এক হক সাহেবকে চিনতাম বটে…কিন্তু সে-তো কবেই মারা গেছে!'

'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল, আমার সাথে একটু বাইরে আসবেন, প্লীজ?'

তিনজনের একজন রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওহে, অধ্যাপক, এই ভদ্রলোক বলছেন তিনি তোমার সাথে কথা বলতে চান। গিলেছ তো মোটে তিন পেগ, তাতেই এই!'

ঢলে লোকটার গায়ে পড়লেন একরামুল হক। 'কথা বলতে চাইছেন?' সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, রানার দিকে তাকালেন না। 'কে উনি? কি চান? বলে দাও, আমার এখন সময় হবে না।'

রানা বলল, 'আপনার জন্যে ভাল একটা প্রস্তাব ছিল।'

পালা করে তিন সঙ্গীর কাঁধ খামচে ধরলেন একরামুল হক, শুধু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নয়, ভারসাম্য রক্ষার জন্যেও বটে। 'শোনো তোমরা, শোনো! উনি আমাকে প্র-প্রস্তাব দেবেন।' ঢুলুঢুলু চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু ভাই, আমি তো কুমারী নই!' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন। তারপর হঠাৎ সিরিয়াস হতে চেষ্টা করলেন। 'আপনার প্রস্তাবে কি যথেষ্ট মালপানি আছে? নাকি শুকনো খটখটে প্রস্তাব?'

'আছে।'

'ক-কত?'

'লাইফের হয়ে একটা রিপোর্ট করেছিলেন, মনে আছে? আমি আপনাকে দিয়ে ওই ধরনেরই আরেকটা রিপোর্ট করাতে চাই।'

যেমন আন্দাজ করেছিল রানা, মুহূর্তে নেশা ছুটে গেল একরামুল হকের। রানার মুখে কি যেন খুঁজলেন তিনি। হঠাৎ ঠোঁটের একটা কোণ কেঁপে উঠল। 'কে আপনি? আমার সাথে ঠাট্টা করতে এসেছেন?' প্রায় কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়ল রানা। 'অনেক দূর থেকে এসেছি আমি। আপনাকে খুঁজতে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ঠাট্টা হবে কেন?'

কিন্তু একরামুল হক তবু সতর্ক। 'আপনি জানলেন কিভাবে কোথায় আছি আমি?'

'একটা মেয়ে আপনার কামরায় অপেক্ষা করছিল। খানিক আগে তার সাথে আপনার ফোনে কথা হয়েছে, তাই না?'

'ও, হ্যাঁ।' অন্যমনস্ক দেখাল ভদ্রলোককে। হঠাৎ জোড়া হাত দিয়ে টেবিলের ওপর চাপড় মারলেন তিনি, গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা মদ, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'এখুনি ফিরছি,' সঙ্গীদের বললেন। 'ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে হবে।' টেবিল আর চেয়ারের মাঝখান থেকে সাবধানতার সাথে বেরিয়ে এলেন, পা বাড়ালেন পর্দার দিকে—চেষ্টা করছেন দু'পাশের টেবিলের সাথে যাতে ধাক্কা না খান। একবার রানার মনে হলো, পড়ে যাবেন। ধরার জন্যে হাত বাড়াল ও। হাতটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। 'লাগবে না!'

বার থেকে রেস্তোরাঁয়, রেস্তোরাঁ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। রানা সামনে, পিছনে একরামুল হক। ঠাণ্ডায় কাঁপ ধরার অবস্থা হলো রানার। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানোর বহর দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে।

'ওদিকে নয়,' দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। 'দোকানদার সিগারেটের টাকা পাবে।'

হাত তুলে রাস্তার আরেক দিক দেখালেন রানাকে। 'ওদিকে চলুন।' অগত্যা ঘুরতে হলো রানাকে। ওদের পিছনে রয়ে গেল গলিতে রেখে আসা গাড়িটা।

বিশ গজের মত এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভদ্রলোক, ঘুরলেন, হেলান দিলেন পাঁচিলের গায়ে—পাশের পোস্টারে টুপি পরা ও দাড়িওয়ালা এক হাতুড়ে ডাক্তার মোনাজাতের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে স্থির হয়ে রয়েছে, নিচে লেখা—স্বপ্নে পাওয়া ওষুধে ইনশাল্লাহ আপনার ক্যানসার ভাল হয়ে যাবে। 'বলুন, কি প্রস্তাব?'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। আপনাকে আমি চিনি না, কাজেই আপনার সাথে দূরে কোথাও আমি যেতে পারি না। এখানেই বলুন।' পাশের অন্ধকার গলি থেকে দু'জন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। লোক দু'জন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে ঢিল পড়ল তাঁর পেশীতে। বিকট শব্দে দূরে কোথাও বাজ পড়ল একটা, সেই সাথে বৃষ্টি শুরু হলো।

'মাস কয়েক আগে আপনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন, অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট সম্পর্কে একটা গবেষণার ওপর রিপোর্ট লেখার জন্যে, তাই না?'

'বলে যান।'

'আপনার সাথে আরেক ভদ্রলোক ছিলেন—রফিকুল বারী।'

'আপনি দেখছি অনেক কিছু জানেন।'

'আপনাদের রিপোর্টটা আমি পড়েছি। চমৎকার হয়েছে। তার কারণও অবশ্য আছে—বিষয়টার ওপর আপনারা বিশেষজ্ঞ।'

ইঙ্গিতটা এড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক। 'প্রস্তাবটা কি বলবেন?' বৃষ্টির প্রকোপ বেড়েছে, ভিজে যাচ্ছে ওরা। 'সারারাত দাঁড়িয়ে ভিজব নাকি?'

'ওই কাজের শেষ অংশটা সম্পর্কে আগ্রহী আমি,' শান্ত সুরে, স্পষ্ট ভাবে বলল রানা। 'তবে তার আগে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে বিস্তারিত শুনতে চাই।'

'শেষ অংশ? বিস্তারিত শুনতে চান? আমার তো ধারণা ছিল, সবই আপনি জানেন!' পাঁচিল থেকে কাঁধ তুললেন একরামুল হক। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল করে তাকালেন, যেন রানাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। কেন যেন আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। 'তারচেয়ে আপনি বলুন, আমি শুনি।'

'এ-ধরনের একটা বিষয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা কি ঠিক হবে? আপনি চান, দুনিয়ার সবাই শুনুক?'

'আপনি দেখছি আজব একটা মানুষ!' ঠিক রাগ নয়, অভিযোগের সুরে বললেন ভদ্রলোক। 'রাস্তায় ডেকে নিয়ে এসে কি সব আবোলতাবোল বকছেন। কাজের কথা থাকলে সরাসরি বলুন, ভণিতা বাদ দিন...'

'তারচেয়ে আপনি বরং আমার বাড়িতে চলুন,' বলল রানা। 'আমার সাথে গাড়ি আছে। আর সেই মেয়েটা, আপনার বান্ধবী না কি যেন, তিনিও আমার গাড়িতে...'

'কোথায়?'

হাত তুলে সুজি ওয়াঙের দিকটা দেখাল রানা। 'ওদিকের একটা গলিতে।'

'না।'

'না মানে?'

'আপনার সাথে কোথাও আমি যাব না। যদি কিছু বলার থাকে…'

'হক সাহেব,' বলল রানা, একটু কঠিন হবার প্রয়োজন বোধ করছে। 'আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে…'

রানা যা সম্ভব বলে ভাবেনি পরমুহূর্তে তাই ঘটে গেল, যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল একরামুল হকের শরীরে। ঠিক নাভীর ওপর দেড় মণ ওজনের একটা ঘুসি খেলো ও, ফুসফুস থেকে এক পলকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল ও, সময় আর সুযোগ পেয়ে ওর চিবুকে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে বেমক্কা গুঁতো মারলেন একরামুল হক। ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন তিনি, পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে পতনের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রানা, ভদ্রলোককে ধরা হলো না। নিজেকে সামলে নিয়েই দৌড় দিলেন তিনি, বৃষ্টির মধ্যে একটা মিগুকের হলদেটে আলোয় রানা দেখল পাশের গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

মধ্যবয়স্ক এক লোক, মাতাল, তাকে মারধর করে পালিয়ে যাচ্ছে, নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। ছুটে গলির মুখে এসে শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তবে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে। গলির ভেতর ঢুকে ছুটল রানাও, গলা চড়িয়ে বলল, 'শুনুন, বোকামি করবেন না, দাঁড়ান!' বোঝা গেল, রানার চেয়ে দ্রুত ছুটছেন ভদ্রলোক। সামনে থেকে একটা ডাস্টবিন উল্টে পড়ার শব্দ শুনে রানা বুঝল, মাঝখানের দূরত্ব আরও বেড়ে গেছে।

আরও খানিক এগোবার পর রানা দেখল, গলিটার একটা শাখা বাঁ দিকে চলে গেছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাঁক ঘুরল, আর ঠিক তখুনি পর পর দু'বার মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখতে পেল ও, পরমুহূর্তে বাতাসে শিস কেটে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটগুলো। ডাইভ দিয়ে রাস্তার কাদা-পানির ওপর পড়ল রানা, সাথে অস্ত্র নিয়ে আসেনি বলে তিরস্কার করল নিজেকে।

কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। কোন শব্দ হলো না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার, ভাবল ও। একরামুল হকের হাতে প্রাণ হারাবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। একটু পরই আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। সামনে একটা ডাস্টবিন উল্টে পড়ে আছে, সরু গলি সম্পূর্ণ ফাঁকা।

দাঁড়াল রানা। ভিজে সপসপ করছে কাপড়চোপড়। মাথার ওপর গর্জন করছে মেঘ। পকেটে হাত ভরে একটা বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। পেন্সিল টর্চটা বের করে একবার জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলল। কিছুই ঘটল না। টর্চটা আবার জ্বালল। ডাস্টবিনের আবর্জনার সাথে একরামুল হকের এক পাটি জুতো পড়ে থাকতে দেখল ও, জুতোর পাশেই একটা পিস্তল। দেখে মনে হলো পুরানো একটা ব্রিটিশ সার্ভিস পিস্তল, নাইন এম এম ওয়েবলি স্কট। রুমাল দিয়ে পিস্তলটা ঢাকল রানা, সাবধানে তুলে পকেটে ভরল।

গলিটা গেছে কোন্ দিকে? শেষ মাথায় পাঁচিল, নাকি আর কোন রাস্তায় বেরুনো যাবে? সাবধানে এগোল রানা, ভয় লাগছে অন্ধকার থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন একরামুল হক। যার কাছে পিস্তল থাকে, ছোরা থাকাও বিচিত্র নয়।

এঁকেবেঁকে এগিয়েছে গলিটা। মিনিট সাতেক একটানা হাঁটার পর বড় একটা রাস্তায় বেরিয়ে এল। জানা কথা, এই পথেই বেরিয়েছেন একরামুল হক। তারমানে অনেক আগেই পগার পার হয়ে গেছেন তিনি।

প্রথমে রাস্তাটা চিনতে পারল না রানা। বৃষ্টি শুরু হবার পর দু'পাশের দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে, এলাকায় এই মুহূর্তে কারেন্টও নেই। মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা তেমাথায় পৌঁছে স্টেশন রোড চিনতে পারল। আরও মিনিট আড়াই হাঁটলে গাড়ির কাছে পৌঁছুবে ও।

সুজি ওয়াঙকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। একরামুল হক এখানে ফিরে আসবে না, কাজেই থামল না রানা। সোজা হেঁটে গলির দিকে এগোচ্ছে ও। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, মেয়েটার সাহায্য দরকার হবে ওর। সে হয়তো বলতে পারবে, পালিয়ে গিয়ে কোথায় লুকাতে পারেন একরামুল হক। গলির মুখে চলে এল রানা। দেখল, গাড়িটা নেই। মেয়েটাকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

আট

কয়েক সেকেন্ড ফাঁকা গলির ভেতর তাকিয়ে থাকল রানা। সমস্যার প্রকৃতি বোঝার সাথে সাথে সমাধানও উঁকি দিল মনে। যতই ক্লান্ত আর ভিজে হোক সে, পথে একরামুল হকের পায়ের দাগ তাজা থাকতেই পিছু নিয়ে ধরতে হবে তাকে। ভদ্রলোককে খুঁজে বের করার পথ একটা নয়। দীপক ব্যানার্জি রোডের কামরাগুলায়, ওর স্থির বিশ্বাস, কিছু গোপন রহস্যের চাবি অবশ্যই পাওয়া যাবে। সেগুলো কি দেখার এখনই সময়। আপাতত এই পথটাই অনুসরণ করবে ও।

'সাব, কৈ যাইবেন?' বলে কেউ ডাকল না, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আরোহী পেতে অনেকেরই কোন অসুবিধে হয়নি, কেউ কেউ রিকশা নিয়ে আজকের মত গ্যারেজে ফিরে গেছে। ভিজতে ভিজতে ফতুল্লার দিকে হাঁটা ধরল রানা। বেশ দূরের পথ, খালি রিকশার খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। খানিক পর দেখল, বিদ্যুৎবেগে প্যাডেল ঘুরিয়ে একটা আসছে বটে, কিন্তু থামবে বলে মনে হলো না। তবু হাত তুলল রানা, বলল, 'এই যে ভাই, ওদিকে যাবেন নাকি?'

মাথা নেড়ে রানাকে পাশ কাটাল ড্রাইভার। ঝম ঝম বৃষ্টি মাথায় করে আবার হাঁটা ধরল ও। বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড পর পিছনে বেল বাজল। ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে রানা, পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রিকশাটা। 'আহেন, সাব। কই যাইবেন?'

'আপনার বোধহয় উল্টোদিকে হয়, তাই না? ফিরে এলেন কি মনে করে?' রিকশায় চড়ে বসল রানা।

প্যাডেলে চাপ দিল ড্রাইভার, রানার দিকে তাকাল না। 'আপনে যে "আপনে" কইরা ডাক দিলেন...' দু'একটা শব্দ আরও কি যেন বলল রিকশাওয়ালা, বৃষ্টির জন্যে শুনতে পেল না রানা।

একজন লোককে উল্টোদিকে কতদূর নিয়ে যাওয়া যায়, খানিক পর রিকশা বদল করল ও। দীপক ব্যানার্জি রোডে পৌঁছুতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। ছাত্রাবাসের গেট বন্ধ, সত্তর নম্বর বাড়ির সামনে বা গোটা রাস্তায় না আছে লোকজন, না আলো। রিকশা বিদায় করে দিয়ে হেঁটে বাড়িটার পিছন দিকে চলে এল রানা, সরু গলিটাও অন্ধকার। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে, সাবধানতার সাথে উঠল ও। ওঠার পর ভাল করে পরীক্ষা করল বারান্দাটা, বিশেষ করে পিলারের আড়াল আর রেলিঙের নিচেটা। কেউ নেই। চাবিটা দরজার মাথার ওপরই পাওয়া গেল। ঘরের ভেতরে ঢুকে প্রথমেই দরজা বন্ধ করল রানা, তারপর আলো জ্বালল।

বিশ্রাম নেয়ার সময় নেই, কারণ মেয়েটা বা খোদ একরামুল হক ফিরে আসতে পারেন। দুটো মাত্র কামরা, একটায় লেখাপড়া ও বসার কাজ চলে, আরেকটা শোবার ঘর। ছোট্ট একটা কিচেন আর ততোধিক ছোট একটা বাথরুম রয়েছে। স্টাডি কাম ড্রইংরুমে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। বৈজ্ঞানিক কোন ইকুইপমেন্টও নেই। বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখল রানা। বেশিরভাগই টেকনিক্যাল বই। বেডরুমেও একটা বুকশেলফ রয়েছে। আলমারিটাতেও প্রচুর বই পাওয়া গেল বেডরুমে একটা টেবিল আর চেয়ার রয়েছে। টেবিলের ওপর একটা ইংরেজি টাইপরাইটার। দেয়ালে ঝুলছে একটা বেহালা। নেড়েচেড়ে সেটা দেখল রানা।

বেডরুমেই শুধু কার্পেট রয়েছে, বহুকালের পুরানো। সেটা কয়েক জায়গায় তুলে মেঝেটা পরীক্ষা করল ও। ট্র্যাপডোর ধরনের কিছু দেখল না। দুনিয়ার জিনিস-পত্রে ঢাকা পড়ে আছে টেবিলের ওপরটা। মোজা থেকে শুরু করে ফ্লাস্ক, কি নেই। এমনকি তোবড়ানো একটা পুতুল পর্যন্ত পেল রানা। পুতুলটা ঝাঁকাল ও। ভেতরটা ফাঁকা। প্রচুর কাগজ-পত্র রয়েছে, পরীক্ষা করতে সময় লাগবে। একটা তুলে নিয়ে চোখ বুলাল ও। নামকরা এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর চিঠি, ইংরেজিতে লেখা। কি একটা গবেষণার বিষয়ে একরামুল হকের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।

থামল রানা। ভাবল, কি খুঁজছে সে? বলা মুশকিল। তবে এমন একটা কিছু, যা দেখে একরামুল হককে অপরাধী ভাবা চলে। টেবিলের দেরাজগুলো দেখল ও, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর পিছনে তাকাল, এলোমেলো করল বিছানা। টেবিলের পাশে, কার্পেটের ওপর রয়েছে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট। উপুড় করল সেটা। ছড়িয়ে পড়ল খালি সিগারেটের প্যাকেট, ভাঙা একটা চিরুনি ইত্যাদি। অনেক কাগজ, বেশিরভাগ ছেঁড়া। একটা কাগজে বিজবিজ করছে অসংখ্য টাইপ করা অক্ষর। পড়ল রানা, 'অ্যাটমিক নিউক্লিআই কন্টেইন নট ওনলি প্রোটনস, বাট বডিজ অভ সিমিলার সাইজ অ্যান্ড ওয়েট হুইচ আর ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল অ্যান্ড আর নোন অ্যাজ নিউট্রনস...' সাধারণ বিষয়, তাই না? সম্ভবত ছাত্রকে দেয়া নোট হবে। উঁহুঁ, তল্লাশি চালিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না।

আবর্জনাগুলো লোহার জালের তৈরি বাস্কেটে তুলতে যাবে রানা, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। বাস্কেটের তলিটা নিশ্ছিদ্র টিনের পাত দিয়ে তৈরি, উল্টোদিকে ছোট একটা কার্ডবোর্ড টিউব টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। টেপ খুলে জিনিসটা হাতে নিল রানা। ভেতর থেকে বেরুল সেলোফিনে মোড়া সিক্স-বাই-সিক্স

নেগেটিভ-এর একটা প্যাকেট।

নেগেটিভটা বের করে আলোর সামনে ধরল রানা। হালকা রঙের ওভারঅল পরা এক মেয়ে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভাব দেখে মনে হলো তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। তার ডান দিকে, ছবিতে পরিষ্কার ধরা পড়েছে, নল আকৃতির পায়ার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌকো একটা কি যেন, সম্ভবত ড্রইং-বোর্ড।

নেগেটিভটা তাড়াতাড়ি এনভেলাপে ভরে ফেলল রানা, এনভেলাপটা রেখে দিল মানিব্যাগের ভেতর। মেয়েটা কি শারমিন চৌধুরী? নিজেদের ল্যাবে দাঁড়িয়ে আছে? আর ড্রইং-বোর্ডে কিছু যদি থাকে, কি হতে পারে সেটা?

উত্তেজনার লাগাম টেনে পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেয়া যেতে পারে ভাবল রানা। এত রাতে, বৃষ্টি হচ্ছে, রিকশা বা বেবী ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন হবে। তাছাড়া, ফতুল্লা থেকে রমনা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন অনেক দূরের পথ। ঘুমোবার জন্যে একরামুল হকের বিছানাটা মন্দ কি! ভদ্রলোক ফিরে আসতে পারেন, কিন্তু তার পিস্তলটা ওর কাছে রয়েছে। বরং ফিরে আসতে পারেন বলেই এখানে ওর রাতটা কাটানো দরকার। ঘুমোবার ব্যবস্থা না হয় হবে, কিন্তু পেটে যে ছুছুন্দরীরা নাচানাটি শুরু করেছে, তার কি?

কাপড়চোপড় ছেড়ে গ্যাসের চুলোয় শুকাতে দিল রানা। হাতমুখ ধুলো। তারপর হানা দিল ফ্রিজে। আবার কাপড় পরে দরজার গায়ে একটা চেয়ার ঠেকিয়ে রাখল ও। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। পকেটে আশ্রয় পাওয়া পিস্তলের ওজন আশ্বস্ত করল ওকে, ঘুম আসতে কোন অসুবিধে হলো না। ঘুম যত গভীরই হোক, সামান্য শব্দেও যাতে জেগে ওঠে সে-ট্রেনিং দেয়া আছে নিজেকে।

অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল রানার। চোখ মেলেই দেখল, জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে ভেতরে। হাতঘড়িতে আটটা বাজে। কেউ আসেনি। একরামুল হক জানেন, দীপক ব্যানার্জি রোডে একবার এসেছে রানা, কাজেই আবারও আসতে পারে ভেবে বাড়িটা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

বিছানা থেকে নামতে যাবে, এই সময় বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হলো। বিছানা থেকে নিঃশব্দে নামল ও, ড্রইং আর বেডরুমের মাঝখানের দরজার আড়ালে চলে এল। পায়ের শব্দ থামল বারান্দায়। খস খস শব্দ শুনে উঁকি দিল রানা। দেখল দরজার তলা দিয়ে ড্রইংরুমে খবরের কাগজ ঢুকছে। দূরে মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ।

ড্রইংরুমে ঢুকে কাগজটা তুলে নিল রানা। হেডিঙে রাজনৈতিক খবর। আট নম্বর কলামে, একেবারে নিচের দিকে, ছোট্ট একটা খবর চোখে পড়ল। শিরোনামটা পড়ল রানা—'বুড়িগঙ্গা থেকে প্রফেসরের লাশ উদ্ধার'। খবরে বলা হয়েছে—'পুলিস সূত্রে জানা গেছে কাল রাতে ফতুল্লার কাছাকাছি রাস্তা থেকে একটা প্রাইভেট কার সরাসরি বুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ে যায়। দুটো লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। একজন প্রফেসর একরামুল হক, অপরজন এক যুবতী, তার পরিচয় এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি…'

এইটুকুই যথেষ্ট। নষ্ট করার মত এক সেকেন্ড সময়ও নেই। যে-কোন মুহূর্তে পুলিস হাজির হতে পারে। এখনও যে কেন আসেনি সেটাই আশ্চর্য। কাগজটা ভাজ করল রানা, কোটের পকেটে ভরল, বেরিয়ে এল বারান্দায়। দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা রেখে দিল আগের জায়গায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে হাঁটছে রানা, পুলিসের একটা জীপ পাশ কাটাল ওকে। কাছাকাছি একটা রেস্তোরা দেখে ঢুকে পড়ল। ভেতরটা নোংরা, কিন্তু গুরুত্ব দিল না, বসে পড়ল খালি একটা মাছি-ওড়া টেবিলে। পকেট থেকে কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলছে, অর্ডার না দেয়া সত্ত্বেও একটা প্লেটে করে চারটে ডালপুরী দিয়ে গেল ওয়েটার।

'চা দিন,' বলে খবরের বাকি অংশটুকু পড়তে শুরু করল রানা।

'কাল রাত প্রায় সাড়ে ন'টার দিকে অজ্ঞাতনামা এক লোক টেলিফোন করে ফতুল্লা থানায় খবর দেয় যে রাম বাবুর কাঠগোলার পিছনে একটা প্রাইভেট কার বুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ে গেছে। পরে কাঠগোলার পিছনে নদীর কিনারায় চাকার দাগ দেখে খবরের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়। তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে ওঠায় এক ঘণ্টা পরই দুটো লাশ উদ্ধার করা গেছে। পোশাকের সাথে পাওয়া কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে জানা গেছে তাদের মধ্যে একজন হলেন অধ্যাপক একরামুল হক। অধ্যাপক হক দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল অভ অ্যারোনটিকস-এ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণ এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। পুলিস কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতনামা খবরদাতাকে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, ব্যাপারটা ঠিক দুর্ঘটনা নাও হতে পারে। রাস্তা থেকে নদী খানিকটা দূরে হওয়ায় এ-কথা মনে করার কারণ আছে যে ঘটনার পিছনে মানসিক ভারসাম্যহীনতা বা ভাবাবেগের অবদান থাকতে পারে। আশা করা হয়েছে আজ দুপুরের মধ্যে গাড়িটা উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

নয়

সেদিনই বিকেলের পর দ্বিতীয়বার যখন সি.সি.আই. হেডকোয়ার্টারে ঢুকল রানা, চীফ রাহাত খানের চেম্বারে দশাসই এক ভদ্রলোককে কার্পেটের ওপর অস্থিরতার সাথে পায়চারি করতে দেখল ও। রাহাত খান পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক রিসার্চ প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান-এর ডিরেক্টর, উইং কমান্ডার হাবিবুর রহমান। চট্টগ্রাম থেকে খানিক আগে পৌঁচেছেন, রাহাত খানের জরুরী বার্তা পেয়ে।

বসের অনুমতি পেয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা। ইতোমধ্যে পায়চারি থামিয়েছেন উইং কমান্ডার, রানার পাশের চেয়ারটায় বসলেন, বিশাল শরীরের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল সেটা। 'মেজর,' ভদ্রলোক আড়ষ্ট একটু হাসলেন, 'বুঝতে পারছি না আপনাকে অভিনন্দন জানাব, নাকি আপনার নিন্দা করব। আপনি

আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন।' ডেস্ক থেকে তুলে রানার দিকে একটা থারটি-বাই-ফরটি প্রিন্ট বাড়িয়ে দিলেন। 'দেখুন এটা।'

'তোমার নেগেটিভের এনলার্জমেন্ট,' ব্যাখ্যা করলেন রাহাত খান।

পরিষ্কার, ঝকঝকে ছবি। ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো মেয়েটা অবশ্যই শারমিন চৌধুরী। কিন্তু রানাকে স্তম্ভিত করল তার ডান দিকে ঢালু ড্রইং-বোর্ডের বিষয়বস্তু।

'ওখানে আপনি আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর সাধনার যাবতীয় ফল দেখতে পাচ্ছেন,' গম্ভীর সুরে বললেন উইং কমান্ডার। 'অ্যাটমিক এয়ারক্রাফ্ট তৈরির জন্যে অ্যান্টি-র‍্যাডিয়েশন স্ক্রীন-এর ব্লু-প্রিন্ট। বোর্ডের বাঁ দিকে, একেবারে মাথার কাছে পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে রিয়াজুল হাসান আর তার সহকর্মীদের আবিষ্কারগুলোর টাইপ করা স্পেসিফিকেশন—ওয়েট, কমপোজিশন, মেটেরিয়ালস, মেথড অভ ফিব্রিং এটসেটরা। খালি চোখে ওগুলো আপনি পড়তে পারবেন না, তবে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে প্রতিটি অক্ষর পরিষ্কার পড়া যাবে। বুঝে দেখুন, কি ঘটে গেছে!'

'গুড গড!' বিড়বিড় করে উঠল রানা, হতভম্ব হয়ে গেছে। উইং কমান্ডার, তারপর বসের দিকে তাকাল ও, দু'জনেই তাঁরা চুপ করে থাকলেন। অবশেষে দম ফেলল রানা, 'কথাটা তাহলে এমনি বলা হয় না, বিজ্ঞানীদের কখনও বিশ্বাস কোরো না।'

'এর জন্যে অবশ্যই ভুগতে হবে রিয়াজুল হাসানকে,' গমগম করে উঠল উইং কমান্ডারের ভারী গলা। 'ওর বেঁচে থাকা অসম্ভব করে তুলব আমি? ব্লাডি ট্রেইটর!'

'তাই কি?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'সত্যি কি লোকটা বেঈমান? তুমি কি বলো, রানা?'

'ঠিক মেলে না,' সতর্কতার সাথে বলল রানা। 'রিয়াজুল হাসান, সুব্রত বড়ুয়া বা শারমিন চৌধুরী, তিনজনই ওঁরা যখন খুশি ডকুমেন্টগুলো চাইলেই পেতে পারেন। ল্যাবের চাবি শুধু রিয়াজুল হাসানের কাছে থাকে, এ আমি বিশ্বাসই করিনি। জানা কথা, তিনজনই যখন ইচ্ছে ঢুকতে বা বেরুতে পারেন। ওঁদের কেউ যদি টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট বিদেশে পাচার করতে চান, একটা ক্যামেরা নিয়ে একা ঢুকলেই পারেন। সবদিক থেকে নিরাপদ সেটা। কিন্তু তা না করে, ঝুঁকির পথটা কেন তিনি বেছে নেবেন? কি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে, ভেবে দেখুন। ড্রইং-বোর্ডটা ডকুমেন্ট দিয়ে সাজাতে হয়েছে, পাশে দাঁড় করাতে হয়েছে শারমিন চৌধুরীকে অর্থাৎ তাঁকে অপরাধের সাক্ষী বানানো হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, "এক মিনিট, ডার্লিং, স্থির হয়ে দাঁড়াও—একরামুল হক সাহেব ছবিটা ভারতে পাঠাতে চান"। অসম্ভব না?'

অন্য কোন পরিস্থিতি হলে উইং কমান্ডার অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। কিন্তু তিনি শুধু মুচকি একটু হাসলেন। 'তাহলে?'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু বিকল্পটা কি হতে পারে?'

'আমাদের কাছে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, এর জন্যে দায়ী অবহেলা,' বলল

রানা। টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট সারাক্ষণ হাতের কাছে থাকায়, দেখতে দেখতে বিজ্ঞানীরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে নিরাপত্তার দিকগুলো বেমালুম ভুলে বসেছিলেন।'

'এ অসম্ভব!' তিরস্কারের সুরে বললেন উইং কমান্ডার।

'রানা বোধহয় ঠিক বলছে,' রাহাত খান বললেন। 'এই ব্যাপারটা থেকেই এসপিওনাজ জগতে যত সমস্যার সৃষ্টি–বিজ্ঞানীরা ভুলে যায়।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তাহলে এখন তুমি কি করবে বলে ভাবছ?'

'এক মিনিট, স্যার,' উইং কমান্ডার রাহাত খানকে বললেন, ফিরলেন রানার দিকে। 'তাহলে কি ধরে নেব, আপনি বলছেন, ওদের তিনজনের বিরুদ্ধে আমি কোন অ্যাকশন নেব না? যেমন কাজ করছে তেমনি করে যেতে দেব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'অ্যাকশনের ব্যাপারে আমি বলব–না। কাজ করার ব্যাপারেও–না। গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে ওঁদেরকে হাত দিতে দেয়া উচিত হবে না। কি সর্বনাশ ঘটে গেছে, সেটা ওঁদেরকে আমি জানাতে চাই। তার আগে আরেকটা কথা–সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টই কি পাচার হয়েছে? নাকি পাচার হবার যোগ্য আরও কিছু আছে ওখানে?'

'প্রজেক্টটা তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ওরা শুধু দুটো ভাগ নিয়ে কাজ করেছে। বাকি অর্থাৎ শেষ ভাগটা নিয়ে কাজ শুরু হবে আগামী মাসে। গুরুত্বের বিবেচনায় সেটাও প্রথম দুটোর তুলনায় কম নয় কোন অংশে।'

'তারমানে কি দুটো যদি পাচার হয়ে থাকে, ফর্মুলাটা সম্পূর্ণ পায়নি ওরা?'

মাথা নাড়লেন উইং কমান্ডার। 'পায়নি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'তাহলে তো ওদেরকে কাজ করতে দেয়া আরও উচিত নয়।'

'এখন কি ঘটবে?' প্রশ্ন করলেন উইং কমান্ডার।

চুরুট ধরাতে যাচ্ছিলেন রাহাত খান, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তিনিও রানার দিকে তাকালেন।

'একরামুল হক সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাঁকেই বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু অন্য রকম চিন্তা-ভাবনা করার কারণও আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'যেমন?'

'তিনি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিলেন যে আমরা তাঁকে খুঁজছি। তাহলে, একটা কপি ভারতে পাঠাবার পরও কেন তিনি আরেকটা কপি ঘরে রেখেছিলেন? কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি ওটা নষ্ট করে ফেলেননি কেন?'

'এমন হতে পারে,' আন্দাজ করলেন রাহাত খান, 'তার ভারতীয় বন্ধুরা তাকে সাবধান করেনি। নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবছিল সে।'

রানা বলল, 'আমার তা মনে হচ্ছে না, স্যার। বিজনেস সিন্ডিকেট অবশ্যই তাকে সাবধান করবে। তারা বিশ্বাস করেছে জাহাজে করে ঢাকায় আসার সময় মাইক্রোফিল্মটা আমি দেখেছি, তা না হলে তারা আমাকে প্রজেক্ট জিরো-জিরো-

ওয়ানের কথা বলত না। লোক দু'জন দিল্লীতে ফিরে না যাওয়ায় বিজনেস সিন্ডিকেট ধরে নিতে বাধ্য যে ঢাকায় বেঈমানটাকে অর্থাৎ তাদের লোককে খোঁজ করা হবে। কেন তাহলে একরামুল হককে তারা সাবধান করবে না?'

'এমন হতে পারে না যে তারা জানত, কিন্তু একরামুল হককে জানায়নি?' চুরুট কামড়ে ধরে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন রাহাত খান। 'হতে পারে না, তারা আসলে একরামুল হককে হারাতে চাইছিল!'

গুরু-শিষ্য তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ। রানা শুরু করল, 'কিন্তু...'

বাধা দিলেন রাহাত খান। 'এক মিনিট। মাতাল একরামুল হকের দ্রুত অধঃপতন ঘটছিল, বিজনেস সিন্ডিকেটের দৃষ্টিতে লোকটা হয়ে উঠছিল বিরাট একটা সিকিউরিটি রিস্ক। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কি ঘটে, সবাই আমরা জানি। হয় তাকে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়, নয়তো ফেলে দেয়া হয় বাঘের খাঁচায়।'

'বাঘ মানে আমরা?' উইং কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, নিজেদের পরিচয় উপলব্ধি করে চোখ জোড়া তাঁর বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'ছোটখাট এজেন্টদের একটা কন্ট্যাক্ট দেয়া হয়—ভুয়া পরিচয় নিয়ে এক লোক, সে তাদেরকে জানায় কখন ও কোথায় তাদের দেখা হবে। এই লোক যদি আসতে ব্যর্থ হয়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হারিয়ে গেল এজেন্ট। তারপর, সে যদি ধরা পড়ে, ফাঁস করার মত কিছুই তার থাকবে না। আমরাও তার পিছনের লোকগুলোকে কোন দিন খুঁজে পাব না।'

রানা বলল, 'কিন্তু লোকটা না আসাতে এজেন্ট একটা ওয়ার্নিং পেল না?'

'পেল। আর, এ-ধরনের ওয়ার্নিং থেকে সে বুঝে নেবে বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করেছে। ফলে একরামুল হকের মত দুর্বলচিত্ত লোকের সামনে একটাই পথ খোলা থাকে—নদীতে ঝাঁপ দেয়া।'

'জল-চিকিৎসা!' মুচকি হাসলেন উইং কমান্ডার।

'তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার পর,' রাহাত খান বললেন, 'একরামুল হক কি করল? ঘুরপথে তোমার গাড়ির কাছে চলে আসে সে, দেখতে পেয়ে মেয়েটা তাকে ডাকল। সম্ভবত গাড়িতে ওঠার পর আত্মহত্যা করার উপায়টা দেখতে পায় সে। ফুলস্পীডে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাঁক নিয়ে নদীর দিকে ছুটল গাড়ি।'

'কিন্তু মেয়েটাকে সাথে নিয়ে কেন?'

'একরামুল হক ভেবে থাকতে পারে, মেয়েটারও বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। ড্রাগসের শিকার, তাকে হয়তো ভালও বাসত লোকটা, নিজেদেরকে আলাদাভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না। তবে, আমিও চাই লোকটার অতীত সম্পর্কে আরও তথ্য যোগাড় হোক।'

'কাঠগোলার পিছনে, অত রাতে, লোকজন থাকার কথা নয়,' বলল রানা। 'অথচ একজন লোক গাড়িটাকে পড়ে যেতে দেখল নদীতে। থানা খুব বেশি দূরে নয়, কিন্তু সেখানে না গিয়ে সে টেলিফোন করল, নিজের পরিচয় প্রকাশ করল না। আমি তার পরিচয় জানার চেষ্টা করি। গাড়িটাও একবার দেখে আসা দরকার।'

'পুলিসের সাথে তোমার কথাও বলা দরকার,' রাহাত খান পরামর্শ দিলেন। 'ইতিমধ্যে তারা জেনেছে গাড়িটা শফিকুর রহমানের নামে ভাড়া করা হয়েছিল।'

'গাড়ি হারানোর খবর সকালেই আমি থানায় জানিয়ে দিয়েছি,' বলল রানা। 'টেলিফোনে। রেন্ট-এ-কার কোম্পানীকেও বলেছি।'

'তাহলে এখানের কাজ সেরে কালই আবার তুমি চট্টগ্রামে ফিরে যাও। বিজ্ঞানীরা কি বলেন দেখো।'

'চট্টগ্রামে কোথায় আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন উইং কমান্ডার। মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কি ঘটল আমাকে তাহলে জানাবেন, প্লীজ।'

'জানাব,' বলল রানা। 'ফটোগ্রাফটা কি আমার কাছে থাকতে পারে?'

'রাখো,' বললেন রাহাত খান। 'ওটা তোমার লাগবে।'

ফতুল্লা থানায় যাবার আগে সামরিক ইউনিফর্ম পরল রানা। চোখে হালকা ফ্রেমের সান গ্লাস আর ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ লাগিয়ে খানিক বদলে নিল চেহারা। বলা তো যায় না, সত্তর নম্বর দীপক ব্যানার্জি রোডের বাড়িটায় ওকে হয়তো ঢুকতে বা বেরুতে দেখেছে কেউ।

ফতুল্লা থানার ও. সি., ফারুক আহমেদ, একজন মেজরকে ঢুকতে দেখে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিল রানা, হাত বাড়াল করমর্দনের জন্যে, সে-ই ফারুক আহমেদকে বলল, 'বসুন।' ডেস্কের এ-ধারে নিজেও একটা চেয়ারে বসল ও। তারপর আলাপের সুরে প্রশ্নপর্ব শুরু করল।

অজ্ঞাতনামার কোন কল এসেছিল, কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বিয়াল্লিশ মিনিটে। কোত্থেকে ফোনটা করা হয়েছে, তদন্ত চালিয়ে জানতে পেরেছে থানা। অকুস্থল থেকে সবচেয়ে কাছের টেলিফোন ওটা, দক্ষিণ পাড়ায়, একটা আবাসিক বাড়ির। বাড়ির মালিক তাঁর ড্রইংরুমে বসে পড়াশোনা করছিলেন, এই সময় দরজায় নক হয়। আগন্তুককে বেকার যুবক বলে মনে হয়েছে তাঁর। ভদ্রলোককে সে জানায়, রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় একটা গাড়িকে নদীতে পড়ে যেতে দেখেছে সে, থানায় ফোন করতে চায়। ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করেন, থানা তো কাছেই, টেলিফোন করার দরকার কি? উত্তরে যুবক বলে, কাছে হলেও তার উল্টোদিকে হয়। তাছাড়া, থানায় গিয়ে খবর দিলে তার নাম-ঠিকানা লিখে রাখা হবে, আবার হাজিরা দিতে বলতে পারে, ইত্যাদি নানা ঝামেলা। তাই সে শুধু ফোন করে দায়িত্বটা কাঁধ থেকে নামাতে ইচ্ছুক। এরপর ভদ্রলোক তাকে টেলিফোনটা দেখিয়ে দেন।

নদী থেকে উদ্ধার করা গাড়িটা দেখানোর জন্যে গ্যারেজে নিয়ে আসা হলো রানাকে। 'আপনার কি ধারণা তাহলে?' ফারুক আহমেদকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'অ্যাক্সিডেন্ট, নাকি অন্য কিছু?'

'আপনি বরং, স্যার,' বললেন ও. সি., ইতোমধ্যে রানা আপত্তি করা সত্ত্বেও সম্বোধন পাল্টাতে সফল হলেন না তিনি, 'আগে গাড়িটা দেখুন চিনতে পারেন কিনা।'

ঝুঁকে গাড়ির ভেতর, ড্যাশবোর্ডে ফিট করা ঘড়িটার দিকে তাকাল রানা। ন'টা আটত্রিশ মিনিটে বন্ধ হয়ে গেছে ওটা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল ও। 'বুটে আমার একটা সুটকেস থাকার কথা।'

'ছিল, আছে,' আশ্বস্ত করলেন ফারুক আহমেদ। 'অফিসে পাবেন, স্যা...জ্বী, প্রথমে আমরা দুর্ঘটনা বলেই মনে করেছিলাম। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল, মেইন রোড থেকে বেশ চওড়া একটা কাঁচা রাস্তা রাম বাবুর কাঠগোলার পাশ ঘেঁষে নদীর দিকে চলে গেছে, অন্ধকারে মেইন রোড থেকে সেটাকে আলাদাভাবে চেনা সম্ভব নয়। কাঁচা রাস্তাটা লম্বা নয়, দেড়শো গজের মত হবে। অধ্যাপক সাহেব মদ খেয়েছিলেন। কিন্তু পরে অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা করার কারণ ঘটেছে।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'অধ্যাপক হকের বন্ধু-বান্ধবরা বলছেন, ইদানীং প্রায়ই নাকি তিনি আত্মহত্যার কথা বলতেন।'

'কেন, কারণ কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ কি তা কেউ পরিষ্কার বলতে পারছে না। কারও কারও ধারণা, লাবণীর বিয়ে ভেঙে যাবার পর থেকেই আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন হক সাহেব।'

'লাবণী মানে দ্বিতীয় লাশ?'

'জ্বী। তার পরিচয়ও আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের এলাকার অত্যন্ত নামকরা এক হেডমাস্টার সাহেবের মেয়ে। এক পাষণ্ডের সাথে বিয়ে হয়েছিল। বাবার কাছ থেকে যৌতুকের টাকা চাইতে পারবে না বলে রোজই বেচারিকে স্বামীর হাতে মারধর খেতে হত। তারপর লোকটা দ্বিতীয় বিয়ে করল। তলপেটে লাথি খেয়ে লাবণীকে একবার হাসপাতালে যেতে হয়, তখনই প্রথম প্যাথেডিন নিতে হয় তাকে। ব্যথাটা পুরোপুরি সারেনি। অসহ্য লাগলেই প্যাথেডিন নিত। এভাবেই অভ্যেস হয়ে যায়। এরপর স্বামী তাকে তালাক দেয়। প্যাথেডিন কিনতে গিয়েই হক সাহেবের সাথে তার পরিচয়। সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা। কেউ কেউ বলছে, বিয়ে ভেঙে যাবার পর হক সাহেব লাবণীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লাবণী নাকি রাজি হচ্ছিল না। কাজেই, আমরা ধরে নিচ্ছি, গাড়িতে ওদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দুর্ঘটনাও হতে পারে, আবার আত্মহত্যাও হতে পারে।'

রানা খানিকটা স্বস্তিবোধ করল এই ভেবে যে ও. সি. আরও গভীরে যেতে আগ্রহী নয়। অফিস থেকে সুটকেস নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল ও। মনে খচখচ করে একটা প্রশ্ন বিঁধছে।

ন'টা আটত্রিশ মিনিটে পানিতে পড়ে গাড়িটা। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা মিথ্যে বলে না। ঘড়িটা যে নির্ভুল সময় দেয়, ওর জানা আছে। অথচ ও. সি. বলছে, অজ্ঞাতনামার ফোন কল এসেছিল কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বিয়াল্লিশে। সময়ের এই হিসেব সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কারণ ফোন আসার সাথে সাথে ডিউটি সার্জেন্ট সময়টা খাতায় টুকে রেখেছে। তারমানে গাড়িটাকে নদীতে পড়তে দেখা আর ফোন করার মাঝখানে সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র

চার মিনিট। চার মিনিট অত্যন্ত কম সময় নয়?

রাম বাবুর কাঠগোলা কাছেই, মটরসাইকেল নিয়ে দক্ষিণ পাড়া হয়ে পৌঁছে গেল রানা। আসার পথে বাড়িটাও দেখল, যে-বাড়ি থেকে টেলিফোন করা হয়েছিল। বাড়ি আর নদীর কিনারা, মাঝখানে আধ মাইলেরও বেশি দূরত্ব। দ্রুত হাঁটলে একজন লোক আট মিনিটে পেরুতে পারবে, দৌড়ালে লাগবে অর্ধেক সময়–কোন অবস্থাতেই চার মিনিটের কমে সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে যুবক বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলার সময় পেল কোত্থেকে? উঁহুঁ, ঘাপলা মনে হচ্ছে।

আবার দক্ষিণ পাড়ার বাড়িটার সামনে ফিরে এল রানা। কলিং বেল বাজাতে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। ইউনিফর্ম দেখে ভুরু কোঁচকালেন তিনি। নিজের পরিচয় দিয়ে রানা জানাল, কাল রাতে চুরি যাওয়া গাড়িটা তার। 'ভাগ্য ভাল যে গাড়িটাকে নদীতে পড়তে দেখেছিল একজন, তা না হলে ওটা উদ্ধার করা যেত কিনা সন্দেহ।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' ভদ্রলোক বললেন। 'ভেতরে এসে বসুন না।'

'জী-না, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'যুবকের প্রতি সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। সামান্য কিছু উপহার দিতে চাই, কিন্তু তার ঠিকানা তো জানি না। আপনি তাকে চেনেন…?'

'পুলিসও জিজ্ঞেস করেছিল। না।'

এক মুহূর্ত পর রানা বলল, 'সে যে-ই হোক ঝড়ের গতিতে ছুটে আসতে হয়েছে বেচারিকে। নিশ্চয়ই হাঁপাচ্ছিল?'

'হাঁপাচ্ছিল? না তো!' প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন। 'সম্পূর্ণ শান্ত দেখলাম তাকে আমি। তবে গাড়ি নিয়ে এসেছিল কিনা বলতে পারব না।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল রানা। প্রমাণ যা দরকার ছিল, পাওয়া গেছে। অজ্ঞাতনামা যুবক নদীর কিনারায় ছিল না, গাড়িটাকে সে নদীতে পড়তে দেখেনি। অথবা লোকটা গাড়ি নিয়ে ফোন করতে এসেছিল।

দশ

পরদিন সকাল ন'টা, চট্টগ্রামে নিজের হোটেল কামরায় গিলটি মিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ানের বিজ্ঞানীরা গত দু'দিন কি করেছে না করেছে তার কাছ থেকে জানা যাবে। ওর বিশ্বাস, অবহেলাই যদি সত্যি দায়ী হয়, রিপোর্টটা হবে নেতিবাচক। আর যদি…

খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল রানা, হোটেলের উঠানে তাকাল। একটা ট্রাক থেকে শাক-সব্জি নামানো হচ্ছে। রেডিওতে খানিক আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনেছে রানা, ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট।

একরামুল হকের ব্যাপারটা এখনও চিন্তার মধ্যে রেখেছে ওকে। বসের কথাই বোধহয় ঠিক, ভাবল ও, বিজনেস সিন্ডিকেট হয়তো হক সাহেবকে খরচের খাতায়

তুলতে চেয়েছিল। অজ্ঞাতনামা যুবক সম্ভবত সুজি ওয়াঙেই বসেছিল, একরামুল হককে নিয়ে রানা যখন বেরিয়ে এল, সে ওদেরকে অনুসরণ করে। তারপর, গাড়ি নিয়ে একরামুল হক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে পুলিসে ফোন করার জন্যে দক্ষিণ পাড়ায় চলে আসে, তার সাথেও হয়তো একটা গাড়ি ছিল। কিন্তু কেন? কারণ, উদ্দেশ্য যাই হোক, বিজনেস সিন্ডিকেটের যুবক এজেন্ট আর তার সঙ্গীরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, তারা একরামুল হককে খুন করার আগে বি. সি. আই. যেন ভদ্রলোকের পিছু নেয়। হ্যাঁ, খুন করার আগে। কারণ রানার বিশ্বাস, একরামুল হক নিজে যদি আত্মহত্যা না করতেন, তারাই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিত। এই অদ্ভুত কাহিনী থেকে কি উপসংহার বেরিয়ে আসছে?

গিলটি মিয়া যখন এল, তখনও চিন্তা করছে রানা। এসেই ঝড় তুলল গিলটি মিয়া। বিশদ রিপোর্ট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। শারমিন চৌধুরী আর সুব্রত বড়ুয়ার টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে যাওয়া ছাড়া, গত দু'দিন বাড়ি থেকে একবারও বেরোয়নি রিয়াজুল হাসান। একটা মাত্র ফোন পায় সে। তার বোনের কাছ থেকে, পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা হয়।

'তা'পর, স্যার, কাল রেতে,' চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে বলল গিলটি মিয়া, 'রিয়াজ সাহেব নিজে একটা ফোন কোরলেন।'

'কোথায়?'

'ওয়াসা অপিসে, স্যার। ট্যাপ নাকি লিক হয়ে গেচে...'

'ঠিক আছে, ওটা বাদ দিয়ে যাও।'

'সেকি, স্যার! আপনি জানতে চান না মিস্ত্রি এয়েচিল কিনা?'

'না।'

'কিন্তু, স্যার, এয়েচিল!'

'রিয়াজ সাহেব সম্পর্কে তাহলে এইটুকুই বলার আছে তোমার?'

'জ্বি।'

'এবার তাহলে বাকি দু'জন সম্পর্কে বলো।'

বাকি দু'জন সম্পর্কেও জানার মত কিছু নেই। দু'দিনই সন্ধ্যার সময় পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তারা, প্রথম দিন আগ্রাবাদের একটা চাইনীজ রেস্তোরাঁয় ডিনার খায়, সিনেমা দেখে। দ্বিতীয় দিন আরেক চাইনীজ হোটেলে খায়। সুব্রত বড়ুয়া শারমিন চৌধুরীকে হোস্টেলে পৌঁছে দেয়। সে অবশ্য তার কামরায় ঢুকতে চেয়েছিল, কিন্তু শারমিন চৌধুরী তাকে সে সুযোগ দেয়নি, কৌশলে এড়িয়ে গেছে। দু'দিন সকালেই শারমিনকে ফোন করে সুব্রত। 'কি কি কতা হলো, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যার।' লজ্জা পাবার ভঙ্গি করল গিলটি মিয়া। 'সে আমি আপনাকে বলতেও পারব না।'

'আহ্, গিলটি মিয়া, তুমি সিনেমায় অভিনয় করছ না, একটা ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য করছ। সংক্ষেপে বলো।'

'সুব্রত বাবু, স্যার,' মাথা নিচু করে মৃদুকণ্ঠে জানাল গিলটি মিয়া। 'ছুঁড়িটাকে...থুড়ি, গোলাপীকে পটাবার চেষ্টা করচিল।' শারমিন চৌধুরীকে ছুঁড়ি

বলতে পারবে না, রানা এই নিষেধাজ্ঞা জারির পর তার একটা নাম রেখেছে সে।

'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কিছু?'

'গোলাপী তার খালাকে একবার ফোন করেচে। আর সুব্রত বাবু মফিজ নামে তার এক দোস্তকে।'

'বন্ধুর সাথে কি কি কথা হলো?'

'কবে বেড়াতে আসচে, ছোট্টোবোনের চশমার পাওয়ার মিলেচে কিনা...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'ঠিক আছে, বুঝেছি। এবার তুমি তোমার কাজে যাও।' গিলটি মিয়াকে বিদায় করে দিয়ে নিজেও রানা বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে রওনা হলো এয়ারফোর্সের ল্যাবরেটরি ভবনের দিকে।

থমথমে চেহারা নিয়ে রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন রিয়াজুল হাসান। 'হক সাহেবের দুর্ঘটনা সম্পর্কে কাগজে পড়লাম। আপনি নিশ্চয় আরও বিস্তারিত জেনেছেন।'

'হ্যাঁ, তা জেনেছি,' বলল রানা।

'এই ব্যাপারটার সাথে ভদ্রলোকের মৃত্যুর সম্পর্ক আছে?'

'আমার তাই বিশ্বাস।'

'তাহলে আপনার ধারণা...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একরাম সাহেবই অপরাধী ছিলেন। এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঘটনাটা থেকে আপনাদের জন্যে একটা শিক্ষাই বেরিয়ে আসে, এসপিওনাজ সাংঘাতিক বিপজ্জনক ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, তা তো বটেই। কিন্তু, ভদ্রলোক এখানে মাত্র একবারই এসেছেন–কিভাবে তিনি তথ্যটা নিয়ে গেলেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এ-ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'আপনার সহকর্মীরা সবাই উপস্থিত তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' ওয়েটিং রুম থেকে রানাকে ল্যাবে নিয়ে এলেন রিয়াজুল হাসান। শারমিন চৌধুরী আর সুব্রত বড়ুয়াকে দেখা মাত্র, দু'জনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক জানা থাকায়, ক্ষীণ একটু অপরাধবোধ জাগল রানার মনে। অদ্ভুতই বলতে হয়, এতদিন এসপিওনাজ জগতে থেকেও এ-ধরনের অনুভূতি বিসর্জন দিতে পারেনি ও।

'গুড মর্নিং,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আপনাদের তিনজনকে একটা জিনিস দেখাব আমি।' সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরী কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, রিয়াজুল হাসানকে শুধু কৌতূহলী মনে হলো। সাথে করে একটা লেদার পোর্টফোলিও নিয়ে এসেছে রানা, সেটা থেকে এনলার্জ করা ফটোগ্রাফটা বের করল। প্রথমে রিয়াজুল হাসানকে দেখতে দিল ও, সতর্কতার সাথে দেখার পর দেরাজ খুলে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল সে। তারপর আরও কিছুক্ষণ দেখল, আতঙ্কে নীল হয়ে গেল তার চেহারা। 'বাট দিস ইজ ফ্যানটাসটিক...!' ফটো আর গ্লাসটা সুব্রত বড়ুয়ার দিকে ঠেলে দিল সে।

যতটা না আতঙ্কিত, তারচেয়ে বেশি বিস্মিত হলো সুব্রত বড়ুয়া। চোখে নগ্ন

অবিশ্বাস নিয়ে রিয়াজুল হাসানের দিকে তাকাল সে। 'এ-ধরনের একটা ভুল আপনারা করলেন কিভাবে!'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান। 'শারমিনকে দেখাও।'

শারমিন চৌধুরী ফটোটা পরীক্ষা করল, ভুরু কোঁচকাল, রানার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল যেন কোন ব্যাখ্যা পেতে চায়, কিন্তু কেউ কোন কথা না বলায় নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'এ আমি বুঝতে পারছি না।' রিয়াজুল হাসানের দিকে তাকাল সে। 'আপনি পারছেন?'

রিয়াজুল হাসান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় কথা বলল রানা, 'এই ছবিটা লাইফ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়নি। সেটায় শুধু দেখা গেছে আপনি আর শারমিন চৌধুরী জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা হলো আরেকটা, যেটার কথা আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি যখন আপনার সাথে প্রথমবার দেখা করি—শারমিন চৌধুরীর একক ফটো। ফটোয় বহু কিছু ধরা পড়েছে, তাই না? এর কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

'আমি জোর দিয়ে বলতে পারি...' শুরু করল শারমিন চৌধুরী।

তাকে থামিয়ে দিয়ে রিয়াজুল হাসান বললেন, 'মেজর,' রীতিমত ঘাবড়ে গেছে সে, 'এ-ব্যাপারে কি বলব জানি না। ফটোটা না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না...কসম খেয়ে বলতাম হক সাহেবরা যেদিন ল্যাবে আসেন সেদিন সকালে আমাদের সমস্ত টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট তালাচাবির ভেতর রাখা হয়েছিল। শারমিন, তুমি কি বলো?'

শারমিন চৌধুরী এতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে যে কয়েক সেকেন্ড কথাই বলতে পারল না। 'হ্যাঁ,' অবশেষে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'আমি জানি তালাচাবির ভেতর ছিল।'

ঠোঁটে অসহিষ্ণু হাসি নিয়ে রিয়াজুল হাসান বললেন, 'কিন্তু তা ছিল না, দেখতেই পাচ্ছ—ফটোগ্রাফটা উল্টো কথা বলছে। দু'জনেরই ভুল হচ্ছে, তবে আমি অন্তত আমার চোখের সাক্ষ্য মেনে নিচ্ছি।'

'না, কিন্তু...' শুরু করল শারমিন চৌধুরী।

'এর মধ্যে কোনই কিন্তু নেই, শারমিন। আমাদের স্বীকার করতে হবে, সেদিন আমরা মেজরকে যা বলেছিলাম তা মারাত্মক ভুল ছিল, প্রায় অপরাধের সমতুল্য একটা মারাত্মক ভুল। ওঁকে আমরা শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলি যে হক সাহেবরা যেদিন এলেন সেদিন নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। ছিলাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মুখ থেকে কিছুই তারা জানতে পারেননি। কিন্তু পুরোটা সময় ব্লু-প্রিন্ট আর স্পেসিফিকেশনগুলো ড্রইং-বোর্ডে ছিল, যেখানে সাধারণত ওগুলো থাকে, অথচ দু'জনের একজনেরও খেয়াল হয়নি যে কি রয়েছে ওখানে! অসম্ভব বলি, অবিশ্বাস্য বলি, কিন্তু ছিল!' রানার দিকে ফিরল সে। 'জানি আপনি ব্যাখ্যা চেয়েছেন, মেজর। কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছি না তা-ও বুঝতে পারছি। কিন্তু ভুলের কোন ব্যাখ্যা কিভাবে দিতে হয় আমার জানা নেই।' চেহারায় উদ্বেগ, আতঙ্ক, অসহায়ত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

'আপনি তাহলে অভিযোগের উত্তরে,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আবেদন জানাতে চাইছেন, বলতে চাইছেন, এর জন্যে দায়ী অবহেলা?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান।

তার দিকে চট করে একবার তাকাল শারমিন চৌধুরী, কিন্তু কোন কথা বলল না।

রিয়াজুল হাসান বলল, 'এটা কোন ব্যাখ্যা নয়, তবু বলি। একরামুলক হক সাহেবকে বেশ ভালভাবে চিনতাম আমি, তাকে বিশ্বাসও করতাম, ভুলটা হওয়ার সেটাও একটা কারণ হতে পারে। হিউম্যান মাইন্ডের এ এক রহস্য, কোথাও একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পট আছে। মানুষটাকে বিশ্বাস করতাম বলেই হয়তো সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা জোরালভাবে উপলব্ধি করিনি...'

'এনকোয়্যারি বোর্ডের সামনে আপনার এ-সব যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল শোনাবে,' বলল রানা।

'তা কি আর জানি না? কিন্তু আর কিই-বা বলার আছে আমার!'

শারমিন চৌধুরী, রানা লক্ষ করল, রিয়াজুল হাসানের দিকে আর তাকাচ্ছে না, তাকিয়ে আছে সুব্রত বড়ুয়ার দিকে। আর সুব্রত বড়ুয়া সবার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দিন এখানে এসেও তাকে দূরে সরে থাকতে দেখেছিল রানা। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন ছুটিতে ছিল সে, ফলে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু শারমিন চৌধুরী যেভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে, তাতে রানার যেন মনে হলো সুব্রত বড়ুয়াও কোন না কোনভাবে ব্যাপারটার সাথে জড়িত।

একঘেয়ে সুরে কথা বলে চলেছে রিয়াজুল হাসান। এনকোয়্যারি বোর্ডের সামনে খুশি মনে দাঁড়াবে সে। ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভাল। কিন্তু তার কথায় একটা কান থাকলেও তাকিয়ে আছে রানা সুব্রত বড়ুয়ার দিকে। তার আর শারমিন চৌধুরীর মধ্যে নীরবে যেন একটা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। মেয়েটা যেন চাইছে সুব্রত মুখ খুলুক, কিংবা মুখ খুলে ফেলবে এই ভয় করছে। কোন সন্দেহ নেই নিঃশব্দে একটা আবেদন জানাচ্ছে সে।

রিয়াজুল হাসান থামতে রানা সুব্রত বড়ুয়াকে বলল, 'আপনি ভাগ্যবান, সুব্রত বাবু, সেফ-সাইডে রয়েছেন। নাকি আপনারও কিছু বলার আছে?'

'আমার?' প্রায় চমকে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। 'না, আমার কি বলার থাকবে! আমি তো এখানে ছিলামই না।' নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা বদলে ডান পা থেকে বাঁ পায়ে নিল শরীরের ভর, আর কোন কথা বলল না।

'বেঁচে গেছ!' বলে ফটোটার দিকে আবার তাকালেন রিয়াজুল হাসান, তারপর অকস্মাৎ পকেটে হাত ভরলেন। 'নিয়ম নেই, আমাকে ক্ষমা করবেন!' সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরালেন একটা। 'প্লীজ?' রানা আর সুব্রতকে অফার করলেন তিনি, কিন্তু ওরা কেউ নিল না। সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন, কানের পিছনটা চুলকালেন, তাকালেন রানার দিকে। 'জানি আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা বদলে গেছে, মেজর রহমান। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা তো আর অস্বীকার করার যো নেই। যা হয় হবে, সব দোষ আমি আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি।'

'তারপরও কথা থেকে যায়, হাসান সাহেব,' বলল রানা। 'বুঝতেই পারছেন, এটা পূর্ব-পরিকল্পিত ক্রাইম হতে পারে না। একরামুল হক তো আর জানতেন না যে আপনি মারাত্মক ভুলটা করতে যাচ্ছেন।'

'না, তা জানতেন না।'

'তাহলে আপনার ব্যাখ্যা কি?'

'সম্ভবত বিদ্যুৎ চমকের মত বুদ্ধিটা খেলে যায় তার মাথায়। গোটা ব্যাপারটাকে আমরা হরিবল কোইন্সিডেন্স বলতে পারি। ভদ্রলোক...তাকে এখন আমার ভদ্রলোক বলতে ঘৃণা হচ্ছে...লোকটা ভারতীয় স্পাই ছিল, আর আমার হয়েছে অপরাধতুল্য ভুল। দুটো মিলে এই সর্বনাশ ঘটেছে।'

'হুম,' বলল রানা। রিয়াজুল হাসান মেনে নিতে পারলেও, ও পারছে না। এ-ধরনের কাকতালীয় ঘটনা যে ঘটতে পারে না তা নয়, কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ, বিশ্বব্যাপী সামরিক শক্তির ভারসাম্য ইত্যাদি প্রশ্ন জড়িত সেখানে এ-ধরনের কাকতালীয় ঘটনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসম্ভব বলে ধরে নিতে হবে।

অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিয়ে নিচের উঠানে তাকাল। পাকা চত্বরে একা একটা সাদা বিড়াল গা চুলকাচ্ছে। 'একরামুল হক সাহেব কতক্ষণ ছিলেন এই ঘরে?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ও।

'প্রায় আধ ঘণ্টা।'

'আপনার মনে আছে, কাছাকাছি থেকে বা খুঁটিয়ে ড্রইং-বোর্ডটা উনি পরীক্ষা করেছিলেন কিনা?'

'না, মনে পড়ছে না।' শারমিন চৌধুরীর দিকে ফিরলেন রিয়াজুল হাসান। 'তোমার মনে পড়ে?'

'না,' বলল শারমিন চৌধুরী, তার চেহারায় ও সুরে যথেষ্ট অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল।

'যদি দেখতেন, জিনিসটা যে গুরুত্বপূর্ণ, বুঝতে পারতেন তিনি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, সাথে সাথে। একরাম আর রফিকুল বারী সাহেব, দু'জনেই বিষয়টার ওপর যথেষ্ট ধারণা রাখতেন। সেজন্যেই তো আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম।'

'সতর্ক ছিলেন?' প্রায় হেসে উঠল রানা। 'আপনি বলতে চাইছেন, কথাবার্তায়?'

'হ্যাঁ...'

'ঠিক কখন একরাম সাহেব ফটো তুললেন?'

'একেবারে শেষ মুহূর্তে, যাবার আগে।'

'কোত্থেকে?'

'ওই কোণ থেকে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।'

এই সময় মেঘ সরে যাওয়ায় হেসে উঠল সূর্য। উঠানে বিড়ালটা এমনভাবে মাথা তুলল কেউ যেন তাকে আঘাত করেছে। জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা, রিয়াজুল হাসানের হাত থেকে ফটোগ্রাফটা নিল, ল্যাবের কোণে চলে এসে বারকয়েক ছবি আর সামনের দৃশ্যটা মিলিয়ে দেখল। কোন সন্দেহ নেই, ছবিটা এই

জায়গায় দাঁড়িয়েই তোলা হয়েছে, কিন্তু···'দিনের কোন সময় একরাম সাহেব আসেন এখানে?'

'সকাল দশটায়,' বলল রিয়াজুল হাসান।

হ্যাঁ, গুরুতর বৈসাদৃশ্য একটা আছে বটে। হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। এগিয়ে এল রিয়াজুল হাসান, রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ফটোটার দিকে তাকাল। সে-ও কি অমিলটা দেখতে পাচ্ছে?

'ঠিক আছে,' বলল রানা, ফটোটা উল্টো করে নিয়ে পোর্টফোলিও-তে ভরল। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ওর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। 'আপাতত আমার আর কোন প্রশ্ন নেই, আপনারা যে-যার নিজের চিন্তা নিয়ে থাকুন। হাসান সাহেব, আপনাদের প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে আমি কথা দিয়েছি আজকের ইন্টারভিউ সম্পর্কে জানাব। তাঁর কাছ থেকে শুনবেন আপনারা। বুঝতেই পারছেন, সাংঘাতিক আপ-সেট হয়ে গেছেন তিনি।'

'হ্যাঁ, হবেনই তো,' ম্লানকণ্ঠে বললেন রিয়াজুল হাসান। 'আমরাও কি কম আপ-সেট?'

শারমিন চৌধুরী আর সুব্রত বড়ুয়াকে 'গুডবাই' বলল রানা, হ্যান্ডশেক করল রিয়াজুল হাসানের সাথে, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ল্যাব থেকে। দশ মিনিট পর, গাড়িতে বসে, ট্র্যান্সমিটার-রিসিভার-এর সুইচ অন করল ও। প্রায় সাথে সাথে গিলটি মিয়ার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আচি-স্যার, গিলটি মিয়া বলচি। মানে, শুনচি। ইয়ে, মানে, শোনার জন্যে বলচি।'

'তৈরি থাকো, গিলটি মিয়া, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে পারে,' বলল রানা। 'কোন রকম গাফিলতি বা অবহেলা নয়, নজর রাখার কাজটা ঠিকমত চালিয়ে যাও। প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে।'

এগারো

বিকেলে বৃষ্টি শুরু হবার পর আর থামেনি, সাড়ে পাঁচটাতেই চারদিক অন্ধকার মত হয়ে গেছে।

জুবিলী রোডের মোড়ে গাড়ি পার্ক করেছে রানা, একটা চোখ কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের গেটের দিকে। ভাঁজ খোলা খবরের কাগজটা সামনে মেলে ধরেছে ও, খবরগুলোর ওপর মাঝে-মধ্যে চোখ বুলাচ্ছে, অপেক্ষা করছে শারমিন চৌধুরীর জন্যে।

গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পড়া হয়ে গেছে রানার, খুদে শিরোনামগুলো আকৃষ্ট করতে পারলে পড়ছে, তা না হলে এড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অস্থির চোখ জোড়া তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল। শেষ পৃষ্ঠায় রফিকুল বারী নামটা কোথাও দেখেছে, কিন্তু দেখার সাথে সাথে ধরতে পারেনি, হারিয়ে ফেলেছে পরমুহূর্তে। মিনিট খানেক চেষ্টা

করার পর পাওয়া গেল আবার। 'ঢাকার সংবাদ' শিরোনামে অনেকগুলো খবর, তারই একটা হলো, 'মর্মান্তিক'।

খবরটা এক নিঃশ্বাসে পড়ল রানা।

'কাল সকাল সাড়ে পাঁচটায় একজন ট্রাক ড্রাইভার ঢাকা থেকে পনেরো মাইল দূরে আরিচা রোডে একটা গাড়িকে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। গাড়ির ভেতর থেকে পাঁচটা অগ্নিদগ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সনাক্ত করার পর লাশগুলোর পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন, অধ্যাপক রফিকুল বারী, তাঁর স্ত্রী, ও তাঁদের তিন শিশুসন্তান। অধ্যাপক রফিকুল বারী বিদেশে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করার পর কিছু দিন হলো দেশে ফিরে আসেন, দেশের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছিলেন তিনি, নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট হিসেবে দেশে-বিদেশে তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি ছিল।'

ব্যস, এইটুকুই। ঘটনার কারণ হিসেবে কিছুই বলা হয়নি। তবে কারণটা আঁচ করা কঠিন কিছু নয়। গাড়িতে আগুন লাগলে পুড়ে মরার অপেক্ষায় সীটে বসে থাকে না আরোহীরা। ব্যাপারটা যে নির্মম হত্যাকাণ্ড তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

একরাম সাহেব মারা গেলেন, তারপর রফিক সাহেব। মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল রানার। রাগের কারণ অদৃশ্য শত্রুর স্পর্ধা, নাকি নিজের ব্যর্থতা ঠিক বুঝল না। ওর তদন্তে কোথাও গুরুতর কোন ত্রুটি আছে। রফিকুল বারীকে একবারও সন্দেহ করেনি ও। তাঁর সম্পর্কে তথ্যগুলো তাঁকে সন্দেহের বাইরে রাখতে সাহায্য করেছে। আর মানুষ হিসেবে তাঁকে যেমন দেখেছে রানা, সন্দেহ হবার কথা নয়।

শনিবার সন্ধ্যার ইন্টারভিউ-এর কথা মনে পড়ল রানার, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটার ঠিক দশ ঘণ্টা আগের ঘটনা। ঢাকা থেকে পনেরো মাইল দূরে আরিচা রোড ধরে সপরিবারে কোথায় যাচ্ছিলেন রফিকুল বারী? ঘটনাটা যদি ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘটে থাকে, ধরে নিতে হয় অন্তত এক ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছিল বারী পরিবার। রওনা হবার জন্যে প্রস্তুতি দরকার হয়েছে, তারমানে ঘুম থেকে তাঁরা আরও এক ঘণ্টা আগে ওঠেন। অথচ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় রানা যখন বিদায় নিয়ে চলে এল তাঁর মণিপুরী পাড়ার বাড়ি থেকে, কই, তিনি তো দূরে কোথাও সপরিবারে যাবার কথা কিছু বলেননি! না, অসম্ভব! তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, রফিকুল বারীর ভাব দেখে মনে হয়েছে ফিরতে তাদের রাত হবে। কেউ যদি দূর-পাল্লার ভ্রমণে সপরিবারে কোথাও যেতে চায়, তার আগে সে তার ছেলেমেয়েকে যথেষ্ট বিশ্রাম নেয়ার সময় দেবে না? ক্লান্ত বাচ্চাদের নিয়ে ভ্রমণ করা আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করা একই কথা। কেন তা করতে যাবেন রফিকুল বারী?

ভদ্রলোকের পরিচয় সম্পর্কে ক্ষীণ একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রানার মনে। হঠাৎ করে আরেকটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সন্দেহটা আরেকটু বাড়ল। রানাকে তিনি বলেছেন, ছাত্রদের খাতা দেখতে হবে, তাই পরিবারের সাথে যেতে পারেননি। কথাটা বলে আসলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? ছাত্র? ইউনিভার্সিটির ছাত্র? কিন্তু ইউনিভার্সিটিগুলো তো ছুটি উপলক্ষে বন্ধ সব। ব্যাপারটার হয়তো অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে, আরেকটু খোঁজ-খবর করা দরকার।

ড্যাশবোর্ডে লাল একটা আলো জ্বলে উঠল। গিলটি মিয়া কথা বলতে চায়।

তার গোলাপী অর্থাৎ শারমিন চৌধুরী নিউমার্কেট থেকে কেনাকাটা সেরে জুবিলী রোডের দিকে ফিরছে। গাড়িটা একটা গ্যারেজে রেখে হেঁটে ফিরছে সে, বোধহয় মেরামত দরকার। তারপর সে বলল, 'স্পষ্ট বুজতে পারচি না, তবে মনটা কেমন কেমন করচে—কেউ বোদায় স্যার পিচু লিয়েছে আমাদের। আপনি যদি গোলাপীর ওপর চোক রাকেন, কেউটাকে চাকমা দেখিয়ে ভাগতে পারি আমরা। আর যদি বলেন একহাত দেকাতে হবে...'

'একহাত মানে হাঙ্গামা? না,' নিষেধ করল রানা। 'আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া মারপিটের মধ্যে যাবে না। আগে সন্দেহ সত্যি কিনা দেখো। সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, এলাকা ছেড়ে কোথাও যাবে না তোমরা। জুবিলী রোডের আশপাশে চাই তোমাদের।'

'ঠিক আচে।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল রানা। দু'মিনিট পর ফুটপাথ ধরে শারমিন চৌধুরীকে হেঁটে আসতে দেখল ও, হাতে একটা ব্যাগ রয়েছে। রানার সামনে বিশ গজ দূরে রাস্তা পেরোল সে, হোস্টেলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। গাড়ি থেকে নেমে তার পিছু নিল রানা। লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশে চলে এল। 'হ্যালো, মিসেস শারমিন। এক মিনিট সময় হবে?'

বিস্মিত হলো, তবে সামান্যই, রানার দিকে ফিরে মৃদু হাসল। 'আরে, এমন হঠাৎ, কোত্থেকে?'

'গাড়িতে বসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিছু কথা হওয়া দরকার, আজ সকালের ইন্টারভিউ-এর ব্যাপারটা নিয়ে। আমরা কি কোন রেস্তোরাঁয় বসতে পারি?'

'না,' বলল শারমিন চৌধুরী। 'কথা আমারও কিছু আছে। আপনি বরং আমার কামরায় চলুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মত হলো রানা। দু'জন, একসাথে এলিভেটরে চড়ল। পাঁচতলায় উঠছে এলিভেটর, নিঃশব্দে তাকে লক্ষ করল রানা। চেহারায় স্মিত হাসি থাকলেও, তার মনের উদ্বেগ পরিষ্কার ফুটে রয়েছে চোখ দুটোয়। সারা শরীরে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা, কি না কি শুনতে হবে ওকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপ্রতিভ বোধ করল ও। ছি ছি, একটা মেয়ের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়। কিন্তু চেষ্টা করেও চোখ দুটো সরাতে পারল না রানা। পানপাতা আকৃতির অবয়বে এত বেশি লাবণ্য, গায়ের চামড়া এত মসৃণ আর কোমল, শরীরের গড়ন এতটাই নিখুঁত যে রোমান্টিক কবিতার দু'একটা লাইন নিজের অজান্তেই উঁকি দিল মনে।

শারমিন চৌধুরী কিছু টের পেল কিনা বলতে পারবে না রানা, হঠাৎ রানার দিকে ফিরে জোর করে একটু হাসল সে, বলল, 'আপনি আসায় সত্যি আমি খুব খুশি হয়েছি।' কথা বলার সময় চিবুক একটু উঁচু করল সে। 'আমি নিজেই ভাবছিলাম কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায়...'

কামরাটা পাঁচতলায়, দুটো ঘর আর একটা কিচেন, সংলগ্ন বাথরুম। হালকা

ফার্নিচার দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো, কোথাও কোন বাহুল্য নেই। ফ্রেমে বাঁধা প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেশীয় শিল্পীদের আঁকা। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ড্রইংরুমের আলো জ্বেলে দিল শারমিন চৌধুরী। হাতের ব্যাগটা রেখে এল কিচেনে। বলল, 'আপনাকে আপ্যায়ন করার মত কোন উপায় নেই, দুঃখিত, মেজর রহমান। চা বা কফি আমি খাই না। ওমা, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, প্লীজ বসুন।' হাত একটু তুলে সিঙ্গেল সোফাটা দেখিয়ে দিল রানাকে। 'আপনি অবশ্য সিগারেট খেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।' যদিও সিগারেট ধরাল না রানা। 'কে শুরু করবে আগে? আপনি, না আমি?'

রানার সামনে সোফায় বসে কয়েক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল শারমিন চৌধুরী। তারপর মুখ তুলে তাকাল। থমথম করছে চেহারা। 'ফটোটা সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ-শুরু করুন।'

'হক আর বারী সাহেব যখন ল্যাবে এসেছিলেন, ফটোটা তখন তোলা হয়নি, হতে পারে না।'

'কেন?'

'পরিষ্কার মনে আছে আমার, আমি নিজে ড্রইং-বোর্ড থেকে সব সরিয়েছিলাম, সরিয়ে তালাচাবির ভেতর রেখেছিলাম। তাছাড়া, ফটোতে আমার চুলের যে স্টাইল দেখা যাচ্ছে, ওঁরা যখন ভিজিট করতে আসেন তখন ওই স্টাইলে আমি চুল বাঁধতাম না। ওটা আমি শুরু করেছি এবারের বসন্তে।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করি,' বলল রানা। 'কারণ আমিও আপনার মত একই উপসংহারে পৌঁচেছি।'

'তারমানে আপনিও ধরে ফেলেছেন যে ফটোটা ওই সময়ের নয়?'

'হ্যাঁ।'

'উফ্, বাঁচা গেল! আমার ভয় হচ্ছিল আপনি বোধহয় আমাকেও মিথ্যেবাদী ভাববেন।'

'আপনাকেও? আপনাকেও? আর কে মিথ্যে কথা বলছে?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে, দয়া করে আমাকে বলবেন, কিভাবে আপনি আন্দাজ করলেন ওটা একরাম সাহেবের তোলা ফটো নয়?'

'ব্যাপারটা আন্দাজ নয়, শারমিন,' নাম ধরে সম্বোধন করলেও, উচ্চারণে সমীহের সুর থাকল। 'আমার চোখে ধরা পড়েছে, ছায়াগুলো আলাদা। হক সাহেব সাড়ে দশটার সময় ছবি তোলেন, তাই না? এটা দেখুন,' বলে পকেট থেকে প্রিন্টটা বের করল রানা, চার ভাঁজ করা, ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'আজ আমিও আপনাদের ল্যাবে সাড়ে দশটার সময় ছিলাম। দরজার পাশের কোণটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে হক সাহেব ছবিটা তুলেছিলেন বলে বলা হচ্ছে। সেদিনের মত, আজও রোদ ঢুকেছিল ঘরে। ফটোতে ছায়া পড়েছে যেদিকে, আজ আমি তার উল্টোদিকে ছায়া দেখলাম, বিশেষ করে আপনার ছায়াটা। দেখতে পাচ্ছেন?' উঠে দাঁড়াল রানা, শারমিন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল, আঙুল দিয়ে ফটোর ছায়াটা

দেখাল।

'হ্যাঁ,' বলে মুখ তুলল শারমিন চৌধুরী, হঠাৎ দু'জনের মুখ অত্যন্ত কাছাকাছি চলে এল, প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি হতে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সিধে হলো রানা। 'ফটোটায় দেখতে পাচ্ছি রোদ ঢুকেছে পশ্চিম দিক থেকে, তারমানে সময়টা হবে শেষ বিকেল।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর আবার মুখ খুলল, 'হক বা বারী সাহেব আর কখনও ল্যাবে ফিরে আসেননি, কাজেই ধরে নিতে হয় এটা তুলেছে দু'জনের একজন–হয় হাসান ভাই, নয়তো সুব্রত।'

সহজ, শান্তভাবেই কথাগুলো বলল শারমিন চৌধুরী, যেন এই সন্দেহটা অনেক আগে থেকেই মনে পুষে রেখেছে সে। কিন্তু বলে ফেলার পর তার প্রতিক্রিয়া হলো। হাত থেকে খসে পড়ল ফটোটা, নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল, দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরল। 'খোদা! ওহ্ খোদা! এ কাজ কেন করতে গেল ও! কিসের অভাব ওর, কেন এ-পথে পা বাড়াল!'

রানার জন্যে এটা একটা বিস্ময়। 'সুব্রত বাবু?'

'হ্যাঁ, সে ছাড়া আর কে!' মুখ লুকিয়ে সোফা ছাড়ল শারমিন চৌধুরী। 'প্লীজ, মাফ করবেন আমাকে। এক মিনিট, প্লীজ...' এক ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

মুখ ধুয়ে প্রায় তখুনি ফিরে এল সে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'শান্ত হয়ে বসুন, এখুনি কিছু বলার দরকার নেই। ধীরে ধীরে সব শোনা যাবে, কেমন?'

সোফায় বসে হেলান দিল শারমিন চৌধুরী, নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলও সে। 'বলে ফেলার পর মনটা হালকা লাগছে। আজ সকালেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলাম। ফটোটা দেখে ধড়ে আমার প্রাণ ছিল না। ওটা যে তোলা হয়েছে তাই আমার জানা ছিল না। তার আগে পর্যন্ত দুটো পরস্পর বিরোধী ধারণা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারছিলাম না। একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম আমি, হক সাহেবরা যেদিন এলেন সেদিন সকালে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোন উপায় ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো, আমি মরিয়া হয়ে বিশ্বাস করতে চাইছিলাম হক সাহেবই অপরাধী, আমি আর হাসান ভাই যেভাবে হোক কোথাও ভুল করেছি। বুঝতেই পারছেন, সময়টা কি কষ্টের মধ্যে কেটেছে আমার...'

'হক সাহেব যে অপরাধী তাতে কোন সন্দেহ নেই, অন্তত তিনি জড়িত ছিলেন। তবে আসল লোক তিনি ছিলেন না। আপনার কি ধারণা, রিয়াজুল হাসান সত্যি বিশ্বাস করেন তাঁর ভুল হয়েছে?'

'না, আমি তা মনে করি না। তাঁর এ-ধরনের ভুল হওয়া অসম্ভব।'

'অথচ আজ সকালে তিনি বার বার জোর দিয়ে সে-কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।'

'জানা কথা সুব্রতকে বাঁচাবার জন্যে। আমি জানি সুব্রতকে তিনি সন্দেহ করেন।'

'কিভাবে জানলেন?'

'এ-ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলেছেন তিনি। বিশেষ করে সুব্রতর অতীত জীবন, সর্বহারা পার্টির সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি...' খানিক ইতস্তত করল শারমিন চৌধুরী। 'মানে...বলতে খারাপ লাগছে আমার...'

'হাসান সাহেব আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনি যেন সুব্রত বাবুর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন, যাতে তার সম্পর্কে আরও ভালভাবে জানা যায়...?'

বিস্ফারিত হলো চোখ জোড়া, শারমিন চৌধুরী প্রায় আঁতকে উঠে জানতে চাইল, 'আ-আপনি জানলেন কিভাবে?'

'আমি শুধু জানি সুব্রত বাবুর সাথে প্রায়ই আপনি বেড়াতে-টেড়াতে যান।'

'আপনি আমাদের ফলো করেছেন?'

'না,' মিথ্যে বলল রানা। 'তবে জেনেছি।'

'ও।' শারমিন চৌধুরী নড়েচড়ে বসল সোফায়। 'সুব্রতকে কি বলতে হবে সব আমাকে শিখিয়ে দেন হাসান ভাই: দুনিয়ার সবচেয়ে ত্যাঁদোড় আর আসুরিক সাম্রাজ্যবাদ হলো রাশিয়া। কমিউনিজম নির্দয় বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই মতবাদ মানুষের কোমল অনুভূতিগুলোকে কানাকড়ি মূল্য দেয় না। মার্ক্স ছিলেন অর্ধমানব, হৃদয়হীন একটা ব্রেন। তারপর দেখো কি তার প্রতিক্রিয়া হয়।'

একটা ভুরু কপালে তুলল রানা। 'তারমানে হাসান সাহেব এ-ব্যাপারে রীতিমত সিরিয়াস ছিলেন।'

'ছিলেন না মানে! আমাকে তিনি আরও লক্ষ করতে বলেন সুব্রত দু'হাতে টাকা ওড়ায় কিনা।'

'ওড়ান?'

'হ্যাঁ...মানে,' মৃদু হাসল শারমিন চৌধুরী, 'আমার জন্যে বেশ ভালই খরচ করে সে...!'

রানাও একটু হাসল। 'সেটা সঙ্গত, কারণটা পরিষ্কার। আর তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি? তিনি কি এখনও সর্বহারা পার্টির সাথে গোপনে সম্পর্ক রাখেন? ভাল কথা, হাসান সাহেবকে আপনি জিজ্ঞেস করেননি, সর্বহারা পার্টি করা মানেই কি দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা?'

'করিনি মানে! উনি বললেন, আমরা একটা সন্দেহের ওপর তদন্ত চালাচ্ছি, সুব্রতকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করছি না। না, সুব্রত পার্টির সাথে সম্পর্ক অনেক আগেই চুকিয়ে ফেলেছে। সে নিজে কথাটা বলেছে আমাকে। সর্বহারা পার্টির প্রতি সহানুভূতি আছে তার, তবে এ-কথাও তাকে বলতে শুনেছি দেশের লোক শিক্ষিত না হলে কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়।'

'আপনার মুখে রাশিয়ার নিন্দা শোনার পর কি বলেন তিনি?'

'ওহ্, শারমিন, রাশিয়ার কথা বাদ দাও, আমি তোমার কথা শুনতে চাই!' সামান্য আড়ষ্ট ও লালচে হলো সে, ক্ষীণ হাসল।

'সুব্রত বাবুর দোষ কি, সামনে আপনি থাকলে রাজনীতির মত বিষয় নিয়ে

কেই-বা মাথা ঘামাতে চাইবে!'

প্রশংসা শুনে আবারও হাসল বটে শারমিন চৌধুরী, তবে এখনও তাকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

প্রসঙ্গ থেকে সরল না রানা, 'সুব্রত বাবু দোষী ভেবে আপনি কেঁদে ফেললেন, কিন্তু নিজেই দেখুন তার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পাওয়া গেল। আচ্ছা, সুব্রত বাবুর বদলে রিয়াজুল হাসান নয় কেন?' মনে মনে রানা ভাবল, কিংবা নয় কেন শারমিন চৌধুরী? ফটোটায় সে আছে, তারমানে তো এই নয় যে নিজে কেউ নিজের ফটো তুলতে পারে না। সে-ই যে তোলেনি, তার প্রমাণ কোথায়?

সরাসরি উত্তর দিল না শারমিন চৌধুরী, তবে প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'কি সর্বনাশ! মনে পড়ে গেছে! আজ রাতে সুব্রতর সাথে বাইরে যাওয়ার কথা আমার। এখুনি তাকে জানিয়ে দেয়া দরকার, আমি যাচ্ছি না।' টেলিফোনের দিকে এগোল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'হাসান ভাই কেন যে দোষী নয়, একটু পর বলছি আপনাকে।'

ড্রইংরুমের এক কোণে টেলিফোনটা। রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে। 'হ্যালো? হ্যালো, সুব্রত? আমি, সুব্রত...' মৃদু শব্দে হাসল সে, শুনে শিরশির করে উঠল রানার মেরুদণ্ড। 'সুব্রত, লক্ষীটি রাগ কোরো না। সত্যি আমি ভারি দুঃখিত, জানি তুমি...আহ্, আগে শোনোই না ছাই...আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, একটু শীত শীতও করছে। সন্ধ্যায় যাবার কথা ছিল না? আজ সম্ভব নয়। কি, রাগ হচ্ছে? সত্যি আমি সাংঘাতিক দুঃখিত...কি...? না...দরকার নেই...সত্যি বলছি...না-না, ছেলেমানুষি কোরো না তো...হ্যাঁ, ঠিক আছে...তাহলে কাল সকালে দেখা হচ্ছে। খোদাহাফেজ!'

ফিরে এসে রানার সামনে সোফায় আবার বসল শারমিন চৌধুরী, চেহারায় আড়ষ্ট হাসি, কষ্ট পাচ্ছে বোঝা যায়। 'কি বলব, ও না আমাকে...সত্যি...মানে...'

'ভালবাসে,' বলল রানা।

'কি জানি...অন্তত এইটুকু বলতে পারি, আমি তা চাইনি।'

'রিয়াজুল হাসান সম্পর্কে বলুন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কি বলবে ভেবে নিল মেয়েটা। 'প্ল্যানসহ ড্রইং-বোর্ড আর পাশে আমাকে নিয়ে ফটোটা যে-ই তুলে থাকুক, সে চেয়েছে সবাই মনে করুক ওটা একরামুল হক সাহেব তুলেছেন।'

'একমত।'

'কাজেই সে ভেবেছে ফটোটা যদি আমাদের ইন্টেলিজেন্স-এর হাতে পড়ে তাহলে তারা বিশ্বাস করবে যে একরামুল হক অপরাধী।'

'ঠিক।'

'কিন্তু ব্যাপারটা নির্ভর করে হক সাহেব যেদিন এলেন সেদিন ড্রইং-বোর্ডে প্ল্যানটা ছিল কিনা তার ওপর। সুব্রত অনুপস্থিত ছিল, এবং তার ধারণা প্ল্যানটা ওখানে ছিল। আমি আর হাসান ভাই জানি, ছিল না। আমাদের জানাটা মিথ্যে হতে পারে না। তারমানে সুব্রতর ধারণাটা মিথ্যে। মিথ্যে একটা ধারণার পক্ষে কথা বলছে সে,

কাজেই ধরে নিতে হয় কোন না কোনভাবে…'

'আপনার কথায় খানিকটা যুক্তি থাকতে পারে,' বলল রানা, কথাগুলো মেনে নিতে পারছে না। 'কিন্তু কি জানি। তবে একটা কথা তো ঠিক যে আজ সকালে রিয়াজুল হাসান যখন অবহেলাকে দায়ী করছিলেন, উনি আসলে মিথ্যে কথা বলছিলেন?'

'সে তো সুব্রতকে বাঁচাবার জন্যে।'

'নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করার ঝুঁকি নিয়ে কেন তিনি সুব্রতকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন?'

'কারণ সুব্রতকে উনি খুব ভালবাসেন।'

শারমিন চৌধুরীর ম্লান, উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে নিয়ে রানা বলল, 'ভাল তো তাকে আপনিও বাসেন?'

'তাকে আমি পছন্দ করি, হ্যাঁ…'

হঠাৎ করে রানার মনে হলো, মেয়েটা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ধারাল হলেও, ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরার ব্যাপারে এখনও তেমন দক্ষতা অর্জন করেনি। অপরিণতই বলা যায়। রোজ যে লোকটার পাশে বসে কাজ করে তার প্রতি নিজের অনুভূতিগুলো এখনও সে সনাক্ত করতে পারেনি। মনের অনুভূতিগুলোকে ভয় পায় সে, বোধহয় সেজন্যেই সুব্রতর বিরুদ্ধে দ্রুত একটা উপসংহারে পৌঁছুতে চাইছে, যাতে ভাবাবেগের বন্ধন ছিড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। কোন সন্দেহ নেই তার এই আবেগ তাকে, যে-কোন কারণেই হোক, অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ধর্ম একটা কারণ হতে পারে। সুব্রত মুসলমান নয়, তাকে ভালবাসলে শেষ পরিণতি শুভ হবে না, এই ধারণা থেকেও অশান্তির উদ্ভব হতে পারে।

'আপনি বরং গোটা ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' বলল রানা। 'নিজেকে শুধু শুধু কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না। সুব্রত বাবুর কাছ থেকে বেফাঁস কথা আদায় করার কোন দরকার নেই। তাছাড়া, বুদ্ধিটা আপনার নয়। ভাল কথা, কবে এই পরামর্শটা দেন আপনাকে রিয়াজুল হাসান?'

'বেশ কিছুদিন আগে।'

'ইদানীং নয়?'

'না।'

'দ্বিতীয় ফটোটা তোলার পর, গত বসন্তে?'

'হ্যাঁ, তাই হবে। চুলের স্টাইল দেখে আমি বলে দিতে পারি প্রথমটার বেশ কিছুদিন পর দ্বিতীয় ফটোটা তোলা হয়েছিল।'

'হুম। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, কিন্তু সুব্রত বাবুর সাথে এই অন্যায় খেলাটা আপনার জন্যে সিরিয়াস বিপদ ডেকে আনতে পারে। কাজেই, ও-সব বাদ। রাজি?'

'খুশি মনে।' দেখে মনে হলো স্বস্তিবোধ করছে শারমিন চৌধুরী, তার জন্যে করুণা বোধ করল রানা। যদিও বোধটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

ও বলল, 'অন্য কোন অর্থ করবেন না, বলছি আপনার ভালর জন্যে—আপনি খুব

সুন্দরী, আর সুন্দরী মেয়েরাই বিপদে পড়ে। আমি চাই না আপনার অকালমৃত্যু হোক বা আরও খারাপ কিছু ঘটুক।'

চেহারা শুকিয়ে গেল মেয়েটার, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

'দুর্নাম বা দণ্ড, মৃত্যুর চেয়ে খারাপ নয়?'

দম দেয়া পুতুলের মত মাথা ঝাঁকাল শারমিন চৌধুরী।

'তাহলে আমি যা বলব শুনবেন তো?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল শারমিন চৌধুরী, রানা কি বলে শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তার শাড়ির আঁচল খানিকটা খসে পড়ল, ব্লাউজের গায়ে ফুলে উঠল বুক। 'হ্যাঁ, বলুন।'

সোফায় হেলান দিল রানা। 'প্রথমে, আপনি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন। সৌন্দর্যের আলাদা একটা আবেদন আছে, ধরে নিতে পারেন আমি আপনার রূপে মুগ্ধ। এখন···আপনি যদি ব্যাপারটার সাথে জড়িত হন, যদি গভীরভাবে জড়িত হন, এই মুহূর্তে সব কথা খুলে বলুন আমাকে। আপনার নিরাপত্তার জন্যে দরকার এটা। একরামুল হক সাহেব জড়িত ছিলেন। আপনি জানেন, তিনি মারা গেছেন। বলতে পারেন, তিনি তো আত্মহত্যা করেছেন। হয়তো তাই, কিন্তু কেন? কারণ তিনি জানতেন, আর কোন পথ খোলা নেই। জানতেন, আত্মহত্যা না করলে তাকে খুন করা হবে। তারপর আর কে খুন হলো? রফিকুল বারী। কেন, তিনি কেন খুন হলেন? তিনি খুন হলেন, কারণ তিনি একরামুল হক সাহেবকে সন্দেহ করেছিলেন। তিনি একা নন, ওরা তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ গোটা পরিবারকে মেরে ফেলেছে। আপনি চান, আপনার ভাগ্যেও তাই ঘটুক?'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল শারমিন চৌধুরী। 'না, মাগো, না! কি-কিন্তু কিভাবে?'

'খানিক আগে খবরের কাগজে পড়লাম। ঢাকায়, আরিচা রোডে পাওয়া গেছে তাঁর গাড়িটা, ভেতরে পাঁচটা পোড়া লাশ।'

'সত্যি খুন?'

'হতে বাধ্য।'

'কিন্তু কেন?'

'এখনও জানি না। আগের রাতে রফিকুল বারী সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। হতে পারে হক সাহেব সম্পর্কে আমাকে যতটা বলেছেন তারচেয়ে অনেক বেশি জানতেন তিনি, আর এই বেশি জানাটাই তার জন্যে কাল হয়েছে।'

হাঁটুর ওপর কনুই রাখল শারমিন চৌধুরী, হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'ও আল্লাহ, এসব কি ঘটছে!'

'এ-সব আপনাকে আমি ভয় দেখানোর জন্যে শোনাচ্ছি না,' বলল রানা। 'যদি কিছু জানেন, ভুল বুঝে বা না বুঝে যদি কিছু করে থাকেন, সব আমাকে বলুন। সময় নেই, এখনই। তারপর আপনার নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল সে রানার দিকে, চেহারায় যতটা না ভয় তারচেয়ে বেশি দিশেহারা ভাব। 'আপনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ

করছেন, তাই না?'

'সেটাই কি আমার ডিউটি নয়?'

মেয়েটা রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। এমন সঙ্কটে সে কাঁদল না বা অস্থির হলো না দেখে মনে মনে তার প্রশংসা করল রানা। 'আপনিই বলে দিন কিভাবে নিজেকে আমি নির্দোষ প্রমাণিত করব? নির্দিষ্ট কিছু জানতে চান আপনি?'

'হ্যাঁ, চাই। কল্পনা করুন, কেসটা কোর্টে উঠেছে। রিয়াজুল হাসান শপথ করে বলছেন, হক আর বারী সাহেব যেদিন ল্যাবে এসে ছবি তোলেন সেদিন ড্রইং-বোর্ডে ডকুমেন্টগুলো ছিল না। সুব্রত বাবু ল্যাবে সেদিন ছিলেন না। ফটোতে শুধু শারমিন চৌধুরী আর ড্রইং-বোর্ড দেখা যাচ্ছে। আরও কল্পনা করুন, বিচারক স্বয়ং আপনি। আপনার এ-কথা মনে হবে না যে শারমিন মেয়েটা নিজেই টাইম এক্সপোজার বা ডিলেইড অ্যাকশন মেকানিজমের সাহায্যে ফটোটা তুলেছে, যখন ল্যাবে একা ছিল সে?'

বিস্ময়কর চরিত্রের অধিকারিণী শারমিন চৌধুরী সম্পূর্ণ শান্ত থাকল। হঠাৎ যেন সে ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত সে। 'হ্যাঁ, তাই ভাবব, আমি বিচারক হলে অবশ্যই তাই মনে করব। কিন্তু আসল ঘটনা তাতে বদলাচ্ছে না-ফটোটা আমি তুলিনি।'

'তাহলে ব্যাখ্যাটা কি হবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সে, তারপর শান্তভাবে বলল, 'সহজ ব্যাখ্যা আছে। প্রথমে ড্রইং-বোর্ডের ফটো তোলা হয়েছে, তারপর আমার ফটো সেট করা হয়েছে ওটায়। ওটা একটা ভুয়া ব্যাপার-মন্তাজ বোধহয় একেই বলে। আসুন, ফটোটা আরেকবার দেখা যাক।'

প্রিন্টটা কার্পেটে পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে নিল শারমিন চৌধুরী। আবার সোফা ছেড়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'হতে পারে,' বলল ও। 'আপনার পায়ের দিকে তাকান, ওগুলো ঠিক যেন মেঝেতে ঠেকে নেই।'

'আর আমার আউটলাইন একটু যেন বেশি গাঢ়। তবু...' প্রিন্টটা রানাকে ফেরত দিল শারমিন চৌধুরী, 'নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে শুধু একজন এক্সপার্ট। তবে একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহে জানুন, মেজর রহমান, এই ব্যাপারটার সাথে কোনভাবে আমি জড়িত নই। আমি সত্যি কথা বলছি, আপনি বুঝতে পারছেন না?'

মেয়েটার চোখের দিকে ঝাড়া তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর রানার মনে হলো, হ্যাঁ, বিশ্বাস করে সে। 'পারছি। প্লীজ ফরগিভ মি...এবার, ক্ষতিপূরণ কিভাবে করা যায় বলুন তো?'

'ক্ষতি? পূরণ? কি বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?'

'সুব্রত বাবুর সাথে আপনার ডিনারটা আমি নষ্ট করেছি,' বলল রানা। 'আমাকে অপরাধবোধ থেকে উদ্ধার করার একটা উপায় হয় না?'

ফিক্ করে হেসে ফেলল শারমিন চৌধুরী। 'কি উপায় হলে খুশি হন আপনি?'

'এই ধরুন, আপনাকে আমি ডিনার খাওয়াতে কোথাও নিয়ে যেতে পারি না?'

'না, ঘরেই ভাল লাগছে আমার,' রানার মুখে কি যেন খুঁজল শারমিন, আগ্রহে

চকচক করছে চোখ জোড়া। 'তাছাড়া আপনি যা শোনালেন, বাইরে বেরুতে সত্যি ভয় করছে।'

'সাথে আমি থাকলে আপনার কোন ভয় নেই,' আশ্বস্ত করল রানা।

'উঁহু,' মাথা নাড়ল শারমিন। 'প্লীজ! তবে যাই বলুন, আপনি কিন্তু ভারি আশ্চর্য একটা মানুষ। ভয় দেখিয়ে এইমাত্র কাহিল করে ফেললেন, এখন আবার সাহস দিচ্ছেন।' মাথা তুলল সে, আবার কাছাকাছি চলে এল দুটো মুখ। রানার একটা হাত ধরল সে। 'জানি না কেন, আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'অকারণ ভয় দেখাতে চেয়েছি তা কিন্তু সত্যি নয়। সব মিলিয়ে আপনিও স্বীকার করবেন, আপনার আমি ভাল চাইছি। অনেক কারণের একটা হলো...'

'কি হলো, থামলেন কেন?' রানার হাতটা ছাড়ল না শারমিন।

'না, থাক,' হেসে ফেলে বলল রানা। 'তবে হাতটা যদি আরও কিছুক্ষণ ধরে থাকেন, এমন হতে পারে যে ছাড়ার সময় হলে দেখবেন আমি ছাড়তে দিচ্ছি না।'

রানার হাতে মৃদু চাপ দিল শারমিন, তারপর ছেড়ে দিল। 'কই?' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল সে। 'কি ছেলেমানুষি করছি আমরা, তাই না?'

'ছেলেমানুষি বলুন আর যাই বলুন, মাঝে মধ্যে এরকম এক-আধটু তরল হতে পারলে বেঁচে থাকার আনন্দ বেড়ে যায়। তিক্ত কর্তব্য, কৃত্রিম গাম্ভীর্য, বুদ্ধিবৃত্তির ক্লান্তিকর চর্চা, ভাবাবেগ দমন ইত্যাদি শুধু নিরানন্দ ব্যাপার নয়, আয়ুও ক্ষয় করে।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আজ তাহলে আসি...'

রানার সাথে, প্রায় লাফ দিয়ে, উঠে দাঁড়াল শারমিনও। 'ওমা! সেকি! আপনি না বললেন আমার সাথে খাবেন?'

'কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে প্রস্তাবটা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

'ও-ও-মা! ছি-ছি!' রানার হাত আবার শারমিনের মুঠোর ভেতর চলে গেল। 'কি ভুলো মন আমার, এখনও আপনাকে বলাই হয়নি! শুনুন মশাই, আপনার সাথে সময়টা আমার দারুণ কাটছে। কিছু যদি মনে না করেন, আপনার সঙ্গ আমার সাংঘাতিক ভাল লাগছে—যাকে বলে প্রাইভেসী, সেটা আমি হারাতে চাইনি—আর সেজন্যেই, বুঝলেন সাহেব, আপনার সাথে বাইরে কোথাও যেতে চাইছি না। বসুন,' নির্দেশের সুরে বলল সে, 'বসুন বলছি!' অগত্যা শারমিনের সোফাতেই, হাতলের ওপর বসে পড়ল রানা। 'বোঝার ভুল হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গেছে—আমরা একসাথে খাব আজ। আপনিই খাওয়াবেন, তবে পরিবেশন করব আমি।'

'বিজ্ঞানীরা ভুলো হয়, কিন্তু এতটা কি সত্যি হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, মৃদু হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে। 'আমি ঢোকার সাথে সাথে আপনি কি বলেছিলেন মনে নেই? আমাকে আপ্যায়ন করার মত কিছুই নেই ঘরে।'

সোফায়, রানার পাশে, বসল শারমিন, হাত তুলে ঘরের কোণটা দেখাল। 'ওটা কি দেখতে পাচ্ছেন? টেলিফোন। বিল্ডিংএ ঢোকার আগে ডান দিকে কি আছে দেখেছেন? একটা চাইনীজ হোটেল। ওরা আমার ফোন পেয়ে অভ্যস্ত। বললেই বেয়ারা পাঠিয়ে দেবে। আপনি শুধু বলুন, কি খেতে চান।'

'বাহ্, চমৎকার। সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। আপনি যা খাবেন আমিও তাই।'

সোফা ছেড়ে ফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল শারমিন। 'ডিনারের পর আপনার জন্যে কফি বা চা বলব? নাকি ঠাণ্ডা কিছু? ইচ্ছে করলে আপনি বিয়ারও চাইতে পারেন, ওদের ওখানে সব পাওয়া যায়,' চোখে দুষ্টামির ঝিলিক নিয়ে বলল সে। ঝুঁকে ফোনের রিসিভার তুলল, উত্তরের অপেক্ষায় রানার দিকে তাকিয়ে আছে। ভঙ্গিটা ভাল লাগল রানার। সুগঠিত নারীদেহের এটা একটা বৈশিষ্ট্য, শ্রেফ শালীন দেহভঙ্গিমার সাহায্যেও পাগল করে তুলতে পারে পুরুষকে।

'না,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আপনি যা খুশি আনান, আমার জন্যে কফি।'

সর্দিসর্দি ভাব, কাজেই ঠাণ্ডা কিছু খাব না আমি। আর কফি তো সহ্যই হয় না। তাহলে শুধু আপনার জন্যে।' ডায়াল করল শারমিন, অর্ডার দিল, তারপর ফিরে এল। এবার সে দূরত্ব বজায় রেখে রানার মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় বসল। আপন মনে মাথা নাড়ল সে, কি যেন ভাবছে, ঠোঁটে হাসির প্রলেপ।

'কি ব্যাপার?'

'আমার সমস্ত সুনাম ভেস্তে গেল!' বলল শারমিন 'রেস্তোরাঁর ম্যানেজার লোকটাকে বিরতিহীন লাউডস্পীকার বলতে পারেন। কাল সকালের মধ্যে গোটা হোস্টেল জেনে যাবে ব্যাপারটা। শারমিন চৌধুরী ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। কাল রাতে তার ঘরে পুরুষ মানুষ ছিল! দু'জন একসাথে ডিনার খেয়েছে।'

দু'জনেই ওরা গলা ছেড়ে হেসে উঠল। হাসি থামার পর গম্ভীর হলো শারমিন, বলল, 'না, ঠাট্টা নয়। সত্যি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। হোস্টেলে কোন পুরুষকে এন্টারটেইন করা এমনিতেও নিষেধ। অবশ্য এক কাজ করলে হবে, বেয়ারা যখন আসবে, আপনি বাথরুমে চলে যাবেন।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রানা। 'আর আপনি গলা চড়িয়ে ডাক দেবেন—বিলকিস, তাড়াতাড়ি কর, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল!'

আবার একবার হেসে উঠল ওরা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। এক সময় রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'আপনার সাথে অন্য কোথাও, অন্য কোন পরিস্থিতিতে আলাপ হলে ভাল হত।'

'সাগর সৈকতে, তাই না? দু'জনেই ছুটিতে আছি, কাজে ফেরার কোন তাগাদা নেই। প্রথমদর্শনেই ভাল লাগল পরস্পরকে। কিন্তু আমার হাত ধরতেই প্রথম তিনটে দিন পার করে দিলেন আপনি। তবু, ছুটির বাকি চারদিন আমরা হাত ধরাধরি করে সৈকতে আর পাহাড়ে হাঁটলাম, বোটে করে ঘুরে বেড়ালাম, কথা বললাম অনর্গল। তারপর একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আর তো ছুটি নেই। বিদায়ের সময় কেউ আমরা কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলাম না।' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল শারমিন চৌধুরী। 'জীবন মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস বৈ কিছু নয়, তাই না?'

'বাধাগুলো টপকাতে পারলে ব্যথাটুকু ভুলে থাকা যায়।'

'মনের আর সমাজের বাধা, ঠিক।' হঠাৎ মুখ তুলল শারমিন, ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা বলতে পারেন, মানুষ কোনদিনই কি মুক্তবিহঙ্গ হতে পারবে না? জানেন, আমি এমন একটা জীবনের স্বপ্ন দেখি যেখানে আমার কোন অপরাধবোধ

নেই, কোন বাধা আমাকে থামাতে আসে না, যা খুশি তাই করি, যাকে ভাল লাগে তাকেই আমার সবচেয়ে মজার জিনিসটা দিয়ে খুশি করতে চাই, তারটা চেয়ে নিয়ে তৃপ্ত হই অথচ কোন কলুষ আমাকে স্পর্শ করে না, সদ্যজাত শিশুর মত পবিত্র, বাঁধনহীন বাতাসের মত স্বাধীন, আমি…'

'কাজ চলছে, তবে খুব ধীরে ধীরে,' না, হাসি গোপন করেই বলল রানা। 'মানবসভ্যতা একদিন হয়তো পৌঁছে যাবে সেই স্বর্গরাজ্যে। তবে একটা শর্ত আছে, যদি না তার আগে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে নিজেদেরকে আমরা দুনিয়ার বুক থেকে সাফ করে দিই।'

'কোন মানুষকে ভাল লেগে গেলে আমার খুব ভয় করে,' বলল শারমিন। 'জানি, আগে হোক পরে হোক একটা আঘাত আসছে। আপনার ব্যাপারটাই দেখুন না, জানি আপনি আমার অশান্তির কারণ হয়ে উঠবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'আবার তাহলে তিক্ত প্রসঙ্গটা তুলতে হয়। হয় হাসান ভাই, নয়তো সুব্রত, তাই না? আপনি জানেন না, ওদের দু'জনকেই আমি খুব পছন্দ করি।'

'হুম… আচ্ছা, আপনার মনে পড়ে না, দু'জনের কেউ একজন আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে কখনও কোন ফটো তুলেছে কিনা?'

'না, অবশ্যই না—তুললে নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগত আমার, কাজেই মনে থাকত।'

হেসে উঠল রানা। 'অদ্ভুত তো লাগতই।' লক্ষ করল, হঠাৎ লালচে হয়ে উঠল শারমিন। 'কিন্তু বুঝে দেখুন। ফটোটা যদি কৃত্রিম হয় তাহলে দিনের কোন্ সময় বা বছরের কোন্ ঋতু এ-সব প্রশ্নের আর কোন গুরুত্ব থাকছে না। ছায়া বা আপনার চুলের স্টাইল কোন উপসংহার টানতে পারছে না। একরামুল হক, আপনাকে বাদ দিয়ে, প্ল্যানসহ শুধু ড্রইং-বোর্ডের ফটো তুলে থাকতে পারে।'

'না,' বলল শারমিন। 'তা সম্ভব নয়। কারণ এইমাত্র একটা কথা মনে পড়ে গেল। ফটোতে, ড্রইং-বোর্ডের যে ডকুমেন্টগুলো আমরা দেখছি সেগুলো তখনও ফাইনাল করা হয়নি। খসড়া অবস্থায় ছিল। কিছু সমস্যার সমাধান তখনও আমরা বের করতে পারিনি, সেগুলো আরও কয়েক হপ্তা পরে বেরিয়ে আসে। তারপর প্ল্যানগুলো ফাইনাল করা হয়।'

'ঠিক জানেন?'

'পজিটিভ। কারণ, যেদিন ফাইনাল হলো সেদিন তারিখ ছিল পনেরোই এপ্রিল, তারিখটা আমার ভোলার কথা নয় এই জন্যে যে ওটার সাথে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্পর্ক আছে। কয়েক বছর আগে, ওই দিনে, ডিভোর্স পাই আমি।'

'ও আচ্ছা, ভেরি স্যাড।' মুখ তুলল রানা। 'আর একরামুল হক ল্যাবে এসেছিলেন মার্চ মাসে?'

'হ্যাঁ।'

'উফ্, ভারি স্বস্তিবোধ করছি,' বলল রানা, যদিও স্বস্তিটুকুর ভাগ শারমিন পেল

'কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল—হয় হাসান ভাই নয়তো সুব্রত।' এই সময় নক হলো দরজায়। 'বেয়ারা!' ঝট করে দাঁড়াল শারমিন, এগিয়ে এসে রানার হাত ধরে টান দিল। 'আসুন আমার সাথে, তাড়াতাড়ি!'

বাথরুমে নয়, রানাকে বেডরুমে দিয়ে গেল সে। স্যান্ডেলের মৃদু শব্দ তুলে ড্রইংরুমের দরজা খুলতে চলে গেল। একটু পরই তার গলা পেল রানা, 'এসো, সগির।'

বেডরুমের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। মাঝারি আকারের কামরা, বিছানার চাদর থেকে শুরু করে জানালার পর্দা পর্যন্ত সব দুধের মত সাদা।

শারমিনের চিৎকার ভেসে এল, 'বিলকিস, ডিনার এসে গেছে, তাড়াতাড়ি এসো!'

'আসছি বাবা, আসছি! খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট!' নারীকণ্ঠ নকল করল রানা।

এ-ধরনের কিছু প্রত্যাশা করেনি শারমিন, তার হাত থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ায় ঝন ঝন শব্দ হলো, সম্ভবত একটা চামচ। খুট-খাট আওয়াজ শুনে রানা বুঝল ড্রইংরুমের নিচু টেবিলটাতেই খাবার সাজানো হচ্ছে। হাতে দু'চার মিনিট সময় আছে মনে করে বাথরুমে উঁকি দিল ও। ভেতরে ছোট্ট একটা কাবার্ড রয়েছে, তাড়াতাড়ি সেটা খুলে পরীক্ষা করল। ওষুধ ইত্যাদি ছাড়া আর কি আছে দেখা দরকার। এই সময় ড্রইংরুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। ফিরে এল রানা।

ওকে দেখে হেসে উঠল শারমিন। 'দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল বেয়ারা। বোধহয় বিশ্বাস করতে পারেনি।'

'নাই করুক,' বলল রানা। 'আপনি যে জগতের স্বপ্ন দেখেন, আপাতত সেই জগতে রয়েছি আমরা। আমাদের কোন অপরাধবোধ নেই, কোন বাধাই আমরা ফেস করছি না।'

'আসুন, খেতে খেতে গল্প করি।' পাশাপাশি বসল ওরা, পরিবেশন করল শারমিন। খেতে প্রচুর সময় নিল ওরা, খাওয়ার চেয়ে কথা বলল বেশি। সবশেষে, রানার কাপে কফি ঢালল শারমিন।

তার হাত থেকে ধূমায়িত কাপটা নিয়ে রাখল রানা। 'গন্ধটা দারুণ, আপনিও একটু খান না?'

'বললাম না…'

'মনে আছে,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কফি বা চা আপনি খান না। আজ নাহয় নিয়মটা ভাঙলেন, আমার সম্মানে।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল শারমিন। তারপর ধীরে ধীরে বলল সে, 'ও, বুঝেছি—আপনি ভাবছেন আমি বোধহয় আপনার কফিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি, তাই না?' আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

মুচকি একটু হাসি রানার ঠোঁটেও ফুটল। 'একেবারেই কি অসম্ভব? আপনাকে আমি কতটুকু চিনি, বলুন?'

সোফা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে গেল শারমিন, কিচেন থেকে হাতে একটা কাপ

নিয়ে ফিরে এল। রানার কাপটা নিজের দিকে টেনে নিল সে, খালি কাপটায় পট থেকে কফি ঢালল, কাপটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'আমি সম্মানিত বোধ করছি।' যে-যার কাপ মুখের সামনে তুলল ওরা, চুমুক দিল একসাথে।

'রাতে যদি ঘুম না আসে, আপনি দায়ী,' বলল শারমিন।

'তারমানে আপনাকে ঘুম না পাড়িয়ে এখান থেকে আমার যাওয়া হবে না।'

'ইস! না মশাই, আমি ছোট্ট খুকিটি নই যে আমাকে ঘুম পাড়াতে হবে। তবে আপনার যদি আপত্তি না থাকে, রাতটা আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারি, লোকে যাই বলুক।'

'তারমানে স্বরচিত জগতে সত্যি সত্যি বাস করতে শুরু করেছেন।'

কাপে পর পর দু'বার চুমুক দিল শারমিন, দেখাদেখি রানাও।

'আরে, ভালই তো লাগছে! তারমানে কি এতদিন বঞ্চিত করেছি নিজেকে?'

'আপনার অভ্যেস নেই বলেই বোধহয় ধরতে পারছেন না, একটু বেশি তেতো লাগছে কফিটা,' বলল রানা। 'নাকি সত্যি সত্যি বিষ মিশিয়েছেন? আমাকে নিয়ে মরতে চাইলে...'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শারমিন।

'কি হলো?' অবাক হয়ে রানা দেখল, শারমিন টলছে, তারপরই তার হাত থেকে খসে পড়ল কাপ-পিরিচ। 'আপনি অসুস্থবোধ করছেন?' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, দু'হাতে পেট চেপে ধরল।

'ব্য-থা...!'

এক লাফে তার পাশে চলে এল রানা, দু'হাত বাড়িয়ে দিল কাঁধ দুটো ধরার জন্যে, কিন্তু পৌঁছুল মাত্র একটা হাত। অপর হাত দিয়ে নিজের পেট চেপে ধরল ও, ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ।

এরপর সব যেন স্লো মোশান ছায়াছবির মত লাগল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে রানার। দেখল অনন্ত সময় নিয়ে মেঝের ওপর পড়ে যাচ্ছে শারমিন। ওর মনে হলো, মাথার ভেতরটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাশক্তি দুর্বল। পা বাড়াতে গিয়ে হোঁচট খেলো, পতনটা ঠেকাল একটা চেয়ার ধরে ফেলে। চিৎকার করল রানা, কিন্তু গলা দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল, 'জলদি, শারমিন! আপনার ডাক্তারের ফোন নম্বর!'

মেঝে থেকে ঘাড় বাঁকা করে রানার দিকে তাকাল শারমিন। তার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু আওয়াজ বেরুল না, কিংবা বেরুলেও শুনতে পেল না রানা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার, শারমিনের বুকের ওপর মুখ দিয়ে পড়ল ও। মাথা তুলে তাকাল মেয়েটার আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ জোড়ার দিকে। 'ডাক্তার! ফোন!'

উত্তরে ঘরের কোণে তাকাল শারমিন, ওখানে টেলিফোনের পাশে ইনডেক্স নোটবুক রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা। গলা, বুক আর পেটে যেন আগুন ধরে গেছে ওর। সারা শরীর হু হু করে জ্বালা করছে। নোটবুকটা কখন হাতে চলে এসেছে জানে না। পাতা ওল্টাচ্ছে, কিন্তু প্রথমে মনেই করতে পারল না কি খুঁজছে

সে। ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারের ডি দেখল, তার পাশে স্মল লেটার আর, তারপর ফুলস্টপ। ডক্টর। ডক্টর মনিরুল ইসলাম। ফোন…

রিসিভার তোলার পর হাত থেকে সেটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে। শুয়ে পড়ল রানা, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে সে, কিংবা মারা যাবে। শেষবার একবার চোখ মেলে তাকাল। রিসিভারটা নাকের সামনে। বাঁচার আকুতিতে ঝাঁকি খেলো ওর গোটা শরীর। সমস্ত সচেতনতা আর পেশীর শক্তি এক করে মাথা তুলতে চেষ্টা করল। ক্রেডলটা নিচু টেবিলের ওপর, ধরতে গিয়ে সেটাকেও মেঝেতে ফেলে দিল রানা। শুয়ে শুয়েই ডায়াল করল ও। কিন্তু নাম্বারটা ভুল হচ্ছে না তো? নোটবুকে এই নম্বরই কি ছিল? রিসিভারে কথা বলল রানা, 'গিলটি মিয়াকে জানাও…'

ক্লিক করে শব্দ হলো অপরপ্রান্তে, একটা ভারী পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'ডক্টর মনিরুল ইসলাম স্পিকিং…'

জিভ অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে, নাড়তে পারছে না রানা। কথাগুলো বলল, কিন্তু অপরপ্রান্তে ডাক্তার কি বুঝলেন বলা মুশকিল, 'তাড়াতাড়ি করুন, ডাক্তার। মিসেস শারমিন চৌধুরী, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, পাঁচতলা…জলদি, ডাক্তার, জলদি!' মাথা মেঝেতে ঠুকে গেল রানার, স্থির হয়ে গেল শরীর।

বারো

একটা প্রাইভেট ক্লিনিকের কেবিনে শুয়ে, জেগে জেগে শারমিন চৌধুরীকে স্বপ্ন দেখছে রানা। এই সময় হাতে একগোছা লাল গোলাপ আর বগলের নিচে ব্রীফকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকল সোহেল আহমেদ, পিছু পিছু এল আঙুর ভর্তি বেতের ঝুড়ি হাতে ক্লিনিকের একজন কর্মী। টেবিলের ওপর ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

কমপ্লিট স্যুট পরে আছে সোহেল, বোঝাই যায় না তার একটা হাত নেই। 'কেমন আছিস?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কথা বলতে পারবি?'

'তোর ফুল আর ফল, সব নিয়ে যা,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'এমন ভাব দেখাচ্ছিস, আমি যেন কঠিন কোন রোগে ভুগছি, সারার কোন আশা নেই।'

'কঠিন রোগ হলে তবু তো ভাল, তোর সেবা-শুশ্রূষা করার সুযোগ পাব,' সহাস্যে বলল সোহেল। 'কিন্তু বিনা নোটিশে পটল তুললে একটা দুঃখ থেকে যাবে। বেঁচে গেছিস ভাগ্যের জোরে, সে-খবর রাখিস? ডাক্তার এইমাত্র আমাকে বললেন, কাপের সবটুকু কফি খেলে আর দেখতে হত না! ঠিক কি বলেছেন, শুনবি? আর মাত্র এক চুমুক খেলেই হত! ভাল কথা, দুটো কাপ দু'রকম কেন?'

'একজনের জন্যে অর্ডার দেয়া হয়েছিল, শারমিন চা বা কফি খায় না,' বলল রানা। 'আমার সন্ধানে খাচ্ছিস।'

'মাসুদ রানাকে সম্মান দেখানোর খেসারত!' হেসে উঠল সোহেল। 'তার সাথে কথা হয়েছে তোর?'

'টেলিফোনে।'

'আঙুর খাবি?'

'তুই খা।'

ঝুঁকে ঝুড়ি থেকে আঙুর তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল সোহেল। রানার বুকের ওপর পড়ে থাকা ফুলগুলো ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'বস্ পাঠিয়েছেন।'

'তোর মাধ্যমে যখন পাঠিয়েছেন, আমার ধন্যবাদটাও পৌঁছে দিস তুই।'

'তোর বিপদ কেটে গেছে শোনার পর আজ সকালে ঢাকায় ফিরে গেছেন তিনি।'

বিছানার ওপর উঠে বসল রানা। 'বস্ আমাকে দেখতে এসেছিলেন? আগে বলিসনি কেন?'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলল সোহেল। 'থাম। খুশি হবার কিছু নেই। যা পাস তাই খাস শুনে রেগে বোম হয়ে আছেন।'

'জানতে পেরেছিস, বিষটা কোত্থেকে এল?'

'হ্যাঁ এবং না। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার লোকটার ব্যাকগ্রাউন্ড তন্নতন্ন করে চেক করা হয়েছে. চেক করা হয়েছে বেয়ারার অতীত আর বর্তমান–দু'জনেই ক্লিন।'

'না, ওদের কোন হাত থাকার কথা নয়।'

'তবে বেয়ারা ছেলেটা বলছে, গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে তার সাথে এক লোক এলিভেটরে উঠেছিল। লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করল, ডিনার নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে। ছোকরা বোকার মত জবাব দেয়. মিসেস শারমিন চৌধুরীর রূমে, পাঁচতলায়।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'গায়ে-মাথায় চাদর জড়িয়ে ছিল, চেহারার বর্ণনা দিতে পারছে না। ছোকরা হাবা গোছের।'

'ডিনার কি খোলা ট্রে করে আনে সে? কোন কাভার ছিল না? আনার সময় আমি দেখিনি।'

'হ্যাঁ। কফি পটটা ছিল ট্রের এক কোণে, বরফ ভরা জাগ-এর আড়ালে। ডিনার কোথায় যাচ্ছে. লোকটা জিজ্ঞেস না করলেও পারত। শারমিন চৌধুরীর নামে বিল ছিল ট্রেতে।'

'কিন্তু তাকে টার্গেট করা হয়নি,' বলল রানা।

'কেন, এ-কথা বলছিস কেন?'

'খুন-খারাবির ব্যাপার, কেউ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে তা হতে পারে না। পটে যে-ই বিষ মিশিয়ে থাকুক. সে জানত কফি একা শুধু আমি খাব। পরিচিত কেউ, জানে, শারমিন খায় না।'

মুখে একটা আঙুর পুরে সোহেল বলল, 'মেয়েটার ঘরে তুই মারা গেলে বেচারির কি অবস্থা হত বুঝতে পারছিস?'

'খুনের দায়ে গ্রেফতার হত–খুনী সম্ভবত সেটাই চেয়েছিল।'

'ইতিমধ্যে আমরা গ্রেফতার করেছি সুব্রত বড়ুয়াকে।'

'তাই নাকি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন?'

'সে তার বান্ধবীর দরজার পাশে, অন্ধকার সিঁড়ির ধাপে ঘাপটি মেরে বসেছিল,' বলল সোহেল। 'নিজের লোকের কাছ থেকে তোর অবস্থা জানার পর গিলটি মিয়া দলবল নিয়ে গোটা হোস্টেল তল্লাশি চালায়, তখনই ধরা পড়ে সে।'

'কি বলছে সুব্রত? কোন ব্যাখ্যা দেয়নি?'

'স্পিকটি নট। ছত্রিশ ঘণ্টা হলো চোদ্দশিকের ভেতর বসে রয়েছে। মুখ খুলতে রাজি নয়।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'শারমিনের হোস্টেলে তার আসার কারণ স্রেফ ঈর্ষাও হতে পারে। মেয়েটাকে ভালবাসে সে। ওর সাথে আমি যে রাতে ছিলাম, কথা ছিল ওকে নিয়ে সুব্রত ডিনার খেতে যাবে। ফোনে মানা করে দেয় শারমিন।'

'ও, আচ্ছা, তা হতে পারে।'

'রিয়াজুল হাসানের খবর কি?'

'সে-রাতে একবারও সে বাড়ি থেকে বের হয়নি। তোর লোকেরা এ-ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত।'

'তারমানে গোটা ব্যাপারটা আবার সুব্রতর কাছে ফিরে এল, তাই না? ভাল কথা, একরামুল হক সম্পর্কে তদন্ত কতদূর এগোল?'

ব্রীফকেসে টোকা মারল সোহেল। 'একরামুল হক আর রফিকুল বারী, দু'জন সম্পর্কেই এখানে কিছু তথ্য আছে।'

'দেখি।'

ব্রীফকেস খুলে দুটো মোটা ফাইল বের করল সোহেল। দেখেই আঁতকে উঠল রানা।

'দেখতে না চাইলে...'

'না-না, দেখব,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। দুটো ফাইল নিয়ে কোলের ওপর রাখল একটা, অপরটা খুলল। 'তবে কি জানিস, এখন আর এ-সব থেকে তেমন সাহায্য পাওয়া যাবে না। একরামুল হক খুদে একটা ঘুঁটি ছিলেন। কিন্তু আমাদের ভুল পথে চালানোর জন্যে তাকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন তিনিই প্রধান চরিত্র। স্বীকার করছি, বেশ কিছুটা সময় ভুল পথে ছিলামও আমি। তুই তো জানিস, অনেক ছোটখাট তথ্য এড়িয়ে গেলে তার পরিণতি কী মারাত্মক হতে পারে।' একরামুল হকের ফটোটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। তারপর দ্বিতীয় ফাইলটা তুলে নিয়ে খুলল। সাথে সাথে চমকে উঠল ও।

'কি হলো?'

'এ কার ফটো? ইনি তো রফিকুল বারী নন!'

'মন মানে? পারিবারিক একটা ফটোগ্রাফ থেকে এনলার্জ করা হয়েছে...'

'তাহলে ভদ্রলোকের মণিপুরী পাড়ার বাসায় গিয়ে আমি যাকে দেখেছি সে রফিকুল বারী ছিল না। মোটাসোটা, টাক, ভারী ফ্রেমের চশমা—হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মুখের গোটা আকৃতি মেলে না।' ফাইলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা পায়ের

কাছে। 'ফটোটা যদি আগে দেখতাম তাহলে আর এই সর্বনাশ হত না! শালা আমাকে ভারি বোকা বানিয়েছে তো!'

'কিন্তু...' সোহেল চিন্তিত।

'তবে লোকটা তুখোড় অভিনেতা। রফিকুল বারী যেমনটি আচরণ করবেন বলে ধারণা করা যায় ঠিক তেমনটিই করেছে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'তারমানে, মণিপুরী পাড়ার বাসা থেকে আসল লোক, রফিকুল বারী, তার পরিবারকে নিয়ে শনিবার বিকেলেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, রোববার ভোরে নয়।'

'এখন আর নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই,' বলল সোহেল।

'জানাটা এখন আর জরুরীও নয়। ফটোটাই প্রমাণ। তাহলে সমস্যা দাঁড়াল—ভুয়া একজন রফিকুল বারীর প্রয়োজন হলো কেন? আরেকটা প্রশ্ন, কিভাবে সে আমাকে ভুল পথে থাকতে সাহায্য করল?'

'সম্ভবত একরামুল হক সম্পর্কে তোকে ভুল তথ্য যোগান দিয়ে। কি কি বলেছে বল দেখি?'

কপালটা একবার টিপে ধরল রানা। 'স্মৃতি শক্তি নষ্ট করতে সায়ানাইডের জুড়ি নেই। দাঁড়া, কি বলেছিল? আমি জানতাম না এমন কিছু বলেনি সে। একরামুল হকের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে লেকচার দেয়। আভাসে বলতে চায়, পাকিস্তান সরকারের সাথে বা পাকিস্তানী অপরাধচক্রের সাথে তার গোপন একটা চুক্তি হয়ে থাকতে পারে। ব্যস, আর কিছু তো মনে পড়ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? একজনের বাড়িতে ভুয়া এক লোককে রোপণ করা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ। এর পিছনে বড় একটা উদ্দেশ্য না থেকেই পারে না। কি সেটা?'

'ওরা জানবে কিভাবে ওই বাড়িতে যাবি তুই?'

'ধরে নিয়েছিল। সাধারণ যুক্তি। ওরা জানত একরামুল হক সাহেবের পিছনে লেগেছি আমি, তার সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার। রফিকুল বারীর চেয়ে ভালভাবে আর কে আমার চাহিদা মেটাতে পারে?'

'সত্যি যদি আঙুরগুলো খেতে না চাস, আমি সাবাড় করলে তোর কোন আপত্তি...?'

মৃদু হাসল রানা। 'চালিয়ে যা।'

'ধন্যবাদ।' ঝুঁকে আরও কয়েক থোকা আঙুর ঝুড়ি থেকে তুলে নিল সোহেল। খেতে খেতে বলল, 'সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের ইনফরমারকে বাঁচাবার জন্যে প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়েছে ওরা।'

'আমি একমত। আর কফি পটে বিষ ঢালার ব্যাপারটা ছিল ভূমিকা বদলানোর সূচনা। চিন্তা করে দেখ, কি ধুরন্ধর চালাক ওরা।'

'কি বলতে চাস?'

'ওরা জানে ব্লাফটা কাজে লাগেনি। একরামুল হক খতম হলেও, তদন্ত চলছে। এখন তাহলে কি করা? এক ঢিলে দুই পাখি মারো—শফিকুর রহমান ওরফে মাসুদ রানাকে খুন করো, তাতে তদন্ত স্থগিত রাখা হবে। একই সাথে, আপনাআপনি, সন্দেহ গিয়ে পড়বে আরেকজনের ওপর।'

'শারমিন চৌধুরী?'

'হ্যাঁ–নির্দোষ একটা মেয়ে, জানা কথা–কাজেই আবার যখন শুরু হবে তদন্ত, তদন্তকারীরা আরেকটা ভুল পথ ধরে এগোবে।'

অস্থির হয়ে উঠল সোহেল। 'কী ভয়ঙ্কর!' তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কি করবে ওরা?'

'ব্যাপারটা যখন কেঁচে গেছে, ওদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় না,' বলল রানা; 'আসল ইনফরমারকে খতম না করে উপায় নেই ওদের। তাকেই আমরা খুঁজছি, বিশ্বাসঘাতক নম্বর এক। কাজেই চোখ কান খোলা রেখে দুই চিড়িয়াকেই প্রটেকশন দিতে হবে আমাদের। দু'জনের একজন ওদের লোক, তাকে ওরা...'

'তারমানে মইয়ের একটা ধাপ খুলে নেবে?'

'হ্যাঁ। ওটাই ওদের পদ্ধতি।'

চেয়ার ছাড়ল সোহেল। 'রিপোর্ট দুটো রেখে গেলাম। আজ বিকেলে সুব্রত বাবুর সাথে কথা বলতে পারবি, নাকি...?'

'পারব বোধহয়। তবে প্রথমে আমি রিয়াজুল হাসানের সাথে কথা বলতে চাই। ইতিমধ্যে তুই এক কাজ কর, গিলটি মিয়াকে বলে যা সে যেন এক পায়ে খাড়া থাকে।'

'ঠিক আছে, আবার দেখা করব।'

সোহেল চলে যাবার পর ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামল রানা। বিষ আর প্রতিষেধক এখনও ওকে দুর্বল ও আচ্ছন্ন মত করে রেখেছে। পা এত কাঁপছে দেখে বিস্মিত হলো ও। ড্রেসিং গাউন পরে করিডরে বেরিয়ে এল, সাদা পোশাক পরা দু'জন বডিগার্ড পায়চারি করছে, একজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের কামরাটাই শারমিন চৌধুরীর। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। বিছানায় রয়েছে শারমিন, বসে বসে বই পড়ছে। মুখ তুলে তাকাল, হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও ম্লান।

'কি, এরইমধ্যে বিচরণ শুরু হয়ে গেছে?'

'এইমাত্র দেড় হাজার মাইল হেঁটে এলাম, আপনার বিছানার কিনারায় একটু বসতে পারি?' অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে বসে পড়ল রানা। 'আপনাকে এখনও ফ্যাকাসে লাগছে। কেমন বোধ করছেন?'

'শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।'

'কিন্তু সৌন্দর্য হারাননি।' শারমিনের একটা হাত ধরল রানা, তালুর উল্টোপিঠে আলতো স্পর্শে চুমো খেলো। 'এটা অন্য কোন অর্থে নেবেন না, স্রেফ কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমি যতদূর বুঝেছি, এ-যাত্রা আপনার জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছি আমি। আজ আমাকে কবর দেয়ার কথা।'

'আমার জন্যে? কি বলছেন? কিভাবে?' শারমিন অবাক।

'আপনার সাথে ছিলাম, কফির অর্ডার দেয়া হয়, তাই ওরা বিষ মেশানোর সুযোগ পেয়েছে। তা না পেলে ওরা অবশ্যই অন্য কোন মাধ্যম বেছে নিত। সেটা পিছন থেকে একটা গুলিও হতে পারত। তাছাড়া, আপনাকে ভাগ দেয়ায় আমি মাত্র

আধ কাপ পেয়েছিলাম কফি…'

'আমার অবদান, এ স্রেফ আপনার কল্পনা। তা সে যাই হোক, কে দায়ী জানা গেছে?'

'এখনও যায়নি. তবে আজই আবার ধাওয়া শুরু করব। বিকেলের আগেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি।'

'চলে যাচ্ছেন?' কণ্ঠে ক্ষীণ উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল শারমিন। 'কিন্তু এখনও তো আপনি…!'

'চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক আছি। তিনজন দেহরক্ষী থাকছে করিডরে, আপনাকে পাহারা দেবে। তবে আপনি বিপদে আছেন বলে মনে করি না আমি। সন্ধের দিকে একবার এসে দেখে যাব।'

'দাঁড়ান,' রানা উঠতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল শারমিন। ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে। 'যাবেনই যখন, বাধা দেব না। আমি আপনার জন্যে দোয়া করব।'

শারমিনের হাতে আরেকবার চুমো খেলো রানা।

বালিশে হেলান দিয়ে হাসল শারমিন, কিছু বলল না। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল রানা।

তেরো

কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল সিকিউরিটি অফিসার, তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। করিডরের শেষ মাথার দেয়ালঘড়িতে তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। বগলের তলায় ফাইল নিয়ে বাঁক ঘুরল একটা মেয়ে, সরাসরি ওদের দিকে এগিয়ে এল। এই সময় ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে গেল। এক পাশে সরে গিয়ে রানাকে ঢোকার পথ করে দিল রিয়াজুল হাসান। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সে। হেঁটে চলে এল কামরার মাঝখানে, চেহারায় গাম্ভীর্য আর উদ্বেগ মাখামাখি হয়ে আছে। দোতলা থেকে কি যেন ভাঙার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আবার আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল রানা।

'আরে না, ভাই। বিরক্ত হব কেন। তাছাড়া এভাবে দমাদম ছাদ পেটানো হলে কিভাবে মানুষ কাজ করে!'

সিলিঙের দিকে একবার তাকাল রানা। 'কি করছে ওরা?'

'পার্টিশন ভেঙে কারা যেন বড় করছে অফিসঘর। ইতিমধ্যে তিনবার আপত্তি জানিয়েছি আমি। বুঝি না রাতে কাজ করলে ওদের অসুবিধেটা কি!' খুব চটে আছে রিয়াজুল হাসান, তবে নিজেকে দমন করল সে। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল রানাকে, সিগারেট ধরাল। 'আপনার খবর শুনে ভারি আপ-সেট হয়ে পড়েছিলাম। আজ সন্ধ্যার শারমিনকে দেখতে যাব। কেমন আছে ও?'

'আগের চেয়ে ভাল, তবে এই মুহূর্তে ভিজিটরদের যেতে দেয়া হচ্ছে না। আমি

কাল দেখতে যাব। আপনি জানেন, সুব্রত বাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। উইং কমান্ডারের কাছ থেকে শুনলাম। কি ঘটেছিল?'

কাহিনীটা সংক্ষেপে বলল রানা। মনোযোগ দিয়ে শুনল রিয়াজুল হাসান। রানা থামতে মাথা ঝাঁকাল সে, শান্তভাবে বলল, 'এখন আর চেপে রেখে লাভ নেই...সত্যি বলতে কি, সুব্রতকে আমি সব সময় সন্দেহ করতাম। খুব বেশিদিন হয়নি ওর পেছনে শারমিনকে লাগাই আমি—ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে বলি, এই যেমন সন্ধের দিকে একসাথে বেড়াতে বেরোতে পারে, রাজনীতি নিয়ে কথা তুলতে পারে। আগে থেকেই জানতাম, শারমিনের ওপর ওর দুর্বলতা আছে। ভেবেছিলাম চেষ্টা করলে ওর গোপন কথা শারমিন বের করে আনতে পারবে...'

'হ্যাঁ, আমি জানি। শারমিন আমাকে বলেছে।'

বিস্মিত হলো রিয়াজুল হাসান, কিন্তু অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত বলে মনে হলো না। 'তাই? আচ্ছা...ঠিক আছে। কিন্তু আরেকটা বিষয় আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম আমি...এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা কেন যে আগে মনে পড়েনি! সত্যি আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কি কাণ্ড দেখুন, মাত্র কালকে মনে পড়ল। হক সাহেবরা যেদিন ল্যাবে এলেন, অ্যান্টি-রেডিয়েশন স্ক্রীনের ব্লু-প্রিন্ট সেদিন ড্রইং-বোর্ডে থাকতে পারে না, কারণ ওটার তখনও কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজটা আমরা শেষ করি এপ্রিলের পনেরো তারিখে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসল রানা। 'হ্যাঁ, তা-ও আমি জানি! সেদিন কফি খাবার আগে শারমিন আমাকে বলেছে।'

'আপনাকে শারমিন বলেছে? তাহলে আমাকে কেন মনে করিয়ে দেয়নি সে? খেয়াল করেনি, সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছে?' হেসে উঠল রিয়াজুল হাসান। 'কি মেয়ে বলুন দেখি! এটা একটা ভাইটাল ক্লু, তাই না? দু'জনের একজনেরও যদি আগে মনে পড়ত কথাটা, আপনাকে তাহলে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, সিগারেটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সিলিঙের দিকে। 'আগে কেন মনে পড়েনি আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল সিগারেট, তারপর হাসল রিয়াজুল হাসান। 'শুনুন তাহলে, আপনাকে সত্যি কথাই বলি। প্রফেশনাল এবং অন্যান্য কারণে, আমি চাইনি টীমটা ভেঙে যাক। সুব্রতকে আমি সন্দেহ করতাম ঠিক, আপনাকে তো বললামই, কিন্তু ব্যাপারটা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এল, কি যে হলো আমার, সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে ওকে আড়াল করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম...'

'বা বলা যায়, সব দোষ একরামুল হকের ঘাড়ে চাপিয়ে...?'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তাই দাঁড়ায়। তবে, নিতান্তই অবচেতন মনের কারসাজি, বুঝতেই পারছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য মনে পড়তে বাধা দিল। কোন সন্দেহ নেই মনের গভীরে সুব্রতকে সাংঘাতিক ভালবাসি আমি।'

সিগারেটের লাল আগুনের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকল রানা। 'তাহলে বলতে হয়, আপনার মন দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'রকম কাজ করেছে। মনের একটা

অংশ চেয়েছে শারমিনের সাহায্য নিয়ে সুব্রতকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করাতে। আরেকটা অংশ, চূড়ান্ত পর্যায়ে, সে যে অপরাধী এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারেনি।'

'বিদঘুটে শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই। নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না আমার, এটাই হলো আসল কথা। আসলে বোধহয় আমি চেয়েছিলাম সুব্রত সম্পর্কে নিরেট কোন প্রমাণ পেলে তাকে তার ভুল পথ সম্পর্কে সতর্ক করে দেব, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব...'

'তাকে শোধরাবার একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর যখন দেখলেন, তা সম্ভব নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আপনার অবচেতন মন আপনাকে সাবধান করে দিয়ে বলল- "রোখো! আওর আগে মাত বাঢ়ো"!'

হেসে ফেলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান। তার সাথে রানাও হাসল। 'তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? দোষী একরাম সাহেব নন, রফিকুল বারী নন, শারমিন নয়-কারণ ফটোতে দেখা যাচ্ছে তাকে-আমিও নই, তাহলে আর বাকি থাকল কে? ও কি স্বীকারোক্তি দিয়েছে?'

'এখনও দেয়নি।'

'একটা আহাম্মক,' বিষণ্ন সুরে বলল রিয়াজুল হাসান। 'এত সুন্দর একটা ক্যারিয়ার...'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'সব জানিয়ে আপনাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই আসা। খুশি হয়েছি স্ক্রীন যেদিন শেষ করলেন সেদিনের তারিখটা আপনার মনে পড়ায়। আপনার মুখ থেকে কথাটা শুনতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারি।'

'গুডবাই, হাসান সাহেব। যোগাযোগ থাকবে। কাল হয়তো একবার দেখা করতে আসতে পারি।'

'গুডবাই, মেজর। এক মিনিট, আমি সিকিউরিটি অফিসারকে ফোন করি।'

কয়েক মিনিট পর, ধীর পায়ে গাড়ির দিকে হাঁটছে রানা। সাক্ষাৎকারটা ওকে ক্লান্ত করে তুলেছে। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছে, দুর্বলতা দূর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নেই। খুব তাড়াতাড়ি অনেকগুলো কাজ সারতে হবে।

জেলখানার এক কোণে, আলাদা একটা সেলের ভেতর আটকে রাখা হয়েছে সুব্রত বড়ুয়াকে। সরু একটা চৌকির ওপর বিছানা ছাড়াও বসার জন্যে চেয়ার দেয়া হয়েছে ওকে। শুয়ে ছিল, রানাকে দেখে উঠে বসল। সাথে জেল সুপার এসেছেন, তাঁর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, ওদেরকে একা রেখে সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'কি বলে অভ্যর্থনা জানাব আপনাকে?' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল সুব্রত বড়ুয়া। 'শুনলাম-আমি নাকি আপনাকে বিষ খাইয়েছি। বেঁচে গেছেন, সেজন্যে

অভিনন্দন জানাই।'

লোকটা যদি অপরাধী হয়, স্বীকার করতে হবে প্রতিভাবান অভিনেতা।

'আমাকে শুধু একা নয়, শারমিনকেও খাওয়ানো হয়েছে,' হাসিমুখে বলল রানা। 'সে-বিষয়েই কথা বলার জন্যে এলাম। সেদিন রাতে জুবিলী রোডে কি করছিলেন আপনি?'

হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল সুব্রত বড়ুয়া। 'এই একই প্রশ্ন অন্তত একশো বার করা হয়েছে আমাকে,' ঝাঁঝের সাথে বলল সে। 'আবারও বলছি, আমি উত্তর দেব না।'

কঠিন পাত্র, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। গত আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে হুমকি ইত্যাদি কম দেয়া হয়নি, সব প্রতিরোধ করেছে সে। তবে, সন্দেহ নেই, মনের গভীরে নিঃসঙ্গ বোধ করছে; ভয়ও পাচ্ছে। এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত কোমল ব্যবহারে হয়তো জাদুমন্ত্রের মত কাজ হতে পারে।

'বসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনাকে আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না।'

চেয়ারটায় বসে সিগারেট ধরাবার প্রস্তুতি নিল রানা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে না ধরিয়ে পকেটে রেখে দিল, 'শুনুন। আপনাকে বুঝতে হবে, বিপদটা এখনও খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঠিক যখন বিষটা কফিতে মেশানো হয় তখন আপনি শারমিনের ঘরের আশপাশে ছিলেন। ওখানে আপনার উপস্থিত থাকার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, সেটা চেপে গেলে নিজের জন্যে বিপদটাকে আপনি সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর করে তুলবেন। মুখ বন্ধ রাখুন, খুব দ্রুত হত্যার অভিযোগে কাঠগড়ায় দেখতে পাবেন নিজেকে। ঠিক সেটাই কি চাইছেন আপনি, সুব্রত বাবু?'

ভয়ের একটা ছায়া ফুটল সুব্রত বড়ুয়ার চোখে। 'কেন তা চাইব! কিন্তু কারণটা যদি বলি, কেউ বিশ্বাস করবে না। গোটা ব্যাপারটা এমন ছেলেমানুষি যে…এখন বরং আমার লজ্জাই লাগছে…' থামল সে, যেন আশা করছে কোন মন্তব্য শুনতে পাবে। রানা কিছু বলল না দেখে আবার শুরু করল সে, 'কারণটা আর কিছুই নয়, ঈর্ষা।'

'ঈর্ষা?'

'শারমিন আমাকে ফোন করে বলল, সে আমার সাথে বেরুতে পারবে না। প্রথম কয়েক মিনিট সব ঠিক ছিল, স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম। তারপরই সন্দেহটা জাগল—শারমিনের সাথে কি অন্য কোন পুরুষ আছে? তারপর ভাবলাম, হ্যাঁ, ঠিক তাই। মনের অবস্থা এমন দাঁড়াল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখন হোস্টেলের সামনে পৌঁছে গেছি নিজেই জানি না। কি বলবেন জানি…পরিণত একজন মানুষ এ-ধরনের অদ্ভুত আচরণ করতে পারে না…'

'না,' সহাস্যে বলল রানা। 'মোটেও অদ্ভুত নয়।' গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামাল ও, 'প্রেমে পড়ে আমিও একবার…থাক সেকথা।' হঠাৎ গম্ভীর হলো ও।

'যদি জানতাম শারমিনের ঘরে আপনি আছেন তাহলে তো যেতামই না…'

'পুলিসকে আপনি কথাটা বলেননি কেন? আটচল্লিশ ঘন্টা মুখ বন্ধ করে থাকার কি কারণ? কি ঘটতে যাচ্ছে আপনি জানেন না?'

'কে বিশ্বাস করবে? এই বয়সে...প্লীজ, আর কেউ যেন না শোনে...'

'বলতে হয়তো হবে, তবে সম্ভব হলে চাপা থাকবে, কথা দিলাম।'

'না, মানে...শারমিন জানলে লজ্জায় আমি...'

'ঠিক আছে। জানবে না।'

বাইরে থেকে দেখে যাই মনে হোক, অন্তত এই মুহূর্তে অসহায় শিশুর মত লাগল সুব্রতকে। শারমিনকে দেবীর মত পুজো করে সে, আর দেবী স্বয়ং তার প্রতি এখনও পুরোপুরি সদয় নয় বলে নিজের ব্যক্তিত্বহীন আচরণ গোপন রাখতে চায়। সুব্রতকে আরও অসহায় করে তোলার কোন ইচ্ছে রানার নেই, তবে দেবীর আসন থেকে শারমিনকে নামাতে পারলে ওর তদন্তের স্বার্থে অনুকূল ফল পাওয়া যেতে পারে। 'না বলে পারছি না,' খুক করে কাশল রানা, 'শারমিনকে নিয়ে আপনি বোধহয় খানিকটা বোকামি করে ফেলেছেন।'

একটা ঝাঁকি খেলো সুব্রত। 'কি? মানে?'

'যা বললাম।'

'আপনি বলতে চাইছেন আমার প্রতি তার ধারণা, অনুভূতি...?'

'আপনি জানেন কিনা জানি না, তবে একটা কথা সত্যি, আপনার সাথে ঘন ঘন বেড়াতে বেরুনোর পিছনে তার একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল।'

'গোপন উদ্দেশ্য? কি বলছেন আপনি!'

'শারমিন আপনাকে রাজনীতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছে, তাই না?'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে রানার মুখে কি যেন খুঁজল সুব্রত, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে কথা বলাতে চেয়েছে সে। কারণটা আমি বুঝিনি।'

'সহজ ব্যাখ্যা আছে। কাজটা শারমিন নিজের বুদ্ধিতে করেনি। আরেকজন তাকে অনুরোধ করে।'

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে রানার সামনে পড়ল সুব্রত বড়ুয়া। 'সব খুলে বলুন তো! নাকি আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?'

'আপনার রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পর্কে একজনের মনে সন্দেহ দেখা দেয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করেন। তাঁর সে অধিকার আছে, কারণ প্রজেক্টের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তাঁকে দায়ী করা হবে। তাঁর কথামতই শারমিন আপনার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়।'

স্থির পাথর হয়ে গেল সুব্রত, শুধু মুখে ছায়া পড়ল গভীর বেদনার। 'শারমিন... শারমিন আমাকে...আপনি ঠিক জানেন এ-সব সত্যি?' ধীরে ধীরে গম্ভীর হলো সে। 'কে সে? কার কথায় শারমিন...?'

'তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, ব্যস, এখানেই ব্যাপারটার ইতি ঘটুক না?'

হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল সুব্রত বড়ুয়ার। 'না, আমাকে জানতে হবে। তা না হলে আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব না।'

'বিশ্বাস করতে অসুবিধে হলে শারমিনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

'না, আমি ভাবতেও পারি না…আপনি কি এ-বিষয়েই তার সাথে সেদিন রাতে আলাপ করছিলেন?'

'হ্যাঁ, আরও অনেক বিষয়ের মধ্যে এটাও ছিল।'

'সুব্রতটা কি বোকা, বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল শারমিন, তাই না?' প্রায় হিংস্র হয়ে উঠল বড়ুয়া বাবুর চেহারা। 'আমাকে নাকানিচোবানি খাইয়ে…'

'না, আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না। কাজটা করতে হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, লজ্জায় বেচারি মরে যাচ্ছে! আমি যখন তাকে বললাম যে আপনি তাকে ভালবাসেন, আরও কষ্ট পেয়েছে সে…'

'কি।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুব্রত। 'আপনি তাকে বললেন! গুড গড! এতদিনেও সে বোঝেনি, ব্যাখ্যা করে তাকে আপনার বোঝাতে হলো?' ঝট্ করে ঘুরে লোহার রড আর তারের জাল লাগানো খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল সে।

'শারমিন আপনাকে পছন্দ করে, সে নিজে আমাকে বলেছে।'

'পছন্দ করে!' ঘৃণায় হিসহিস করে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। জানালার দিকে পিছন ফিরল সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে, ছিহ্! ও এত নীচ হতে পারল! আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি শারমিন একটা… একটা দুশ্চরিত্রা মেয়ে…!'

'তা সে নয়,' শান্তভাবে বলল রানা।

'রাখুন সাহেব!' প্রায় ধমকে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। 'আপনার কি, এই জঘন্য আচরণ যদি আপনার সাথে করত তাহলে দেখতেন কেমন লাগে!'

কথা না বলাই উত্তম বলে ভাবল রানা।

'আমাকে তাহলে বেঈমান বলে মনে করে সে। বেশ বেশ। উপযুক্ত প্রতিদানই বটে!'

'হ্যাঁ, অন্তত এ-ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করেছেন। শারমিনের সন্দেহ, বেঈমান আপনিও হতে পারেন।'

'ওটা একটা ডাইনী!' চিৎকার জুড়ে দিল সুব্রত বড়ুয়া। 'আমি তাকে ঘৃণা করি! আমি বেঈমান, তাই না? সে নয় কেন? সে হতে পারে না? আমি যদি বলি, সে-ই ডকুমেন্টগুলো চুরি করে জারাতে পাচার করেছে?'

'কথাটা আমিও ভেবেছি,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেখছি না।'

হঠাৎ হেসে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। 'তারমানে ভালো আপনাকেও সে আটকেছে? রূপ আর ভঙ্গি দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছিল মেয়েটা, ভুলে যাবেন না! বিশ্বাস করুন, পরিষ্কার করে কিছু না বললেও আমি হলপ করে বলতে পারি, সে আমার সাথে আগাগোড়া প্রেমের অভিনয়ই করে গেছে। বোধহয় আপনার সাথেও…'

'না,' বলে চুপ করে থাকল রানা।

রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল সুব্রত বড়ুয়া। 'ফটোটায় সে আছে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে ওটা সে-ই তোলেনি। আপনি জানেন, সে দক্ষ ফটোগ্রাফার? তার পক্ষে যে-কোন ষড়যন্ত্র করা সম্ভব।'

'ষড়যন্ত্র করে বিষ মেশাবে কফিতে, তারপর সেটা খেয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নেবে?'

'মানে?' প্রসঙ্গটা ধরতে এক সেকেন্ড সময় নিল সুব্রত বড়ুয়া। 'ও, বিষ।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, আসুন ওটা নিয়ে আলোচনা করি। শুনেছি, আপনারা একসাথে ডিনার খেয়েছেন। প্রস্তাবটা কার ছিল?'

'শারমিনের।'

'সে কফি খায় না। শুনেছি আপনার জন্যে আনানো হয়। কফির কথা কে তোলে?'

'শারমিন।'

'খায় না, কিন্তু সেদিন খেলো—কেন? নিজের ইচ্ছেয়, নাকি আপনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, মানে...'

'আপনি তাকে খাইয়েছেন। কেন?'

'কারণটা আপনাকে আমি বলতে বাধ্য নই।'

'কিন্তু পরিষ্কার, তাই না? আপনি ভয় পেয়েছিলেন শারমিন হয়তো আপনার কফিতে বিষ মিশিয়ে রেখেছে।'

'শুনুন,' বলল রানা। 'এখানে কে কাকে জেরা করছে?'

'আমি আপনাকে,' গলা চড়িয়ে বলল সুব্রত বড়ুয়া। 'সে অধিকার আমার আছেও বটে। আপনি আমার মাথাটাকে প্রায় বিগড়ে দিয়েছেন। কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝার চেষ্টা করছি আমি। ধরুন, শারমিন সন্দেহ করল আপনি জানেন সে আপনার কফিতে বিষ মিশিয়েছে। এবার, আপনি যদি তাকে কফি খেতে বলেন, খাবার জন্যে চাপ দেন, কি করার ছিল তার? খেতে অস্বীকার করলে, আপনি হয়তো খাবেন না। যদি খায়, তাহলে তাকেও মরার ঝুঁকি নিতে হয়—যদি না সময়মত ডাক্তারকে খবর দেয়া যায়। কিন্তু শুধু এভাবেই নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারে সে—চিরকালের জন্যে। ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু নিয়েছে সে, এবং আপনাকে বোকা বানিয়েছে।'

হেসে উঠল রানা। 'রূপকথা পড়ার অভ্যেসটা এখনও ছাড়েননি দেখছি' আপনার বিবেচনা থেকে মেয়েটা স্বয়ং বাদ পড়ে যাচ্ছে। এতদিন ধরে তাকে দেখে কি মনে হয় আপনার, তার পক্ষে কাউকে বিষ খাওয়ানো সম্ভব? প্রেম আর ঘৃণা নাকি পাশাপাশি থাকে. এই মুহূর্তে আপনার ভেতর সম্ভবত শুধু ঘৃণাই উথলে উঠছে।'

হিংস্রদৃষ্টিতে রানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সুব্রত বড়ুয়া. তারপর হিসহিস করে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে আপনার মাথায় আগুন ধরাবার ব্যবস্থাই করি। বলুন তো, শারমিন আর একরামুল হক যে পরস্পরের আত্মীয়, আপনি জানেন?'

রানার দম বন্ধ হয়ে এল। 'আত্মীয়?'

'জানেন না! একরামুল হক শারমিনের ভাসুর ছিলেন, বুঝলেন! আমার বানানো কথা নয়, ইচ্ছে করলেই খোঁজ নিয়ে যাচাই করতে পারবেন। শারমিনের স্বামী,

আহসানুল হক, যার সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, তার সৎ ভাই ছিলেন একরামুল হক–মা এক, তবে বাবা আলাদা।' বিজয়ীর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে রানার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে থাকল সুব্রত বড়ুয়া।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছে রানা। কথাটা আগে কেন কেউ জানায়নি তাকে?

'ইন্টারেস্টিং, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সুব্রত বড়ুয়া। 'সম্ভবত তাৎপর্যপূর্ণও বটে, কি বলেন?'

হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু সে-কথা স্বীকার করতে রাজি নয় রানা, তাই শুধু বলল, 'ঠিক আছে। আপনি তাহলে শারমিনকে অভিযুক্ত করছেন। আপনার প্রতি অন্যায় করে তার মন খারাপ হয়ে আছে, তবে আপনার অভিযোগ শোনার পর আশা করি তার মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। আপনি বরং প্রস্তুতি নিন, তার সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগটা করলে ভাল হয়।'

'তার সামনে...কেন? তার দরকার কি? কেন আমি...' কিন্তু ইতোমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, প্রতিবাদরত সুব্রত বড়ুয়াকে সেলের ভেতর রেখে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

সোহেলের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে সুব্রত বড়ুয়ার দেয়া তথ্য যাচাই করা সম্ভব হলো। একরামুল হকের এক সৎ ভাই আছে বটে, নাম আহসানুল হক। শারমিন চৌধুরীর ফাইল ঘেঁটে জানা গেল, আহসানুল হক নামে এক লোকের সাথেই তার বিয়ে হয়েছিল; তবে আহসানুল হক বাংলাদেশে আরও অনেক আছে, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা দরকার।

ক্লিনিকে পৌঁছে রানা দেখল, নিজের কেবিনে ঘুমে ঢুলছে শারমিন। দরজা খোলার আওয়াজ শুনে চোখ মেলে তাকাল সে। রানাকে দেখে হাসল। বলল, 'এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম।'

দরজা বন্ধ করে বেডের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, শারমিনের বাড়ানো হাতটা দেখতে না পাবার ভান করল। 'আপনার প্রাক্তন স্বামী সম্পর্কে বলুন আমাকে।'

'ও, আচ্ছা, তার কথা তাহলে জেনে ফেলেছেন!'

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'কথাটা কি সত্যি? একরামুল হক আর আহসানুল হক পরস্পরের সৎ ভাই?'

'হ্যাঁ,' কোন রকম ইতস্তত না করেই বলল শারমিন। 'কথাটা আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এইমাত্র আপনাকে দেখেই বলার ইচ্ছে হয়েছিল আমার...'

'হ্যাঁ। আপনার মুখে শুনতে পেলে ভাল হত। ইদানীং আপনার সাথে একরামুল হকের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল?'

'না। ল্যাবে যেদিন এলেন, বহু বছর পর সেদিনই প্রথম দেখা হলো।'

'যোগাযোগ ছিল না? ফোন করতেন না আপনারা? কিংবা চিঠি...?'

বিছানায় উঠে বসল শারমিন। 'কি আশ্চর্য! ডিভোর্স হয়ে গেছে কত বছর আগে, স্বামীর বড় ভাইয়ের সাথে কেন আমি যোগাযোগ রাখব?'

'ল্যাবে যেদিন এলেন, আপনাদের মধ্যে কি আলাপ হলো?'

'অতীতের কথা? কিছুই আলাপ হয়নি। পরস্পরকে আমরা চিনতে পারলাম, কিন্তু প্রসঙ্গটা তুললাম না।'

'এক সময় ভাসুর ছিলেন ভদ্রলোক, তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সব কথা জানা আছে আপনার। কি কি জানেন বলুন দেখি।'

তীক্ষ্ণচোখে তাকাল শারমিন। 'ঠিক কি জানতে চান আপনি?'

'তাঁর মত জ্ঞানী-গুণী মানুষের অমন অধঃপতন হলো কেন?'

'শুনেছি প্রথম জীবনে প্রেমে ব্যর্থ হবার ফলেই তিনি মদ ধরেন। তারপর আর ছাড়তে পারেননি। বোধহয় সেজন্যেই সারা জীবন বিয়েও করেননি...'

'তাঁর পাকিস্তানে গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে কি জানেন আপনি? লাহোর থেকে পালিয়ে আসার পর ভারত সরকারই বা কেন তাঁকে গ্রেফতার করেছিল?'

'পাকিস্তানে গ্রেফতার হয়েছিলেন? ভারত সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেছিল?' আকাশ থেকে পড়ল শারমিন। 'কই, আমি তো কিছু জানি না। অবশ্য এ-সব আমার বিয়ের অনেক আগের ঘটনা। তবে,' চিন্তিত দেখাল তাকে, 'এ-ধরনের কিছু ঘটলে আহসান আমাকে বলত...'

'আপনাদের বিয়েটা ভেঙে গেল কেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার...'

'আমি কিন্তু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি না,' ঠাণ্ডা গলায় মনে করিয়ে দিল রানা। 'ভুলে যাবেন না, একজন বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমি।'

'আহসান ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল,' বলে মাথা নিচু করল শারমিন। 'কোনভাবেই তাকে আমি ভাল করতে পারিনি।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তাহলে একরামুল হকের গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে কিছু জানেন না?'

'না।'

'কিন্তু এখানে বলা হয়েছে,' সোহেলের দেয়া রিপোর্টটা পকেট থেকে বের করল রানা, পাতা উল্টে তথ্যগুলো পড়ল। প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাথে দেখল, ভারত বা পাকিস্তানে একরামুল হকের গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে সোহেলের দেয়া রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। শুধু লেখা আছে, 'অসুস্থ অবস্থায় লাহোর থেকে পালিয়ে আসেন তিনি, তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ছিলেন'। 'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! এখানে ও-সব কিছুই লেখা নেই।' শারমিনের দিকে তাকাল ও। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আহসানুল হককে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে। বলতে পারেন, তাঁকে কোথায় পাব আমি?'

'খুলনার একটা ওষুধ কোম্পানীতে চাকরি করে। কোম্পানীর নাম ছাড়া আর কিছু আমি জানি না।'

'প্লীজ, নামটা বলুন।'

নামটা জেনে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা, শারমিনকে বলল খানিক

পর ফিরে আসবে। ক্লিনিকের অফিস থেকে খুলনায় ফোন করল রানা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওষুধ কোম্পানীর হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ হলো। আহসানুল হকের এক সহকর্মী জানাল, একরামুল হকের জানাজায় যোগ দেয়ার জন্যে আহসানুল হক এই মুহূর্তে ঢাকায় রয়েছে। ঢাকায় হোটেলে উঠেছে সে। হোটেলের নামটা জেনে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা।

ঢাকার হোটেলে ফোন করে, ভাগ্য ভাল, আহসানুল হককে পেয়ে গেল রানা। নিজের পরিচয় দিল সাংবাদিক বলে, অধ্যাপক একরামুল হকের বিশদ জীবনী জানতে পারলে একটা লেখা লিখবে। বিশেষ করে ভদ্রলোকের লাহোর সেন্ট্রাল জেল ভেঙে পালানো আর ভারতে গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দরকার তার। উত্তরে কর্কশ স্বরে হাসল আহসানুল হক। কে, সে জানতে চাইল, আজগুবি গল্পটা বানিয়েছে? পাকিস্তান থেকে একরামুল হক পালিয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু জেল ভেঙে নয়, কারণ সেখানে তিনি গ্রেফতার হননি। আর ভারতে তাঁর গ্রেফতার হওয়ার কাহিনীও স্রেফ ভিত্তিহীন। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার দরুন তাঁর লিভারে সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল, একটা ক্লিনিকেই কাটে তিন মাস। তারপর, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান তিনি।

হতভম্ব হলো রানা। তারপর ভাবতে বসল ও। হঠাৎ করেই মনে পড়ল এক কর্নেলের কথা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন ভদ্রলোক। আবার ঢাকায় ফোন করল রানা। ভদ্রলোককে বাড়িতেই পাওয়া গেল। রানার প্রশ্ন শুনে তিনি হাসলেন। বললেন, 'দূর, কে বলল তোমাকে? আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছিলাম আমি, একরামুল হককে চিনতামও। না, তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হলেও, পাকিস্তান পুলিস ধরতে পারেনি। আমরা দু'দিন আগে পরে ভারতে পালিয়ে আসি। আহমেদাবাদে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়। ভারত সরকার তাঁকে গ্রেফতার করার প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, তখন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। গোটা ব্যাপারটা এতদিনে একটা আকৃতি পাচ্ছে বলে মনে হলো ওর।

চোদ্দ

সময় বয়ে চলেছে অথচ টাইগার পাস, কদমতলীতে গিলটি মিয়ার ছায়া পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। প্ল্যান বদল করার দরকার হবে কিনা ভাবছে রানা, এই সময় নাটকীয় আকস্মিকতার সাথে গাড়ির পাশে সটান খাড়া হলো এক লোক।

আগেই পৌঁচেছে গিলটি মিয়া, ক্রল করে গাড়ির জানালার নিচে এসে হঠাৎ এভাবে খাড়া হবার কারণ, তাকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিল রানা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার, তারপর তাকে চিনতে পেরে ধড়ে প্রাণ ফিরে

পেল। 'এ-সব কি? জিনিসটা এনেছ?'

গিলটি মিয়ার ছোট্ট মুখে চওড়া হাসি ফুটল। 'ইয়েস, স্যার।' চোরের মত চারদিকে চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঢোলা ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল সে, জানালা গলিয়ে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে গাড়ি থেকে নেমে এল রানা।

'চলো।'

'আশপাশটা নির্জন তো, স্যার? একবার চষে এলে হত না?'

'এখন আর সময় নেই।' একশো গজের মত হেঁটে গলির মুখ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। 'ঝুঁকিটা নিতেই হবে।' বাড়িটার সামনে দিয়ে দশ গজের মত এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, রাস্তায় লোকজন থাকলেও তারা সবাই এইমাত্র ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেছে, কেউ তাকিয়ে নেই। ঘুরল রানা, ওর সাথে গিলটি মিয়াও। 'যাও, তালা খোলো।'

বাড়িটার দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে, ভেতরে লোকজন নেই। এক হাতে কোমরের কাছে ট্রাউজার ধরে, অপর হাতটা পকেটে ভরে চাবি বের করল গিলটি মিয়া, তার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা।

চাবি নয়, গিলটি মিয়ার ভাষায় জাদুর কাঠি, তার নিজের আবিষ্কার। ফুটোয় ঢুকিয়ে বার তিনেক ঘোরাতেই খুলে গেল তালা।

'তালা লাগিয়ে কেটে পড়ো,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'খবরদার, রাস্তায় ঘুরঘুর করবে না। তাড়াতাড়ি, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।'

'ঠিক আছে, স্যার। আশপাশেই আচি আমি।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। কবাট বন্ধ করল। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল গিলটি মিয়া। কান পেতে থাকল রানা, তার পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে।

এই ঘরে আগেও এসেছে রানা, কোন ফার্নিচার নেই কেউ এসে পড়ার আগে ঘরগুলো একবার ঘুরে দেখা দরকার। ড্রইংরুমটাও পরিচিত–সোফা, কালার টিভি, কার্পেট সব আগের মতই আছে। দুটো জানালা, তার মধ্যে একটা খোলা। বাইরে রেললাইন দেখা যায়। ড্রইংরুম থেকে একটা করিডরে বেরিয়ে এল ও। উল্টোদিকের দেয়ালে দুটো দরজা, দুটোই বেডরুম, দুই বেডরুমের মাঝখানে একটা দরজা।

করিডরের ডান দিকে আরেকটা দরজা, খোলা দেখে ঢুকে পড়ল রানা। এটা ডাইনিং রুম। ডাইনিং রুমের আরেকটা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় বেডরুমে ঢোকা যায়। আত্মগোপন করার জন্যে দ্বিতীয় বেডরুম আর ডাইনিং রুমটাকে পছন্দ হলো রানার। করিডরের ডান দিকে আরেকটা দরজা আছে, তবে সেটা উল্টোদিক থেকে বন্ধ।

লুকোনোর জন্যে ডাইনিংরুমটাকে বেছে নিল রানা। জানালা আর দরজাগুলোয় মোটা পর্দা ঝুলছে, আড়াল নেয়া সম্ভব। ড্রইংরুমে ফিরে এসে একটা সোফায় বসল ও, অপেক্ষার পালা শুরু হলো। মাঝে মধ্যে একটা করে ট্রেন পাশ কাটাচ্ছে, থর থর-

করে কেঁপে উঠছে গোটা বাড়ি। তারপর আবার সব চুপচাপ। আশপাশের কোন ছাদ থেকে খানিক পর পর মিঁউ মিঁউ করছে একটা বিড়াল।

সোয়া ছ'টার মত বাজে, ইতোমধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, এই সময় সদর দরজায় শব্দ হলো। তালা খুলছে কেউ। চিতার মত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সোফা ছাড়ল রানা, ড্রইংরুম থেকে করিডর হয়ে অন্ধকার ডাইনিং রুমে ঢুকে পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিল। খুট করে আওয়াজের সাথে আলোকিত হয়ে উঠল ড্রইংরুম, আলোর আভাটুকু শুধু দেখতে পেল রানা। করিডরে পায়ের আওয়াজ, প্রথম বেডরুম হয়ে দ্বিতীয় বেডরুমে ঢুকল। একবার ইচ্ছে হলো পর্দার বাইরে মুখ বের করে দেখে, কিন্তু ঝুঁকিটা নিল না রানা। খুক করে কাশির শব্দ হলো—পুরুষকণ্ঠ। পায়ের আওয়াজ সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। পানির আওয়াজ হলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে কোথাও থামল না লোকটা, সোজা গিয়ে ঢুকল কিচেনে। কাপ-পিরিচের শব্দ হলো।

দশ মিনিট পর সব চুপচাপ, কোথাও কোন শব্দ নেই। দ্বিতীয় বেডরুমে ঢুকেছে লোকটা, কি করছে আল্লা মালুম। ঝুঁকি নিয়ে পর্দার আড়াল থেকে ধীরে ধীরে চোখ বের করল রানা।

দ্বিতীয় বেডরুমে একটা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি যেন লিখছে লোকটা। ইতোমধ্যে কাপড় বদলেছে সে। পরনে স্লিপিং গাউন। রানার দিকে পিছন ফিরে বসেছে সে। খস খস করে লিখছে, সম্ভবত চিঠি। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচ অন করল রানা।

একটানা পনেরো মিনিট লেখায় ব্যস্ত থাকল রিয়াজুল হাসান। তারপর রানার প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল, যদিও ঠিক এভাবে ঘটবে বলে আন্দাজ করেনি ও। করিডর আর দ্বিতীয় বেডরুমের মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ভেতরে ঢুকল দু'জন লোক। দু'জনের একজন মোটাসোটা, মাথায় টাক, যদিও এই মুহূর্তে তার চোখে চশমা নেই। লোকটাকে দেখার সাথে সাথে চিনতে পারল রানা। ঢাকার মণিপুরী পাড়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে এই ভুয়া রফিকুল বারীকেই দেখেছিল ও। দ্বিতীয় লোকটা লম্বা, একহারা, চেহারায় কাটখোট্টা ভাব।

'গুড ইভনিং, মিস্টার হাসান,' মৃদু, শান্তকণ্ঠে বলল রফিকুল বারী।

চমকে উঠে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রিয়াজুল হাসান, মুখ ঝুলে পড়েছে। টেবিলের ওপর হাতের তালু রেখে চেয়ার ছাড়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু রফিকুল বারী হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করল।

'নড়বেন না, প্লীজ। ওখানেই ভাল আছেন।' ভুয়া রফিকুল বারী আর তার সঙ্গী দুটো চেয়ার টেনে টেবিলের উল্টোদিকে বসল। আশ্চর্য কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, উপলব্ধি করল রানা। কিন্তু, ভাবল ও, লোকগুলো বাড়ির ভেতর ঢুকল কিভাবে? আগে থেকে কোথাও লুকিয়ে ছিল? তা সম্ভব নয়, উঁহুঁ। সবগুলো ঘর আর বাথরুম দেখে তারপর ডাইনিং রুমে লুকিয়েছে ও। তাছাড়া, ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে না ওর উপস্থিতি সম্পর্কে ওরা সচেতন।

'গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা আজ, এখনই হয়ে যাওয়া দরকার,' ঠাণ্ডা, প্রায় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল নকল রফিকুল বারী। 'এভাবে তো আর চলতে দেয়া যায় না।'

ঘটনা যেদিকে মোড় নেবে বলে ধারণা করেছিল রানা, তার সাথে আলোচনার ধরন মিলে যাচ্ছে। রানার দিকে পিছন ফিরে থাকায় রিয়াজুল হাসানের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছে না ও, তবে কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হলো না। বেশ জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে সে।

'আমরা আপনাকে কিছু না করে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলাম,' বলল রফিকুল বারী। 'যাই ঘটুক না কেন, আপনি কোন অ্যাকশনের মধ্যে যাবেন না। টোপ হিসেবে একরামুল হককে ব্যবহার করা হলো, কিন্তু ধাপ্পাটা কাজে লাগল না, কাজেই আরেকটা উপায় বের করার জন্যে কাজ শুরু করলাম আমরা। আগেই পরিষ্কার করে আপনাকে বলা হয়েছিল, এ-সব আমাদের কাজ। কিন্তু আপনাকে বারবার করে সাবধান করা সত্ত্বেও আপনি নির্দেশ অমান্য করলেন। নিজের পেশায় আপনি যতই দক্ষ হন, বিষ মেশাতে গিয়ে এমন কাঁচা একটা কাজ করে ফেললেন যে সব এলোমেলো হয়ে গেল।'

'কোথায়, এলোমেলো হলো কোথায়?' প্রতিবাদের সুরে বলল রিয়াজুল হাসান। 'সুব্রতকে গ্রেফতার করেছে ওরা। ওরা জানে সুব্রতই কাজটা করেছে। আজ সকালে মেজর রহমান আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন...'

রফিকুল বারী কর্কশ শব্দে হাসল একবার। 'তিনি ভাব দেখিয়েছেন, আপনাকে তিনি সন্দেহ করছেন না, এই তো? আপনার জায়গায় আমি হলে, ভদ্রলোককে ছোট করে দেখতাম না। প্রথমবার ধাপ্পা দেয়ার সময় এই ভুলটা আমাদেরও হয়েছে। আগাগোড়া, প্রথম থেকেই, ওটা যে একটা ধাপ্পা তা তিনি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। তাই সমস্ত যুক্তি যখন বলছে যে একরামুল হকই দোষী, তখনও তিনি আসল অপরাধীর খোঁজে তদন্ত চালিয়ে গেছেন। একটা কথা পরিষ্কার, এই লোককে বেশিদিন বোকা বানিয়ে রাখা সম্ভব নয়। চিন্তা করবেন না, ভদ্রলোক খুব তাড়াতাড়ি চিনতে পারবেন আপনাকে।'

'তাহলে আমার...?' প্রায় ধরা গলায় শুরু করল রিয়াজুল হাসান।

বাধা দিয়ে ভুয়া রফিকুল বারী বলল, 'ভয় নেই, তাঁর দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনাকে ধরার সুযোগ তাঁকে আমরা অবশ্যই দেব না-দিতে পারি না। কারণটা পরিষ্কার, তাই না? সব দিক বিচার করে বলা যায়, তাঁর হাতে ধরা পড়ার জন্যে আপনি ঠিক ফিট নন। আমরা জানি, ধরা পড়লে আপনি কথা বলবেন।'

'কি বলছেন! কেন? না, অসম্ভব-কেন বলব!' ভয়ে কেঁপে গেল রিয়াজুল হাসানের কণ্ঠস্বর। 'আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে নিয়ে যাই করুক ওরা, একটা কথাও আদায় করতে পারবে না। এদিক থেকে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিশ্বাস করুন...'

'কথা যদি আপনি না-ও বলেন,' আবার বাধা দিল রফিকুল বারী, 'আপনি আমাদের আর কোন কাজে লাগছেন না। আপনি আপনার চাকরি হারাবেন, তারমানে আমরা হারাব তথ্যের উৎস। এই যখন পরিস্থিতি, এখন তাহলে আপনিই বলুন, কেন আমরা আপনাকে প্রোটেকশন দেব?'

প্রশ্নটার কোন উত্তর হয় না, বাড়া দশ সেকেন্ড অটুট থাকল নিস্তব্ধতা। এখনও অন্ধকার ডাইনিং রূমে, পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে রানা। নিস্তব্ধতা

সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিরা যদি মুখ তুলে এদিকে তাকায়ও, পর্দার বাইরে বেরিয়ে থাকা ওর মুখ তারা দেখতে পাবে না। তিনজন লোক, তিনটে কাঠের মূর্তির মত বসে থাকল টেবিলের দু'দিকে। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল তৃতীয় লোকটি। চেহারা যেমন কাটখোট্টা, তার কণ্ঠস্বরও তেমনি বেসুরো।

'তাছাড়া, আপনি আমাদের তেমন কোন কাজে লাগেননি, মি. হাসান। ডকুমেন্টগুলো তিন ভাগে ভাগ করা, তারমধ্যে আমরা মাত্র দু'ভাগ পেয়েছি। বাকি এক ভাগ...'

'পাবেন, ওটাও পাবেন!' ব্যাকুল কণ্ঠে বলল রিয়াজুল হাসান। 'আমি আপনাদের কথা দিয়েছি, শেষ পর্যায়ের ডকুমেন্টগুলো ফাইনাল হওয়া মাত্র আপনাদের হাতে এক সেট তুলে দেব।'

'কিন্তু সে-সময় আমরা যদি বা আপনাকে দিইও, মেজর রহমান দেবেন না,' বলল তৃতীয় লোকটা। 'কাজেই আমরা ঠিক করেছি, ফাইল ক্লোজ করব। বি.সি.আই. বিস্তর কাঠ-খড় পুড়িয়েছে, তারা একটা রেজাল্ট পেতে ইচ্ছুক, কাজেই অপরাধীকে আমরা তাদের হাতে তুলে দিতে চাই—আসল অপরাধী, আপনাকে।'

শুধু ভাল করে দেখার জন্যে নয়, তৈরি থাকার জন্যেও বটে, পর্দা সরিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ডাইনিং রুমে আলো নেই, কাজেই লোকগুলো ওকে দেখে ফেলার ভয় কম। বিজনেস সিন্ডিকেটের এজেন্ট দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মহা আনন্দে হাসছে, তাদের কাছে যেন খুব মজার লাগছে পরিস্থিতিটা।

'কিন্তু আপনারা যে এইমাত্র বললেন আমি যাতে ওদের হাতে ধরা না পড়ি...' প্রতিবাদ জানাচ্ছে রিয়াজুল হাসান, কিন্তু সুরটা এমন করুণ যেন উত্তরটা কি হবে তা-ও তার জানা।

'আপনাকে ওদের হাতে তুলে দেয়া আর আপনার নির্জীব শরীর ওদের হাতে তুলে দেয়া, এক কথা নয়,' একঘেয়ে সুরে বলল দ্বিতীয় লোকটা। 'অপরাধ স্বীকার করে একটা চিঠি লিখে ফেলুন, ঝটপট। লিখুন, অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট তৈরির জন্যে অ্যান্টি-রেডিয়েশন স্ক্রীন সম্পর্কে যে গবেষণা আপনারা চালাচ্ছেন তার বিশদ বিবরণ, আংশিক, আপনি একটা বিদেশী রাষ্ট্রে পাচার করেছেন। বিজনেস সিন্ডিকেটের নাম লিখবেন না; লিখুন বিদেশী রাষ্ট্র। লিখুন, কাজটা আপনি আদর্শগত কারণে করেছেন। তারপর লিখুন, পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় আপনি...'

'দুনিয়া থেকে মুখ লুকোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' বাক্যটা সমাপ্ত করল ভুয়া রফিকুল বারী।

'চমৎকার! দুনিয়া থেকে মুখ লুকানো! ব্যস, আর কিছু নয়। ছোট্ট একটা স্বীকারোক্তি। আমাদের কথা বা আমাদের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কিছু লিখবেন না।'

দ্বিতীয় বেডরুম আর ডাইনিং রুমের মধ্যবর্তী দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে। এখনও ওর দিকে পিছন ফিরে নিজের চেয়ারে বসে আছে রিয়াজুল হাসান। গত ক'মিনিটে কুঁকড়ে আকারে ছোট হয়ে গেছে সে। তার মাথা

নড়তে দেখে রানা বুঝল, সামনে বসা লোক দু'জনের দিকে পালা করে তাকাচ্ছে সে। তার ঘাড় ঘামে চকচক করছে।

'আপনি দেরি করছেন কেন?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল রফিকুল বারী। 'ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি সারা যায় ততই ভাল, তাই না? আপনার সাথে আমাদের এতদিনের সম্পর্ক, আমরাও তো চাই না এই নরক যন্ত্রণা দীর্ঘসময় ভোগ করুন আপনি। নিন, নিন—কাজটা সেরে ফেলুন।'

কাটখোট্টা লোকটা একটা সিগারেট ধরাল. একটা মাত্র টান দিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল রিয়াজুল হাসানের দিকে। 'ধরুন, এটা টানতে টানতে লিখে ফেলুন।'

প্রায় ছোঁ দিয়ে নিয়ে সিগারেটে ঘনঘন টান দিল রিয়াজুল হাসান, তার মাথার ওপর ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী উঠল। 'ঠিক আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'আপনারা যা চান তাই হবে। দেব…একটা স্বীকারোক্তি লিখে দেব আমি…'

'আমরা এখুনি চাই,' বলল রফিকুল বারী। 'টেবিলে কাগজ কলম রয়েছে, শুরু করে দিন। আমি ডিকটেট করছি—আই, রিয়াজুল হাসান, অভ টোয়েনটি সেভেন টাইগার পাস, কদমতলী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ…'

আর কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল রিয়াজুল হাসান। লেখা শেষ করে কাগজটা বাড়িয়ে দিল সে।

'ওখানে, টেবিলের ওপরই রাখুন ওটা,' বলল রফিকুল বারী। 'কোথায় পাঠাতে হবে, আমরা জানি।' কোটের পকেটে হাত ভরে ছোট্ট একটা শিশি বের করল সে। ছিপি খুলে হাতের তালুতে খুদে একটা ক্যাপসুল নিল। ক্যাপসুলটা রাখল রিয়াজুল হাসানের সামনে, টেবিলের ওপর। 'কিছু না, স্রেফ গিলে ফেলুন,' সহাস্যে বলল সে, যেন প্যারাসিটামল খেতে বলছে। 'সাথে সাথে ফল পাবেন। কষ্টটুকু টেরই পাবেন না।'

তোতলাতে শুরু করল রিয়াজুল হাসান, 'দে-দেখুন এখনও আমি আ-আপনাদের কাজে আসতে পা-পারি। ভারতে নিয়ে চলুন আমাকে। ওখানে আপনাদের জন্যে কাজ করব আমি। নতুন একটা আইডিয়া আছে আমার মাথায়, সেটার ওপর কাজও শুরু করেছি। বিজনেস সিন্ডিকেট সাংঘা-ঘাতিক উপকৃত হবে। যদি চান, আমি স-সব লিখে দিতে পারি। শুধু একটা সুযোগ দিন আপনাদের কাজে লাগার…'

'না। নিজের সম্পর্কে আপনার যা ধারণা, তার সাথে আমরা একমত নই। আমরা জানি, আপনি একা প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান কমপ্লিট করতে পারবেন না। বেশিরভাগ কাজ তো আপনার সহকর্মীরা করেছেন। আপনাকে নিয়ে গেলে আমাদের গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত উঠবে না…'

কাটখোট্টা লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠল। তার হাত যেন হাত নয়, একজোড়া পাকানো রশি। সে-দুটো সামনে বাড়িয়ে হেঁটে এল সে, দাঁড়াল রিয়াজুল হাসানের পাশে। 'আপনি যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে চান, আই অ্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস। একটু হয়তো বেশি সময় লাগবে, তবে ফলাফল একই।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রিয়াজুল হাসান। আতঙ্কে আরও যেন একটু ছোট হয়ে গেল তার আকৃতি। হাতটা বাড়িয়ে দিল সে ক্যাপসুলের দিকে, আঙুলগুলো কাঁপছে।

'হ্যান্ডস আপ!' পিস্তল হাতে দ্বিতীয় বেডরুমে ঢুকল রানা।

কাটখোট্টা সাথে সাথে আদেশ পালন করল। কিন্তু ভুয়া রফিকুল বারী চেয়ার ছাড়তে শুরু করে খপ্ করে হাত ভরল পকেটে। এ-ধরনের সঙ্কটে দ্বিধা করা মানে অবধারিত মৃত্যু, ট্রিগার টেনে দিল রানা। বোমা ফাটার মত বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো পিস্তল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রফিকুল বারী, বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই চেপে ধরল, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। রিয়াজুল হাসানের হাত দুটো বিদ্যুৎবেগে খাড়া হলো মাথার ওপর। শান্ত, সাবলীল ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল রানা, চোখ দুটো তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লক্ষ করছে তিনজনকে।

'দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, তিনজনই। যদি তাড়াহুড়ো করেন, গুলি করব। জেনে রাখুন, কোন লাভ নেই–গোটা বাড়ি ঘিরে রাখা হয়েছে। ভুয়া বারী সাহেব, বাম হাতটা ওপরে তুলুন।'

কেউ কোন শব্দ করল না, তিনজনই হেঁটে গেল দেয়ালের দিকে। নিঃশব্দ পায়ে রফিকুল বারীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তাকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছে ওর। লোকটার টাক মাথায় উল্টো করা পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল ও। ছেড়ে দেয়া পাথরের মত পড়ে গেল রফিকুল বারী। অপর লোকটা আধপাক ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। সতর্ক ছিল রানা, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে লোকটার তলপেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারল। কোমর বাঁকা হয়ে গেল কাটখোট্টার, পরিবেশনের ভঙ্গিতে তার মাথা আর ঘাড় রানার সামনে নুয়ে পড়ল। পিস্তলের দ্বিতীয় আঘাতে তার খুলি ফাটিয়ে দিল রানা। বন্ধুর পাশে নেতিয়ে পড়ল সে।

'না, ভাই, না-না, আমাকে মারবেন না!' করুণ সুরে আবেদন জানাল রিয়াজুল হাসান। 'আমি নড়ব না!'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, তারপর তারও খুলি ফাটাল।

ধরাশায়ী তিনজনের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল ও। কার্পেটের ওপর মজার একটা নকশা তৈরি করেছে লোকগুলো। রিয়াজুল হাসানের মাথা রফিকুল বারীর কোলের ওপর পড়েছে দেখেই হাসি পেল ওর।

পালা করে তিনজনকে সার্চ করল রানা। একমাত্র রফিকুল বারীর পকেটে একটা পিস্তল পাওয়া গেল। সেটা পকেটে ভরে ড্রইংরূমে চলে এল ও, ফোনের রিসিভার তুলল। 'চলে এসো, গিলটি মিয়া। আবর্জনা সাফ করবে না?'

দ্বিতীয় বেডরূমে ফিরে এসে তিনজনকে পরীক্ষা করল রানা। জ্ঞান ফিরে পেতে সময় নেবে ওরা। করিডরে বেরিয়ে এসে ডান দিকে এগোল ও, আগেই দেখেছে বন্ধ দরজাটা খোলা হয়েছে। সন্দেহ নেই, এ-পথেই ঢুকেছে বিজনেস সিন্ডিকেটের লোকগুলো। খোলা দরজা টপকে বেরিয়ে এল রানা একটা ছোট্ট উঠানে। চারদিকে উঁচু পাঁচিল, উল্টোদিকের পাঁচিলে একটা দরজা, পাশের বাড়ি যাওয়ার পথ।

এতদিনে বোঝা গেল রেললাইনের ধারের এই বাড়িটায় কেন বাস করছে রিয়াজুল হাসান। দুটো বাড়ির মাঝখানে এই দরজাটা থাকায় বিজনেস সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিরা তার সাথে নির্বিঘ্নে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারত। তথ্য পাচার করার জন্যে অত্যন্ত নিরাপদ একটা সুযোগ করে দিয়েছে বাড়িটা। সারারাত সাতাশ নম্বর বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল গিলটি মিয়া, কসম খেয়ে রানাকে জানিয়েছে সে, রিয়াজুল হাসান বাড়ি থেকে একবারও বেরোয়নি। কিন্তু ঠিকই বেরিয়েছিল সে, তবে উনত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে, সাতাশ নম্বর থেকে নয়। কফিতে বিষ মিশিয়ে আবার সে সাতাশ নম্বরে ফিরে আসে, উনত্রিশ নম্বর বাড়ি হয়ে।

কলিংবেলের আওয়াজ শুনে রানা ধারণা করল, গিলটি মিয়া পৌঁছে গেছে।

পনেরো

ধূমায়িত কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। হাসি হাসি মুখ, তাকালেন রানার দিকে, খানিকটা নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে হাতের চুরুটটা নাড়লেন। 'রিপোর্ট তো দেবেই, তার আগে তোমার মুখ থেকে গল্পটা শুনতে চাই। বলো।'

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান ও ভারতে গ্রেফতার হয়েছিলেন একরামুল হক, এই মিথ্যে তথ্যটা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমাকে,' বলল রানা। বসের চেম্বারে, একটা হাতলহীন চেয়ারে বসে রয়েছে ও। 'কোত্থেকে পেলাম তথ্যটা? রিয়াজুল হাসানের দেয়া নোট থেকে। তথ্যটা সত্যি বলে সমর্থন করল কে? ভুয়া রফিকুল বারী। প্রজেক্ট ডিরেক্টরের সাথে কথা বললাম। উনি বললেন, হ্যাঁ, রফিকুল বারী আর একরামুল হক সম্পর্কে একটা নোট উনি রিয়াজুল হাসানকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে একরামুল হকের গ্রেফতার হওয়ার কোন তথ্য ছিল না। মূল কপিটা দেখেই কথাটা আমাকে জানালেন তিনি। তারমানে ওটা রিয়াজুল হাসানের বানানো তথ্য। কারণটা পরিষ্কার, তদন্তে দেরি করানো বা আমাকে ভুল পথে চালানো। কাজেই রিয়াজুল হাসানই অপরাধী।'

কাপে আরেকবার চুমুক দিয়ে রুমালে ঠোঁট মুছলেন রাহাত খান। 'তাকে সন্দেহ করার এটাই কি তোমার একমাত্র কারণ ছিল?'

'না, স্যার। এটা জানার পর আরও কয়েকটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগল। প্রথমবার যেদিন তার সাথে আমি দেখা করতে গেলাম, সে আমার পরিচয় জানতে চায়নি। ব্যাপারটা শুধু অবহেলা নয়। সে অপরাধী, কাজেই আমি ভুয়া হলে তার কিছু আসে যায় না। বরং আমি ভুয়া হলেই তার জন্যে ভাল হত।'

'তাছাড়া বিজনেস সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিরা তাকে তো আগেই জানিয়েছিল যে তার সাথে একজন দেখা করতে আসছে।'

'জী, স্যার। তারপর, তার বাড়িটা। বাড়ির সামনে দিয়ে খানিক পর পর একটা

করে ট্রেন যাচ্ছে। তার মত সচ্ছল এক জন লোক, নিরিবিলি পরিবেশ যার একান্ত দরকার, কেন সে ওই পরিবেশে থাকবে? আমাকে বলল বটে যে আওয়াজে তার কোন অসুবিধে হয় না, কিন্তু পরে দেখলাম ল্যাবের ছাদে আরও অনেক কম আওয়াজ হলেও রাগে ছটফট করছিল সে। তারমানে ওই বাড়িতে থাকার বিশেষ একটা কারণ আছে। কারণটা এখন আমরা জানতে পেরেছি।'

'লোকটাকে খুব একটা চালাক বলা যায় না, কি বলো?'

'কিন্তু অভিনেতা হিসেবে খুব ভাল, স্যার। ভুল করেছে ছোট্ট দু'একটা ব্যাপারে। একরামুল হক সম্পর্কে মিথ্যে তথ্যটা আমাকে দেয়া বোকামি হয়ে গেছে। তবে, আইডিয়াটা তার ছিল না...'

'তুমি তাহলে সন্তুষ্ট যে প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ...?'

'সুব্রত আর শারমিন নিষ্কলঙ্ক,' বলল রানা। 'রিয়াজুল হাসান না থাকায় গবেষণার তৃতীয় পর্যায়টা ফাইনাল করতে ওদের বেশ অসুবিধে হবে, তবে বেশ কিছু সময় দেয়া হলে কাজটা শেষ করতে পারবে বলে দু'জনেই ওরা আশাবাদী।'

'ওরা কি ইতিমধ্যে...?'

'জ্বী, স্যার। সুব্রত আর শারমিন কাজে যোগ দিয়েছে। আর...'

রানাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে রাহাত খানের ভুরু কুঁচকে উঠল। 'হ্যাঁ, বলো।'

'না, মানে...ওদের দু'জনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ছিল, সেটা আমি মিটিয়ে দিয়েছি। ব্যক্তিগত ব্যাপার...মানে...ওরা আগামী হপ্তায় বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

'গুড।' খুশি হলেন রাহাত খান। কারণটাও বোঝা গেল। 'ওরা এখন আরও মন দিয়ে গবেষণা চালাতে পারবে। ভাল কথা, ওদের তিনজনকে নিয়ে কি করা হবে কিছু ভেবেছ?'

'সমস্ত কিছু লিখে একটা স্বীকারোক্তিতে সই করেছে রিয়াজুল হাসান। কিন্তু বাকি দু'জন মুখ খুলবে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, স্যার, ওদের কেস বাইরে প্রকাশ না পাওয়াই ভাল।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে কি করা যায় দেখব আমি। সুযোগ পেলেই মেরে সাফ করো, তারপর একদম চুপ! বিজনেস সিন্ডিকেটের জন্যে এটাই সবচেয়ে ভাল ওষুধ। ঠিক আছে, এখন তুমি যেতে পারো। পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত ঢাকায় থাকছ তুমি।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল রানা, রাহাত খান ওকে থামিয়ে দিলেন। 'ছুটি চেয়ো না, কারণ তোমার টেবিলে অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।'

'না, মানে, স্যার,' ঢোক গিলে বলল রানা, 'ওদেরকে আমি কথা দিয়েছি বিয়েতে উপস্থিত থাকব...'

একটা ফাইল খুলে তাতে মনোনিবেশ করলেন রাহাত খান, যেন রানার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই। বসে থাকতে সাহস হলো না রানার, সাহস হলো না আর কিছু বলার। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, ঘুরল, দরজার দিকে

কে রাহাত খান বললেন, 'রওনা হবার আগে
হলে আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু সময় হবে না।
টশন পাওনা হয়েছে ওদের, সাথে করে নিয়ে যেয়ে
!' এক বুক আনন্দ নিয়ে বসের চেম্বার থেকে বেরি

***